

‘ইহুদী জাতির ইতিহাস’
এর পর

ইসরাইলের উত্থান-পতন

নির্বাসিত ইহুদীদের উদ্বাস্তু জীবন থেকে
ইসরাইল প্রতিষ্ঠার দুই শাজার বছরের ইতিহাস
এবং ইহুদী জাতির ভবিষ্যৎকথন



আব্দুল্লাহ ইবনে মাহমুদ

ইসরাইলের উত্থান-পতন

ইহুদী জাতির ইতিহাস-২ (শেষ খণ্ড)

নির্বাসিত ইহুদীদের উদ্বাস্তু জীবন থেকে ইসরাইল রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার
দুই হাজার বছরের ইতিহাস এবং ইহুদী জাতির ভবিষ্যৎকথন



আব্দুল্লাহ ইবনে মাহমুদ

সম্পাদনা

উচ্ছ্বাস ভৌসিফ



হায়াবীথি

সম্পাদকের ভূমিকা

ধর্মীয় জাতিগোষ্ঠী হিসেবে ইহুদী জাতি বেশ রহস্যময়। প্রত্নতাত্ত্বিকভাবে প্রমাণিত না হলেও, ধর্মীয়ভাবে তাদের ইতিহাসের শেকড় অনেক প্রাচীন। বর্তমানে ‘ইহুদী জাতি’ ও ‘ইসরাইল’ মোটামুটি সমার্থক শব্দ হয়ে দাঁড়িয়েছে। সেজন্য মুসলিম সমাজে ইহুদীদের নিয়ে আছে ক্রোধ, ক্ষোভ এবং ক্ষেত্রবিশেষে ঘৃণা। কেন?

এই সবকিছুর জড় অনুসন্ধান করতে গেলে সময়ের হাত ধরে আমাদের ফিরে যেতে হবে সাড়ে তিন হাজার বছর আগের সেই প্রাচীন সময়ে। লেখক আব্দুল্লাহ ইবনে মাহমুদ সেটাই করেছেন। এ নিয়ে ২০২০ সালের অমর একুশে বইমেলায় প্রকাশিত হয় তার লেখা ‘ইহুদী জাতির ইতিহাস’।

লেখার শুরুটা হয়েছিল অবশ্য অন্যভাবে। আব্দুল্লাহ ইবনে মাহমুদ রোর বাংলার পাঠকদের জন্য ধারাবাহিকভাবে ‘ইহুদী জাতির ইতিহাস’ নামে একটি সিরিজ লিখছিলেন। শুরু করেছিলেন ২০১৮ সালের ১৭ জানুয়ারি। এই সিরিজের ১৭টি পর্ব রোরে প্রকাশিত হয়েছে। পরে পাঠকদের অভূতপূর্ব সাড়া পেয়ে লেখক সম্পূর্ণ একটি বই লেখা শুরু করেন। ২০২০ সালের ফেব্রুয়ারিতে সেই বইটিই প্রকাশিত হয়।

আমি নিজে বইটি পড়া শুরু করি রোর বাংলায়। গল্পের গভীরে ঢুকে আর থামার উপায় নেই। কাজেই, বইটা কিনে পড়তে হলো। কিন্তু সেখানেও গল্পের শেষ হলো না।

‘ইসরাইলের উত্থান-পতন’ সেই ‘ইহুদী জাতির ইতিহাস’-এর দ্বিতীয় ও শেষ খণ্ড। প্রথম বইটির একটি সারমর্ম তুলে ধরে এ খণ্ডটি শুরু করেছেন লেখক। তারপর ধারাবাহিকভাবে ইতিহাসের বাঁক ঘুরে, রোমান সাম্রাজ্য, পারস্য সাম্রাজ্য, মুসলিম সাম্রাজ্য, ইউরোপে ইহুদীদের জীবন, হলোকাস্ট হয়ে আজকের ইসরাইল রাষ্ট্র গঠনের পুরো ইতিহাসটি তুলে ধরেছেন। বইটি পড়লে ইহুদীদের গল্পটা যেমন জানা যাবে, তেমনই বোঝা যাবে বর্তমান ফিলিস্তিন কীভাবে আজকের অবস্থায় এসে পৌঁছাল। জানা যাবে নির্মম, রক্তাক্ত এক ইতিহাস।

বইটিতে বিশেষ সংযোজন হিসেবে পরিশিষ্টাংশে আছে ইহুদীদের পুরো ইতিহাসের সময়কাল নিয়ে একটি অধ্যায়। পাশাপাশি হিব্রু ভাষার একদম

বেসিকটা যেন পাঠক ধরতে পারেন, সেজন্যেও একটি অধ্যায় থাকছে। আর থাকছে পাঠকের প্রশ্নের উত্তর। 'ইহুদী জাতির ইতিহাস' বইটি পড়ে পাঠকেরা নানা সময়ে লেখকের কাছে গুরুত্বপূর্ণ অনেক প্রশ্ন পাঠিয়েছেন। বাছাইকৃত প্রশ্নগুলোর জবাব থাকছে এ বইতে।

আমাকে যখন লেখক আব্দুল্লাহ ইবনে মাহমুদ বইটা সম্পাদনা করতে বললেন, রাজি হয়ে গেলাম দ্রুতই। এরকম দারুণ একটা বই প্রকাশের আগে পড়ে ফেলার সুযোগ পাওয়াটা বেশ লোভনীয় বটে। তবে সম্পাদনার ঝঙ্কিও কম নয়। কিন্তু আব্দুল্লাহ ইবনে মাহমুদের সহজ ভাষা এবং চমৎকার উপস্থাপনা এই ঝঙ্কি অনেকটাই সহজ করে দেয়। ক্লান্তি আসে না। তার ওপর বর্ণাঢ্য ইতিহাসের ঘটনার ঘনঘটা তো আছেই! একটানা পড়ে ফেলা যায়। তবে এ বইটা একটু সময় নিয়ে পড়তে হবে। এত তথ্যের সমাবেশ ঘটেছে বইটিতে, মনোযোগ দিয়ে না পড়লে মুশকিল। খানিকটা এগিয়ে তাল হারিয়ে ফেলতে হবে সেক্ষেত্রে।

বাংলা ভাষায় ইহুদী জাতি ও ইসরাইল-ফিলিস্তিনের ইতিহাস এত বিস্তৃত পরিসরে আগে কখনো লেখা হয়নি। সে অর্থে এই বইটিকে একটি মাইলফলক বলা যায়। পড়ে আমি যে তৃপ্তি পেয়েছি, ইহুদী জাতির রহস্যজনক ইতিহাস নিয়ে যাদের আগ্রহ আছে, তারাও ঠিক ততটাই তৃপ্তি পাবেন বলে মনে করি।

উচ্ছ্বাস ভৌসিফ

মিরপুর, ঢাকা

২০ ফেব্রুয়ারি, ২০২২

লেখকের কথা

২০২০ সালের বইমেলাতে বেরিয়েছিল আমার ‘ইহুদী জাতির ইতিহাস’ বইটি। কথা ছিল, ২০২১ সালের মেলাতেই বের হবে ‘ইসরাইলের উত্থান-পতন’। কিন্তু কীসের কী, করোনা মহামারি এসে ভেসে দিল যাবতীয় পরিকল্পনা। আমি সেবার একদিনও বইমেলাতে যাইনি, বের করিনি একটি বইও। তবে ঘোষণা দিয়ে রেখেছিলাম যে, বইখানা আসছে শিগগিরই। সেই আসছে আসছে করে আরেকটি বছর পেরিয়ে গেল। দু’বছর বাদে ২০২২ সালের বইমেলায় প্রকাশিত হলো ‘ইসরাইলের উত্থান-পতন’। এর মাঝে ২০২১ সালে ইসরাইলের গাজা আক্রমণ হয়ে যাওয়াতে নতুন করে লোকের আত্মহ জেগে ওঠে পুরো বিষয়টি জানার। আমি আরও কিছু রসদ পেলাম, সেগুলো যোগ করলাম পাণ্ডুলিপিতে, আর সেই সাথে উত্তর দিলাম শত শত লোকের প্রশ্নের। আমার বিশ্বাস, বইটি এখন মোটামুটি পরিপূর্ণ বলা চলে।

প্রশ্ন হলো, ‘ইসরাইলের উত্থান-পতন’ বইটি কি আগের বইয়ের সিকুয়েল? উত্তর হলো, হ্যাঁ, আমি বইটি চিন্তা করে রেখেছিলাম ‘ইহুদী জাতির ইতিহাস’ লিখবার সময়ই, একসাথে মিলিয়ে লিখতে পারলেই ভালো লাগতো, কিন্তু ৭০০ পৃষ্ঠার বই কেউ পড়বে কিনা সেই সন্দেহ আঁকড়ে ধরেছিল। এখানে একটি ‘কিন্তু’ আছে। কিন্তুটি হলো, কেউ চাইলে এই ‘ইসরাইলের উত্থান-পতন’ বইটি এককভাবে পড়তে পারেন, আবার ‘ইহুদী জাতির ইতিহাস’ বইয়ের সাথে মিলিয়েও পড়তে পারেন। দুটোই চলে। ‘ইহুদী জাতির ইতিহাস’ যেখানে খ্রিস্টপূর্ব ‘ধর্মীয়’ ইতিহাস বর্ণনা করেছে, ‘ইসরাইলের উত্থান-পতন’ বইটি সেখানে খ্রিস্ট-পরবর্তী নিখাদ লিপিবদ্ধ ইতিহাস তুলে এনেছে। প্রথমটি পড়লে ধর্মীয় সমস্ত কিছু জানা হয়ে যাবে যা জানা দরকার এ বিষয়ে, আর দ্বিতীয়টি পড়লে ইতিহাস পুরোটা জানা হয়ে যাবে, যদি ধর্মীয় ব্যাকস্টোরি জানার আত্মহ না থাকে কারও। আর দুটোই পরপর পড়লে পাঠক অর্জন করতে পারবেন পবিত্র ভূমির আগাগোড়া ইতিহাস সম্পর্কে সম্যক ধারণা।

যাক গে। অনেকে প্রশ্ন করেছেন আমাকে, পবিত্র ভূমির সমস্যার সমাধান কী? এ প্রশ্নের উত্তর আমি দিতে পারলে তো ‘নোবেল শান্তি পুরস্কার’ এতদিনে আমার

হাতেই চলে আসতো! পবিত্র ভূমিতে এখন মুসলিমদের দু'ভাগে ভাগ করা যায়- ইসরাইলি নাগরিক যারা, আর যারা তা নয়, অর্থাৎ ফিলিস্তিনি মুসলিম। এ ব্যাপারটি অনেকে নিতেই পারেন না যে, ইসরাইল দেশটিতে মুসলিম আছে। শুধু যে আছে, তা-ই নয়, মোট জনসংখ্যার প্রায় ২১% হলো মুসলিম; করোনা গুরু আগের হিসেব বললাম। ১৯৪৮ সালের ঘটনার পর যারা ইসরাইলি বর্ডারের ভেতরে রয়ে যাওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছিল, সেই আরব মুসলিমদেরকে ডাকা হয় '৪৮-আরব'। এদের মাঝে আবার নেগেভ মরুর বেদুইনরাও আছে, যাদের গ্রামে এখনও অনেকের বিদ্যুৎ-পানি পৌঁছায়নি। ৪৮-আরবদের আত্মীয়-স্বজনরা ফিলিস্তিনের পশ্চিম তীর, গাজা উপত্যকা, জর্ডান, সিরিয়া ও লেবাননে থাকে। এই ইসরাইলি আরবদের প্রায় ৬০% বর্তমানে ইসরাইলকে ভালো চোখেই দেখে, অবাক লাগতে পারে শুনে। আর বেদুইনরাও নিজেদের ইসরাইলি পরিচয় দিয়ে থাকে। পূর্ব জেরুজালেমের ফিলিস্তিনি মুসলিমদের জন্য ইসরাইলের পক্ষ থেকে নাগরিকত্বের অফার রয়েছে, কিন্তু সবাই সেই অধিকার গ্রহণ করে না।

এই যে দেখুন, লেখকের দুটো কথা লিখতে বসে জ্ঞান দেয়া শুরু করে দিলাম, এগুলো নিয়ে বিস্তারিত বইয়ের ভেতরেই নাহয় পড়ে নেবেন। তবে এই বইটি মূলত এই পবিত্র ভূমির আজকের অবস্থা এমনতর কেন- এই প্রশ্নের কারণ অনুসন্ধানের একটি প্রয়াস।

আমি অধীর আগ্রহে থাকব পুরো ইতিহাস পরে পাঠকদের প্রতিক্রিয়া শুনবার। বর্তমান পরিস্থিতি বোঝানোর ব্যাপারে আমি যদি এতটুকুও সাহায্য করতে পারি কোনো পাঠকের, তাহলেই এই বই লেখা সার্থক।

আব্দুল্লাহ ইবনে মাহমুদ

ঢাকা

২১ ফেব্রুয়ারি, ২০২২

বিদ্রূপঃ আমার বইগুলোতে হিব্রু লিপি কেন ব্যবহার করি? এ প্রশ্ন অনেকে করে থাকেন। উত্তর হলো, মূল উচ্চারণগুলো করার বা বোঝার জন্য এই লিপির প্রয়োজন পড়ে। কিন্তু পাঠকেরা তো পড়তে পারেন না! এই সমস্যার সমাধানের জন্য এ বইয়ের শেষে দ্রুত সময়ে হিব্রু পড়ার টেকনিক যোগ করে দিয়েছি। এবার আপনি আমার বইগুলোর হিব্রু উচ্চারণ করে ফেলতেই পারেন!



সূচিপত্র

সম্পাদকের ভূমিকা
লেখকের কথা

অধ্যায়-১	: পূর্বকথন	১৩
অধ্যায়-২	: সেকেন্ড টেম্পলের যুগে	২১
অধ্যায়-৩	: হেলেনিজম শেষে	২৯
অধ্যায়-৪	: রাজা হেরোদের রাজত্বে	৪১
অধ্যায়-৫	: দুই নবীর হত্যাকাণ্ড	৪৬
অধ্যায়-৬	: অতঃপর যীশু খ্রিস্ট	৫৫
অধ্যায়-৭	: রোমের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ	৭০
অধ্যায়-৮	: জেরুজালেমের পতন	৭৭
অধ্যায়-৯	: মাসাদার ঘটনা ও মহাবিদ্রোহের ইতি	৮৬
অধ্যায়-১০	: রোমান শাসনে ইহুদী জীবন	৯৬
অধ্যায়-১১	: ব্যাবিলনের ইহুদী সমাজ	১০৭
অধ্যায়-১২	: ইসলামি সাম্রাজ্যে ইহুদী ধর্ম	১১৫
অধ্যায়-১৩	: খাজার ও কারাইট ইহুদীদের আবির্ভাব	১২৯
অধ্যায়-১৪	: আন্দালুসিয়ার দিনগুলিতে	১৪১
অধ্যায়-১৫	: মধ্যযুগের খ্রিস্টান ইউরোপে	১৪৮
অধ্যায়-১৬	: স্পেনের খ্রিস্টান রাজত্বে	১৫৬
অধ্যায়-১৭	: উসমানি সাম্রাজ্যে ইহুদীরা	১৭৭
অধ্যায়-১৮	: মধ্যযুগ থেকে আধুনিক ইউরোপে	১৮৪
অধ্যায়-১৯	: ইহুদী জাতি এবং সুদপ্রথা	১৯৩
অধ্যায়-২০	: ইহুদীদের আমেরিকা গমন	১৯৫

অধ্যায়-২১ : জায়োনিস্ট আন্দোলনের সূচনা	১৯৮
অধ্যায়-২২ : দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ এবং ইহুদী গণহত্যা	২১২
অধ্যায়-২৩ : ইসরাইল রাষ্ট্রের জন্ম	২২২
অধ্যায়-২৪ : ছয়-দিনের সেই যুদ্ধ	২২৮
অধ্যায়-২৫ : ভৌগোলিক ইসরাইল-ফিলিস্তিন	২৩৩
অধ্যায়-২৬ : অসলো অ্যাকর্ডস অবধি	২৩৯
অধ্যায়-২৭ : অতঃপর বর্তমান	২৪৭
অধ্যায়-২৮ : ইহুদী এসকাটোলজি	২৫৮
পরিশিষ্ট-১ : পাঠকের যত প্রশ্নের উত্তর	২৬৬
পরিশিষ্ট-২ : এক বালকে পুরো ইতিহাস	৩৩৩
পরিশিষ্ট-৩ : হিব্রু পঠন	৩৪২
পরিশিষ্ট-৪ : গ্রন্থপঞ্জি ও তথ্যসূত্র	৩৪৮
শেষ কথা	৩৫০

অধ্যায় ১

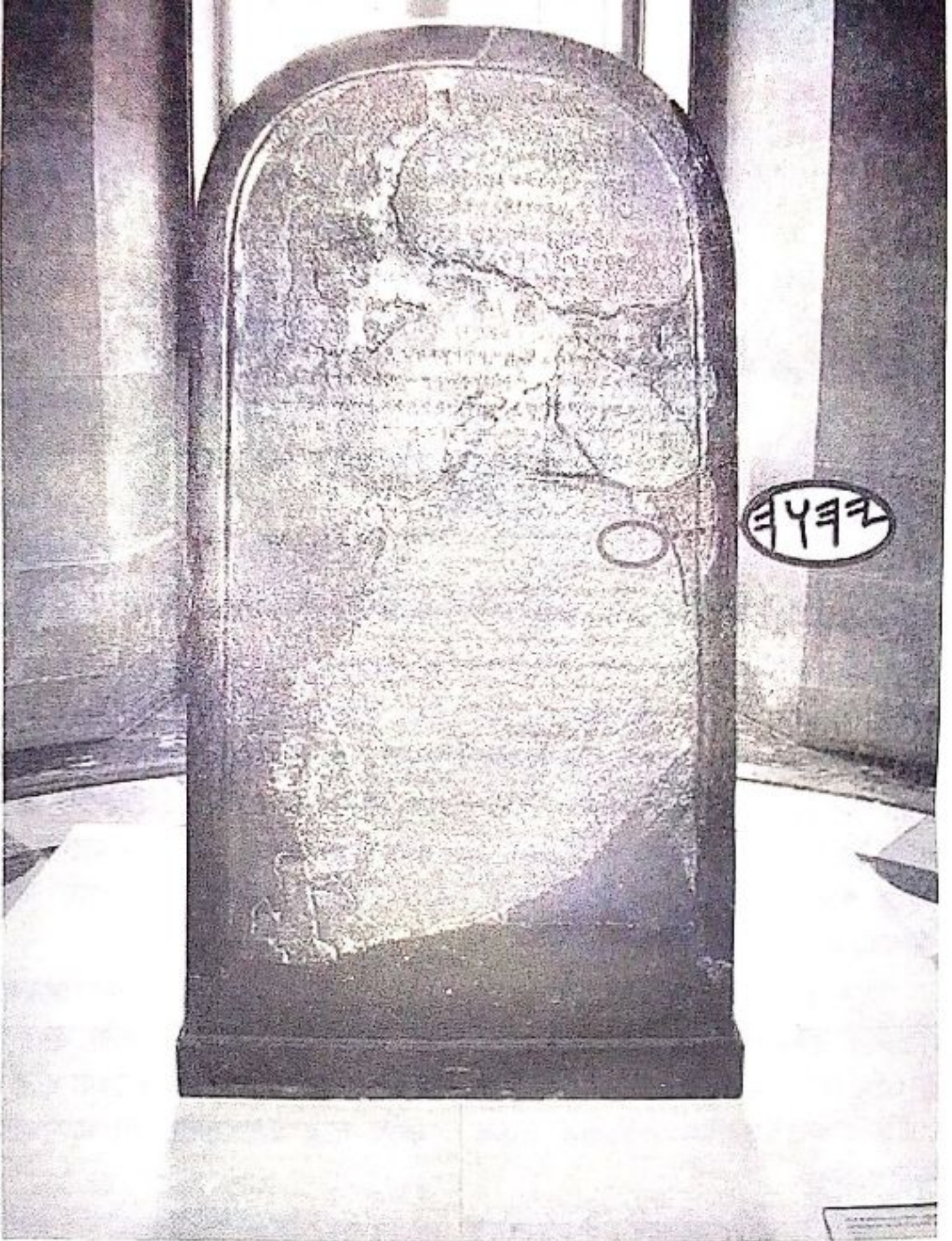
পূর্বকথন



আজকের ইহুদী রাষ্ট্র ইসরাইলের উত্থানের গল্প পুরোপুরি বুঝতে হলে জানতে হবে প্রাচীন “ইহুদী জাতির ইতিহাস”, যে ধর্মীয় ইতিহাসের সূচনা ইসলাম ধর্ম, খ্রিস্টধর্ম আর ইহুদী ধর্মের আদি পিতা ইব্রাহিম (আ)-এর হাত ধরে। বিস্তারিত জানা থাকলে বুঝতে বেশি সুবিধা হবে, তবে অতি সংক্ষেপে যীশু খ্রিস্টের জন্ম পর্যন্ত ইহুদী জাতির খ্রিস্টপূর্ব ইতিহাসটুকু বলে নেয়া যাক। কারণ আমাদের এ বইতে থাকছে খ্রিস্টীয় শতকের সূচনা থেকে ভবিষ্যৎ পৃথিবীর ইতিকথা, যার নেপথ্যে এই ইহুদী জাতি।

হিব্রু বাইবেল এবং ইসলামি ধর্মীয় ইতিহাস মোতাবেক, ঈশ্বর ‘ইয়াহওয়েহ’ (হিব্রুতে স্রষ্টাকে এ নামেই ডাকা হয়, আর আরবিতে ‘আল্লাহ’) নবী হযরত ইব্রাহিম (আ)-কে প্রতিশ্রুতি দেন, পবিত্র ভূমি কেনান তার বংশধরকে দেয়া হবে। এটিই এখন ইসরাইল-ফিলিস্তিন অঞ্চল। অর্থাৎ তার উত্তরসূরীরা এ এলাকার মালিক হবে।

ঈশ্বরের নাম হিসেবে ‘ইয়াহওয়েহ’ (יהוה)-কে এতটাই পবিত্রজ্ঞান করত ইহুদীরা, যে তারা উচ্চারণই করত না। বরং কোথাও নামটা লেখা থাকলে তারা সেটাকে পাঠ করত ‘আদোনাই’ (אדני) বলে, যার মানে ‘প্রভু আমার’। আর যদি সত্যি সত্যি পাশের শব্দটাই ‘আদোনাই’ হয়ে থাকে, তাহলে তারা ‘ইয়াহওয়েহ’ (YHWH)-কে ডাকত ‘এলোহিম’ (אלהים) বলে। অতিধার্মিক ইহুদীরা আজও এ রীতি মেনে চলে। প্রায় তিন সহস্র বছর আগের মোয়াবদেশীয় ফলকে আমরা ইয়াহওয়েহ নামখানা দেখতে পাই—



মোয়াবাইট ফলক, যেখানে ইয়াহওয়েহকে ইসরাইলিদের দেবতা বলা হয়েছে

ইব্রাহিম (আ)-এর প্রধান দুই পুত্র ইসমাইল (আ) আর ইসহাক (আ)। ভাগ্যক্রমে, ইসমাইল (আ) ও তার মা হাজেরাকে আরবের মক্কায় নির্বাসনে পাঠানো হয়। আর ওদিকে কেনান দেশে রয়ে যান ইসহাক (আ), যাকে ইংরেজিতে ডাকা হয় 'আইজ্যাক'। তার পুত্র ছিলেন ইয়াকুব (আ), অর্থাৎ

‘জ্যাকব’। ইয়াকুব (আ)-এর আরেক নাম ছিল ‘ইসরাইল’, তার বারো সন্তানের নামে ইসরাইলের বারো গোত্রের নাম হয়।

ঘটনাক্রমে বারো পুত্রের একজন ইউসুফ (আ) ভাইদের চক্রান্তে মিসরে উপনীত হন দাস হিসেবে। জেলের ভাত খেয়ে সাত বছর পর ভাগ্যের চাকা ঘুরে নিজেকে মিসরকর্তার ডান হাত হিসেবে আবিষ্কার করেন তিনি, এবং একইসাথে হন নবী। দুর্ভিক্ষপীড়িত অন্য ভাইয়েরা তখন তার কাছে সাহায্য চাইতে মিসরে আসে। তারা তখনও জানতো না, ইনিই তাদের মৃত বলে ধরে নেয়া সেই ভাই ইউসুফ (আ), বা ‘জোসেফ’। ইউসুফ (আ) তাদেরকে ক্ষমা করে দেন এবং পুরো পরিবারকে নিয়ে আসেন মিসরে।

কালের পরিক্রমায় শত শত বছর বাদে এই ইসরাইলিরা মিসরের শাসনকর্তা অর্থাৎ ফারাওয়ের দাসে পরিণত হয়। তাদেরকে ‘হিব্রু’ জাতি বলে ডাকতো স্থানীয় মিসরীয়রা। একদিন ফারাওয়ের ঘরে পালিত হওয়া এক মিসরীয় যুবরাজ রাজপরিবারের সমস্ত আয়েশ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে বহু বছর বাদে নির্যাতিত ইহুদীদের নেতা হিসেবে আবির্ভূত হন। তিনি আর কেউ নন, নবী হযরত মূসা (আ)। ইসরাইল জাতিকে লোহিত সাগর পার করে তিনি নিয়ে যান ওপারে, ফেরাউনের কবল থেকে মুক্ত করে।

নবী মূসা (আ) পেলেন আসমানি কিতাব তাওরাত। কিন্তু তখন একেশ্বরবাদী ইহুদীরা পৌত্তলিকতায় মগ্ন হয়ে পড়ে। ফলে আল্লাহ ৪০ বছর শাস্তি দেন তাদেরকে। মরুর বুকে ঘুরপাক খেতে থাকে তারা। অবশেষে নবী ইউশা (আ)-এর নেতৃত্বে তারা কেনান দেশে উপনীত হয়। এবার তাদের কেনান জয়ের পালা।

এখানে এসে আমরা বুঝতে পারি, কেনান দেশের আদি নাগরিক কারা ছিল। আমরা যাদেরকে আজ ফিলিস্তিনি বলি, বলা চলে তারাই। ফিলিস্তিনিরা এখানে আসে ইসরাইলিরা আসার কিছুটা আগে, খ্রিস্টপূর্ব ১২ শতকে। ফিলিস্তিনিরা মূলত ইজিয়ান (Aegean) অরিজিনের, অর্থাৎ ভূমধ্যসাগরের যে অংশ গ্রিস ও তুরস্কের মাঝে, সে এলাকার। তারা এসেছিল কাফতর থেকে। তার আগে এখানে ছিল হিভাইট, জেবুসাইট, এমরাইট, হিটাইট, পেরিসাইট-এরা। ফিলিস্তিনিরা পৌত্তলিক ছিল; তারা বা’ল, আশেরা ইত্যাদি দেব-দেবীর পূজা করত।

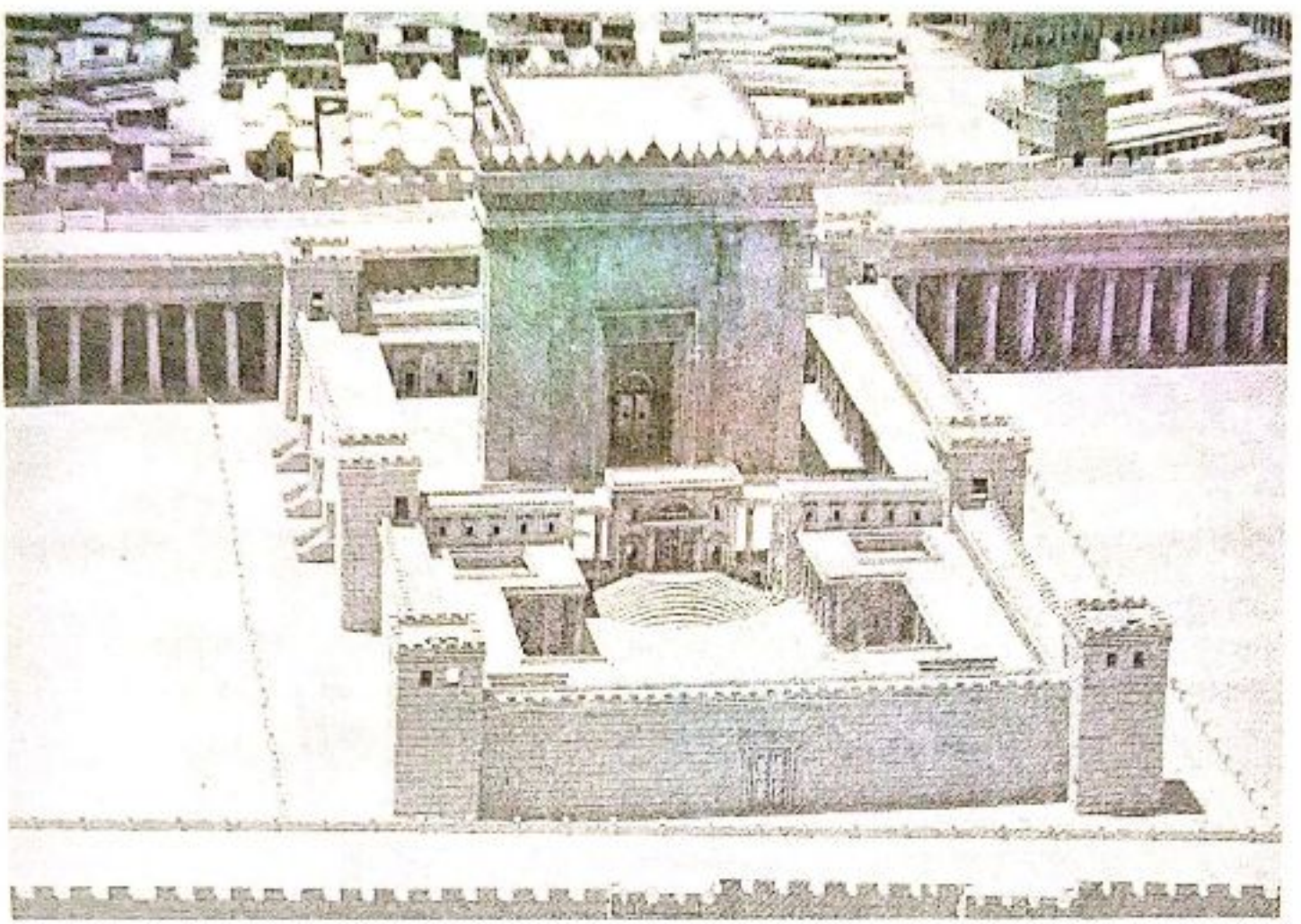
ইসরাইলিরা যখন কেনান দেশে থাকত, তখন তারা স্থানীয়দের বিয়ে করে। ফলে পরবর্তী বংশধর এমনভাবে বাড়তে থাকে যে, ৮৭.৫%-ই হলো কেনানীয় রক্ত। আর ফিলিস্তিনিরা নিজেদের কেনানীদের বংশধর বলেই জানে। তাই জিনগতভাবে তারা আসলে প্রায় একই। কেবল ধর্মবিশ্বাসে ছিল আলাদা। ইসরাইলিরা যেখানে উপাসনা করত এক ঈশ্বরের, সেখানে ফিলিস্তিনিরা ছিল পৌত্তলিক।



সিরিয়ার উত্তরের অত্যন্ত প্রাচীন উগারিত শহরের ধ্বংসাবশেষ থেকে পাওয়া দেবতা বা'লের
খোদিত প্রতিকৃতি

ইসরাইল রাষ্ট্রের প্রথম রাজা হন তালুত, যাকে বাইবেলে বলে সল (Saul)। বেথেলহেমের জেসি বা ইয়াসি-র ছোট ছেলে দাউদ (আ) [ইংরেজিতে তাকে বলা হয় ডেভিড] তালুতের সেনাবাহিনীর পক্ষ হয়ে ফিলিস্তিনের জালুত বা গোলায়াথকে পরাজিত করেন একক যুদ্ধে এবং তখনই সবার নজরে আসেন। কালক্রমে তিনি ইসরাইলের জনপ্রিয় রাজা কিং ডেভিডে পরিণত হন। ইহুদী ধর্মে তেমন কিছু বলা না হলেও, ইসলাম মতে, তিনি নবীও। তার পুত্র সলোমন বা সুলাইমান (আ) তার রাজ্যকে আরো প্রসারিত করেন। তিনি প্রতিষ্ঠা করেন 'বাইতুল মুকাদ্দাস', যা আমরা 'টেম্পল অফ সলোমন' নামেও চিনি ইতিহাসে।

১৬ ইসরাইলের উত্থান-পতন



টেম্পল অফ সলোমনের নকশা

সুলাইমান (আ) বা সলোমন মারা যাবার পর পুত্র রেহোবামের রাজত্বকালে ইসরাইলের পতন শুরু হয়, পৌত্তলিকতায় ডুবে যেতে থাকে। শক্তিমান ব্যাবিলন রাজ্যের আক্রমণে ইসরাইলিরা বন্দী হয়ে পড়ে। তাদের নির্বাসন শুরু হয়, আর ওদিকে ইসরাইল রাজ্য ধুলোয় মিশে যায়।

কিন্তু আল্লাহর চোখে শাস্তি শেষ হলে, পারস্যের রাজা সাইরাস তাদের ব্যাবিলন থেকে মুক্ত করে দেন। এ সময় নবী দানিয়েল (আ)-এর কীর্তি উল্লেখযোগ্য। ফিরে এসে তারা পুনরায় বানায় ধ্বংসপ্রাপ্ত ‘বাইতুল মুকাদ্দাস’। আগেরটির স্থানেই নতুন করে গড়া এ উপাসনালয় সলোমনের দ্বিতীয় উপাসনালয় বা ‘সেকেন্ড টেম্পল অফ সলোমন’ নামে পরিচিত। আর নবী কিংবা সাধু ব্যক্তি হযরত উজাইর (আ) [যাকে ইহুদীরা ‘এজরা’ ডাকে] ও নেহেমিয়া (আ)-এর নেতৃত্বে ইসরাইল আবার উন্নতির দিকে ফিরতে থাকে। তাছাড়া সাহায্য করেন নবী হিজকিল (আ) [যাকে ইহুদীরা ডাকে ‘এজেকিয়েল’]।

সুলাইমানপুত্র রেহোবামের সময় রাজ্য দুভাগ হবার কথা বলছিলাম। উত্তরের রাজ্য ইসরাইল, আর দক্ষিণের রাজ্য জুদাহ (এহুদিয়া)। এটি মোটামুটি খ্রিস্টপূর্ব ৯ম-১০ম শতকের কথা। আর মাঝখানে এত কাহিনী হয়ে রাজা সাইরাসের হাতে তাদের উদ্ধার পাবার সময়কাল ছিল খ্রিস্টপূর্ব ৫৩৯ সাল।



বাইবেলের সেই রাজা সাইরাস

যখন খ্রিস্টপূর্ব ৩২২ সালে আলেকজান্ডার দ্য গ্রেট মারা গেলেন, তখন তার জেনারেলরা কামড়াকামড়ি শুরু করে দেন রীতিমতো। যেমন, টলেমি নিয়ে নিলেন পুরো ইহুদী অঞ্চলের দখল। যদিও পরে সিরিয়ার সেলুসিদদের কাছে খ্রিস্টপূর্ব ১৯৮ সালে টলেমি হারিয়ে ফেলেন এ অঞ্চল। ওদিকে গ্রিক সভ্যতার সংস্পর্শে এসে ইহুদী ধর্ম প্রভাবিত হয়ে নতুন এক সেষ্ট গড়ে ওঠে, যারা পরিচিত হয় হেলেনিস্টিক জ্যু (ইহুদী) নামে। তাদের মাঝে ছিল গ্রিক সংস্কৃতির ছোঁয়া। মূল ধারার ইহুদীরা তাদের ধর্মচ্যুত মনে করত।

খ্রিস্টপূর্ব ৬৩ সালে রোমান জেনারেল পম্পে জেরুজালেম দখল করে নেন। যীশুর জন্মের ৪৭ বছর আগে আলেক্সান্দ্রিয়ার যুদ্ধে ৩,০০০ ইহুদী সেনা পাঠানো হয়, যারা জুলিয়াস সিজার আর ক্লিওপেট্রাকে রক্ষা করে।

১৮ ইসরাইলের উত্থান-পতন

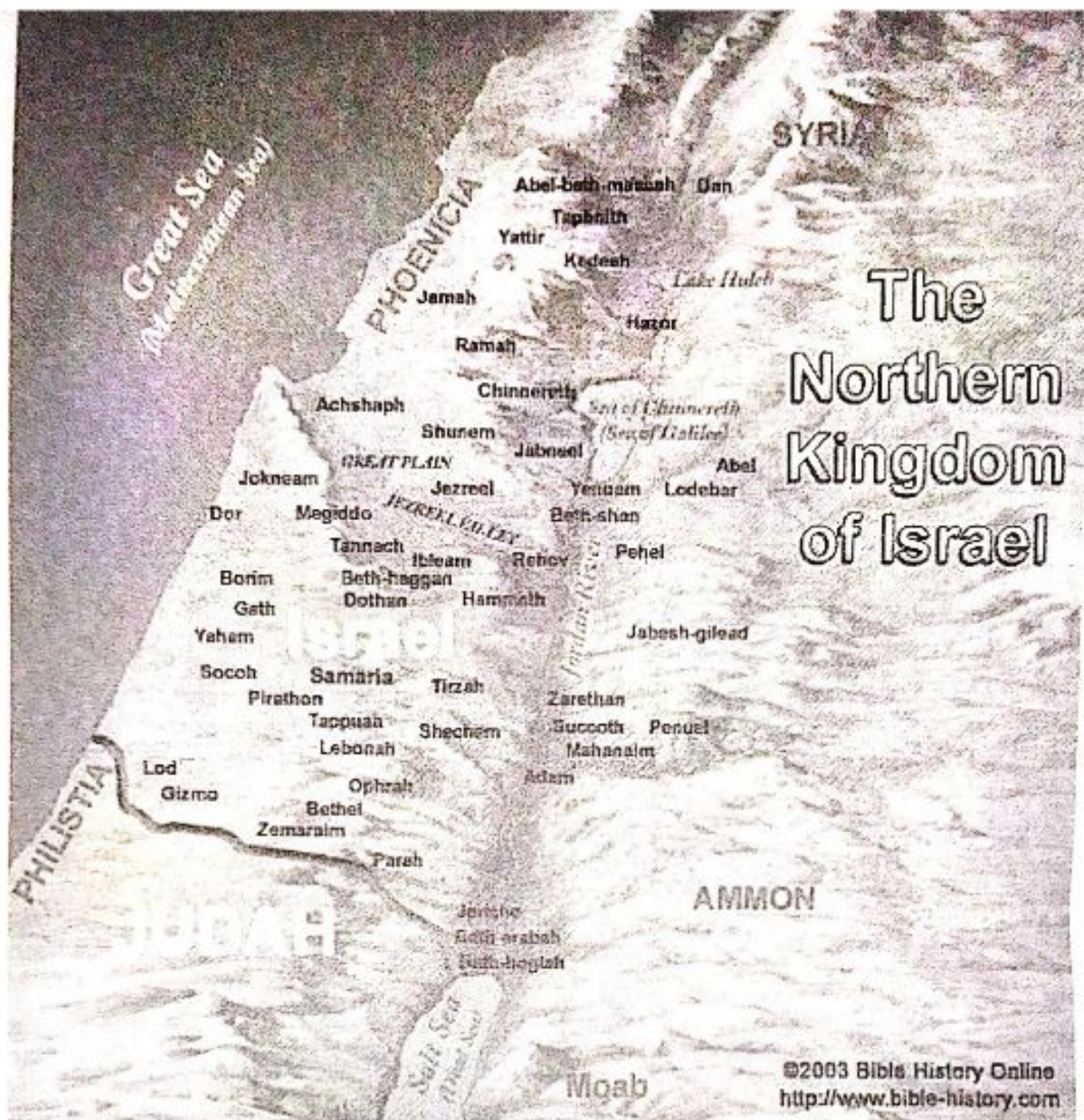


পম্পে দ্য গ্রেট নামে পরিচিত ছিলেন তিনি, SPQR মানে Senatus Populusque Romanus
অর্থাৎ the Senate and the Roman people

রোমান সংসদ হেরোদ নামের একজনকে ইহুদীদের রাজা হিসেবে নিয়োগ দেয়। এরকম সময়ে এই ইহুদী অঞ্চল যখন রোমান সাম্রাজ্যের অধীনে, তখন জন্মগ্রহণ করেন যীশু খ্রিস্ট বা ঈসা (আ)। খ্রিস্ট আর ইসলাম ধর্মমতে, তিনি ছিলেন ‘মসীহ’ (অভিষিক্ত ত্রাতা) বা মেসায়াহ, যিনি কি না এই হতভাগ্য ইহুদী রাষ্ট্রকে উদ্ধার করবেন, নতুন আলোর পথ দেখাবেন। কিন্তু যখন যীশু ইহুদী ইমাম অর্থাৎ র্যাবাইদের দুর্নীতি নিয়ে কথা বলতে লাগলেন, তখন ইহুদী নেতারা চক্রান্ত শুরু করল যেন রোমান কর্তৃপক্ষকে বুঝিয়ে শুনিয়ে যীশুকে সরিয়ে ফেলা যায়।

আমাদের এ বইয়ের বিষয়াদির সূচনা এই সময়কাল থেকেই। একে আমরা ডাকব ‘সেকেন্ড টেম্পলের যুগ’ বলে, কারণ তখনও টিকে আছে দ্বিতীয় বাইতুল মুকাদ্দাস।

পুনশ্চঃ কেউ এ পর্যন্ত সংক্ষেপে বলা ঘটনাগুলোর বিস্তারিত বিবরণ পড়তে চাইলে “ইহুদী জাতির ইতিহাস” বইটি পড়তে অনুরোধ করব। এতে করে পরের ঘটনাগুলো বুঝতে যেমন সহজ হবে, তেমনই আগের ঘটনাগুলোও পুরোপুরি জানা হবে।



অধ্যায় ২

সেকেন্ড টেম্পলের যুগে



আলেকজান্ডারের জেনারেল টলেমি জুদাহ প্রদেশ দখল করলেন ভালোয় ভালোয়। কিন্তু তার প্রাক্তন মিত্র সেলুকাস ব্যাপারটা ভালোভাবে নিলেন না। সেলুকাস ছিলেন আলেকজান্ডারেরই আরেক জেনারেল, তিনি তখন শাসন করছেন সিরিয়া এলাকা। পরবর্তী শতক কেটে গেল তাদের বংশধরদের দ্বৈরথেই।

অবশেষে এলো সেলুকাসদের রাজত্ব, যাকে আমরা সেলুসিদ সাম্রাজ্য বলি, তারা তরবারির সাহায্যে ফয়সালায় পৌঁছে গেল। সিরিয়ার সেলুসিদ রাজা তৃতীয় অ্যান্টিয়কাস (খ্রিস্টপূর্ব ২২৩-১৮৭) মিসরের টলেমি বংশের পঞ্চম রাজাকে একদম তুলেমুলে শেষ করে দিলেন। খ্রিস্টের জন্মের তখনও প্রায় দুশো বছর বাকি।



রাজা পঞ্চম টলেমির স্বর্ণমুদ্রা

শুরুতে অ্যান্টিয়কাস ইহুদীদের ব্যাপারে খুবই সদয় আচরণ করলেন। ইহুদীরা তো খুব খুশি। তিনি ইহুদীদের কর কমিয়ে দিলেন, এমনকি সেকেন্ড টেম্পলে বড় রকমের দান খয়রাত করলেন। কিন্তু দেখতে না দেখতেই তার এ মনোভাব বদলে গেল। তবে ততদিনে তার রাজত্বেরও বিদায় ঘণ্টা বাজছে।

আজকের তুরস্কের এক প্রাচীন শহর ছিল এফিসাস। এফিসাসের ম্যাগনেশিয়াতে খ্রিস্টপূর্ব ১৯০ সালে রোমানদের সাথে যুদ্ধে জড়িয়ে পড়েন সেলুসিদ রাজা অ্যান্টিয়কাস। এতে শোচনীয়ভাবে পরাজিত হন তিনি। জোরপূর্বক তাকে শান্তি চুক্তিতে রাজি হতে হয়। ফলে তিনি এশিয়া মাইনর এলাকা রোমানদের হাতে তুলে দিতে বাধ্য হন। এই এলাকা ছিল তার সাম্রাজ্যের সবচেয়ে ধনবান এলাকা, ফলে তার টাকাপয়সায় টান পড়ে।



এফিসাসের আজকের অবস্থা

অ্যান্টিয়কাসকে তখন খুঁজতে হয় বিকল্প রাস্তা। তিনি ধনসম্পদে ভরপুর উপাসনালয়গুলো লুট করায় মনোযোগ দিলেন। এক বছর পর এরকম এক উপাসনালয় লুণ্ঠনের সময় তিনি পরপারে পাড়ি জমান। সিংহাসনে আরোহণ করেন তার পুত্র চতুর্থ সেলুকাস (খ্রিস্টপূর্ব ১৮৭-১৭৫)। তিনিও একই রাস্তায় হাঁটেন। তার চ্যাসেলর হেলিওডোরাসকে পাঠান জেরুজালেমের বাইতুল মুকাদ্দাস তথা সেকেন্ড টেম্পল লুট করতে, কিংবা ইহুদীদের কাছ থেকে জোর করে টাকা আদায় করতে। এই টাকা দিয়ে তিনি রোমানদেরকে কর দেবেন। কিন্তু হেলিওডোরাসের কী হলো কে জানে, তিনি জেরুজালেম থেকে টাকা পয়সা না নিয়েই ফিরে গেলেন রাজার কাছে, তাকে খুন করে দখল করে নিলেন সিংহাসন। অবশ্য পরে সেলুকাসের ভাই শীঘ্রই রাজ্য পুনরুদ্ধার করেন, নাম ধারণ করেন রাজা চতুর্থ অ্যান্টিয়কাস। তখন খ্রিস্টপূর্ব ১৭৫ সাল।



চিত্রকর রাফায়েল তার 'The Expulsion of Heliodorus from the Temple' চিত্রকর্মে কল্পনা করেছেন, হেলিওডোরাস যখন সেকেন্ড টেম্পলে পৌঁছান, তখন কী হয়েছিল

এ সময় জুদাহ অঞ্চলের ইহুদী সমাজ দুই হোমড়াচোমড়া দলে বিভক্ত ছিল, আর এ জুদাহতেই ছিল জেরুজালেম শহর। এই দুই ইহুদী পরিবারের একটি ছিল তোবায়া (תובאי) পরিবার, যাকে ইংরেজিতে টোবায়াড বলে, আর অন্যটা অনিয়াড পরিবার। অনিয়াড পরিবারের অনিয়াস তখন বাইতুল মুকাদাসের প্রধান ইমাম। কিন্তু অনিয়াসের ভাই জেসনের ইচ্ছা এ পদটা পাবার। তাই তিনি সেই রাজা চতুর্থ অ্যান্টিয়কাসকে ঘুষ দিলেন যেন তাকে প্রধান ইমাম করে দেওয়ার ব্যবস্থা করেন।

তাই হলো, জেসন হলেন প্রধান ইমাম। কিন্তু তিনি ইহুদী ধর্মকে হেলেনাইজ করতে চেষ্টা করলেন, অর্থাৎ এর মাঝে গ্রিক সংস্কৃতি ঢুকাতে চাইলেন। যেমন, তিনি গ্রিক খেলাধুলা শুরু করলেন জুদাহ প্রদেশে। রক্ষণশীল ইহুদী সমাজে এমন নগ্নগাত্র খেলাধুলো দেখে ক্ষেপে গেল মানুষ। খুব দ্রুতই পদ হারালেন জেসন। এবার অনিয়াড পরিবার থেকে ক্ষমতা চলে গেল টোবায়াড পরিবারে। প্রধান ইমাম হলেন এ পরিবারের মেনেলাউস।

ইহুদীদের এ কোন্দল যখন চলছে, তখন রাজা অ্যান্টিয়কাস তার বাহিনী নিয়ে মিসরের রাজা ষষ্ঠ টলেমিকে আক্রমণ করে পরাজিত করলেন। নিজ রাজ্যে

ফেরার সময় তিনি জেরুজালেম হয়ে ফিরলেন, সেই সাথে খালি করে তুলে নিলেন সেকেন্ড টেম্পলের যাবতীয় কোষাগার। তার কাছে মনে হলো, এ তো চমৎকার উপায় টাকাপয়সা পাবার। মিসর আক্রমণ করবেন, আর জেরুজালেমে লুট করবেন।



রাজা চতুর্থ অ্যান্টিয়কাসের মুদ্রা

তিনি যখন আবারও মিসরে চড়াও হতে গেলেন, তখন দেখা গেল সেখানে রোমানরা হাজির। রোমান বাহিনী তাকে হটিয়ে দিল। জেরুজালেমে গুজব ছড়িয়ে পড়লো, রাজা অ্যান্টিয়কাস মারা গেছেন। এ খবর জেসনের কানে যেতেই তিনি টোবায়াদ পরিবারের মেনেলাউসকে প্রধান ইমাম পদ থেকে সরাতে চেষ্টা করলেন। কিন্তু বিধি বাম, অ্যান্টিয়কাস মরেননি। তিনি জেসনের এই গ্রিক হেলেনিস্টিক বিপ্লবের খবর পাওয়া মাত্রই দমন করলেন তাকে আর তার দলকে। তবে জেসনকে দমন করতে গিয়ে তিনি জেরুজালেমের বারোটা বাজিয়ে দিলেন।

অ্যান্টিয়কাস জেরুজালেম জয় করে নিয়ে অনেক লোককে দাস হিসেবে নিয়ে গেলেন। তিনি খৎনা করা নিষিদ্ধ ঘোষণা করলেন। সাক্ষাৎ পালন করা যাবে না আর। তাওরাত তিলাওয়াত করা যাবে না। অ্যান্টিয়কাস আদেশ জারি করলেন, বাইতুল মুকাদ্দাস আজ থেকে আর ইহুদীদের ঈশ্বরের প্রতি উপাসনার জন্য নয়, এখন থেকে এখানে গ্রিক দেবতা জিউসের উপাসনা করা হবে। কুরবানগাহে শুকর জবাই করা হবে। ইহুদী অ-ইহুদী সবাই এখানে উপাসনা করতে পারবেন। ভেতরে জিউসের মূর্তি স্থাপন করা হলো।

জেসনের হেলেনিজম নিয়ে আসলে রাজার সমস্যা ছিল না, সমস্যা ছিল তার আন্দোলন নিয়ে। কোনো রাজাই তার বিরুদ্ধে আন্দোলন পছন্দ করেন না।

শেষমেশ জেরুজালেমে সেই গ্রিক হেলেনিজমই চালু করে দিলেন রাজা অ্যান্টিয়কাস।



হেলেনিজমের ছাপ

কিন্তু অ্যান্টিয়কাস বোঝেননি ইহুদীরা কতটা ধর্মপ্রাণ, তারা জান দিতে রাজি কিন্তু ঐতিহ্য বর্জন করতে রাজি না। ইমাম মন্তাথিয়াস আর তার পাঁচ পুত্রের নেতৃত্বে এক সশস্ত্র বিপ্লব সংঘটিত হলো। মন্তাথিয়াস মারা গেলেও তার ছেলে জুডাস চালিয়ে গেলেন এ আন্দোলন।

সেসময় ইহুদীদের একটি রাজনৈতিক দলের নাম ছিল হাসিদী (חסידי) দল। হিব্রু হাসিদ শব্দের অর্থ 'ধার্মিক', যুগে যুগে সকল ধার্মিকদেরকেই এ নামে ডাকা হয়েছে। কিন্তু এই সেকেন্ড টেম্পলের যুগে রাজনৈতিক দলটিকে আলাদাভাবে স্মরণ করা হয় হাসিদী নামে। মন্তাথিয়াসের সশস্ত্র আন্দোলন আর রক্তপাতের বিরোধিতা করেছিলেন হাসিদীরা। প্রতিবাদস্বরূপ জেরুজালেম ছেড়ে দিয়ে জুদাহর মরুভূমিতে চলে যান তারা। তাদের এ আচরণ ভালোভাবে নেয়নি শাসক সেলুসিদরা। সেলুসিদরা তাদের আক্রমণ করতে এলো, কিন্তু সাব্বাথ দিবস শনিবারে হাতে অস্ত্র তুলে নেবেন না হাসিদীরা। তাতে সেলুসিদদের কিছুই যায় আসেনি, তারা কচুকাটা করলো নিরস্ত্র হাসিদীদের।

ঠাণ্ডা মাথার এই খুন দেখে অন্যান্য ইহুদীরাও যোগ দিল এ আন্দোলনে। একের পর এক সামরিক অভিযান রুখে দিতে লাগলো ইহুদীরা। একটা পর্যায়ে সেলুসিদরা ইহুদীদের প্রতি তাদের কঠোর নীতি বদলাতে বাধ্য হলো।

সেলুসিদরা ইহুদী নিয়ম রীতি পুনপ্রতিষ্ঠা করলো, সেকেন্ড টেম্পল বা বাইতুল মুকাদ্দাস ইহুদীদের হাতে ছেড়ে দিল, সেখানে আর গ্রিক দেবতার উপাসনা হবে না। খ্রিস্টপূর্ব ১৬৪ সালের ১৪ ডিসেম্বর আলোর পথে ফিরে এলো সেকেন্ড টেম্পল, পুনরায় আল্লাহর প্রতি উৎসর্গ করা হলো। এ দিবসকে আজও পালন করে ইহুদীরা 'হানুকা' (חנוכה) নামে, যার অর্থ কোনো কিছুকে উৎসর্গ করা। বড়দিনের আশপাশের সময়ে হানুকা পালন করা হয় এখন।



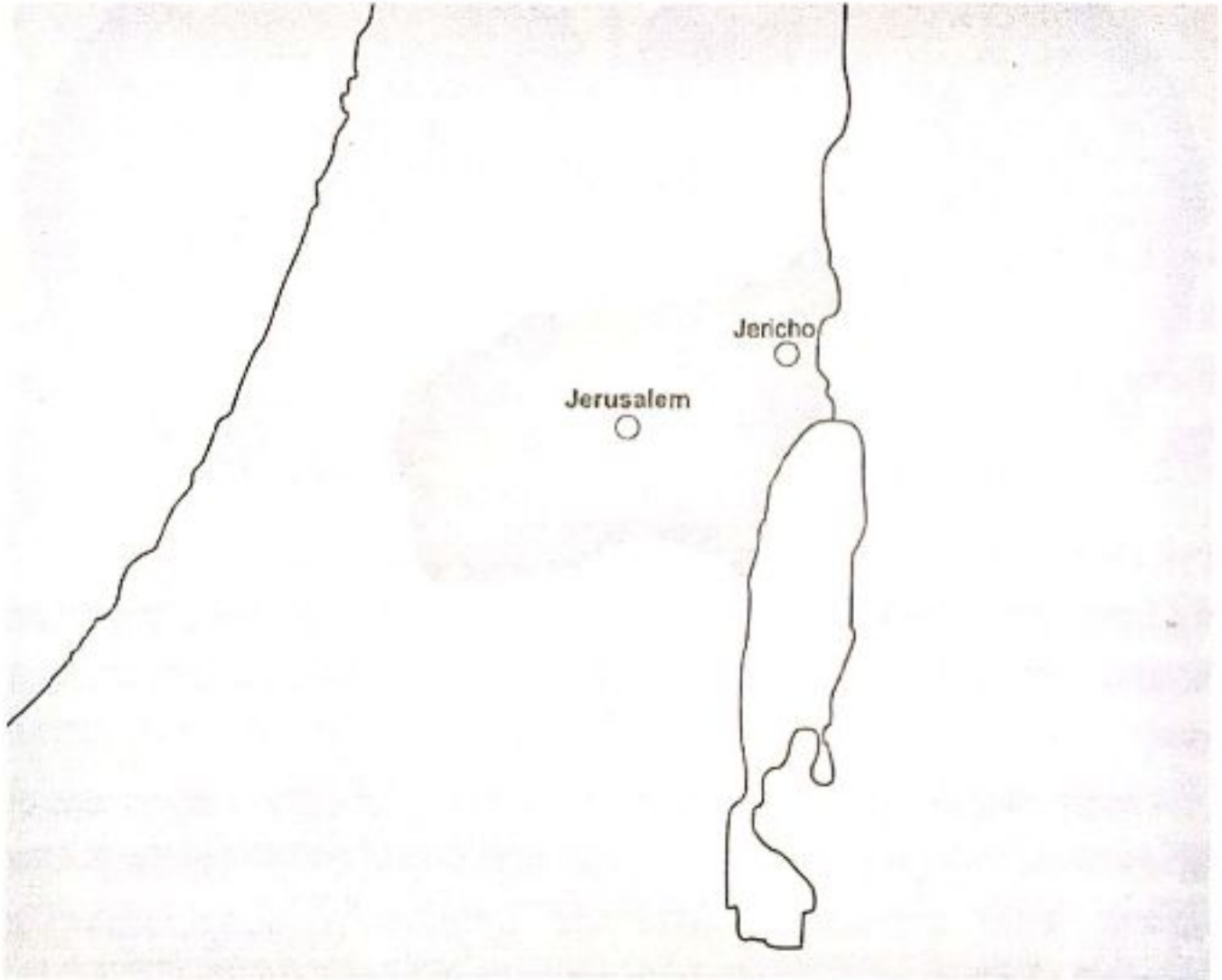
জেরুজালেমে খননকার্য থেকে উদ্ধার করা প্রাচীন হানুকা বাতি

সেলুসিদদের সাথে আন্দোলনের পর জুডাস রোমান রিপাবলিকের সাথে চুক্তি করলেন। কিন্তু চার বছর পর তিনি এক যুদ্ধে মারা যান। জুডাস যেহেতু বাইতুল মুকাদ্দাসের প্রধান ইমাম ছিলেন, তাই তার মৃত্যুর পর প্রধান ইমাম পদে অধিষ্ঠিত হলেন তারই ভাই জোনাথান। একই সাথে তিনি জুদাহ প্রদেশের গভর্নর হলেন। জোনাথানের মধ্যে প্রধান ইমাম হবার গুণাবলি ছিল না আসলে।

জোনাথানের পর প্রধান ইমাম হয়ে এলেন তার ভাই সাইমন, তিনি আবার বেশ যোগ্য ছিলেন বলা চলে। তিনি জুদাহ প্রদেশকে সেলুসিদ সাম্রাজ্যের হাত থেকে স্বাধীনতা এনে দেন। জেরুজালেম নগরীতে সেলুসিদদের যে ব্যারাক ছিল,

সেটি তিনি উচ্ছেদ করেন খ্রিস্টপূর্ব ১৪২-১৪১ সালের দিকে। বহুকাল আগে রাজা সলোমনের সাথে এক ফারাও-কন্যার বিয়ের ফলে সেই ফারাও একটি দুর্গ উপহার দিয়েছিলেন, যা কালক্রমে গাজারা দুর্গ নামে পরিচিত হয়। সেই গাজারা দুর্গ সাইমন পুনরুদ্ধার করেন, সেলুসিদ রাজাকে বশ স্বীকার করান জুদাহ প্রদেশের ব্যাপারে।

এর মধ্য দিয়ে আন্দোলনের সমাপ্তি হলো। এ আন্দোলনকে বলা হয় ম্যাকাবিয়ান আন্দোলন (מֶמְכָּר מַכַּבִּים)। সেলুসিদ সাম্রাজ্যের বিরুদ্ধে যারা বিদ্রোহ করেছিল, তাদেরকে বলা হয় মাকাবি (מַכַּבִּים)। হেলেনিজম বা হেলেনিস্টিক ইহুদীবাদ দূরীকরণের কাজ শুরু করার কৃতিত্ব দেয়া হয় তাদেরকে।



ম্যাকাবিয়ান বিদ্রোহের ফলে যে অংশ জুড়ে বিস্তৃত হয় ইহুদী সাম্রাজ্য

সাইমন আনুষ্ঠানিকভাবে ইহুদীদের শাসক পদে আসীন হলেন। ইহুদী স্কলারদের ধারণা, এ সময়টাতে দানিয়েলের কিতাব বাইবেলে অন্তর্ভুক্ত করা হয়, যদিও এ কিতাবে কেবল ব্যবিলনীয় নির্বাসনের আলাপ আছে।

খ্রিস্টপূর্ব ১৩৫ সালে সাইমনকে হত্যা করা হয় এক প্রাসাদ ষড়যন্ত্রে। তার ছেলে ইউহানা হুরকানোস (জন হিরক্যানাস দ্য ফার্স্ট)। প্রথম হিরক্যানাস (খ্রিস্টপূর্ব ১৩৪-১০৪) একই সাথে শাসক এবং প্রধান ইমাম ছিলেন। তার

শাসনামলের প্রথম দিকে সেলুসিদরা আবার জেরুজালেম আক্রমণ করে, হিরক্যানাস তার কিছু অঞ্চল ছেড়ে দিতে বাধ্য হন, আর জোরপূর্বক সেলুসিদদের সাথে পার্থিয়ানদের বিরুদ্ধে সামরিক অভিযানে অংশ নেন। পার্থিয়ান ছিল পারস্য সাম্রাজ্যের।

পরে হিরক্যানাস ট্রান্সজর্ডান এলাকার একটা বড় অংশ জয় করে নেন। মাটির সাথে মিশিয়ে দেন সামারিয়া এলাকার গেরিজিম পর্বতের ওপর অবস্থিত সামারিয় মন্দির। তাদের সবাইকে তিনি জোরপূর্বক ইহুদী ধর্ম গ্রহণ করান।



হিরক্যানাসের মুদ্রা

তার এক ছেলে গালিলি সাগরের এলাকাগুলো, আর অন্য ছেলে সাগরতীরের অন্যান্য শহর এবং উত্তর ট্রান্সজর্ডানের যাবতীয় হেলেনাইজড শহরগুলো জয় করে নেন।

রাজা সাইমন যে সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠা করেন, ইতিহাসে তাকে আমরা হাসমোনিয়ান (ḥasmōniyān) সাম্রাজ্য নামে চিনি। হাসমোনীয় সাম্রাজ্যের নাম এসেছে বিপ্লবী মাতাথিয়াসের দাদার নাম হাশমোনে (ḥasmōn) থেকে। এ সাম্রাজ্যই (খ্রিস্টপূর্ব ১৪০-৩৭) সর্বশেষ স্বাধীন ইহুদী রাজ্য।

সেলুসিদ আর টলেমি সাম্রাজ্যের হাত ধরে শুরু হয় গ্রিক হেলেনিজম। আর হিরক্যানাসের হাত ধরে ইহুদী সাম্রাজ্য থেকে তা পুরোপুরি দূর হয়ে যায়।

অধ্যায় ৩

হেলেনিজম শেষে



সেলুসিদদের রাজা সপ্তম অ্যান্টিয়কাস মারা যাবার পর হিরক্যানাসের আর্থিক সমস্যার সমাধান হয়ে গেল। কারণ, সেলুসিদরা এ সময় দুর্বল হয়ে যায়। তাই তাদেরকে আর কর দিতে হতো না। এরপর হিরক্যানাস যখন নিজের নামে মুদ্রা চালু করলেন, তখন অর্থনীতি আরও চাঙ্গা হয়ে উঠলো।

হিরক্যানাস জুদাহ জুড়ে নানা ধরনের নির্মাণকাজ শুরু করেন। অ্যান্টিয়কাস যে দেয়ালগুলো ভেঙে ফেলেছিলেন, সেগুলো তিনি পুনর্নির্মাণ করেন। বাইতুল মুকাদ্দাসের উত্তর দিকে একটি দুর্গও নির্মাণ করেন, নাম দেন ‘বারিস’। এছাড়া নিজের নামেও দুর্গ বানান তিনি।

তার চেয়েও বড় কথা, রোমান রিপাবলিক আর অন্যান্য জেন্টাইল (অ-ইহুদী) ক্ষমতাগুলোর সাথে তিনি সখ্যতা বাড়াতে লাগলেন। রোমান সিনেটেই দুটো বিল পাশ হয়, যাতে ইহুদী সাম্রাজ্যের সাথে মিত্রতার কথা বলা হয়। এমনকি রোমানরা হাসমোনীয় সাম্রাজ্যকে স্বাধীন থাকতে দেয়। রোমানদের সমর্থনকে পূঁজি করে চমৎকারভাবে শাসন করতে থাকেন হিরক্যানাস।

শুধু রোমানদের সাথেই নয়, মিসরের টলেমি সাম্রাজ্যের সাথেও তার সুসম্পর্ক। সম্ভবত মিসরে বসবাস করতে থাকা ইহুদীদের টলেমির দরবারে ভালো যোগাযোগ থাকার কারণে এটা সম্ভব হয়েছিল। রোমকে সম্ভ্রষ্ট করতে গ্রিক শহর অ্যাথেন্স আর পার্গামনও হিরক্যানাসকে সম্মান জানালো।

বেথেলহেমে খনন করে হিরক্যানাসের তেষট্টিটি মুদ্রা পাওয়া গেছে, যার এক পাশে লেখা “প্রধান ইমাম ইউহানা” আর অন্য পাশে লেখা “ইহুদী জামাত”। এ

থেকে আন্দাজ করা যায়, তখনকার সময়ে ইহুদীদের মনোরঞ্জন করে চলা শাসক হিরক্যানাসের জন্য দরকারি ছিল।

জীবনের শেষ কাজ হিসেবে তিনি ধর্ম আর শাসনকাজ আলাদা করে যান। তিনি মারা যাওয়ার পর তার বিধবা স্ত্রী শাসনকার্য হাতে নেন। আর তার ছেলে জুডাস অ্যারিস্টেটাবুলাসকে দেয়া হয় প্রধান ইমামের দায়িত্ব। অবশ্য, ছেলে জুডাসের এ ব্যাপারটা পছন্দ হয়নি। তিনি নিজের মাকে গ্রেফতার করে জেলখানায় পুরলেন, তাকে খাবার দাবারও দিতেন না।

জুডাসের কথায় একটু পর আসছি। তার আগে জুডাসের বাবা হিরক্যানাসের সাথে সাদুকি আর ফারিসিদের দ্বন্দের বিষয়টা জেনে নেয়া যাক।

ইহুদীদের তৎকালীন সমাজে সবাই তাওরাতে বিশ্বাস করত বটে, তারপরেও মতবিভেদের অভাব ছিল না। অসংখ্য ভাগ উপবিভাগ দেখা যেত। প্রথম শতকের ইতিহাসবিদ জোসেফাসের মতে, এর মাঝে তিনটি প্রধান দলের কথা উল্লেখ করার মতো। এরা হলো সাদুকি, ফারিসি আর এসিন।



বিখ্যাত ইতিহাস রচয়িতা ফ্ল্যাভিয়াস জোসেফাস

সাদুকিরা (סַדּוּקִים) ছিলেন আর্থ-সামাজিক দিক থেকে একদম উঁচু স্তরের লোক। সম্ভবত রাজা দাউদ (আ)-এর ইমাম সাদুক (סַדּוּক)-এর নাম থেকে এসেছে সাদুকি নামটি। হিব্রুতে এর অর্থ 'সৎ', আরবিতে 'সাদিক' নামের

৩০ ইসরাইলের উত্থান-পতন

কাছাকাছি; যদিও ইংরেজিতে ‘স্যাজুসি’ ডাকা হয়। সাদুকিরা তাওরাতের সমস্ত আইন মানতে রাজি, তবে কেবলই আক্ষরিকভাবে। তারা পরকাল আর আত্মার অমরত্বে বিশ্বাস করত না, এমনকি ফেরেশতাদের অস্তিত্বেও না। মৃত্যুর পরপর আত্মার বিনাশ হয়, এটাই তাদের বিশ্বাস। প্রত্যেক মানুষের স্বাধীন ইচ্ছা আছে, ভাগ্য আগে থেকে নির্ধারিত থাকে না। দুনিয়ার ভালো-খারাপ কর্মকাণ্ডের কোনো প্রতিফল নেই।

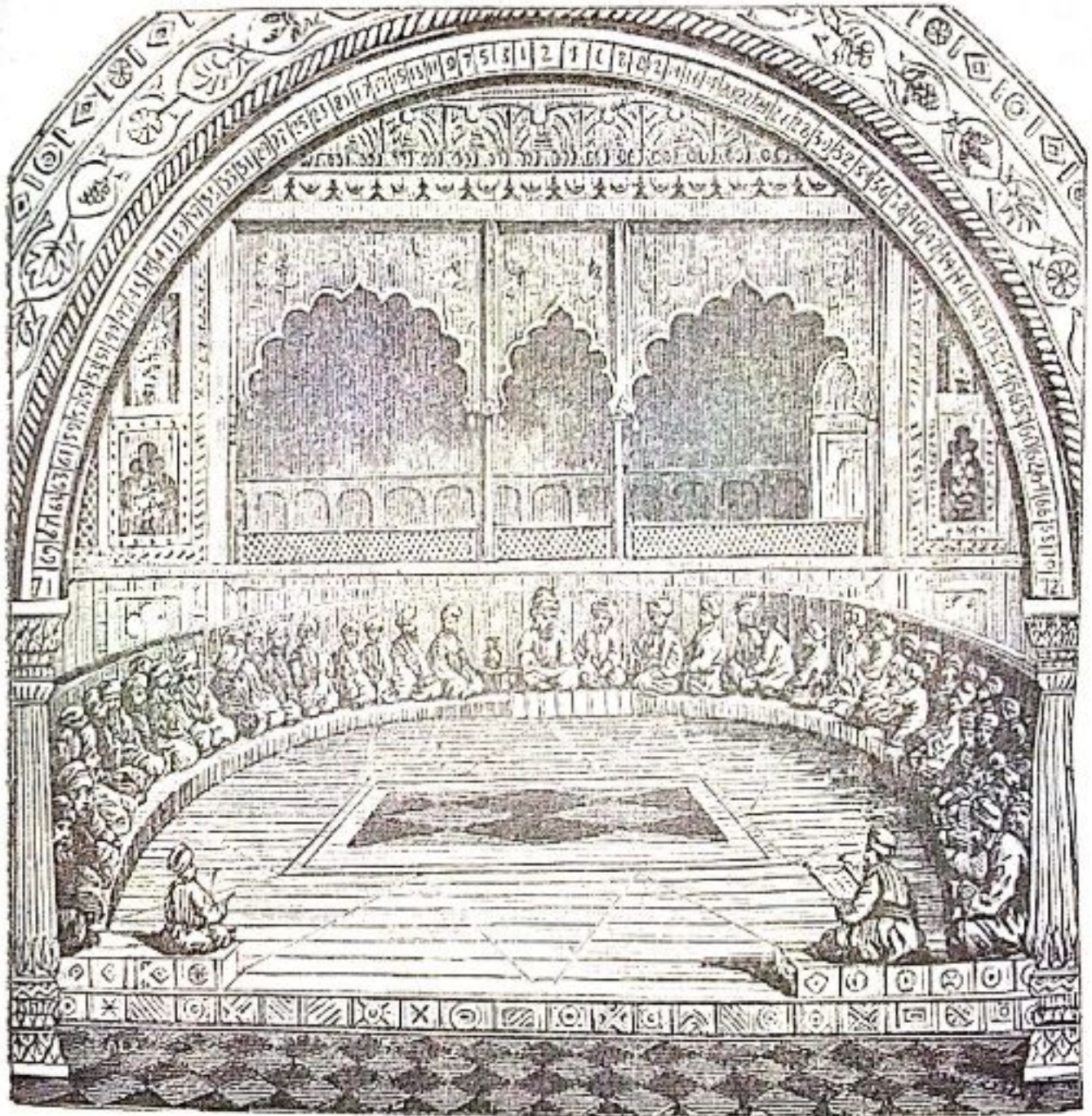
দ্বিতীয় দলটি হলো ফারিসি (פ'ר'১৭৫)। এটি প্রাচীন গ্রিক শব্দ (Φαρισαίος) থেকে এসেছে, কিংবা হিব্রু ‘পারুশ’ থেকে, যার অর্থ ‘আলাদা’। কিছু স্কলার বলেন, তারা নিজেদেরকে আলাদা রাখতেন পবিত্রতার জন্য। এটি ছিল একটি সামাজিক আন্দোলন, একটি চিন্তাধারা। তারা বিশ্বাস করতেন, তাওরাতের আইনের ব্যাখ্যা হওয়া উচিত মূসা (আ)-এর সময়ের হিসেব ধরে। পাশাপাশি তারা পরকাল ও আত্মার অমরত্বে বিশ্বাস করতেন। কেউ বলেন, ইতিহাসবিদ জোসেফাস একজন ফারিসি ছিলেন; আবার কেউ বলেন, তিনি ফারিসিদের থেকে দূরত্ব বজায় রেখে চলতেন। তৎকালীন সময়ে প্রায় ৬,০০০ ফারিসি ছিলেন। সেইন্ট পল ছিলেন একজন ফারিসি। ফারিসিরা আইন ব্যাখ্যায় ওস্তাদ ছিলেন, তারা ভাগ্যে খুবই বিশ্বাস করতেন।

আর তৃতীয় দলটি ছিল এসিন (প'১৩৪)। তারা বিচ্ছিন্নতাবাদী। এদের অনেকেই জগৎ সংসার বিমুখী হয়ে জুদাহ রাজ্যের মরুভূমিতে সন্ন্যাসব্রতে ব্যস্ত থাকতেন। তাদের একটি দল বিয়ে করতেন না। সবাই একসাথে থাকতেন, একসাথে খেতেন। তারা ইসরাইলের রাজনীতিতে কোনো অবদানই রাখতেন না। তাই এদের সাথে কারও সখ্যতা বা শত্রুতা, কিছুই নেই। ধারণা করা হয়, ডেড সি স্কল নামের যে লেখাগুলো এখন পাওয়া যায়, সেটি এসিনদেরই লেখা।

ইহুদীদের কেন্দ্রীয় বিচার আদালত ছিল সানহেদ্রিন (১৭৭৩৩০), অর্থাৎ ‘কাউন্সিল’। তেইশ বা একাত্তর জন র্যাবাইয়ের সম্মিলনে এ আদালত গঠিত। ফারিসি আর সাদুকি, দুই দলই সানহেদ্রিনের সদস্য ছিলেন। পরবর্তী যুগগুলোতে ইহুদীরা যখন নির্যাতিত জীবন কাটায়, তখন সানহেদ্রিন নাম লুকিয়ে একে ‘বাইত হা-মিদ্রাস’ বা ‘শিক্ষাঘর’ বলে ডাকা হতো।

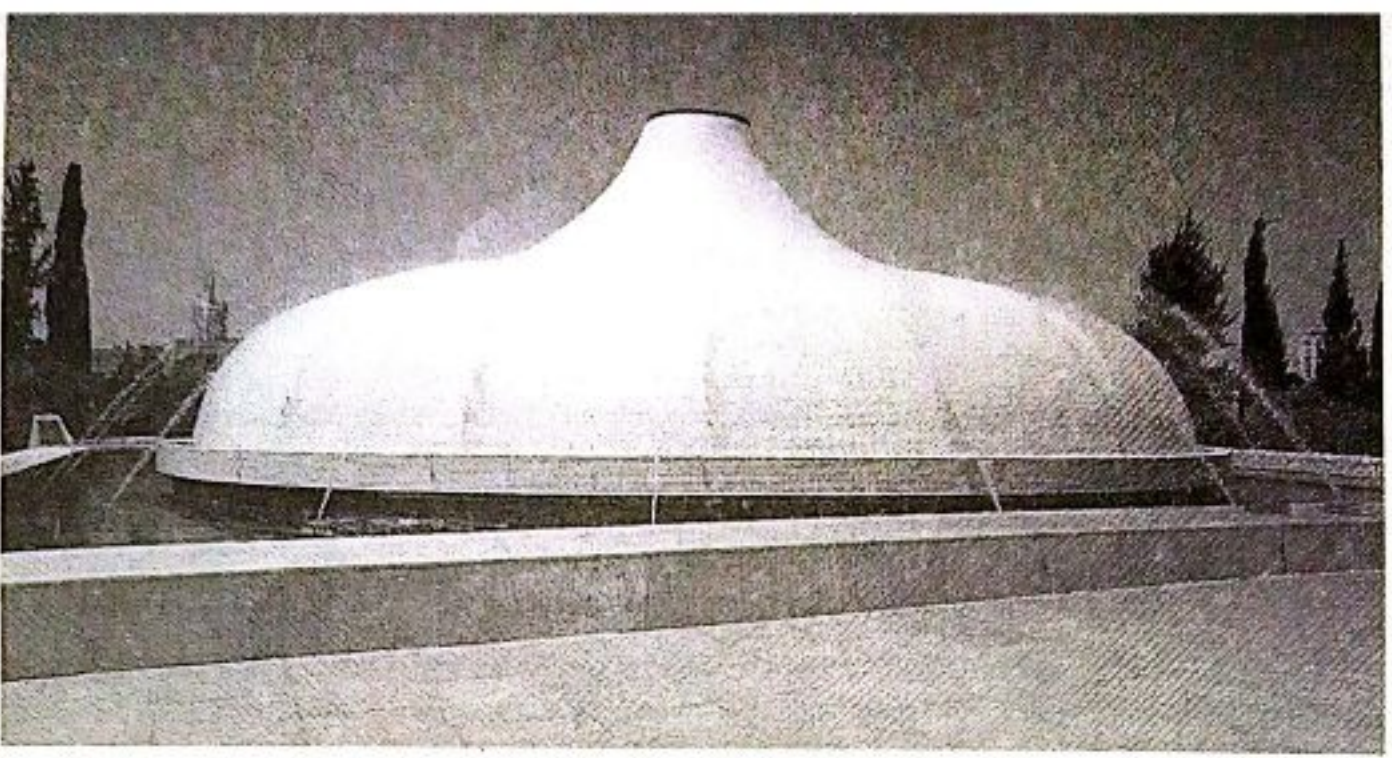
একটু আগে উল্লেখ করা ডেড সি স্কলের বিষয়ে আসা যাক। জুদাহ রাজ্যের মরুভূমির বুকে কুমরান গুহা থেকে উদ্ধার করা হয় প্রাচীন ইহুদীদের এসব হিব্রু পাণ্ডুলিপি। এ গুহাগুলো মৃত সাগর বা ডেড সির উত্তর তীরে। তাই উদ্ধারকৃত পাণ্ডুলিপিগুলোকে ‘ডেড সি স্কল’ বলা হয়; আবার ‘কুমরান কেভ স্কল’ নামেও

ডাকা হয়। খ্রিস্টপূর্ব শেষ তিনটি শতক আর প্রথম খ্রিস্টীয় শতক জুড়ে এ
 ক্রলগুলো লেখা হয়েছিল বলে বিশেষজ্ঞদের ধারণা। এ পর্যন্ত আবিষ্কৃত হারিয়ে
 যাওয়া ক্রলগুলোর মাঝে সবচেয়ে বিখ্যাত এই ডেড সি ক্রল। বাইবেলের বাইরের
 অনেক কিছুই আমরা এ ক্রলগুলো থেকে জানতে পারি। প্রায় সবগুলো ক্রলই
 ইসরাইল জাদুঘরে সংরক্ষিত আছে এখন, যদিও জর্ডান আর ফিলিস্তিনও এ
 ক্রলগুলোর মালিকানার দাবিদার।



সানহেদ্রিন

ডেড সি এলাকা থেকে কয়েক হাজার ক্রল উদ্ধার করা হয়েছে। তবে খুব কম
 ক্রলই ঠিকভাবে পড়ার মতো অবস্থায় আছে। এর মাঝে কুমরান গুহারগুলোই
 উল্লেখযোগ্য। এগারোটি গুহা থেকে মোট ৯৮১টি ক্রল পাওয়া গেছে এখন পর্যন্ত।
 প্রথম আবিষ্কারের কৃতিত্ব কয়েকজন রাখালের।

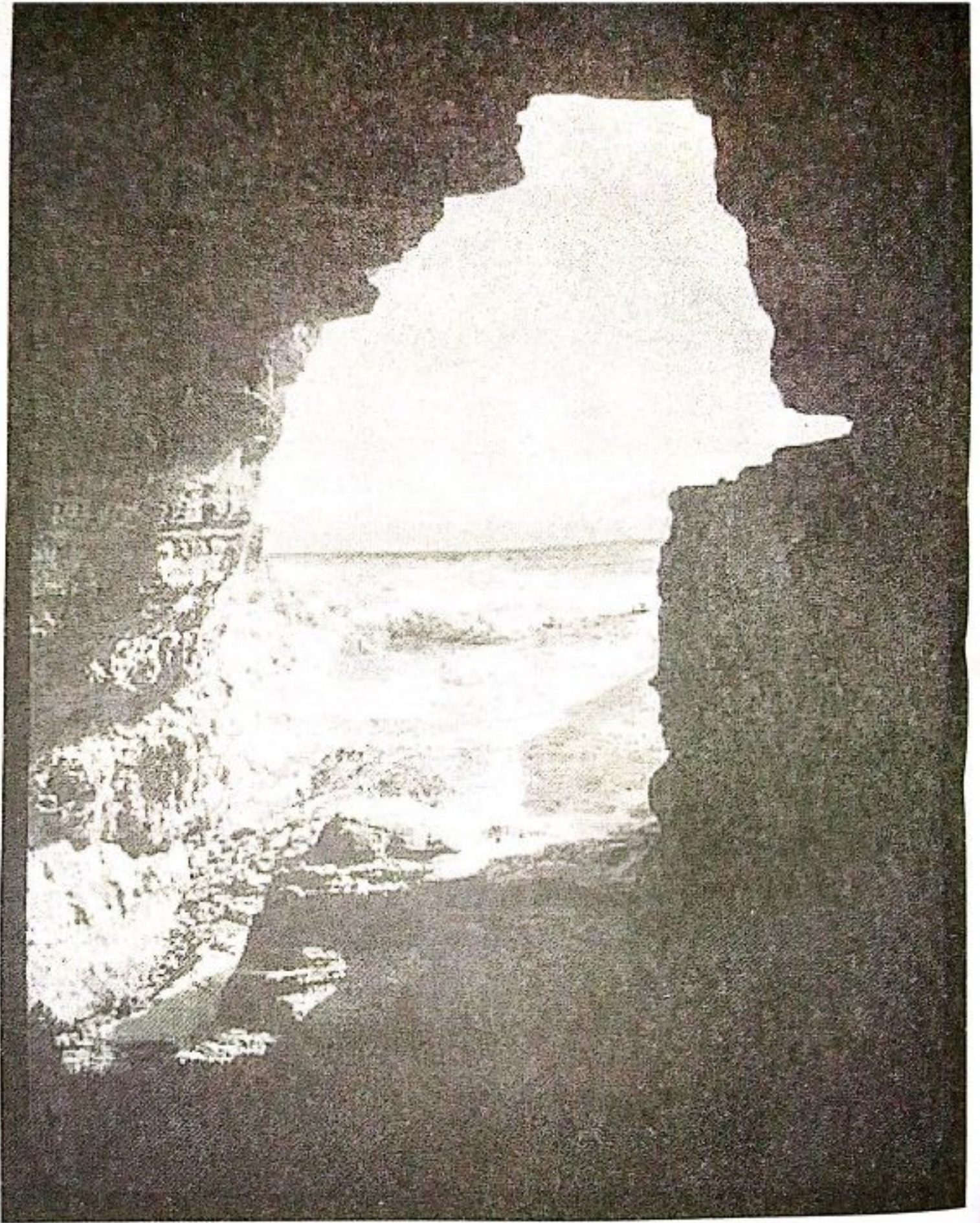


ইসরাইল জাদুঘরের শাইন অফ দ্য বুক সেকশন, এখানেই সংরক্ষিত ডেড সি স্ক্রলগুলো

১৯৪৭ সালের দিকে মুহাম্মদ, জুমা আর খলিল মূসা নামের কয়েকজন বেদুইন রাখাল কুমরানের গুহায় একটি কলসে সাতটি স্ক্রল আবিষ্কার করে, যখন তাদের একজন ভুল করে গুহার ভেতরে পড়ে যায়। মুহাম্মদ গুহা থেকে বেরিয়ে এল হাতে কয়েকটি স্ক্রল নিয়ে। সেগুলো শিবিরে নিয়ে গিয়ে পরিবারকে দেখায় সে। কী করবে ভেবে না পেয়ে তারা সে স্ক্রলগুলো টানিয়ে রাখলো তাঁবুর খুঁটির সাথে। মাঝে মধ্যে লোক এলে খুলে খুলে দেখায়। একটা পর্যায়ে একটি স্ক্রল ছিঁড়ে দুভাগ হয়ে যায়। তখন স্ক্রলগুলোকে বেথেলহেমের এক ডিলারের কাছে নিয়ে যাওয়া হয়। কিন্তু সেই ডিলার এগুলোকে মূল্যহীন বলে ফিরিয়ে দিল। তবে বেদুইনরা হাল ছাড়লো না, একজনের কাছে তিনটি স্ক্রল প্রায় সোয়া তিনশো ডলার মূল্যে বিক্রি করতে পারলো। পরের বছর সাতটি স্ক্রল নজরে পড়ে আমেরিকান স্কুলস অফ অরিয়েন্টাল রিসার্চের বিশেষজ্ঞ জন ট্রেভরের। তার উদ্যোগে আনুষ্ঠানিকভাবে এ স্ক্রলগুলো উদ্ধারের ব্যবস্থা করা হয়। এ স্ক্রলগুলোতে পাওয়া যায় নানা অজানা তথ্য। তবে আজও সমস্ত স্ক্রলের মানে বের করা যায়নি।



একটি ডেড সি স্ক্রল



এ গুহা থেকেও পাওয়া গিয়েছিলো ডেড সি স্ক্রল, দূরে মৃত সাগর দেখা যাচ্ছে

একটু আগে মাকে খেঁফতার করা জুডাস অ্যারিস্টোবুলাসের কথা বলছিলাম।
ইতিহাসের পাতায় তাকেই হাসমোনীয় সাম্রাজ্যের প্রথম রাজা বলা হয়। খ্রিস্টপূর্ব
৩৪ ইসরাইলের উত্থান-পতন

১০৪ সালে তিনি ক্ষমতা হাতে নেন, আর তার মৃত্যু হয় ঠিক এক বছর পরেই। তখন এ ক্ষমতা চলে যায় তার ভাই জোনাথান আলেকজান্ডারের হাতে। তবে তার নাম বদলে রাখা হয় আলেকজান্ডার ইয়ান্নাই।



রাজা আলেকজান্ডার ইয়ান্নাই

রাজা আলেকজান্ডার তার মৃত ভাইয়ের বিধবাকে বিয়ে করেন। সামরিক অভিযান থেকে শুরু করে গৃহযুদ্ধ মিলিয়ে তার পুরো শাসনকাল ছিল রক্তপাতময়। তবে বাইবেলের বাইরে আলেকজান্ডারের রাজত্বকেই সবচেয়ে শক্তিশালী আর সবচেয়ে বড় ইহুদী রাজ্য হিসেবে ইতিহাসে দেখা হয়। ফিলিস্তিনের ভূমধ্যসাগর থেকে জর্ডান নদীর আশেপাশের অঞ্চল পর্যন্ত আলেকজান্ডারের রাজত্ব ছিল। দ্বিমতের কারণে তিনি অনেক মানুষকে হত্যা করেন।

আলেকজান্ডারের রাজত্বের সময় ফারিসিরা তার বিরুদ্ধে আন্দোলন করেন। তাদের দাবি, তিনি হেলেনিস্টিক প্রভাব ফেলছেন রাজ্যে। ফারিসিরা তাই আলেকজান্ডারকে অগ্রাহ্য করে নিজেরাই মুদ্রা বানাতে শুরু করেন। কিন্তু এই বিদ্রোহ টেকেনি, মাঝ দিয়ে অনেকে প্রাণ হারালেন।

আলেকজান্ডার মারা যাবার পর তার স্ত্রী (যিনি আগের রাজারও স্ত্রী ছিলেন) ক্ষমতা হাতে তুলে নেন। রানী সালোমি আলেক্সান্দ্রা (7710178 1137177) ক্ষমতায় আরোহণ করে সব নিয়ম বদলে দিলেন। হেলেনিজমের ছিটেফোঁটা থাকলেও তা বাতিল করলেন। সব রায় দিলেন ফারিসিদের পক্ষে, যেন তারা তার হাতে থাকেন। তিনি খ্রিস্টপূর্ব ৭৬ থেকে ৬৭ সাল পর্যন্ত রাজত্ব করেন। তিনি স্বাধীন ইসরাইলের শেষ রানী, এবং শেষ শাসক। সত্যি বলতে, ইসরাইলের ইতিহাসে কেবল দুজন নারী শাসক ছিলেন। এক এই আলেক্সান্দ্রা, অন্যজন রাজা আহাব আর রানী জেজেবেলের কন্যা আতালিয়া (77707)।



রানী আলেক্সান্দ্রা

রানী আলেক্সান্দ্রার মৃত্যুর পর তার দুই পুত্র ক্ষমতা নিয়ে কাড়াকাড়ি শুরু করে দেন। তাদের দুজনের নামই পূর্ববর্তী রাজাদের নামে—দ্বিতীয় হিরক্যানাস ও দ্বিতীয় অ্যারিস্টোবুলাস। দক্ষিণ ইসরাইলের ইদুমিয়া থেকে অ্যান্টিপাটার নামের এক গোত্রপতি এলেন দ্বিতীয় হিরক্যানাসের আমন্ত্রণে। হিরক্যানাস তাকে বললেন, তিনি যেন তার মিত্র জর্ডানের নাবাতীয়দের নিয়ে হিরক্যানাসের সমর্থনে জেরুজালেম আক্রমণ করেন। কিন্তু তারা চিন্তাও করেননি, অন্য দিক থেকে কেউ এসে তাদের সব পরিকল্পনা ভগ্ন করে দিয়ে যাবে।

তখন সদ্য সিরিয়া জয় করেছেন রোমান নেতা পম্পে। তার অভিযানেই নির্ধারিত হবে হাসমোনীয়দের ভবিষ্যৎ। খ্রিস্টপূর্ব ৬৩ সালে পম্পে দ্য গ্রেটকে অনুরোধ করা হলো হাসমোনীয় রাজ্যের উত্তরাধিকারের ব্যাপারটা একটু দেখে দিতে। তিনি ভালো মতোই দেখে দিলেন! হাসমোনীয় সাম্রাজ্য ধ্বংস হয়ে গেল।



মুদ্রায় পম্পের ছবি

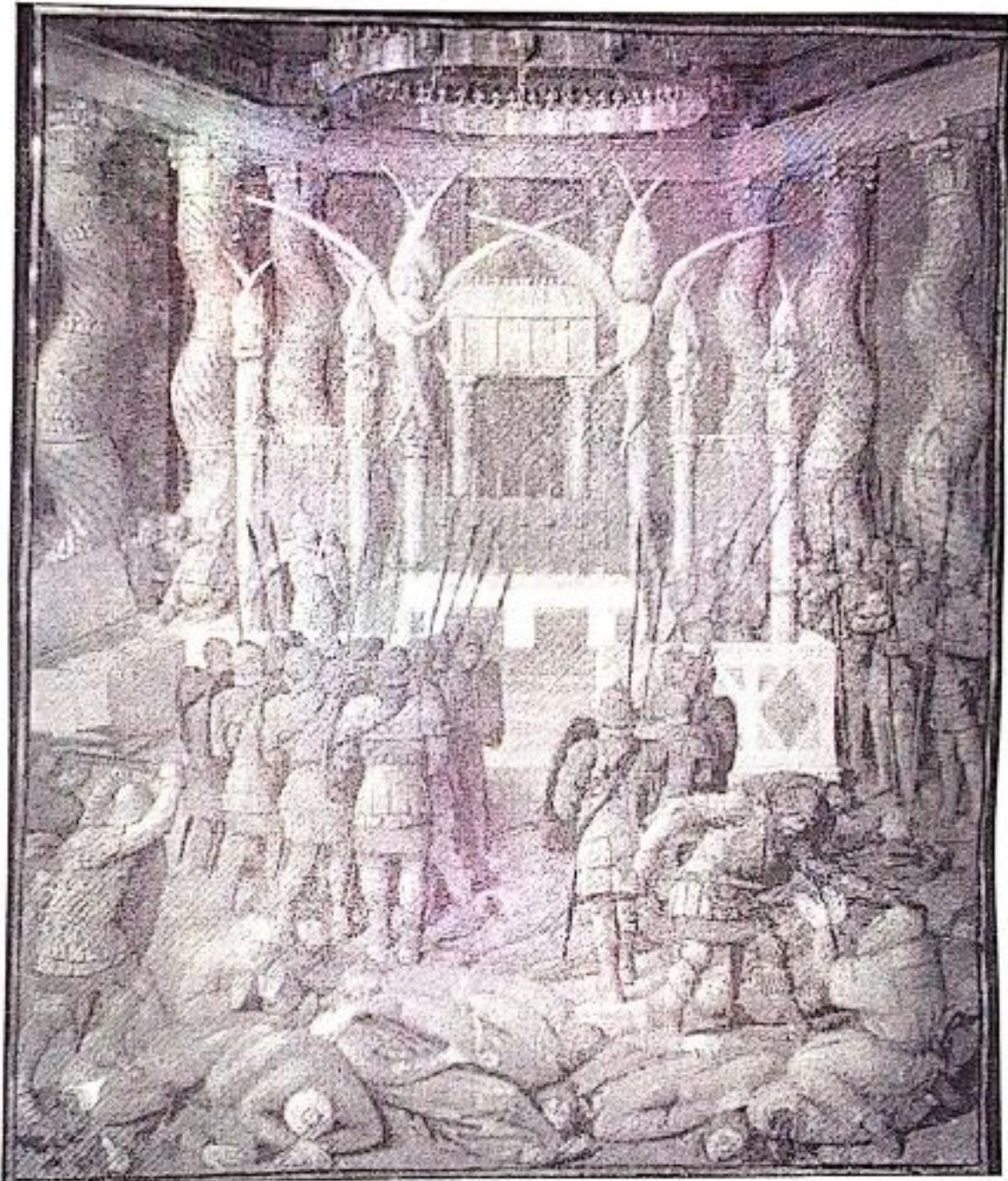
দুই ভাই-ই সিরিয়ার দামেস্কে গিয়ে পম্পেকে বলেন, বিষয়টা সমাধান করে দিতে। পম্পে বললেন, তিনি স্বয়ং জুদাহ রাজ্যে এসে সমাধান করবেন। অ্যারিস্টোবুলাস পম্পের সমাধানের অপেক্ষায় না থেকে দামেস্ক ত্যাগ করে আলেকজান্দ্রিয়াম দুর্গে নিজেকে আটকে রাখলেন। এতে পম্পের রাগ উঠে গেল। তিনি তার বাহিনী নিয়ে জুদাহ গেলেন, তার বাহিনী দেখেই অ্যারিস্টোবুলাস আত্মসমর্পণ করলেন। কিন্তু যখন জেরুজালেম অধিকার করে নিতে গেল তার বাহিনী, তখন অ্যারিস্টোবুলাসের সমর্থকরা রোমানদের ঢুকতে দিল না। আবারও রেগে গিয়ে পম্পে অ্যারিস্টোবুলাসকে গ্রেফতার করলেন, এবং জেরুজালেম অবরোধ করলেন।

জোসেফাস বলেন, পম্পে দেখতে পেলেন জেরুজালেমের দেয়ালগুলো এত শক্তিশালী যে এগুলো ভেদ করে আক্রমণ করা বৃথা। তার ওপর শহরে যদি ঢুকেও যান তিনি, লোকজন টেম্পল অফ সলোমনে আশ্রয় নিতে পারবে। সেই টেম্পলের দেয়াল আরও শক্তিশালী।

তবে দ্বিতীয় হিরক্যানাসের সমর্থকেরা সম্ভবত শহরের উত্তর-পশ্চিম দিকের একটি দেয়াল খুলে দিল। সেখান দিয়ে রোমানরা ভেতরে প্রবেশ করলো। এর ফলে পম্পে প্রাসাদ আর জেরুজালেমের ওপরের দিকের দখল পেয়ে গেলেন, কিন্তু অ্যারিস্টোবুলাসের সমর্থকেরা শহরের পূর্ব দিক অর্থাৎ বাইতুল মুকাদাস

এলাকা নিজেদের দখলে রেখেছে। পম্পে তাদেরকে আত্মসমর্পণের সুযোগ দিলেন, কিন্তু তারা প্রত্যাখ্যান করল।

পম্পে রেগে গিয়ে পুরো বাহিনী নিয়ে আক্রমণ করলেন বাইতুল মুকাদ্দাস। কিন্তু সেখানকার প্রতিরক্ষা খুবই ভালো। নানা ফন্দি ফিকিরে তিন মাস কেটে যাবার পর পম্পের বাহিনী বাইতুল মুকাদ্দাসে প্রবেশ করতে পারলো। ভেতরের ১২,০০০ ইহুদীকে গণহত্যা করা হলো। এ সময় মাত্র কয়েকজন রোমান সেনা মৃত্যুবরণ করে।



বাইতুল মুকাদ্দাসে গণহত্যা চালানোর সময় পম্পে

আর্ক অফ দ্য কোভেন্যান্ট রাখার জায়গাকে বলা হয় হোলি অফ দ্য হোলিজ, সেখানে কেবল প্রধান ইমামের প্রবেশের অনুমতি থাকে। স্বয়ং পম্পে সেখানে প্রবেশ করে বিনষ্ট করেন সবকিছু। তবে তিনি সেখান থেকে কিছু সরাননি, কোনো ধনসম্পদ বা একটি মুদ্রাও নয়। বরং পরদিনই তিনি আদেশ করেন পুরো বাইতুল

মুকাদ্দাস ধুয়ে মুছে ঠিক করতে, আবার ইহুদী রীতি চালু করতে। অ্যারিস্টোবুলাসকে ধরে নিয়ে গেলেন পম্পে, রোমে প্রবেশ করলেন বিজয়ীর বেশে।

তবে যাওয়ার আগে পম্পে দ্বিতীয় হিরক্যানাসকে প্রধান ইমাম পদে বসিয়ে যান। কিন্তু তার শাসক উপাধি কেড়ে নেয়া হয়। অনেকদিন পর, ৪৭ খ্রিস্টপূর্বাব্দে রোম তাকে জুদাহ ও গালিলির শাসক হিসেবে পরিচয় দিয়েছিল। কাগজে কলমে জুদাহ স্বাধীন রইলো, কিন্তু সিরিয়ার রোমান শাসকদের কাছে কর দিতে হতো। পুরো রাজ্যকে পাঁচটি জেলায় ভাগ করা হলো। প্রত্যেক জেলার স্থানীয় শাসকগোষ্ঠী থাকবে, যাদের বেশিরভাগ সাদুকি। যেমন একটু আগে অ্যান্টিপাটারের নাম বলা হলো, তিনি ক্ষমতা পেলেন ইদুমিয়ার, সেই সাথে তিনি কর সংগ্রাহকের দায়িত্বও পেলেন।

খ্রিস্টপূর্ব ৪৮ সালে পম্পে মারা যাবার পর, দ্বিতীয় হিরক্যানাস আর অ্যান্টিপাটার মিসরের বিরুদ্ধে সৈন্য দিয়ে সমর্থন দিলেন জুলিয়াস সিজারকে। এর পুরস্কার হিসেবেই আসলে হিরক্যানাসকে শাসক উপাধি ফিরিয়ে দেয়া হয়, আর তার মন্ত্রী হন অ্যান্টিপাটার। জুলিয়াস সিজার জুদাহ বা ইহুদী রাজ্যের বাইরে ইহুদীদের নিরাপত্তার ব্যবস্থা করেন। ইহুদীদেরকে উপাসনায় কেউ বাধা দেবে না। তারা বিনা বাধায় জেরুজালেমের বাইতুল মুকাদ্দাসে উপহার পাঠাতে পারবে। তাদেরকে জোরপূর্বক সামরিক বাহিনীতে যোগ দিতে হবে না। নিজেদের বিচার আচার ইহুদী সানহেদ্রিন নিজেরাই করবে। রোমানদের সাহায্য চাইলেই কেবল চূড়ান্ত বিচারে সাহায্য করা হবে।

অ্যান্টিপাটারের পুত্র ফাসেল হলেন জেরুজালেমের গভর্নর। তার আরেক পুত্র হেরোদ হলেন গালিলির গভর্নর। গালিলিতে একটি বিদ্রোহ হয়েছিল এ সময়, হেরোদ সেটি তুলেমূলে নির্মূল করেন। তার নির্দয়তার কারণে সানহেদ্রিন তাকে জুদাহ থেকে বহিস্কার করে।

ব্রুটাস আর ক্যাসিয়াসের মতো সিনেটরদের হাতে নিহত হলেন জুলিয়াস সিজার। তখন খ্রিস্টপূর্ব ৪৪ সাল, অর্থাৎ ইহুদীদের এ নতুন সুযোগ সুবিধার মাত্র তিন কি চার বছর হলো। তবে সিজারের গুপ্তহত্যার পর ক্যাসিয়াস হেরোদকে গুরুত্বপূর্ণ সামরিক দায়িত্ব দিয়েছিলেন, যেমনটি সিজার বেঁচে থাকার সময়ও সিরিয়ার গভর্নর দিয়েছিলেন।

জুলিয়াস সিজারের মৃত্যুর প্রতিশোধ নিতে মার্ক অ্যান্টনি আর অক্টাভিয়ান এগিয়ে আসেন, তাদের হাতে পরাজিত হয়ে ক্যাসিয়াস আত্মহত্যা করেন। মার্ক অ্যান্টনি ও অক্টাভিয়ান ফাসেল আর হেরোদকে শাসক হিসেবে রাখেন, যদিও

হেরোদের ব্যাপারটা মেনে নিতে চায়নি ইহুদীরা। তাতে অ্যান্টনি ও অক্টাভিয়ানের কিছু যায় আসেনি। রোমানদের অধীনস্থ রাজা হিসেবে ফাসেল ও হেরোদ জুদাহ শাসন করতে থাকেন।

কিন্তু কিছু সময় পরেই, খ্রিস্টপূর্ব ৪০ সালে পারস্যের পার্থিয়ানরা আক্রমণ করে রোমানদের অধিকৃত এশিয়া মাইনর অঞ্চল, আর সেই সাথে সিরিয়া ও জুদাহ। ভাইপো অ্যান্টিগোনাসের হাতে সিংহাসন ছেড়ে দিতে বাধ্য হন রাজা দ্বিতীয় হিরক্যানাস; পার্থিয়ানদেরকে ডেকে এনেছিলেন এই অ্যান্টিগোনাসই।

হেরোদ এ চাল বুঝে যান, তিনি পার্থিয়ানদের সাথে শান্তিচুক্তি স্বাক্ষর করতে তাদের শিবিরে যেতে মানা করেন ফাসেলকে। কিন্তু তবুও সেখানে যান ফাসেল, সাথে ছিলেন হিরক্যানাস। হিরক্যানাসের জীবিত দেহ ক্ষতবিক্ষত করে পার্থিয়ানরা। এমন ভাগ্য যেন বরণ করতে না হয়, সেজন্য নিজের মাথার মগজ নিজেই খুলি ফাটিয়ে বের করে আত্মহত্যা করেন ফাসেল। মারা যাবার আগে তিনি নিশ্চিত করেন যে, ছোট ভাই হেরোদ (Caiaphas হিব্রু 'হোর্দোস') জেরুজালেম থেকে পালিয়ে নিজের জীবন রক্ষা করেছেন।

কিন্তু পালিয়ে যাওয়া হেরোদ হয়তো তখনও জানতেন না, তার দম ফুরায়নি। তিনি আরও অনেক বছর টিকে থাকেন। এই সেই 'হেরোদ দ্য গ্রেট', যার সময় জন্ম নেন যীশু খ্রিস্ট বা হযরত ঈসা (আ)।

অধ্যায় ৪

রাজা হেরোদের রাজত্বে



পার্থিয়ানরা বিজয় পেয়ে যাওয়ার পর হেরোদ রোমের উদ্দেশ্যে যাত্রা করেন, তার ইচ্ছে মার্ক অ্যান্টনির সাথে দেখা করবেন।

মার্ক অ্যান্টনির আসল নাম মার্কাস অ্যান্টনিয়াস, তবে আমরা তাকে মার্ক অ্যান্টনি বা অ্যান্থনি নামেই চিনি বেশি। তিনি ছিলেন জুলিয়াস সিজারের কড়া সমর্থক, সেটি পাঠক ইতোমধ্যেই জেনে গিয়েছেন। গৃহযুদ্ধের সময় সিজার এই মার্ক অ্যান্টনিকে ইতালির প্রশাসক হিসেবে নিয়োগ দেন, যেন তিনি নিজে এ সুযোগে ঠাণ্ডা মাথায় গ্রিস, উত্তর আফ্রিকা আর স্পেন জুড়ে নিজের রাজনৈতিক শত্রুদের নির্মূল করতে পারেন। কিন্তু খ্রিস্টপূর্ব ৪৪ সালে জুলিয়াস সিজার নিহত হলেন। তখন অ্যান্টনি আরও দুজনের সাথে সম্মিলিতভাবে এ হত্যার প্রতিশোধ নিতে উঠে পড়ে লাগেন। এ দুজনের একজন ছিলেন সিজারের জেনারেল মার্কাস লেপিডাস, আর অন্যজন সিজারের পালিত পুত্র অক্টাভিয়ান। তারা দুই বছর পর ফিলিপির যুদ্ধে এ হত্যার বদলা নেন। এরপর তারা নিজেদের মাঝে সরকারব্যবস্থা ভাগাভাগি করে নিলেন। অ্যান্টনি দেখবেন রোমের পূর্ব দিকের প্রদেশগুলো, যার মাঝে অধীনস্থ রাজ্য মিসরও আছে; মিসর তখন শাসন করছেন রানী সপ্তম ক্লিওপেট্রা। অ্যান্টনির কাঁধে এসে পড়ে পারস্যের পার্থিয়ার বিরুদ্ধে যুদ্ধের ভারও।

কিন্তু ক্ষমতার বন্টনের কিছুদিন পরেই এই তিন মহারথীর মাঝে দ্বন্দ্ব শুরু হয়। খ্রিস্টপূর্ব ৪০ সালে অক্টাভিয়ানের সাথে অ্যান্টনির গৃহযুদ্ধ প্রায় লাগবে লাগবে অবস্থা; কিন্তু অ্যান্টনি অক্টাভিয়ানের বোন অক্টাভিয়াকে বিয়ে করে ফেললেন, তাই

গৃহযুদ্ধ এড়ানো গেল। কিন্তু সমস্যা হলো তখনই, যখন অ্যান্টনি একই সাথে রানী ক্লিওপেট্রার সাথেও প্রেম চালিয়ে যেতে থাকলেন। ক্লিওপেট্রার গর্ভে অ্যান্টনির তিন সন্তান জন্ম নেয়। ফলে অ্যান্টনির সাথে অষ্টাভিয়ানের সম্পর্ক আরও খারাপ হয়ে যায়।

খ্রিস্টপূর্ব ৩৬ সালে লেপিডাসকে এই তিনজনের জোট থেকে বহিষ্কার করা হয়। তার তিন বছর পর অ্যান্টনি ও অষ্টাভিয়ানের দ্বন্দ্ব চূড়ান্ত রূপ নেয়। টানা দুবছর ধরে চলে আসা এ দ্বন্দ্ব একটা পর্যায়ে গৃহযুদ্ধে রূপ নিল।

অষ্টাভিয়ানের নির্দেশে রোমান সিনেট যুদ্ধ ঘোষণা করলো রানী ক্লিওপেট্রার বিরুদ্ধে, আর অ্যান্টনিকে বিশ্বাসঘাতক আখ্যায়িত করা হলো। সে বছর অ্যাক্টিয়ামের যুদ্ধে অষ্টাভিয়ানের বাহিনী অ্যান্টনিকে পরাজিত করে। ক্লিওপেট্রার সাথে তিনি মিসরে পালিয়ে যান।

সেখানেও অষ্টাভিয়া আক্রমণ চালালেন। মিসরের আলেক্সান্দ্রিয়া অবরোধ করলেন তিনি। আপাতদৃষ্টিতে মনে হলো, জিততে চলেছেন অ্যান্টনিই। কিন্তু বিধিবাম, অ্যান্টনিকে পরাজয় বরণ করতে হলো। আত্মহত্যা করলেন অ্যান্টনি। যুদ্ধের নয় দিন পর রানী ক্লিওপেট্রাও নিজের প্রাণ কেড়ে নিলেন। সিজার ও ক্লিওপেট্রার ছেলে সিজারিয়ন, এবং অ্যান্টনির বড় ছেলে অ্যান্টাইলাস— দুজনকেই মৃত্যুদণ্ড দেন অষ্টাভিয়ান।

অ্যান্টনি মারা গেলে পরে অষ্টাভিয়ান রোমান সাম্রাজ্যের একচ্ছত্র অধিপতি বনে যান। খ্রিস্টপূর্ব ২৭ সালে তিনি অগাস্টাস উপাধি নিয়ে নিজেকে প্রথম রোমান সম্রাট হিসেবে ঘোষণা দেন।

এবার ফিরে আসি হেরোদের কথায়। মার্ক অ্যান্টনি বেঁচে থাকতে তিনি প্রভাব খাটিয়ে হেরোদকে জুদাহ রাজ্যের রাজা বানিয়ে দেন। এটা করার কারণ ছিল, এতে পার্থিয়ানদের সমর্থিত শাসক অ্যান্টিগোনাসকে সরানো যেতে পারে। রোমান বাহিনী নিয়ে এসে হেরোদ জুদাহ আক্রমণ করেন, পাঁচ মাস টানা অবরোধ করে রাখেন তিনি জেরুজালেমকে।

অবশেষে খ্রিস্টপূর্ব ৩৭ সালে জেরুজালেমের পতন হয়। হেরোদ রাজা হলেন। রাজা হবার পর তিনি সামারিয়ার সাথে জুদাহ রাজ্য যোগ করে রাজ্যের আকার বড় করলেন। তিনি বয়স্ক ইহুদীদের কাউন্সিল বাতিল করে আগেকার হেলেনিজম মানা শাসকদের মতো পরামর্শক কাউন্সিল তৈরি করলেন। তার মনে ছিল, সানহেদ্রিন তাকে সমর্থন না দিয়ে অ্যান্টিগোনাসকে দিয়েছিল, এ কারণে হেরোদ সানহেদ্রিনের একাত্তর সদস্যের মধ্যে পঁয়তাল্লিশ জনকেই হত্যা করেন। এর মাঝে হাসমোনীয় সাম্রাজ্যের সমর্থক অনেক সাদুকিই ছিলেন। তবে তিনি

মহান সানহেদ্রিনের দুজন গুরুত্বপূর্ণ ফারিসি নেতাকে ছেড়ে দিলেন। তারা ছিলেন হিল্লেল এবং শাম্মাই। লেখালেখি ও শিক্ষাকর্ম চালিয়ে গেলেন তারা। এই দুজনের লেখা আজও ইহুদীদের মাঝে পবিত্র।

হেরোদের জন্ম ইদুমি পরিবারে। এ পরিবার থেকে ইমাম হওয়া যাবে না। ইদুমিরা হাসমোনীয়দের হাতে জোরপূর্বক ইহুদী ধর্ম গ্রহণ করেছিল বহু আগে। যেহেতু ইমাম হবার যোগ্যতা তার নেই, তাই হেরোদ এ দায়িত্ব অর্পণ করলেন হানানেল নামের এক ব্যবিলনীয় ইহুদীর হাতে। তিনি নাকি সাদুক বংশের মানুষ।

হাসমোনীয় রাজা দ্বিতীয় হিরক্যানাসের কন্যা আলেক্সান্দ্রার কথা মনে আছে? হেরোদ বিয়ে করেন তারই মেয়ে পরমা সুন্দরী রাজকন্যা মারিয়ামিকে, হিব্রুতে তার নাম মিরিয়াম (מִרְיָם), বা আরবিতে মারিয়াম (ইনি যীশুর মা নন)। তাদের পাঁচ সন্তানের জন্ম হয়। বেঁচে ছিল দুই ছেলে আর দুই মেয়ে। পঞ্চম জন ছিল ছেলে সন্তান। হেরোদ যখন তার ছেলেদেরকে রোমে পাঠান পড়াশোনা করতে, তখন এই পঞ্চম সন্তান পানিতে ডুবে কম বয়সে মারা যায়।

ইতিহাসবিদ জোসেফাস জানান, মিরিয়াম এত করে চাইতেন যে তার চাপে পড়ে মিরিয়ামের ভাই অ্যারিস্টোবুলাসকে হেরোদ প্রধান ইমাম বানিয়ে দেন হানানেলকে সরিয়ে। কিন্তু অ্যারিস্টোবুলাসের বয়স তখন আঠারোও হয়নি। এক বছরের মাথাতেই সে পানিতে ডুবে মারা যায়, এবং হানানেল আবার এ পদে ফিরে আসেন। মিরিয়ামের মা আলেক্সান্দ্রা এ মৃত্যুর জন্য হেরোদকে দায়ী করতে থাকেন। এমনকি রানী ক্লিওপেট্রার কাছে চিঠি লিখেন, তিনি যেন হেরোদকে শাস্তি দেন এজন্য।

ক্লিওপেট্রা মার্ক অ্যান্টনিকে অনুরোধ করলেন হেরোদকে শাস্তি দিতে। অ্যান্টনি আত্মপক্ষ সমর্থনের সুযোগ দেয়ার জন্য ডাকলেন হেরোদকে। হেরোদ চাচা ইউসুফ বা জোসেফের কাছে রেখে গেলেন তার সুন্দরী স্ত্রী মিরিয়ামকে। যাওয়ার আগে বলে গেলেন, যদি অ্যান্টনি হেরোদকে মেরে ফেলেন, তাহলে চাচা যেন মিরিয়ামকে মেরে ফেলেন। কারণ এত সুন্দরী এ বউকে তিনি মৃত্যুর পর আরেকজনের স্ত্রী হতে দেবেন না। চাচা জোসেফ রানীর সাথে সখ্যতা গড়ে তোলেন, আর এক পর্যায়ে হেরোদের এ কথাটা তাকে বলে দেন, কথাটা জানাজানিও হয়ে যায়।

খুব শীঘ্রই গুজব রটে যায়, হেরোদকে নাকি মার্ক অ্যান্টনি মেরে ফেলেছেন। আলেক্সান্দ্রা তখন জোসেফকে অনুরোধ করলেন, তিনি যেন তাকে আর মিরিয়ামকে রোমান নিরাপত্তায় নিয়ে যাওয়ার ব্যবস্থা করেন। কিন্তু ওদিকে হেরোদ মার্ক অ্যান্টনির কাছ থেকে ছাড়া পেয়ে ফিরে এলেন। এসে জানতে পারলেন

আলেক্সান্দ্রার পরিকল্পনার কথা। হেরোদের মা আর বোন সালোমি সব বলে দিলেন তাকে।

সালোমি হেরোদের কাছে অভিযোগ করলেন, মিরিয়াম নাকি জোসেফের সাথে ব্যভিচার করেছেন, কিন্তু হেরোদ স্ত্রীর সাথে আলাপের পর এ অভিযোগ উড়িয়ে দিলেন।

হেরোদের স্ত্রী মিরিয়াম তাকে জিজ্ঞেস করলেন, আসলেই কি হেরোদ এমন আদেশ দিয়ে গিয়েছিলেন যে, তিনি মারা গেলে মিরিয়ামকেও যেন मेरे ফেলা হয়? এটা শুনে হেরোদের মাথায় রক্ত উঠে গেল। তিনি ভাবলেন, এ গোপন কথা জোসেফ কেবল তখনই মিরিয়ামকে বলতে পারেন, যদি তারা ঘনিষ্ঠ হন। মানে, তারা নিশ্চয়ই যৌন সম্পর্কে লিপ্ত হয়েছেন। হেরোদ চাচা জোসেফকে মৃত্যুদণ্ড দিলেন, আলেক্সান্দ্রাকে বন্দী করলেন। তবে স্ত্রী মিরিয়ামকে কিছুই করলেন না।

এরপরেও হেরোদ একই আদেশ দিয়ে যেতেন, তিনি মারা গেলে যেন মিরিয়াম আর তার মাকে হত্যা করা হয়। এ থেকে মিরিয়ামের ধারণা হয়, হেরোদ আসলে তাকে ভালোবাসেন না। একবার হেরোদ বাড়ি ফেরার পর মিরিয়াম তার সাথে কঠিন আচরণ করতে লাগলেন, নিজের ঘৃণা প্রকাশ করলেন। হেরোদের মা আর বোনও মিরিয়ামের নামে মিথ্যা সব তথ্য দিতে লাগলেন। তারপরও হেরোদ তার স্ত্রীকে কিছুই করলেন না। কিন্তু মিরিয়াম তার সাথে সঙ্গম করতে অস্বীকার করলেন।

বোন সালোমি এসে হেরোদকে বললেন, মিরিয়াম হেরোদকে বিষ পান করিয়ে হত্যা করতে চান। হেরোদ সত্য বের করার জন্য মিরিয়ামের সেবক খোজার ওপর প্রচণ্ড নির্যাতন চালালেন (সে আমলে রানী বা রাজকন্যাদের সেবার দায়িত্ব নারী ও খোজাদের ওপর থাকত)। খোজার কাছ থেকে কিছুই জানা গেল না। তবে একের পর এক অভিযোগের তোড়ে খ্রিস্টপূর্ব ২৯ সালে হেরোদের আদেশে মিরিয়ামকে মৃত্যুদণ্ড দেয়া হয়। মূল অভিযোগ— হেরোদের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র। মিরিয়ামের মৃত্যুর পর অনেকদিন শোকগ্রস্ত ছিলেন হেরোদ। কথিত আছে, মিরিয়ামের মৃতদেহকে মধুতে মাখিয়ে সাত বছর পর্যন্ত তিনি সঙ্গম চালিয়ে যান।

অ্যান্টনি ও ক্লিওপেট্রা যখন অষ্টাভিয়ানের বাহিনীর হাতে পরাজিত হন, তখন হেরোদ অষ্টাভিয়ানের প্রতি আনুগত্য প্রকাশ করলেন। ফলে পম্পে জুদাহ প্রদেশ থেকে যা যা কেড়ে নিয়েছিলেন, সেগুলো তাকে ফিরিয়ে দেয়া হলো, সেই সাথে দুটো গ্রিক শহরও দেয়া হয়। পরের সাতাশ বছর হেরোদ অষ্টাভিয়ান তথা রোমান সম্রাট অগাস্টাসের অনুগত হিসেবে কাটিয়ে দেন জুদাহতে।

হেরোদ অ্যাপ্টিয়ামের যুদ্ধে অষ্টাভিয়ানের বিজয় স্মরণে খেলাধুলা চালু করেন, জেরুজালেমে গ্রিক থিয়েটার আর অভিনয়মঞ্চ তৈরি করেন। মাসাদার মতো কিছু শক্তিশালী দুর্গও তিনি নির্মাণ করেন। তবে তার সবচেয়ে বড় কীর্তি হলো, তিনি বাইতুল মুকাদ্দাস ভবন পুনর্নিমাণ করেন বিশালাকারে। এ ভবনের অল্প কিছু জিনিসই এখন অবশিষ্ট আছে।

তার নির্মিত বাইতুল মুকাদ্দাসে অ-ইহুদীদের কোর্টের পর কেবল ইহুদীদের জন্য ছিল আলাদা দ্বার। এরপর মহিলাদের কোর্ট। তারপর সাদুকিদের কুরবানি করার জায়গা, তের বছরের বেশি বয়সী ইহুদীরা সেখানে দাঁড়িয়ে কুরবানি দেখতে পারে। কেবল ইয়ম কিপুরের ঈদের দিনে প্রধান ইমাম ঢুকতে পারেন হোলি অফ দ্য হোলিজে।

পরের বছরগুলোতে হেরোদ আরও বড় কিছু জায়গা পান সিরিয়া থেকে। তবে জর্ডানের নাবাতীয়দের আক্রমণ করে তিনি অগাস্টাসকে রাগান্বিত করেন। সম্রাটকে শান্ত করতে তিনি আজ্ঞা জারি করেন, জুদাহ রাজ্যের সকল ইহুদীকে এই মর্মে সাক্ষ্য দিতে হবে যে, রোমান সম্রাট তাদের শাসক, তার প্রতি তারা অনুগত। একই সাথে হেরোদের প্রতিও তারা অনুগত।

কিন্তু ফারিসিদের বিশ্বাস ছিল, এমন আনুগত্য প্রকাশ করলে একটা পর্যায়ে মিসরের ফারাওয়ের মতো সম্রাটের পূজো করা লাগতে পারে। তাই তারা এমন আনুগত্য প্রকাশে অস্বীকার করলেন।

দেবদেবী উপাসক রোমানদের হাতে অধীনস্ত হওয়ার মতো দুর্দিন ইহুদীদের এসে গিয়েছে, তাই ফারিসিরা অপেক্ষায় রইলেন ভবিষ্যৎবাণীর সেই মাসিহ বা মেসায়ার, যিনি ইহুদীদের ত্রাণকর্তা রূপে আবির্ভূত হবেন। এরকম মেসায়ার নিয়ে চিন্তাভাবনা ফারিসিরা আগে করতেন না বটে, কিন্তু এখন করতে লাগলেন। কেউ কেউ তো মানুষকে বুঝিয়েও ফেললেন যে, তার পুত্রই হতে চলেছে মেসায়ার রাজা। তাদেরকে মৃত্যুদণ্ড দিলেন হেরোদ। অন্য কোনো রাজার কথা তিনি শুনতে চান না।

পরের বছর হেরোদ বাইতুল মুকাদ্দাসের মূল ফটকে ঈগল পাখির মূর্তি স্থাপন করেন। কিন্তু মূর্তি ইহুদী ধর্মে নিষিদ্ধ, তাই ধর্মপ্রাণ ইহুদীরা জড়ো হয়ে সেই মূর্তির বিরুদ্ধে আন্দোলন করে, মূর্তিটি নামিয়ে ধ্বংস করে ফেলে। এ আন্দোলনের জন্য হেরোদ তাদেরকে মৃত্যুদণ্ড দেন।

কিন্তু সে সময় নানা ঘটনার মাঝে হেরোদ নিজেই মারা যান খ্রিস্টপূর্ব ৪ সালে।

অধ্যায় ৫

দুই নবীর হত্যাকাণ্ড



ইহুদী ধর্মবেত্তাগণ পারতপক্ষে যীশু খ্রিস্টের ব্যাপারে কথা বলেন না। তাকে খ্রিস্ট বা মেসায়্যা হিসেবে স্বীকার করা তো দূরের কথা, নবী হিসেবেই স্বীকার করেন না। এ বইয়ের লেখক ব্যক্তিগত উদ্যোগে ইসলামের শুভাকাঙ্ক্ষী একজন র‍্যাবাইয়ের সাথে অনলাইনে আলাপ করে জানতে পারেন, ইসলাম মতে ঈসা (আ) ও মুহাম্মাদ (সা)-এর নবী হওয়ার ব্যাপারটি ইহুদী ধর্মমতে অবিশ্বাসের কিছু নয়। কিন্তু ইহুদীদের কেন্দ্রীয় যে কাউন্সিল কারও নবীত্বের সত্যতা ঘোষণা করতো, সে কাউন্সিল বহু আগেই ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়েছে। তাই এখন আনুষ্ঠানিকভাবে তাদেরকে নবী মানার সুযোগ নেই। তবে ইসলামে কুরআনে যে ঈসা (আ)-এর কথা এসেছে, তাকে নবী মানতে সমস্যা না হলেও, খ্রিস্টানদের ঈশ্বরপুত্র যীশুকে নবী মানতে সঙ্গত কারণেই কড়া আপত্তি আছে ইহুদীদের।

ঈসা (আ) বা যীশু খ্রিস্টের কথা বলতে গেলে, তার আগে অবধারিতভাবেই দুজন নবীর কথা বলা লাগে। তারা হলেন জাকারিয়া (আ) ও ইয়াহিয়া (আ)। জাকারিয়া (زكريا) কে হিব্রুতে ‘জেকারায়াহ’ (נִזְרְיָה) ডাকা হয়, যার মানে ‘ইয়াহ’ বা আল্লাহকে জেকার বা স্মরণ করা। তিনি মূসা (আ)-এর ভাই হারুন (আ)-এর বংশের একজন ইমামও ছিলেন। ইসলামে তাকে নবী হিসেবে উপস্থাপন করা হয়েছে। তার স্ত্রী ছিলেন হারুন বংশের এলিজাবেথ বা এলিসাবেথ (اليسابيث) (عۡلِيسَابۡث)। বৃদ্ধ বয়সে বাবা-মা হন তারা। তাদের সন্তানই নবী ইয়াহিয়া (আ)।

বাইবেল তাদের শেষ বয়সের সন্তানলাভের ঘটনাকে এভাবে বর্ণনা করে, “এহুদিয়ার (জুদাহ) বাদশাহ্ হেরোদের সময়ে জাকারিয়া নামে এক জন ইমাম ছিলেন; তার স্ত্রী হারুন-বংশীয়া, তার নাম এলিজাবেথ। তারা দুজন ধার্মিক ছিলেন, প্রভুর সমস্ত হুকুম ও নিয়ম অনুসারে নির্দোষভাবে চলতেন। তাদের কোনো সন্তান ছিল না। কেননা এলিজাবেত বন্ধ্যা ছিলেন এবং দুজনেরই অনেক বয়স হয়েছিল। একদিন জাকারিয়া যখন নিজের পালা অনুসারে ইমামের দায়িত্ব পালন করছিলেন, তখন প্রথানুসারে গুলিবাঁট ক্রমে তাকে প্রভুর পবিত্র স্থানে প্রবেশ করে ধূপ জ্বালাতে হলো। সেই ধূপ জ্বালাবার সময় সমস্ত লোক বাইরে থেকে মুনাজাত করছিল। তখন প্রভুর একজন ফেরেশতা ধূপ-গাহের ডান পাশে দাঁড়িয়ে তাকে দর্শন দিলেন। তাকে দেখে জাকারিয়ার মন অস্থির হয়ে উঠলো, ভীষণ ভয় তাকে পেয়ে বসলো। কিন্তু ফেরেশতা তাকে বললেন, জাকারিয়া, ভয় করো না, কেননা তোমার ফরিয়াদ গ্রাহ্য হয়েছে। তোমার স্ত্রী এলিজাবেত তোমার জন্য পুত্র প্রসব করবেন ও তুমি তার নাম ইয়াহিয়া রাখবে। তোমার আনন্দ ও উল্লাস হবে এবং তার জন্মে অনেকে আনন্দিত হবে। কারণ, সে প্রভুর সামনে মহান হবে এবং মদ পান করবে না; আর সে মায়ের গর্ভ থেকেই পাক-রূহে পরিপূর্ণ হবে; এবং বনী ইসরাইলদের মধ্যে অনেককে সে তাদের আল্লাহ্ মালিকের প্রতি ফেরাবে। তখন জাকারিয়া ফেরেশতাকে বললেন, কেমন করে আমি তা জানতে পারব? কেননা আমি বৃদ্ধ এবং আমার স্ত্রীরও অনেক বয়স হয়েছে। ফেরেশতা জবাবে তাকে বললেন, আমি জিবরাইল, তোমার সঙ্গে কথা বলার ও তোমাকে এসব বিষয়ের সুখবর দেবার জন্য প্রেরিত হয়েছি। আর দেখ, এসব যেদিন ঘটবে, সেদিন পর্যন্ত তুমি নীরব থাকবে, কথা বলতে পারবে না। যেহেতু আমার এই সকল বাক্য যা যথাসময়ে সফল হবে, তাতে তুমি বিশ্বাস করলে না।” (গসপেল অফ লুক, ১:৫-২০)

ইসলাম ধর্ম অনুযায়ী, জাকারিয়া (আ) ছিলেন জেরুজালেমে বাইতুল মুকাদাসের ইমাম। তিনি এ উপাসনালয়ের যাবতীয় কাজকর্ম দেখা শোনা করতেন, আর আল্লাহর প্রতি সদা অনুগত ছিলেন।

বৃদ্ধ বয়সে পৌঁছাবার পর তিনি ভয় করতে লাগলেন, তার বংশে আর বাতি জ্বলবে না। তিনি চাইতেন, তার কোনো পুত্র হোক, যে আল্লাহওয়ালা হবে, মানুষকে আল্লাহর পথে ডাকবে। তিনি স্বপ্ন দেখতেন, ইসরাইল সেই ইয়াকুব (আ)-এর স্বর্ণযুগে ফিরে যাবে।

কুরআনে জাকারিয়া (আ) দম্পতির কথা উল্লেখ আছে ঠিক এভাবে, “এটা তোমার প্রতিপালকের অনুগ্রহের বিবরণ তাঁর বান্দা জাকারিয়ার প্রতি, যখন সে তার প্রতিপালককে গোপনে ডেকেছিল। সে বলেছিল, হে আমার প্রতিপালক! আমার হাড়গুলো দুর্বল হয়ে গেছে, আর বার্ষিক্যে আমার মস্তক সাদা হয়ে গেছে। হে আমার প্রতিপালক! আপনাকে ডেকে আমি কখনো বিফল হইনি। আর আমার পরে স্বগোষ্ঠীয়দের সম্পর্কে আমি আশংকাবোধ করছি। আমার স্ত্রী তো বন্ধ্যা, অতএব আপনি আমাকে আপনার পক্ষ থেকে একজন উত্তরাধিকারী দান করুন। যে আমার উত্তরাধিকারী হবে আর উত্তরাধিকারী হবে ইয়াকুব পরিবারের; আর হে আমার প্রতিপালক! তাকে করুন আপনার সন্তুষ্টির পাত্র। আল্লাহ (ফেরেশতা মারফত) বললেন, হে জাকারিয়া! আমি তোমাকে এক পুত্রের সুসংবাদ দিচ্ছি যার নাম হবে ইয়াহিয়া, পূর্বে এ নামে আমি কাউকে আখ্যায়িত করিনি। সে বলল, হে আমার পালনকর্তা! আমার পুত্র হবে কেমন করে, আমার স্ত্রী তো বন্ধ্যা, আর আমি বার্ষিক্যের শেষ স্তরে পৌঁছে গেছি। তিনি বললেন, এভাবেই হবে, তোমার প্রতিপালক বলেছেন, এটা আমার পক্ষে সহজ। ইতোপূর্বে আমিই তোমাকে সৃষ্টি করেছি, যখন তুমি কিছুই ছিলে না। সে বলল, হে আমার প্রতিপালক, আমার জন্য একটি নিদর্শন ঠিক করে দিন। তিনি বললেন, তোমার জন্য এটাই নিদর্শন যে, তুমি সুস্থ থেকেও তিন রাত কারো সাথে কথা বলবে না। অতঃপর সে মিহরাব হতে বেরিয়ে তার লোকদের সামনে আসল এবং ইশারায় তাদেরকে বলল যে, তোমরা সকাল ও সন্ধ্যায় তাসবীহ পাঠ করো।” (কুরআন, সূরা মারিয়াম, ১৯:২-১১)

“অতঃপর আমি তার ডাকে সাড়া দিয়েছিলাম এবং তাকে দান করেছিলাম ইয়াহিয়া, আর তার জন্য তার স্ত্রীকে (গর্ভধারণের) যোগ্য করেছিলাম। তারা সৎকাজে প্রতিযোগিতা করত, আর তারা আমাকে ডাকত আগ্রহ ও ভীতির সাথে এবং তারা ছিল আমার নিকট ভীত-অবনত।” (কুরআন, সূরা আশ্বিয়া ২১:৯০)

বাইবেলে জাকারিয়া (আ)-এর কথা বলার অক্ষমতাকে শান্তির মতো করে উল্লেখ করা হলেও, কুরআনে এ ঘটনাকে নিদর্শন বলা হয়েছে। কেউ বলেন, তার বয়স তখন ছিল বিরানব্বই, কেউ বা বলেন সাতাত্তর বা তারও বেশি। তার এ ঘটনার সাথে ইব্রাহিম (আ)-এর বৃদ্ধ বয়সে সন্তান হবার ঘটনার মিল রয়েছে।

ইয়াহিয়া (আ)-কে খ্রিস্টধর্মে ‘জন দ্য ব্যাপ্টিস্ট’ ডাকা হয়, আর হিব্রুতে ‘ইউহানা’ (יחנן)। পানিতে অবগাহন করিয়ে তিনি লোকদেরকে তরিকা দিতেন দেখে তাকে ব্যাপ্টিস্ট ডাকা হয় খ্রিস্টধর্মে। ইতিহাসবিদ জোসেফাসও তার গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন ইয়াহিয়া (আ)-এর কথা। তাকে অনেকে মেসায়্যা বলে

মনে করত, যদিও তিনি মেসায়ী আগমনের পথ প্রস্তুত করতে এসেছেন বলে কথিত আছে।

হেরোদ দ্য গ্রেটের মৃত্যুর পর, সম্রাট অগাস্টাস এহুদিয়া বা জুদাহ রাজ্যকে হেরোদের তিন সন্তানের মাঝে ভাগ করে দেন। সামারিয়া আর মধ্য-জুদাহের ভাগ পড়ে পুত্র আর্কেলাউসের ওপর, ফিলিপ পান দক্ষিণ সিরিয়া, আর গালিলির দায়িত্ব পান হেরোদ অ্যান্টিপাস, ইতিহাসে তিনি হেরোদপুত্র হেরোদ নামেই পরিচিত। এই হেরোদই ইয়াহিয়া (আ)-এর খুনী। উল্লেখ্য, আর্কেলাউসের শাসন টেকে দশ বছর মাত্র, ইহুদী আর সামারিটানদের কাছ থেকে অনেক অভিযোগ পেয়ে অগাস্টাস তাকে নির্বাসিত করেন। ফলে জুদাহ প্রদেশ রোমানদের অধীনে চলে এলো বেশি করে, একজন রোমান গভর্নর 'প্রিফেক্ট' উপাধি নিয়ে শাসন করতেন এ এলাকা।

হেরোদ দ্য গ্রেট তার দুই পুত্রকে খ্রিস্টপূর্ব ৭ সালে মৃত্যুদণ্ড দেন। এরপর তিনি নিজের এক পুত্রের সাথে বিয়ে দিলেন রাজকন্যা হেরোদিয়াসের, কিন্তু সেই পুত্র আবার হেরোদিয়াসের সৎ-চাচা। হেরোদের বড় ছেলে অ্যান্টিপ্যাটার এ বিয়ের বিরোধিতা করেন, কিন্তু তাকে তিন বছর পরে মৃত্যুদণ্ড দেন হেরোদ দ্য গ্রেট তাকে বিষ প্রয়োগ করে মারতে চাওয়ার অভিযোগে। হেরোদিয়াস স্বামী ফিলিপের কাছ থেকে তালাক নিয়ে নিলেন। এ ঘরে তার এক মেয়ে ছিল, যার নাম সালোমি।

হেরোদিয়াস এবার বিয়ে করলেন তার স্বামীর ভাই হেরোদ অ্যান্টিপাসকে। হেরোদিয়াসকে খুশি করতে এই হেরোদ নিজের প্রথম স্ত্রীকে তালাক দিয়ে দিলেন।

এই ঘটনা মেনে নিতে পারেননি নবী ইয়াহিয়া (আ)। তিনি হেরোদের এ কর্মকে অন্যায় ও ঘৃণ্য বলে প্রচার করতে লাগলেন। ব্যাপারটা হেরোদ পছন্দ করলেন না।

হেরোদের জন্মদিনের অনুষ্ঠানে, হেরোদিয়াসের কন্যা সালোমি রাজা আর অতিথিদের সামনে চমৎকার নাচলো। তার নাচে মুগ্ধ হলেন হেরোদ, মাতাল অবস্থায় তিনি সালোমিকে জিজ্ঞেস করলেন, কী চায় সে, দরকার হলে রাজত্বের অর্ধেক দিয়ে দিতে রাজি। সালোমি জিজ্ঞেস করলো তার মাকে, কী চাওয়া উচিত তার। মা হেরোদিয়াস শিখিয়ে দিলেন তাকে, কী বলতে হবে। সালোমি হেরোদকে বলল, সে একটি থালায় করে জন দ্য ব্যাপ্টিস্ট অর্থাৎ ইয়াহিয়া (আ)-এর কাটা মাথা চায়। হেরোদ প্রথমে দুঃখিত হলেন, কিন্তু পরে রাজি হলেন। হেরোদ সাথে সাথেই এক সেনাকে পাঠিয়ে জেলবন্দী ইয়াহিয়া (আ)-এর কাটা মাথা নিয়ে

আসতে বললেন। সেই কাটা মাথা সালোমির সামনে থালায় করে উপস্থাপন করা হলো।

খবর পেয়ে ইয়াহিয়া (আ)-এর সাহাবীরা লাশ নিয়ে গিয়ে দাফন করলেন। খ্রিস্টানরা আজও এ দিনটি শ্রদ্ধার সাথে স্মরণ করে প্রতি বছর ২৯ আগস্ট। কথিত আছে, তাকে দাফন করা হয় আজকের পশ্চিম তীরের নাবলুসে। ইতিহাসবিদরা বলেন, ৩৬২ সালে রোমান সম্রাট জুলিয়ান তার কবর ধ্বংস করে দেন, তার দেহাবশেষের অংশবিশেষ পুড়িয়ে ফেলা হয়। বাকিটুকু নিয়ে যাওয়া হয় জেরুজালেম, এরপর আলেক্সান্দ্রিয়ায়। নাবলুসের কাছে নবী ইয়াহিয়া মসজিদকেই তার আদি কবর বলা হয়। আবার দামেস্কের উমাইয়া মসজিদেও তার দেহাবশেষ রয়েছে বলে দাবি করা হয়।

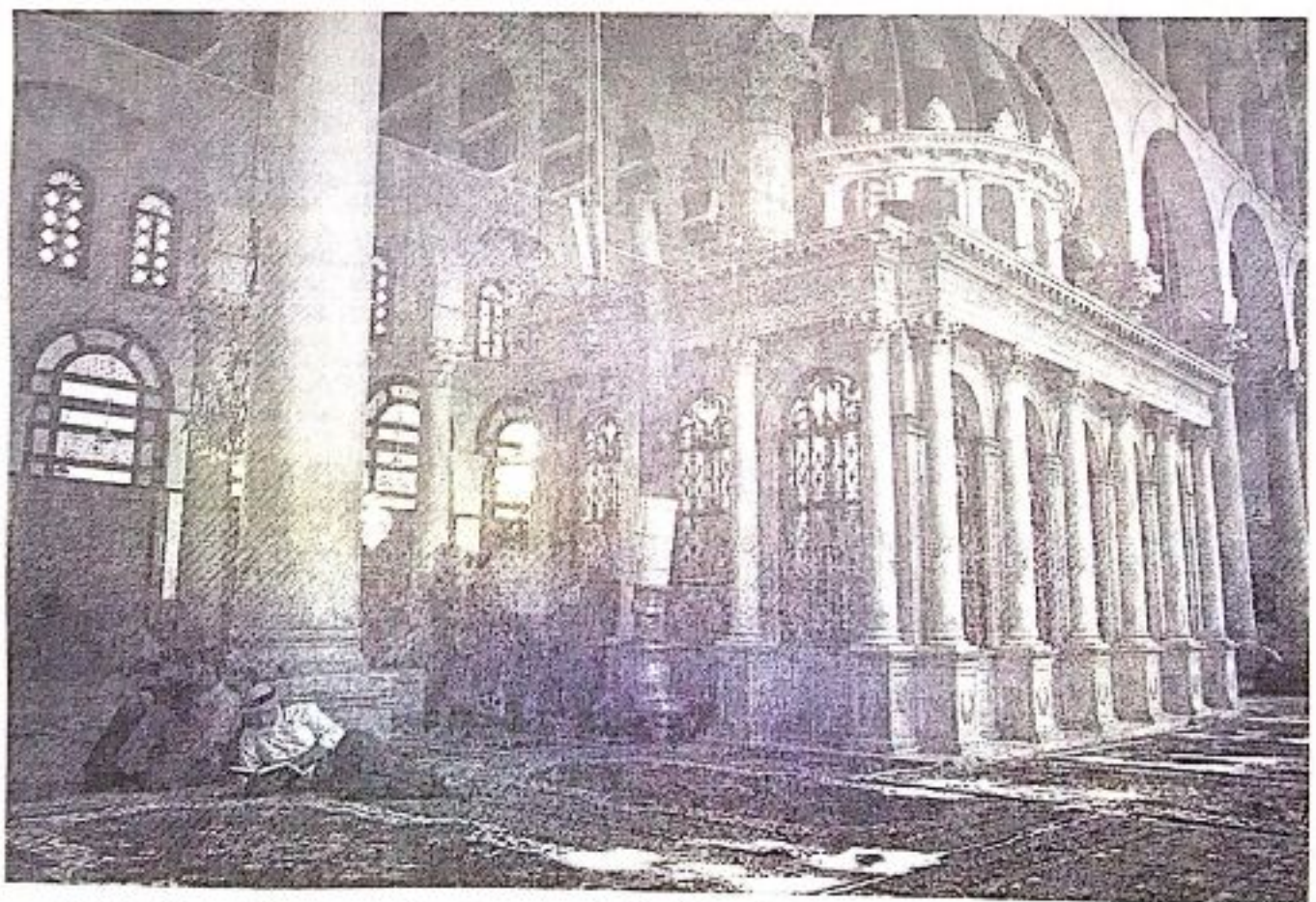


নবী ইয়াহিয়া মসজিদ

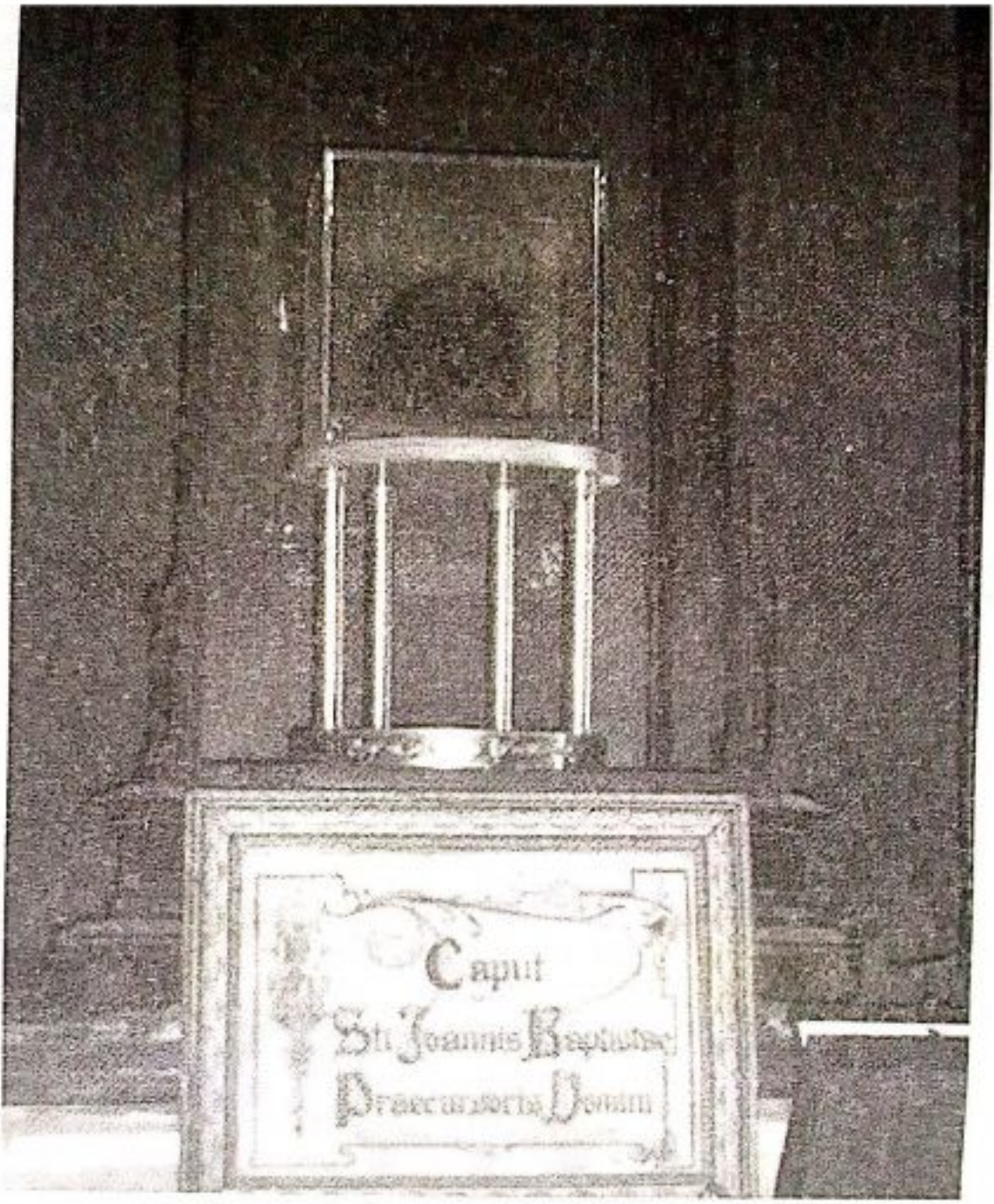
কিন্তু ইয়াহিয়া (আ)-এর সেই কাটা মাথা কোথায় হারিয়ে যায়, তা নিয়ে রয়েছে নানা কিংবদন্তি। রোমান ক্যাথলিকরা বিশ্বাস করেন, রোমে সেইন্ট সিলভেস্টার ব্যাসিলিকায় প্রদর্শিত মাথাই জন দ্য ব্যাপ্টিস্টের মাথা। এ কথায় সমর্থন দিয়েছেন পোপ বেনেডিক্টও। কথিত আছে, মধ্যযুগে টেম্পলার নাইটরা এ কাটা মাথা খুঁজে পেয়েছিল। তবে ইসলামের কথ্য কিংবদন্তি অনুযায়ী, জন দ্য ব্যাপ্টিস্টের মাথা সিরিয়ার দামেস্কের উমাইয়া মসজিদে রয়েছে; পোপ জন পল দ্য সেকেন্ড এ কবর ঘুরে গিয়েছিলেন ২০০১ সালে। মুসলিমদের মাঝে এ বিশ্বাসও প্রচলিত আছে যে, এ মসজিদেই ঈসা (আ) নেমে আসবেন কেয়ামতের আগে।



দামেস্কের উমাইয়া মসজিদ



উমাইয়া মসজিদের এ স্থানে জন দ্য ব্যাপ্টিস্টের কাটা মাথা রক্ষিত বলে কথিত আছে

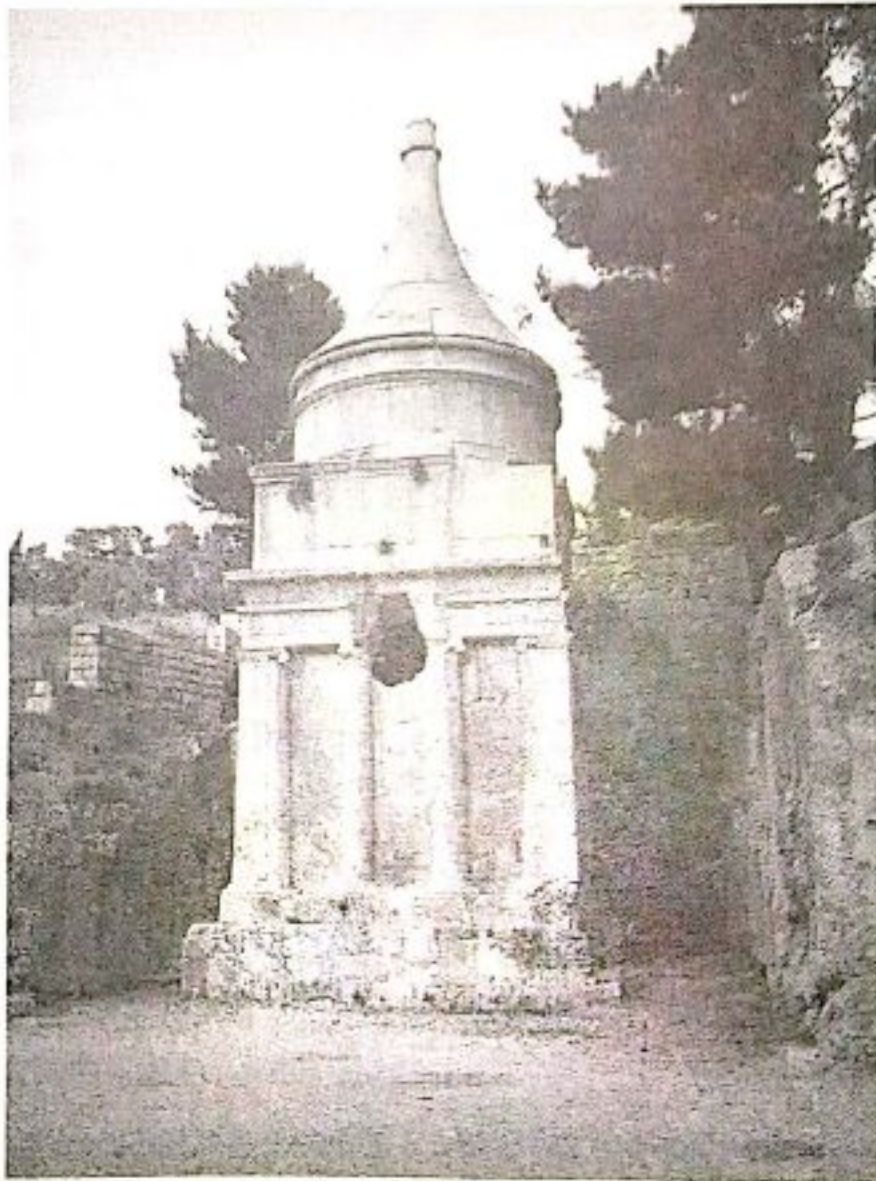


রোমের সেইন্ট সিলভেস্টার ব্যাসিলিকায়

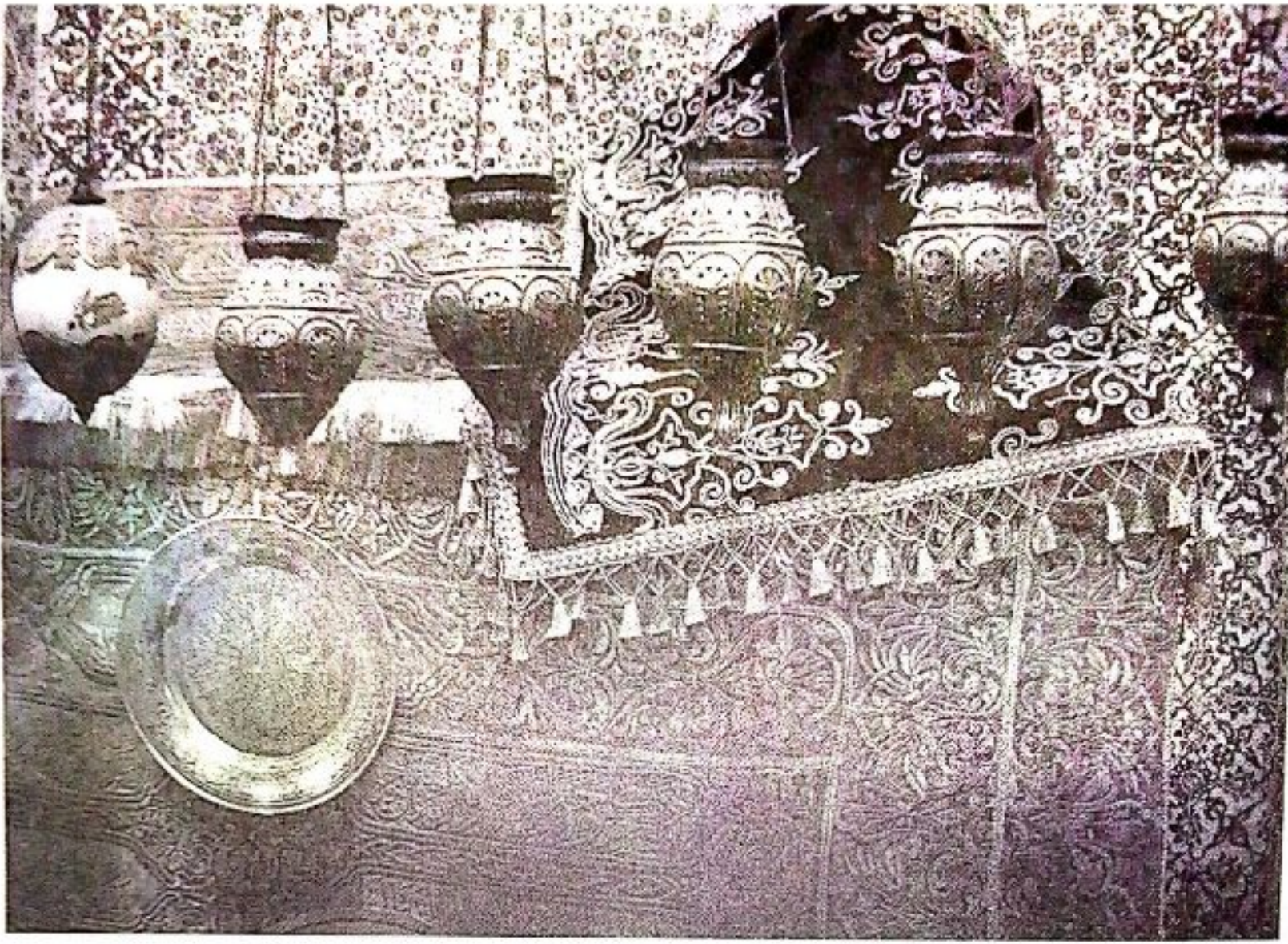
কুরআন অনুযায়ী, ইয়াহিয়া (আ) ছিলেন নিষ্পাপ এবং বাল্যকালেই তাকে কিতাবের জ্ঞান দান করা হয়। “হে ইয়াহিয়া! এ কিতাব (তাওরাত) সুদৃঢ়ভাবে ধারণ কর। আমি তাকে বাল্যকালেই জ্ঞান দান করেছিলাম। আর তাকে দিয়েছিলাম আমার পক্ষ থেকে দয়া-মায়া ও পবিত্রতা। সে ছিল আল্লাহভীরু। আর সে ছিল তার পিতা-মাতার সাথে সদাচারী, ছিল না অহংকারী, অবাধ্য। তার প্রতি শান্তি ছিল যেদিন সে জন্মগ্রহণ করে এবং শান্তি যেদিন তার মৃত্যু হয় এবং যেদিন সে পুনরুজ্জীবিত হবে।” (কুরআন, সূরা মারিয়াম ১৯:১২-১৫)

আল-বিদায়া ওয়ান নিহায়া কিতাবে উল্লেখিত আছে, পুত্র ইয়াহিয়া (আ) এর সন্ধানে পিতা জাকারিয়া (আ) দামেস্কের বুসাইনাতে গিয়েছিলেন। এমনকি ইয়াহিয়া (আ)-এর হত্যার সময় জাকারিয়া (আ) দামেস্কেই অবস্থান করছিলেন।

তবে কেন তিনি জেরুজালেম বা জুদাহ বাদ দিয়ে সিরিয়াতে ছিলেন, তার ব্যাখ্যা উল্লেখ নেই। একটি অতি দুর্বল বর্ণনায় আছে, জাকারিয়া (আ)-এর পুত্র ইয়াহিয়া (আ)-এর হত্যার পর রাজা ও রানী প্রাসাদসমেত ধ্বংস হয়ে যান। তা দেখে ইহুদীরা বলল, আমাদের রাজাকে জাকারিয়ার প্রভু ধ্বংস করে দিয়েছেন, আমরাও তাহলে জাকারিয়াকে ধ্বংস করে দিই। তারা জাকারিয়া (আ)-এর খোঁজে বের হলো তাকে হত্যা করতে। জাকারিয়া (আ) পালাতে লাগলেন এবং এক পর্যায়ে একটি গাছের ভেতরে আশ্রয় নেন। ইহুদীরা করাত দিয়ে সে গাছকে দুখণ্ড করে ফেলে। ফলে জাকারিয়া (আ) মারা যান। এ অদ্ভুত বর্ণনার বড় সমস্যা হলো, হেরোদ দামেস্কে থাকতেন না বা তার প্রাসাদও ধ্বংস হয়নি, তার স্ত্রীরও কিছু হয়নি। তারা আরও বহু বছর বেঁচে ছিলেন। ইতিহাসে তা ভালোভাবেই লিপিবদ্ধ আছে। ইবনে কাসির বলেন, এ হাদিস বড়ই অপ্রাসঙ্গিক, বিস্ময়কর এবং নবী (সা) থেকে বর্ণিত নয়। অন্যান্য মতে, জাকারিয়া (আ) স্বাভাবিকভাবেই মারা যান। তার কবর কোথায়, তা নিশ্চিত করে জানা যায় না।



জেরুজালেমের অদূরে কিদ্রোন উপত্যকার এ কবরে তিন শতক পরে লেখা হয়, এটি নাকি জাকারিয়া (আ)-এর কবর



সিরিয়ার আলেপ্পোর মসজিদে জাকারিয়া (আ)-এর কথিত কবর

তবে জাকারিয়া (আ)-এর আরেকটি পরিচয় ছিল, তিনি ভার্জিন মেরি বা কুমারী মারিয়ামের অভিভাবকও ছিলেন। সম্পর্কে জাকারিয়া (আ) ছিলেন ঈসা (আ)-এর মা মারিয়াম (রা)-এর আত্মীয়। ঈসা (আ) ছিলেন ইয়াহিয়া (আ)-এর খালাত ভাই। ইয়াহিয়া (আ) ছিলেন ছয় মাসের বড়।

অধ্যায় ৬

অতঃপর যীশু খ্রিস্ট



ইহুদীরা বিশ্বাস না করলেও খ্রিস্টধর্ম আর ইসলাম মতে, হারুন বংশের ইমরান পরিবারে জন্ম নেন পুণ্যবতী কন্যা মারিয়াম (আ)।

কুরআনে উল্লেখ আছে, “নিশ্চয় আল্লাহ আদম, নূহ ও ইবরাহীমের বংশধর এবং ইমরানের পরিবারকে সমগ্র সৃষ্টিজগতের ওপর মনোনীত করেছেন। তারা একে অপরের বংশধর... যখন ইমরান-পত্নী নিবেদন করল, হে আমার প্রতিপালক! নিশ্চয়ই আমার গর্ভে যা রয়েছে, তা আমি মুক্ত করে আপনার উদ্দেশে উৎসর্গ করলাম, সুতরাং আপনি আমা হতে তা গ্রহণ করুন, নিশ্চয়ই আপনি শ্রবণকারী, মহাজ্ঞানী। অতঃপর যখন সে তাকে প্রসব করল, বলে উঠল, হে আমার প্রতিপালক! আমি কন্যা প্রসব করেছি এবং আল্লাহ ভাল করেই জানেন যা সে প্রসব করেছে; বস্তুত পুত্র কন্যার মতো নয় এবং আমি তার নাম রাখলাম মারিয়াম এবং আমি তাকে ও তার বংশধরকে বিতাড়িত শয়তান হতে তোমার আশ্রয়ে ছেড়ে দিলাম। তখন তার প্রতিপালক তাকে সম্ভ্রষ্ট সহকারে গ্রহণ করলেন এবং তাকে উত্তমরূপে লালন পালন করলেন এবং জাকারিয়াকে তার তত্ত্বাবধায়ক করলেন। যখনই জাকারিয়া মারিয়ামের কক্ষে প্রবেশ করত, তার কাছে খাদ্য সামগ্রী দেখতে পেত; জিজ্ঞেস করত— হে মারিয়াম! এসব কোথেকে তোমার কাছে আসে? মারিয়াম বলত, ওসব আল্লাহর নিকট হতে আসে। নিশ্চয়ই আল্লাহ যাকে ইচ্ছে অপরিমেয় খাবার দান করেন।” (কুরআন, সূরা আলে ইমরান, ৩:৩৪-৩৭)

মারিয়াম বিনতে ইমরান (বাইবেলে ইমরান হলেন ‘আম্রাম’) ধর্মীয় ইতিহাসে বিনা পিতায় ঈসা (আ)-কে জন্মদানের জন্য স্মরণীয় হয়ে আছেন, একই সাথে

ইসরাইলের উত্থান-পতন ৫৫

তিনি ইসলামে সর্বকালের শ্রেষ্ঠ নারীদের একজন। তার মায়ের নাম হান্না। নাসরত গ্রামের এই ইমরান পরিবার থেকেই জন্ম নেন ঈসা (আ)।

মুহাম্মাদ ইবনে ইসহাক ও অন্যান্য ঐতিহাসিকগণ বলেন, হান্নার কোনো সন্তান হতো না। একদিন তিনি দেখেন, একটি পাখি তার ছানাকে আদর করছে, এ দৃশ্য দেখে তার সন্তান লাভের খুব ইচ্ছে হলো। তিনি মানত করলেন, তার যদি সন্তান হয় তাহলে তিনি তাকে বাইতুল মুকাদাসের সেবক বানাবেন। এই মানতের পরপরই তার ঋতুস্রাব শুরু হয়। স্রাব শেষ হবার পর পবিত্র হয়ে তিনি তার স্বামীর সাথে মিলিত হন। গর্ভে আসেন মারিয়াম (আ)। জন্মের পর দেখা গেল, তিনি কন্যা সন্তান প্রসব করেছেন। কন্যাকে তিনি বাইতুল মুকাদাসে দিতে পারবেন?



আজকের নাসরত

বাইতুল মুকাদাসে মারিয়ামের অভিভাবকত্বের জন্য হয়ে যাওয়া কলম-নিষ্ক্ষেপ লটারিতে তিনবার নাম এলো জাকারিয়া (আ)-এর, সম্পর্কে তিনি মারিয়ামের খালু। তার জন্য জাকারিয়া (আ) সুন্দর কক্ষ নির্ধারণ করে দিলেন। মসজিদের দায়িত্ব পালনের সময় মারিয়াম (আ) তা পালন করতেন। আর বাকি সময় তার কক্ষে থাকতেন। যখনই জাকারিয়া (আ) তার কক্ষে যেতেন, দেখতে

৫৬ ইসরাইলের উত্থান-পতন

পেতেন তার জন্য অজানা উৎস থেকে আসা খাবার সাজানো আছে। অর্থাৎ, ফেরেশতারা তার জন্য খাবার নিয়ে আসেন।

এরকমই একদিন, ফেরেশতা জিবরাঈল (আ) এসে মারিয়াম (আ)-কে সুসংবাদ দিলেন তার গর্ভে আসতে চলা শিশুর, তার নাম রাখতে হবে ঈসা।

কুরআন বলছে— “আর স্মরণ কর, যখন ফেরেশতারা বলল, হে মারিয়াম, নিশ্চয় আল্লাহ তোমাকে মনোনীত করেছেন ও পবিত্র করেছেন এবং নির্বাচিত করেছেন তোমাকে বিশ্বজগতের নারীদের ওপর। হে মারিয়াম, তোমার প্রতিপালকের প্রতি অনুগত হও। আর সিজদা করো এবং রুকুকারীদের সাথে রুকু করো। যখন ফেরেশতারা বলল, হে মারিয়াম! নিশ্চয়ই আল্লাহ তোমাকে তাঁর একটি বাণীর সুসংবাদ দিচ্ছেন। তার নাম মারিয়ামের পুত্র ঈসা মাসিহ, সে দুনিয়া ও আখেরাতে সম্মানিত ও সান্নিধ্য প্রাপ্তদের অন্তর্ভুক্ত হবে। আর সে মানুষের সাথে কথা বলবে দোলনায় ও পরিণত বয়সে এবং সে নেককারদের অন্তর্ভুক্ত। মারিয়াম বলল, হে আমার রব, কীভাবে আমার সন্তান হবে? কোনো মানুষ তো আমাকে স্পর্শ করেনি! আল্লাহ বললেন, এভাবেই, আল্লাহ যা চান সৃষ্টি করেন। তিনি যখন কোনো বিষয়ের সিদ্ধান্ত নেন, তখন শুধু বলেন, হও। ফলে তা হয়ে যায়। আর তিনি তাকে কিতাব, হিকমাত, তাওরাত ও ইনজীল শিক্ষা দেবেন। আর তিনি তাকে বনী ইসরাইলের নিকট রসূল হিসেবে প্রেরণ করবেন। সে বলবে, ‘নিশ্চয়ই আমি তোমাদের প্রতিপালকের পক্ষ হতে নিদর্শনসহ তোমাদের নিকট এসেছি, আমি তোমাদের জন্য মাটি দিয়ে পাখির মতো একটা কায়া গঠন করব, অতঃপর তাতে ফুৎকার দেব, ফলে আল্লাহর হুকুমে তা পাখি হয়ে যাবে এবং আল্লাহর হুকুমে আমি জন্মান্ত ও কুষ্ঠরোগীদের আরোগ্য করব ও আল্লাহর হুকুমে মৃতকে জীবিত করব এবং আমি তোমাদেরকে বলে দেব, তোমাদের গৃহে তোমরা যা আহার করো এবং সঞ্চয় করে রাখ; নিশ্চয়ই এ কাজে তোমাদের জন্য নিদর্শন রয়েছে, যদি তোমরা মুমিন হও।” (কুরআন, সূরা আলে ইমরান, ৩:৪২-৪৯)

মারিয়াম (আ) নিঃসন্দেহে খুবই বিব্রত ছিলেন এই অবিবাহিত গর্ভধারণে। কুরআন থেকেই এর প্রমাণ পাওয়া যায়, “অতঃপর ছেলে তার গর্ভে আসল। তখন সে তা নিয়ে দূরবর্তী জায়গায় চলে গেল। সন্তান প্রসবের বেদনা তাকে এক খেজুর বৃক্ষতলের দিকে তাড়িত করল। সে বলে উঠল, হায়! এর আগেই যদি আমি মরে যেতাম আর মানুষের স্মৃতি থেকে পুরোপুরি মুছে যেতাম!” (সূরা মারিয়াম, ১৯:২২-২৩)

খ্রিস্টধর্ম অনুযায়ী মেরির প্রসববেদনা না হলেও, ইসলাম অনুযায়ী তার প্রচণ্ড প্রসব বেদনা হচ্ছিল- “ফেরেশতা তার নিম্ন পার্শ্ব থেকে আহ্বান করে তাকে বলল, তুমি দুঃখ করোনা, তোমার পাদদেশে তোমার প্রতিপালক এক বর্ণা সৃষ্টি করেছেন। আর তুমি খেজুর গাছের কাণ্ড ধরে তোমার দিকে নাড়া দাও, তাহলে তা তোমার ওপর তাজা-পাকা খেজুর ফেলবে। অতঃপর তুমি খাও, পান কর এবং চোখ জুড়াও। আর যদি তুমি কোনো লোককে দেখতে পাও, তাহলে বলে দিও, আমি পরম করুণাময়ের জন্য চুপ থাকার মানত করেছি। অতএব আজ আমি কোনো মানুষের সাথে কিছুতেই কথা বলব না।” (সুরা মারিয়াম, ১৯:২৪-২৬)

ইহুদীরা ছিল কথা শোনানোর ওস্তাদ। মারিয়াম (আ) নিজেও জানতেন, তাকে ভয়ংকর কথা শোনা লাগবে। তাকে ব্যভিচারিণী আখ্যা পেতেই হবে। নাহলে বিয়ে না করে তার বাচ্চা এলো কোথা থেকে?

“অতঃপর সে সন্তানকে নিয়ে তার সম্প্রদায়ের নিকট উপস্থিত হলো; তারা বলল, হে মারিয়াম! তুমিতো এক অদ্ভুত কাণ্ড করেছ! হে হারুনের বোন (যেহেতু হারুন (আ)-এর বোনের নামও ছিল মিরিয়াম)! তোমার পিতা তো খারাপ লোক ছিল না! আর তোমার মাও ছিল না ব্যভিচারিণী! তখন মারিয়াম তার ছেলের দিকে ইশারা করল। তারা বলল, আমরা কোলের বাচ্চার সঙ্গে কীভাবে কথা বলব? শিশুটি বলল, আমি তো আল্লাহর বান্দা; তিনি আমাকে কিতাব দিয়েছেন এবং আমাকে নবী বানিয়েছেন। আমি যেখানেই থাকি না কেন তিনি আমাকে বরকতময় করেছেন আর আমাকে নামায ও যাকাতের হুকুম দিয়েছেন, যতদিন আমি জীবিত থাকি। আর আমাকে মায়ের প্রতি অনুগত করেছেন এবং তিনি আমাকে অহঙ্কারী, অবাধ্য করেননি। শান্তি আমার ওপর, যেদিন আমি জন্মেছি এবং যেদিন আমি মারা যাব আর যেদিন আমাকে জীবিত অবস্থায় উঠানো হবে। এই হচ্ছে মারিয়াম পুত্র ঈসা। এটাই সঠিক বক্তব্য, যে বিষয়ে লোকেরা সন্দেহ পোষণ করছে।” (সুরা মারিয়াম, ১৯:২৭-৩৪)

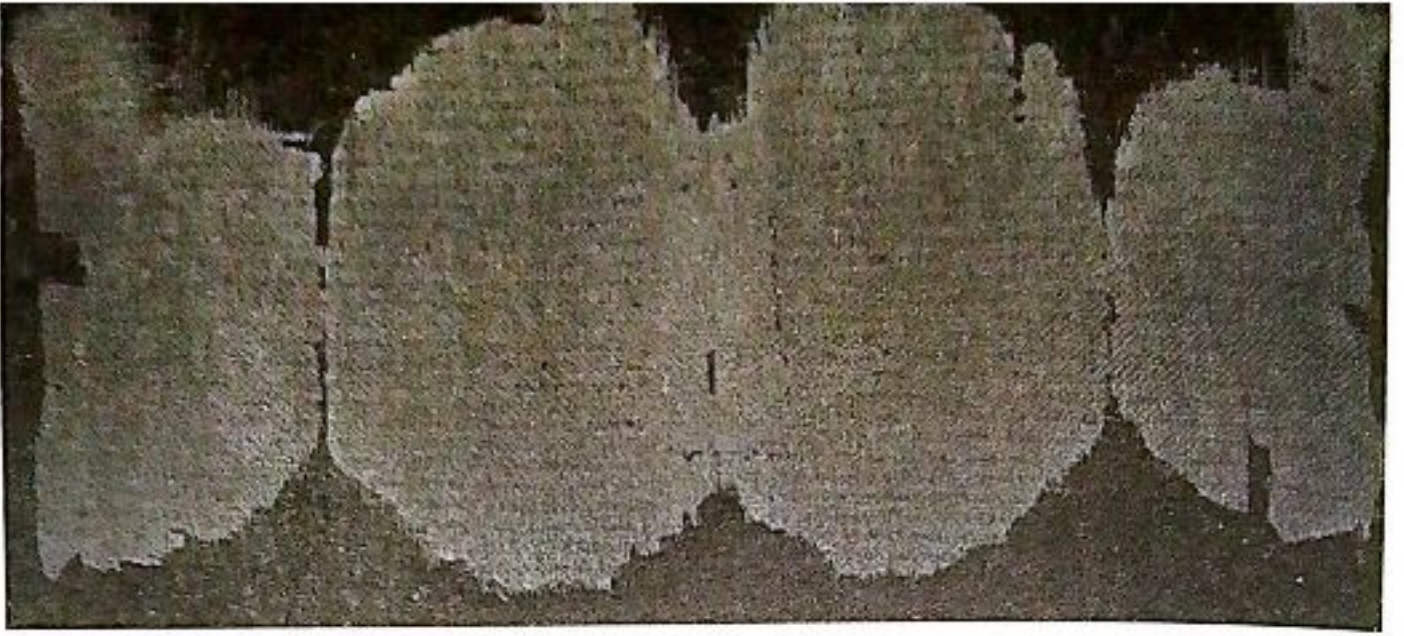
ঈসা (আ) বা যীশুর নাম তার মাতৃভাষায় ইয়েশোয়া (יֵשׁוּעָ), আরবিতে উচ্চারণ করা হয় ঈসা (عيسى)। ইসলাম ও খ্রিস্টধর্ম দ্বিধাহীনভাবে যীশুকে প্রতিশ্রুত মাসিয়াহ (מָשִׁיחַ) বা মাসিহ (مسيح) বা অভিষিক্ত ত্রাণকর্তা হিসেবে ঘোষণা করে। নাসরত (נָצְרַת) গ্রামের অধিবাসী হওয়ায় তার অনুসারীদের একটা সময় থেকে নাসারা ডাকা হতো। খ্রিস্টধর্মের বিস্তারিত ইতিহাস আর যীশু খ্রিস্টের অজানা তথ্যাবলি নিয়ে ইনশাল্লাহ সম্পূর্ণ ভিন্ন একটি বইয়ে আলোচনা করা হবে। তবে ইহুদীদের দৃষ্টিকোণ বোঝাতে যতটুকু জরুরি, ততটুকু এ অধ্যায়ে লেখা হচ্ছে।



জেরুজালেমের মাউন্ট অলিভের পাদদেশে মেরির কথিত কবরের ভেতরে

ঈসা (আ)-এর জন্মের জন্য ইহুদীদের মাঝে কেউ কেউ ইউসুফ নাজ্জার বা জোসেফ নামে একজনকে অপবাদ দেয়, যিনি সম্পর্কে মারিয়ামের এক খালাত ভাই ছিলেন, একই সাথে তিনি বাইতুল মুকাদ্দাসেও কাজ করতেন। কথিত আছে, তিনি প্রথম তাকে অন্তঃসত্ত্বা অবস্থায় আবিষ্কার করেন। ইহুদীরা জাকারিয়া (আ)-কেও সন্দেহের তালিকা থেকে বাদ দেয়নি (কেউ কেউ বলেন, এ কারণেই জাকারিয়াকে হত্যা করা হয়।)। তাফসির থেকে জানা যায়, মারিয়াম জন্মদানের জন্য দূরের যে জায়গায় চলে যান, তার নাম ছিল বাইতে লাহম বা বেথেলহেম। তবে এ ঘটনা ইহুদী উৎসে পাওয়া যায় না। এবং মারিয়ামের সাথে করে নিয়ে আসা শিশুপুত্রের মুখে কথা শোনার পর তাদের অভিব্যক্তি নিয়েও কিছু জানা যায় না।

বিশেষজ্ঞগণ ‘ম্যাসাকার অফ দ্য ইনোসেন্টস’ (গসপেল অফ ম্যাথিউ, ২:১৬-১৮) নামের ঘটনাকে কিংবদন্তি হিসেবে নিলেও, বর্ণিত আছে, রাজা হেরোদ দ্য গ্রেটের কাছে তিন জ্ঞানীলোক বেথেলহেমের তারকার উদয় থেকে এসে হাজির হন উপহার সামগ্রী নিয়ে। বলেন, তারা ইহুদীদের রাজাকে খুঁজছেন, তার সদ্য জন্ম হয়েছে। রাজা হেরোদ এ কথা শুনে রেগে যান প্রচণ্ড। তিনি দুবছর বা তার কম বয়সী সকল বেথেলহেমবাসী পুত্রসন্তানকে হত্যার নির্দেশ দেন, যেন কেউ বড় হয়ে তার রাজত্বকে চ্যালেঞ্জ করতে না পারেন। এতে ভয় পেয়ে মারিয়াম ঈসা (আ)-কে নিয়ে মিসরে পালিয়ে যান।



তৃতীয় শতকের এক গসপেলের কপি

একজন গালিলি ইহুদী হিসেবে ঈসা (আ) স্বাভাবিকভাবেই বড় হন। তার জন্ম খ্রিস্টপূর্ব চার সালের দিকে হলেও, তার নবুয়ত জীবন শুরু হয় ত্রিশ বছর বয়সে, অর্থাৎ প্রায় ২৭ সালের দিকে। তিন বছর তিনি নবুয়তি কার্যক্রম চালান। তিনি অসংখ্য চমকপ্রদ মুজেজা বা অলৌকিক কর্ম প্রদর্শন করেন, যেমন আল্লাহর আদেশে মৃতকে জীবিত করা, কুষ্ঠ রোগীকে সারানো, অন্ধকে দৃষ্টিশক্তি ফিরিয়ে দেয়া, সাগরের পানির ওপর দিয়ে হেঁটে আসা, অল্প খাবারকে অজস্র পরিমাণে পরিণত করা, ইত্যাদি। তার বারো সাহাবীর পাশাপাশি অসংখ্য অনুসারী যোগাড় হয়ে যায়। লোকে তাকে মাসিহ বা মেসায়্যা ডাকতে শুরু করে।



গালিলি সাগরের পাড়ে

৬০ ইসরাইলের উত্থান-পতন

অবশ্য যীশু খ্রিস্টকে তখনও আলাদা করে পান্তা দেবার কারণ ছিল না ইহুদীদের, কারণ তিনিই একমাত্র নন যে মাসিহ বলে দাবি করেছিলেন ওই সময়। ইহুদীদের দুর্দিনে অনেক লোকই এমন দাবি নিয়ে এগিয়ে এসেছিল। তাদেরকে ভণ্ড হিসেবে উপাধি দিত ইহুদীরা। যেমন, খ্রিস্টপূর্ব চার সালে এক রাখাল তার মাথায় মুকুট চড়িয়ে দাবি করে বসে, সে ‘ইহুদীদের রাজা’। নির্মমভাবে তাকে ও তার অনুসারীদের হত্যা করে রেখে যায় রোমানরা। আরেক ভদ্রলোক, যাকে আমরা চিনি ‘সামারিটান’ বলে, তাকে প্রিফেক্ট খোদ পন্টিয়াস পাইলেটই ক্রুশবিদ্ধ করেন। যদিও তার কোনো অনুসারীই ছিল না; তাকে দুনিয়া থেকে বিদায় জানাবার উদ্দেশ্য ছিল কোনো রকমের স্বর্গীয় বা নেতাগোত্রের দাবিদাওয়া নিয়ে আসা কাউকে বরদাশত করাই যাবে না, পাছে সে ভবিষ্যতে ক্ষমতার জন্য হুমকি হয়ে দাঁড়ায়। এরকম করে ডাকাতসর্দার খ্যাত হেজেকিয়া, পেরেয়া থেকে আগত সাইমন, গালিলি থেকে আসা জুডাস, জুডাসের নাতি মেনাহেম, গিওরা থেকে আগত আরেক সাইমন, কোচবার ছেলে অন্য আরেক সাইমন— সবাই নিজেদেরকে প্রতিশ্রুত মসিহ বা ত্রাতা হিসেবে আখ্যা দেন আর ঠাঁই করে নেন পরপারে, ধন্যবাদান্তে রোমান বাহিনী আর ইহুদী ধর্মগুরুরা।



পাথরে পন্টিয়াস পাইলেটের নাম

তাই এত ভণ্ড মেসায়ী বা মসিহের ভীড়ে রোমান কর্তৃপক্ষ আর সমসাময়িক ইহুদী গুরুরা ঘৃণাক্ষরেও ভাবেননি, নাসরত গ্রাম থেকে আসা এক ত্রিশ বছরের কাঠমিস্ত্রী যুবক আবির্ভূত হবেন মেসায়ী হিসেবে। তার গুটি কয়েক অনুসারীকে দমন করার জন্য সেই মেসায়াকে ক্রুশে চড়িয়ে দেয়াটাই তাই তারা ভেবেছিলেন সহজতম সমাধান।

কিন্তু যীশুর ব্যাপারটা গুরুতর হয়ে দাঁড়ায় এ কারণে যে, তিনি নাকি বাইতুল মুকাদ্দাস ভেঙে নতুন করে গড়ার কথা বলেন। আর তাছাড়া নিজের মেসায়ী দাবি তো আছেই। খ্রিস্টধর্ম অনুযায়ী, তাকে ঈশ্বরপুত্র বলা হয়। কিন্তু হিব্রু অলংকারে পিতা বা আব্বা অনেকটাই আরবি শব্দ ‘রাব্ব’ এর মতো ছিল। আক্ষরিক অর্থে নিলে ইহুদীদের কাছে এটি প্রচণ্ড ধর্মবিরোধী একটি কথা। কিন্তু এমন না যে ইহুদীরা কখনও হিব্রুতে কাউকে আল্লাহর সন্তান বলেনি, এমনকি তাদের বর্তমান কিতাবেই ধার্মিক ব্যক্তিদের সকলকে, আর সকল নবী রাসুল এমনকি ফেরেশতাকে আল্লাহর সন্তান বলা হয়েছে, অবশ্য এসব কিতাবকে ইসলাম ধর্মে বিকৃত বলেই বিশ্বাস করা হয়। সত্যি বলতে, ইহুদী ধর্ম বইগুলোতে পাতায় পাতায় আপনি ‘বেনে এলোহিম’ (בְּנֵי אֱלֹהִים) বা ‘বেনে এলিম’ শব্দের খোঁজ পাবেন, যার অর্থ ঈশ্বরের সন্তান; ধার্মিকতা বোঝাতে এটি ব্যবহার করা হতো।



ডেড সি স্ক্রলেও পাওয়া যায় বেনে এলিমের কথা

সমস্যা হয়ে গেল তখনই, যখন কথাটাকে আক্ষরিকভাবে নেয়া হলো, যেমনটা এখন নেয়া হয়। ইহুদীরা এটি মানতে পারেনি। কিন্তু এসবের চেয়েও উর্ধ্বে যে কারণ নিহিত ছিল, তা হলো, রাজনৈতিকভাবে দুর্বল ইহুদীরা চাইতো না

এমন কোনো কিছু ঘটুক, যা তাদের জেরুজালেমে থিতু হয়ে যাওয়া অস্তিত্বকে নড়বড়ে করে দেয়। আসলেই, তাদের আর কী চাই! মাথার ওপর রোমান সাম্রাজ্যের মতো পরাক্রমশালী অভিভাবক আছে, নবনির্মিত বাইতুল মুকাদাস বা সেকেন্ড টেম্পল আছে (আর্ক অফ দ্য কোভেন্যান্ট নেই যদিও, তা ইতিহাস থেকে বিলীন হয়ে গিয়েছে বহু আগেই), আছে ইহুদী ইমাম বা র্যাবাইদের স্থানীয় ক্ষমতা আর প্রতিপত্তি। কেন তারা চাইবে যে নতুন কোনো আন্দোলন বা কিছু এসে তাদের আরামে ব্যাঘাত ঘটুক? বলাই বাহুল্য, পর্দার আড়ালের ক্ষমতার স্বাদ পেয়ে যাওয়া ধর্মগুরুদের মাঝে তখন দুর্নীতি ঢুকেছিল ভালোভাবেই। ঐতিহাসিক অনেক নথিই পাওয়া যায়, যেখানে তৎকালীন ধর্মগুরুদের দুর্নীতির বিস্তারিত উল্লেখ আছে। তাদের নীতি বা কর্মকাণ্ড নিয়ে প্রশ্ন তোলে, এমন কাউকে তারা কোনোভাবেই বরদাশত করতেন না। তাই প্রতিটি আন্দোলনই ছিল তাদের জন্য ভয়ের। সাদুকি আর ফারিসিরা দফায় দফায় এসে জ্বালাতন করে গিয়েছে যীশু খ্রিস্টকে। যীশুর কাছ থেকে নিজেদের দুর্নীতির ফিরিস্তি শুনে তারা আর বরদাশত করতে পারলো না। রাজা হেরোদকে বলে কয়ে প্রিফেক্ট পন্টিয়াস পাইলেটকে দিয়ে তারা আয়োজন করলো তাদের দৃষ্টিতে নব্য মেসায়াকে ক্রুশে দেয়ার।

ইসলাম ধর্মমতে যীশুকে ইহুদীরা ক্রুশে চড়াতে পারেনি, খ্রিস্টধর্মমতে যীশু ক্রুশে চড়ে মৃত্যুবরণ করেন এবং তিন দিন পরে পুনরায় ফিরে আসেন, যাকে ইস্টার সানডে বলে পালন করা হয়। দুই ধর্মই বিশ্বাস করে, যীশু আবার ফিরে আসবেন কেয়ামতের আগে।

ইহুদীরা যীশু খ্রিস্টকে নিয়ে কী ধারণা পোষণ করে?

গুরুত্বপূর্ণ হলো জরুরি, খ্রিস্টধর্মের যীশুর ব্যাপারে ইহুদীরা কড়াভাবে ‘ব্লাসফেমাস’ অনুভূতি পোষণ করে থাকে। কারণ, স্রষ্টার শরিক আর স্রষ্টার আক্ষরিক পুত্র—এমন ধারণা ইহুদী ধর্মেও ইসলামের মতো পরিত্যাগ করে।

ইহুদী ধর্মে একজন মেসায়ার বৈশিষ্ট্য হিসেবে সুনির্দিষ্ট কিছু পয়েন্ট উল্লেখ করা রয়েছে, এ ভবিষ্যদ্বাণীগুলো পূরণ না হলে তাকে মেসায়ী বলা হবে না। মেসায়ী পুরো ইসরাইলকে তাওরাতের পথে ফিরিয়ে আনবেন, আল্লাহর পথে যুদ্ধ করাবেন, জেরুজালেমের আদি ও আসল বাইতুল মুকাদাস নির্মাণ করবেন (থার্ড টেম্পল), ইসরাইলের নির্বাসিত সকল ইহুদীকে একত্রিত করবেন।

যীশুকে মেসায়ী না মানার পেছনে যে প্রধান কারণগুলো দেন ইহুদী ধর্মগুরুগণ—

১) যীশু মেসয়া সংক্রান্ত ভবিষ্যদ্বাণী পূরণ করেন।

২) মেসয়ার ব্যক্তিগত বৈশিষ্ট্য বা গুণাবলি তার মাঝে দেখা যায়নি



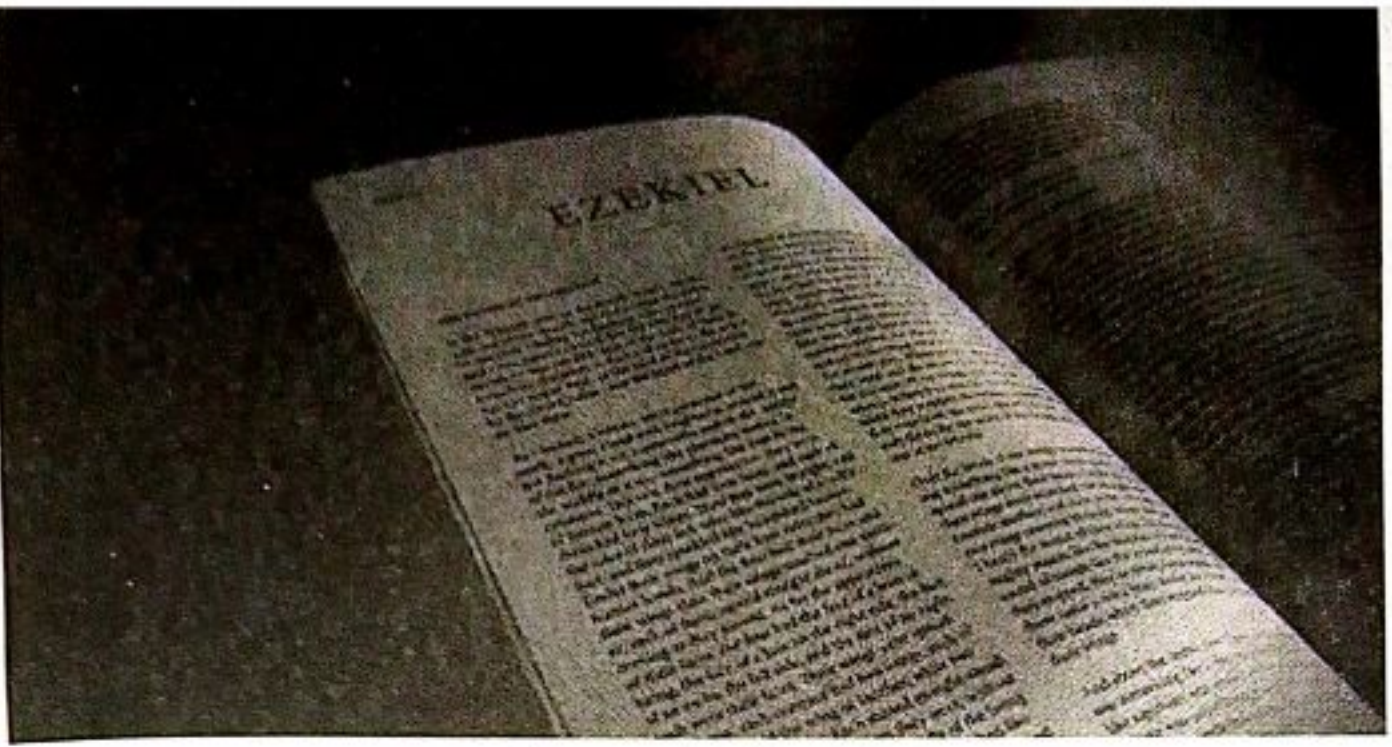
প্রাচীন ইশাইয়া কিতাব

কী কী ভবিষ্যদ্বাণী মেলেনি বলে জানান ইহুদী গুরুরা?

- ১) এজেকিয়েল ৩৭:২৬-২৮ অনুযায়ী, মেসয়া থার্ড টেম্পল তৈরি করবেন।
- ২) ইশাইয়া ৪৩:৫-৬ অনুযায়ী, সকল ইহুদীকে পবিত্র ভূমিতে ফিরিয়ে আনবেন মেসয়া।
- ৩) ইশাইয়া ২:৪ অনুযায়ী, মেসয়া এক শান্তির যুগের সূচনা করবেন। কোনো জাতি অন্য জাতির বিরুদ্ধে তলোয়ার তুলবে না। যুদ্ধ কী জিনিস, তা লোকে ভুলে যাবে।
- ৪) জাকারিয়া ১৪:৯ অনুযায়ী, ইসরাইলের স্রষ্টার ছায়াতলে মেসয়া সারা পৃথিবীকে এক করবেন।

এর মধ্যে একটিও যদি পূর্ণ না হয়, তাহলে সেই ব্যক্তিকে ইহুদীরা মেসয়া ডাকবে না। বলা বাহুল্য, কেউই এ যাবৎ এগুলো পূরণ করেননি, তাই কাউকেই ইহুদীরা মেসয়া খেতাব দেয়নি, যীশুকেও না।

অবশ্য মুসলিম ও খ্রিস্টানদের বিশ্বাস অনুযায়ী, ইসা (আ) ফিরে এসে এগুলো পূরণ করবেন।



এজেকিয়েল বা হিজকীলের কিতাব

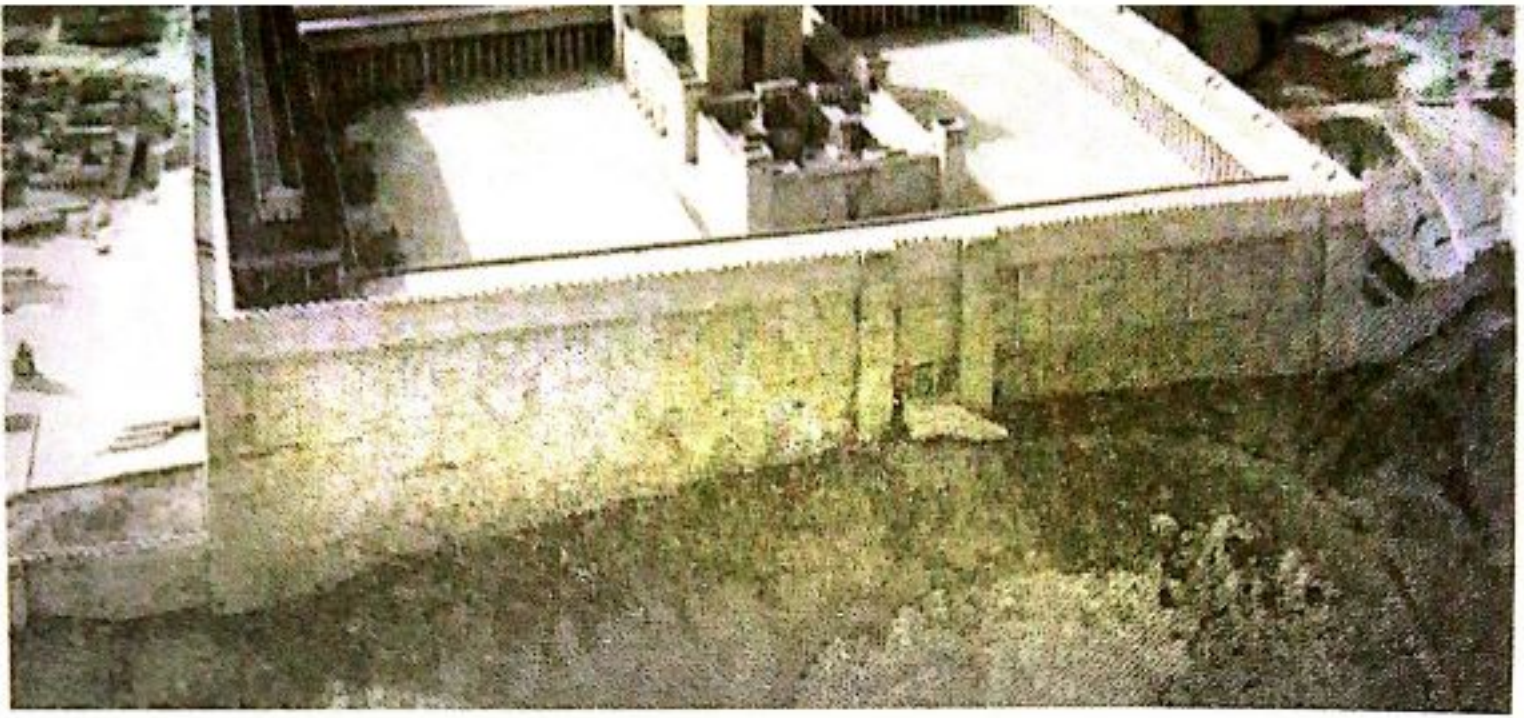
কোন কোন ব্যক্তিগত বৈশিষ্ট্য মেলেনি যীশুর?

মেসায়ী হবেন মূসা (আ)-এর পর সবচেয়ে বড় নবী। নবীদের যুগ ব্যাবিলনে থাকতেই শেষ হয়ে গিয়েছে বলে ইহুদীদের ধারণা। তাই এরপরের কোনো নবীকেই তারা মানেনি।

ইশাইয়া ১১:১-৯, ইয়ারমিয়া ২৩:৫-৬, ৩০:৭-১০, ৩৩:১৪-১৬, হিজকীল ৩৪:১১-৩১, ৩৭:২১-২৮, হোসিয়া ৩:৪-৫ অনুযায়ী, মেসায়াকে হতে হবে পিতার দিক থেকে রাজা দাউদ (আ)-এর বংশধর, তিনি ইসরাইল শাসন করবেন। কিন্তু যীশু পিতাহীনভাবে জন্মালে পিতার দিক থেকে দাউদের বংশধর হওয়ার সুযোগ আর থাকে না। ইহুদী বিশ্বাস অনুযায়ী, মেসায়ার সাধারণ পিতা-মাতা থাকবে, তার কোনো অলৌকিক ক্ষমতা থাকবে না।

মেসায়ী অবশ্যই তাওরাত মেনে চলবেন, সাক্ষাৎ মানবেন। কিন্তু গসপেল অফ জন ৯:১৪ বলছে, ঈসা (আ) শনিবার অর্থাৎ সাক্ষাৎ দিবসে কারও চোখ ভালো করে দিয়েছিলেন, যা সাক্ষাৎের লংঘন। সুতরাং তিনি তাওরাত মানতেন না।

মধ্যযুগের ইহুদী দার্শনিক মাইমনিদিজ (মোজেস বেন মাইমন) বলেন, “যীশু ভবিষ্যদ্বাণী পূরণে সক্ষম তো হন-ইনি, তার ওপর আবার মারাও যান, সুতরাং তিনি নিঃসন্দেহে তাওরাতের সেই মেসায়ী নন। আল্লাহ তাকে পাঠিয়েছিলেন ইহুদীদের পরীক্ষা করতে, তারা ভণ্ড মেসায়ার কথা শুনে বিভ্রান্ত হয় কি না দেখতে।” (হিলকোস মেলাখিম ১১:৪-৫)



সেকেন্ড টেম্পলের মডেল

যীশু অবশ্য সর্বতভাবেই একজন ঐতিহাসিক চরিত্র, তার অস্তিত্বের প্রমাণও ইতিহাসে মেলে। খ্রিস্টান নথিপত্রের বাইরেও ইহুদী উৎসে তার উল্লেখ পাওয়া যায়। যেমন, ইহুদী মৌখিক ধারা তথা মিশনহাতে আমরা যীশুর দেখা পাই, যাকে একজন জাদুকর হিসেবে উপস্থাপন করা হয়েছে। এমনকি ইহুদীদের তাফসিরগ্রন্থ তালমুদেও যীশুর উল্লেখ আছে। অবশ্যই তাকে সুনজরে কোথাও উল্লেখ করা হয়নি।

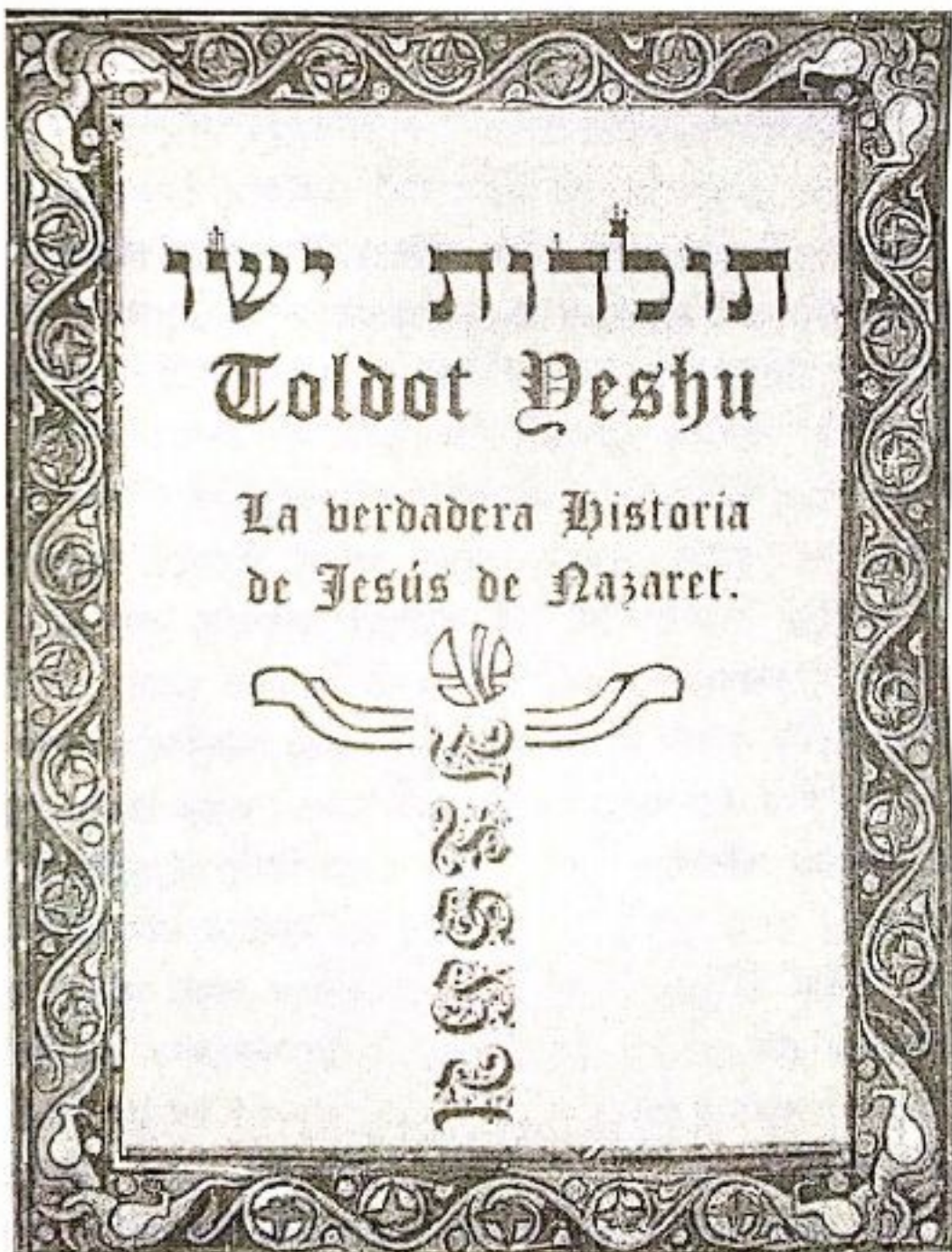


ইহুদী দার্শনিক মাইমনিদিজ

৬৬ ইসরাইলের উত্থান-পতন

যীশুর জীবনী নিয়ে একটি ইহুদী গ্রন্থ রচিত হয়েছিল যার নাম “সেফের তলেদোৎ ইয়েশু” (יִשְׁרָאֵל 117:117-150), অর্থাৎ “ইয়েশু’র (যীশুর) জীবনীগ্রন্থ”। সেখানে তারা যে কাহিনী তুলে ধরে, তা অনেকটা এরকম— জুদাহ বংশের এক লোক ছিল, যার নাম জোসেফ প্যাভেরা, তার নিকটে এক বিধবা বাস করতেন, তার কন্যার নাম মিরিয়াম। এই কুমারী মেয়ের সাথে বাগদান হয়েছিল ইউহানা নামের এক লোকের, যিনি তাওরাতের শিক্ষাপ্রাপ্ত, আল্লাহভীরু, দাউদবংশীয়। এক সাব্বাথ দিবসে জোসেফ মিরিয়ামের দিকে কুদৃষ্টি ফেলল, সে মিরিয়ামের দরজায় কড়া নাড়ল, ভান করল যেন সে তার স্বামী ইউহানা। মিরিয়াম জোসেফের কাছে নিজেকে সমর্পণ করলেন ইচ্ছার বিরুদ্ধে। ইউহানা ফিরে এসে জানতে পারলেন কী হয়েছে। কিন্তু প্যাভেরাকে শাস্তি দেয়ার উপায় নেই, কারণ কোনো সাক্ষী নেই। দুঃখে ইউহানা ব্যাবিলন চলে গেলেন। ওদিকে, যথাসময়ে যীশুকে জন্ম দিলেন মিরিয়াম। বড় হলে তাকে ইহুদী রীতিতে শিক্ষা দিলেন। একদিন যীশু বড়দের সামনে অসম্মানসূচকভাবে মাথায় টুপি না দিয়েই হাঁটছিল। তখন লোকে বুঝতে পারলো সে ভালো লোকের সন্তান নয়। মিরিয়াম স্বীকার করলেন, যীশু প্যাভেরার সন্তান। যীশু অপমানিত হয়ে গালিলির পাহাড়ী অঞ্চলের দিকে চলে গেলেন। পরে তিনি জেরুজালেমের বাইতুল মুকাদাসে গিয়ে স্রষ্টার ইসমে আজম শিখে নিলেন, যা ব্যবহার করে কেউ যা ইচ্ছা তা করতে পারে। অনেক লোককে জড়ো করে তিনি নিজেকে মেসায়্যা দাবি করলেন। বললেন, তার বিষয়েই ভবিষ্যদ্বাণীগুলো ছিল তাওরাতে। আল্লাহর নাম ব্যবহার করে তিনি এক খোঁড়া লোককে সুস্থ করে দিলেন। লোকে তাকে মেসায়্যা হিসেবে আরাধনা করতে লাগলো। সানহেদ্রিন সিদ্ধান্ত নিল, এই লোককে গ্রেফতার করা জরুরি। তারা শীষ্যের ছদ্মবেশে জেরুজালেমে আসার আমন্ত্রণ জানাতে লোক পাঠালো যীশুর কাছে। যীশুকে রানীর সামনে হাজির করা হলো, তাকে জাদুবিদ্যার দায়ে অভিযুক্ত করা হলো। কিন্তু যীশু এক লাশকে জীবন্ত করে তুললে তাকে ছেড়ে দেয়া হলো। তার নামে আবারও অভিযোগ এলো, কিন্তু এবার তিনি অনুসারীদের বললেন, লড়াই না করতে। তাকে ধরে নিক। ইসমে আজম ব্যবহার করে তিনি কাদামাটি দিয়ে পাখি বানিয়ে উড়িয়ে দিলেন। ইহুদী মনীষীরা তখন এহুদা বা জুডাস ইস্কারিয়ট নামের এক লোককে ইসমে আজম শিক্ষা করালেন। তারপর দুজনের মধ্যে যুদ্ধ হলো। দুজনেই ইসমে আজম ভুলে গেলেন। যীশুকে গ্রেফতার করা হলো, তাকে পেটানো হলো। তাকে টাইবেরিয়াসে নিয়ে গিয়ে এক সিনাগগের পিলারের সাথে বাঁধা হলো। পান করতে দেয়া হলো ভিনেগার। তার মাথায় কাঁটার মুকুট পরানো হলো। মনীষী আর যীশুর অনুসারীদের মাঝে এ সময় বাগড়া

বিবাদ শুরু হলো, এই সুযোগে যীশু ও তার অনুসারীরা পালিয়ে গেলেন। ঈদুল ফিসাখের আগের দিন যীশু সিদ্ধান্ত নিলেন, তিনি বাইতুল মুকাদ্দাস গিয়ে স্রষ্টার ইসমে আজম উদ্ধার করবেন। তিনি গাধার পিঠে চড়ে জেরুজালেম প্রবেশ করলেন। কিন্তু জুডাস ইস্কারিয়ট মনীষীদের বলে দিলেন, যীশু বাইতুল মুকাদ্দাস যাচ্ছেন। তাকে এক গাছের সাথে ঝুলিয়ে হত্যা করার চেষ্টা করা হলো, কিন্তু ইসমে আজম ব্যবহার করে যীশু গাছ ভেঙে ফেললেন। শেষমেশ এক স্তূপ বাধাকপির ওপর তাকে দাঁড়া করিয়ে ফাঁসি দেয়া হলো। এরপর তাকে দাফন করা হলো। রবিবার দিন তার অনুসারীরা গিয়ে রানীকে বলল, যীশু নাকি আর কবরে নেই, তিনি নাকি স্বর্গে আরোহণ করেছেন। আসলে এক মালী তাকে কবর থেকে সরিয়ে নিয়েছিল। পরে সেই মালী নিজেই স্বীকার করে এসে, সে লাশ সরিয়েছে।



সেফের তলেদোৎ ইয়েশু বইখানা

৬৮ ইসরাইলের উত্থান-পতন

সেই লাশকে মনীষীরা পরে ঘোড়ার লেজের সাথে বেঁধে রানীর কাছে নিয়ে গেলেন। অবশেষে রানী বুঝতে পারলেন, আসলে এই লোক ভণ্ড নবী ছিল। তিনি তিরস্কার করলেন অনুসারীদের, আর প্রশংসা করলেন ইহুদী মনীষীদের।

আরেক ইহুদী বিবরণে, প্যাণ্ডেরা আসলে এক রোমান সেনা ছিল, যিনি মেরিকে ধর্ষণ করেন তার মাসিক চলাকালীন সময়ে। নারীদের চুল ঠিক করে দেয়ার পেশায় নিয়োজিত মিরিয়ামকে রোমান সেনা পানটেরা ধর্ষণ করে বলে তালমুদে উল্লেখ আছে।

অধ্যায় ৭

রোমের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ



আবার ফিরে আসা যাক ইতিহাসের পাতায়। আগেই ব্যাখ্যা করা হয়েছে, কীভাবে জুদাহ রাজ্য একটি রোমান প্রদেশে পরিণত হয়েছে, যার দায়িত্বে থাকেন একজন প্রিফেক্ট বা প্রোকিউরেটর। যে সময়ের কথা বলা হচ্ছে, তখন রোমান শাসনের অধীনে ইহুদীদের রাজা হলেন হেরোদপুত্র হেরোদ অ্যান্টিপাস।

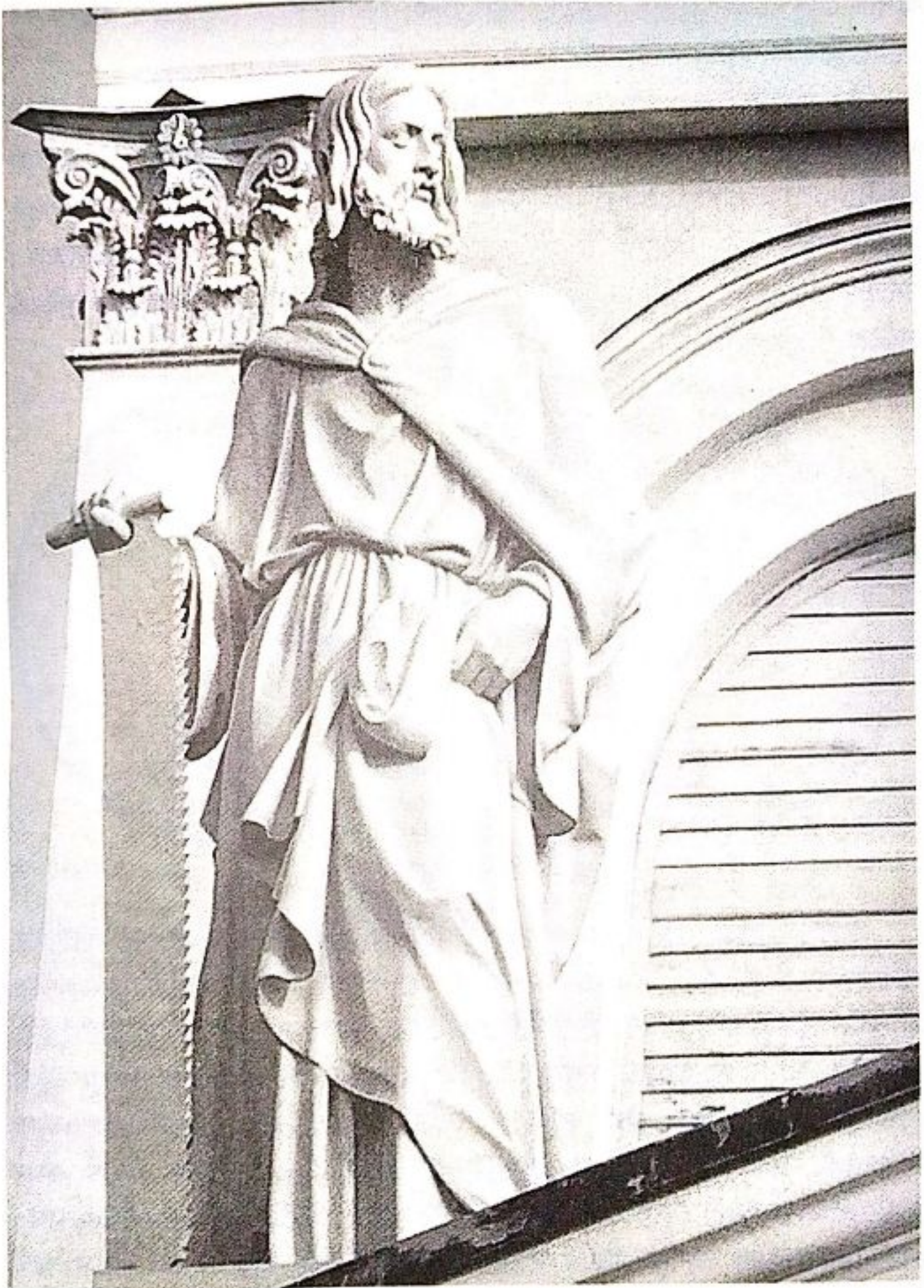
রোমানরা ইহুদীদের জনসংখ্যা গুণতে চাইলো, এবং সেজন্য পদক্ষেপ নিলো। কিন্তু ইহুদী আইনে এভাবে আদমশুমারি নিষিদ্ধ। রোমানদের এ কাজের বিরুদ্ধে জনগণ ক্ষেপে উঠলো। গালিলির জুডাসের নেতৃত্বে এক আন্দোলন চলতে শুরু করল, যাকে ‘জিলটস’ (Zealots) বলা হয়।

হিব্রুতে একে ‘কানাই’ (קנאים) ডাকা হতো, মানে স্রষ্টার জন্য অন্ধ। জিলট বলতে ধর্মাত্ম বোঝানো হয়। এ আন্দোলনের উদ্দেশ্য ছিল রোমান শাসনের ইতি টানা, পবিত্র ভূমি থেকে তাদের তাড়ানো।

ইতিহাসবিদ জোসেফাস সাদুকি, ফারিসি, এসিনের পাশাপাশি চতুর্থ দল হিসেবে জেলটদের কথা উল্লেখ করেন, যার প্রতিষ্ঠাতা জুডাস। সিরিয়ার রোমান গভর্নর কুইরিনিয়াস ৬ সালে জুদাহ রাজ্যে আদমশুমারির আয়োজন করেন।

জেলটদের মাঝে একজন ছিলেন সাইমন বা শিমোন। তিনি পরে যীশুর সাহাবী হয়েছিলেন। আদমশুমারির কারণে শুরু হওয়া এ আন্দোলন যীশুর ধর্মপ্রচারের সময়ও ছিল। ৬ সাল থেকে ৭৩ সাল পর্যন্ত চলে জেলটস বিদ্রোহ। ইহুদীদের তালমুদে জেলটদেরকে ‘বিরইয়োনিম’ (ביריאונים) বা বর্বর জংলি বলা ৭০ ইসরাইলের উত্থান-পতন

হয়েছে। জেলটদের একটি দলের নাম ছিল সিকারি, যার অর্থ ছোরাওয়ালা।
রোমানদের বিরুদ্ধে এ বিদ্রোহের বিপক্ষে কোনো ইহুদী টু শব্দ করলেই তাদের
পরপারে পাঠিয়ে দিত সিকারিরা।



সাইমন দ্য জেলট

জেলটদের পাশাপাশি এ সময়ে অনেকেই মেসায়ার দাবিদার হয়েছিলেন। অবশ্য সব ধরনের আন্দোলনের বিরুদ্ধে ছিলেন সাদুকিরা। তারা রোমানদের সহায়তা করেন পুরোদমে। বিনিময়ে রোমানরা সাদুকিদের মধ্য থেকে বাইতুল মুকাদ্দাসের প্রধান ইমাম বাছাই করে দিত। রোমানদের ছত্রছায়ায় ইহুদীদের সানহেদ্রিন আবার প্রতিষ্ঠিত হলো।

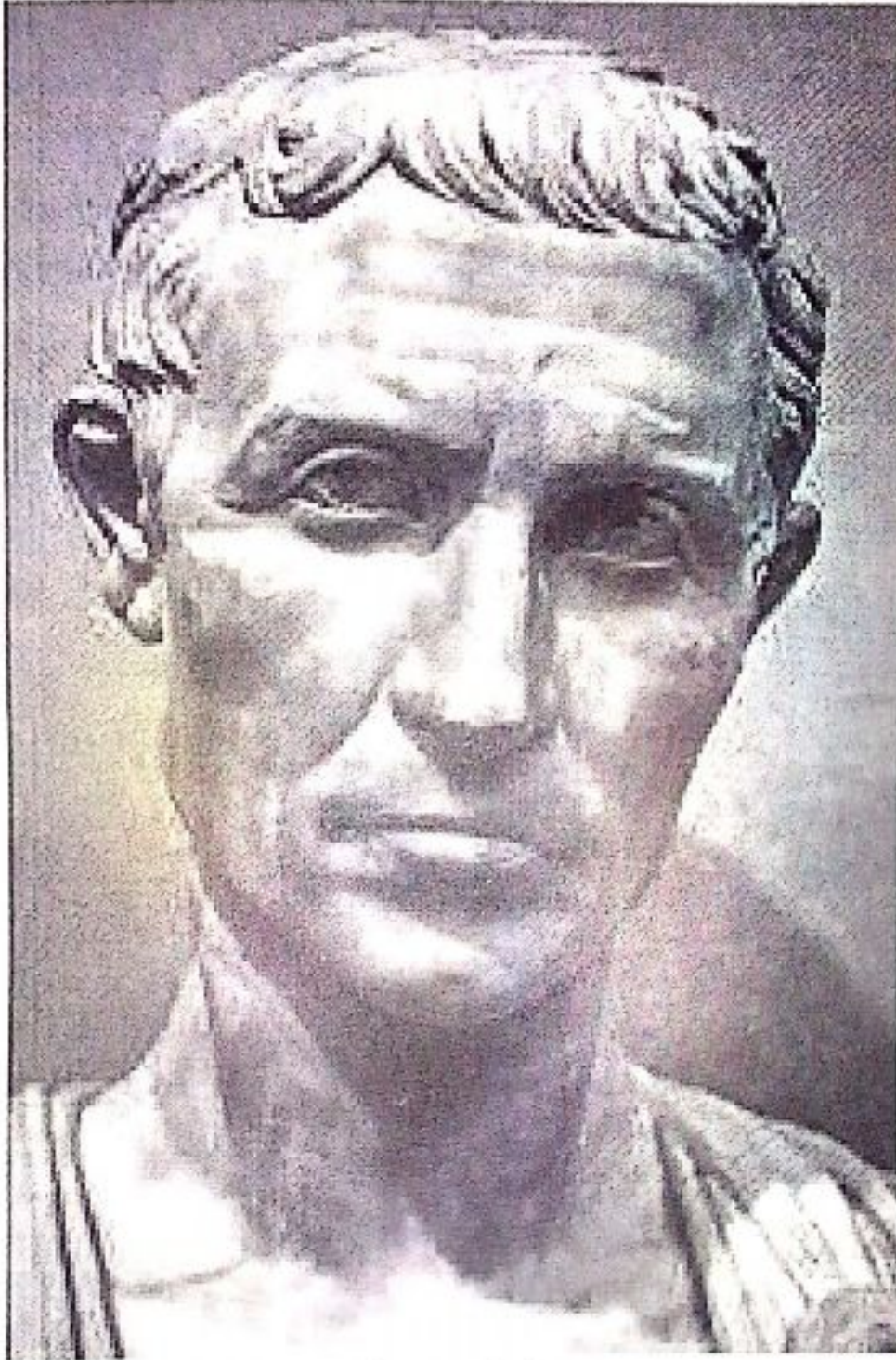
১৪ সালে রোমান সম্রাট টাইবেরিয়াস সিংহাসনে আরোহণ করলেন। তিনি তার রক্ষীদের প্রধান কমান্ডার সেজানুসের পরামর্শকে খুব মূল্য দিতেন। সেজানুস ইহুদীদের পছন্দই করতেন না। কারণ? কারণ, হাসিনাই আর হানিলাই নামের দুই ইহুদী পার্থিয়ান ব্যবিলনের নিহাদিয়াতে স্বায়ত্তশাসিত সমাজ গড়ে তুলেছিলেন। সেজানুস আশংকা করতেন, এমন স্বায়ত্তশাসনের ইচ্ছা জুদাহ রাজ্যেও ছড়িয়ে পড়তে পারে।



সম্রাট টাইবেরিয়াসের স্বর্ণমুদ্রা

জুদাহ রাজ্যে চতুর্থ বা পঞ্চম রোমান প্রিফেক্ট হয়ে আসলেন পন্টিয়াস পাইলেট। তিনি বেশ সমস্যার সম্মুখীন হয়েছিলেন ইহুদী সমাজে। সম্রাটের নামধাম প্রতিকৃতি বয়ে বেড়ানো সামরিক লোক পন্টিয়াস পাইলেটের কর্মকাণ্ডকে পৌত্তলিক বিবেচনা করতে লাগলো ইহুদীরা। তার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ সভা হতো জেরুজালেমে; এরপর সেই প্রতিবাদ হতে লাগলো তার সরকারি বাসভবন সিজারিয়া ম্যারিটিমার সামনে, এমনকি স্টেডিয়ামেও। পাইলেট একটি নালা নির্মাণের জন্য ইহুদী কোষ থেকে অর্থ ব্যবহার করার পর জনরোষেও পড়েছিলেন। হেরোদের সাবেক প্রাসাদে তিনি সোনায়ে মোড়া বর্ম তুলে রাখেন, যাতে তার আর সম্রাটের নাম খোদাই করা ছিল। ইহুদীরা তা মোটেও পছন্দ করেনি। অবশ্য

যীশুকে ক্রুশে চড়িয়ে মৃত্যুদণ্ড দেয়ার ব্যাপারে সহায়তা করায় ইহুদীরা খুশি হয়েছিল। তবে পাইলট নিজে নাখোশই ছিলেন তাদের প্রতি। ৩৬ সালে রোমান প্রিফেক্ট হিসেবে তার এ দায়িত্ব শেষ হয়।



পন্টিয়াস পাইলট

সম্রাট টাইবেরিয়াসের পর তার উত্তরাধিকারী হন ভাতিজা ক্যালিগুলা। সম্রাট ক্যালিগুলা (৩৭-৪১) ছিলেন ভয়ংকর পাগলাটে, কিন্তু অদ্ভুত কারণে ইহুদীদের প্রতি সদয়। হেরোদ যখন রোমে পড়ালেখা করতে গিয়েছিলেন, তখন তিনি থাকতেন সম্রাট অগাস্টাস আর টাইবেরিয়াসের আবাসে। সেখানে তিনি যাদের সাথে খেলাধুলা করে বড় হয়েছেন, তাদের মাঝে ছিলেন ক্যালিগুলা, তাদের বন্ধুত্বের কারণে ইহুদীদের প্রতি একটা সদয় অনুভূতি কাজ করত ক্যালিগুলার।

ইসরাইলের উত্থান-পতন ৭৩

ক্যালিগুলা হাজার হাজার লোক হত্যা করেছিলেন, যার মাঝে তার রাজনৈতিক প্রতিদ্বন্দ্বীরা তো ছিলেনই। বলা হয় তিনি নিজেকে দেবতা বলতেন- অ্যাপোলো, জিউসের সাথে নিজের মূর্তিও দাঁড়া করিয়েছিলেন। তার নিজের রক্ষীরাই তাকে হত্যা করেছিল।

ক্যালিগুলার আমলে মিসরের আলেক্সান্দ্রিয়ার ইহুদীরা এক কোন্দলে জড়িয়ে পড়ে রোমানদের সাথে। এই ইহুদীরা পূর্ণ নাগরিকত্ব চাইছিল। কিন্তু গ্রিক সমাজ তা মানতে নারাজ। গ্রিকরা ইহুদী উপাসনালয়গুলোতে ঢুকে সম্রাটের মূর্তি স্থাপন করতে লাগলো। মিসরে তখন রোমান গভর্নর অলাস অ্যাভিলিয়াস ফ্ল্যাকাস। তিনি ইহুদীদের কাউন্সিলের আটত্রিশজন সদস্যকে জনসম্মুখে চাবুক দিয়ে পেটাতে বললেন। ইহুদী নারীদের জোর করে শুকরের মাংস খাওয়ানো হলো। অবশেষে হেরোদ দ্য গ্রেটের নাতি হেরোদ (যার সাথে ক্যালিগুলার খাতির) তার প্রভাব খাটিয়ে গভর্নরের এই আদেশ রদ করান।



রোমান মুদ্রায় ক্যালিগুলা (৩৮ সাল)

৪০ সালে গ্রিক ও ইহুদীরা উভয়ই এ বিষয়টি পেশ করতে রোমে ক্যালিগুলার দরবারে আসে। ইহুদীদের দলটির নেতা দার্শনিক ফাইলো বলেন, ক্যালিগুলা তাদেরকে পাগল বললেন যখন তারা তার ঐশ্বরিকত্ব অস্বীকার করল। অর্থাৎ রায় ইহুদীদের পক্ষে যায়নি।

জুদাহ রাজ্যের তীরে গ্রিকরা সম্রাটের মূর্তি স্থাপন করল। ইহুদীরা রেগে গিয়ে সেটি ভেঙে ফেলল। এতে করে সম্রাট ক্যালিগুলাও রেগে গেলেন, তিনি রাজা অ্যান্টিয়কাসের সেই হেলেনিজম রীতি ফিরিয়ে আনলেন, এখন থেকে বাইতুল মুকাদ্দাসসহ সকল ইহুদী উপাসনালয় রোমান দেবতাদের মন্দিরে পরিণত হবে।

সিরিয়ার গভর্নর পেট্রোনিয়াসকে আদেশ করা হলো, জেরুজালেমে জিউস অর্থাৎ রোমান দেবতা জুপিটারের বেশে ক্যালিগুলার বিশাল মূর্তি স্থাপন করতে হবে।

গভর্নর জানেন, এ কাজ ইহুদীরা করতে দেবে না সহজে। তার দুই লিজিয়ন সেনা লাগবে। প্রতি লিজিয়নে প্রায় ৪,২০০ সেনা। রাজা হেরোদ অবশ্য তাকে রাজি করালেন যেন তিনি এ মূর্তি স্থাপন না করেন। তবে শর্ত মেনে নেন যে, ইহুদীরা আর এখন থেকে সম্রাট পুজোয় বাধা দেবে না অ-ইহুদীদেরকে। কিছুদিন পরেই অবশ্য ক্যালিগুলা মারা যান। ইহুদীরা সেদিন ঈদের মতো আনন্দ করেছিল।

ক্যালিগুলার পর সম্রাট হয়ে আসেন ক্লডিয়াস (৪১-৫৪)। তিনি এসেই আলেক্সান্দ্রিয়ার এই ইহুদী বনাম গ্রিক দ্বন্দ্ব পেলেন সামনে। তিনি দুপক্ষকে চিঠি লিখলেন। বললেন, তারা যেন এক দল অন্য দলের প্রতি সহনশীল হয়। ইহুদীরা যেন অন্য ধর্মের দেবতাদের ব্যাপারে কুৎসা না রটায়। ইহুদীদের প্রতি সদয় হয়ে তিনি জুদাহ রাজ্যে সরাসরি রোমান শাসন সরিয়ে নেন, জুদাহ রাজ্যকে স্বায়ত্তশাসিত করে দেন। জুদাহ রাজ্যের রাজা তখন হেরোদই, তবে এবার তার মাথার ওপরে রোমান ঝামেলা নেই।



সম্রাট ক্লডিয়াসের স্বর্ণমুদ্রা

কিন্তু হেরোদ মারা যেতেই জুদাহ প্রদেশের এ সাময়িক শান্তির ইতি টানা হলো। জুদাহ আবারও রোমান প্রদেশে পরিণত হলো। গভর্নররা শাসন করতেন জুদাহ। অনেক সমস্যার সৃষ্টি হলো রাজ্য পরিচালনায়। ধনী-গরিবের প্রবল বৈষম্য, স্বঘোষিত নবীদের উপস্থিতি, ইত্যাদি। বিশাল এক খরা হয় এ সময়,

প্রিফেক্ট টাইবেরিয়াস জুলিয়াস আলেকজান্ডারকে (৪৬-৪৮) সামাল দিতে হয় এ
খরা। প্রিফেক্ট ভেন্টিডায়াসের আমলে (৪৮-৫২) সংঘটিত হয় দাঙ্গা, বাইতুল
মুকাদ্দাসে এক গণহত্যা, সামারিটান আর গ্যালিলিয়দের দ্বৈরথ, ইত্যাদি। যখন
প্রিফেক্ট হিসেবে এলেন অ্যান্টোনিয়াস ফেলিক্স (৫২-৬০) তখন তিনি পেলেন
স্বাধীনতা যোদ্ধাদের, আর পেলেন কয়েকজন অলৌকিক নিরাময়কারীদের
ছড়াছড়ি, তারা মেসায়ার আশায় উন্মুখ।

মোদা কথা, ইহুদীদের ওপর তখন রোমানরা ত্যক্ত বিরক্ত।

অধ্যায় ৮

জেরুজালেমের পতন



এতক্ষণ যে হেরোদের কথা বলা হলো, তিনি হেরোদ দ্য গ্রেটের নাতি হেরোদ আগরিপাহ (৩৩-৭২) দ্য ফার্স্ট (Ἡρώδης Ἀγρίππας)। তিনি মারা যাবার পর রাজা হন তার ছেলে হেরোদ আগরিপাহ দ্য সেকেন্ড। তিনিই হেরোদীয় রাজবংশের পঞ্চম ও শেষ রাজা ('রাজা' হিসেবে না নিলে, হেরোদ বংশীয় শাসক ছিলেন মোট আট জন)।



হেরোদ আগরিপাহ দ্য ফার্স্টের মুদ্রা

পরবর্তী প্রসঙ্গে যাবার আগে ইহুদী প্রধান ইমাম বা হাই প্রিস্ট জোনাথানের মৃত্যুর ঘটনা না তুললেই নয়। যে কজন ইহুদী হাই প্রিস্টের নাম ভালো করে জানি আমরা, তার মাঝে একজন ছিলেন আনানুসের ছেলে তরুণ জোনাথান। তিনি যখন প্রাণ হারান, তখন চলছে সবে ৫৮ সাল।

যখন ইহুদীদের ঈদুল ফিসাখের সময় হতো, মানে পাসওভার আরকি, তখন দূর দূরান্ত থেকে ইহুদীরা ছুটে আসত এই পবিত্র জায়গায়। শুধু পাসওভার না, অন্যান্য ঈদেও একই অবস্থা। সে সময় এখানে ব্যবসা হতো দারুণ। জেরুজালেমের জনসংখ্যা তখন এক ধাক্কায় হয়ে যেত প্রায় দশ লাখ। ফটকের বাইরে ব্যবসায়ীরা বসে থাকতো, দূর থেকে আসা তীর্থযাত্রীরা এখানে এসে বাইতুল মুকাদাসে কুরবানি করতো। কিন্তু যা-ই কুরবানি দিক না কেন, পশু কিনতে হবে ইসরাইলি মুদ্রা শেকেল দিয়ে; ধর্মীয় মাহাত্ম্যের কারণে অন্য কোনো বিজাতীয় মুদ্রা তারা গ্রহণই করবে না, ফটকে বসে থাকা খুচরা ব্যবসায়ীদের অধীনেই ছিল সেই কুরবানির পশু। বিদেশি মুদ্রা বদলে তারা শেকেল দিতো তীর্থযাত্রীদের হাতে, বিনিময়ে মোটা অংকের পারিশ্রমিকও রেখে দিত। কেউ তো আর না করত না।

ইমামদের বেঁধে দেয়া নিয়ম- বাইতুল মুকাদাসের উঠানের একটা সীমানা পর্যন্ত হলো জেন্টাইলদের কোর্ট, এটা পার হতে পারবে কেবল ইহুদীরা, বিধর্মী অর্থাৎ জেন্টাইলরা থাকবে এ সীমানার বাইরে। একটু দূরে গিয়ে আরেকটা সীমানা, মহিলাদের কোর্ট, এর চেয়ে ভেতরে মহিলাদের যাওয়া নিষেধ, গেলে কপালে তার মৃত্যুদণ্ড। এরপর শেষ সীমানাটা অর্ধবৃত্তাকার, এটার নাম ইসরাইলি কোর্ট, এ পর্যন্ত সাধারণ পুরুষ ইহুদীরা আসতে পারত, নাইকানোর গেট পেরিয়ে কয়েক ধাপ সিঁড়ি বেয়ে উঠে সেই সীমানা শেষ। ঈশ্বরের উপস্থিতির সবচেয়ে কাছে এ পর্যন্তই যেতে পারত সাধারণ মানুষেরা, এর বেশি না। কারণ, ঠিক ওপারে বাইতুল মুকাদাসের পবিত্রতম স্থান হোলি অফ দ্য হোলি'জ, যেখানে স্রষ্টার উপস্থিতি আছে বলে বিশ্বাস করত ইহুদীরা। এ কারণে, একে আল্লাহর ঘরও বলতো।

বছরে মাত্র একদিন প্রধান ইমাম সেই কক্ষে প্রবেশ করতে পারেন, সেটি হলো পাপমোচনের দিন, ইয়ম কিপুর। তাদের বিশ্বাস, সেদিন ইসরাইল জাতির পাপ মোচন করেন স্রষ্টা। একটি দড়ি তার শরীরে শক্ত করে পেঁচিয়ে দেয়া হতো, সে অবস্থায় তিনি পবিত্র কক্ষে প্রবেশ করতেন। যদি তিনি জীবিত বেরিয়ে আসেন, তাহলে ঈশ্বর সবার পাপ ক্ষমা করে দিয়েছেন প্রধান ইমামের প্রার্থনার বদৌলতে। আর যদি তিনি যোগ্য না হন, তাহলে ইহুদীদের বিশ্বাস ছিল, তাকে সেখানেই আল্লাহ মৃত্যু দেবেন। তিনি যদি মারা যান, মৃতদেহ বয়ে আনার জন্য

যেন আর কাউকে সে কক্ষে প্রবেশ করতে না হয়, সেজন্যই তার কোমরের দড়ি, ওটা দিয়েই টেনে আনবে তাকে লোকে।

তো সে বছর, মানে ৫৮ সালে, ইমাম জোনাথানের দায়িত্ব পড়লো পবিত্র কক্ষে প্রবেশ করার। উঠানে তাকে দেখামাত্রই লোকে তাকে একবার স্পর্শ করার জন্য পাগল হয়ে যেত। এই মানুষটি যে একটু পর ঈশ্বরের কক্ষে ঢুকতে পারবেন! সেই ভীড় ঠেকাতে প্রহরীরা ব্যূহ তৈরি করে তাকে ঘিরে রাখত। কিন্তু সেই অলঙ্কারের ছুঁয়ে দেয়ার মুহূর্তটা, সেটি শেষ হয়ে যাওয়া মাত্রই হাজার হাজার মানুষ অবাক হয়ে দেখলো, মাটিতে লুটিয়ে পড়েছেন ইমাম জোনাথান। তার দেহ থেকে রক্তবন্যা গড়িয়ে যাচ্ছে। কোনো এক কারণে এই ভীড়ের সুযোগে এত মানুষের সামনে কে বা কারা হত্যা করে গিয়েছে জোনাথানকে।

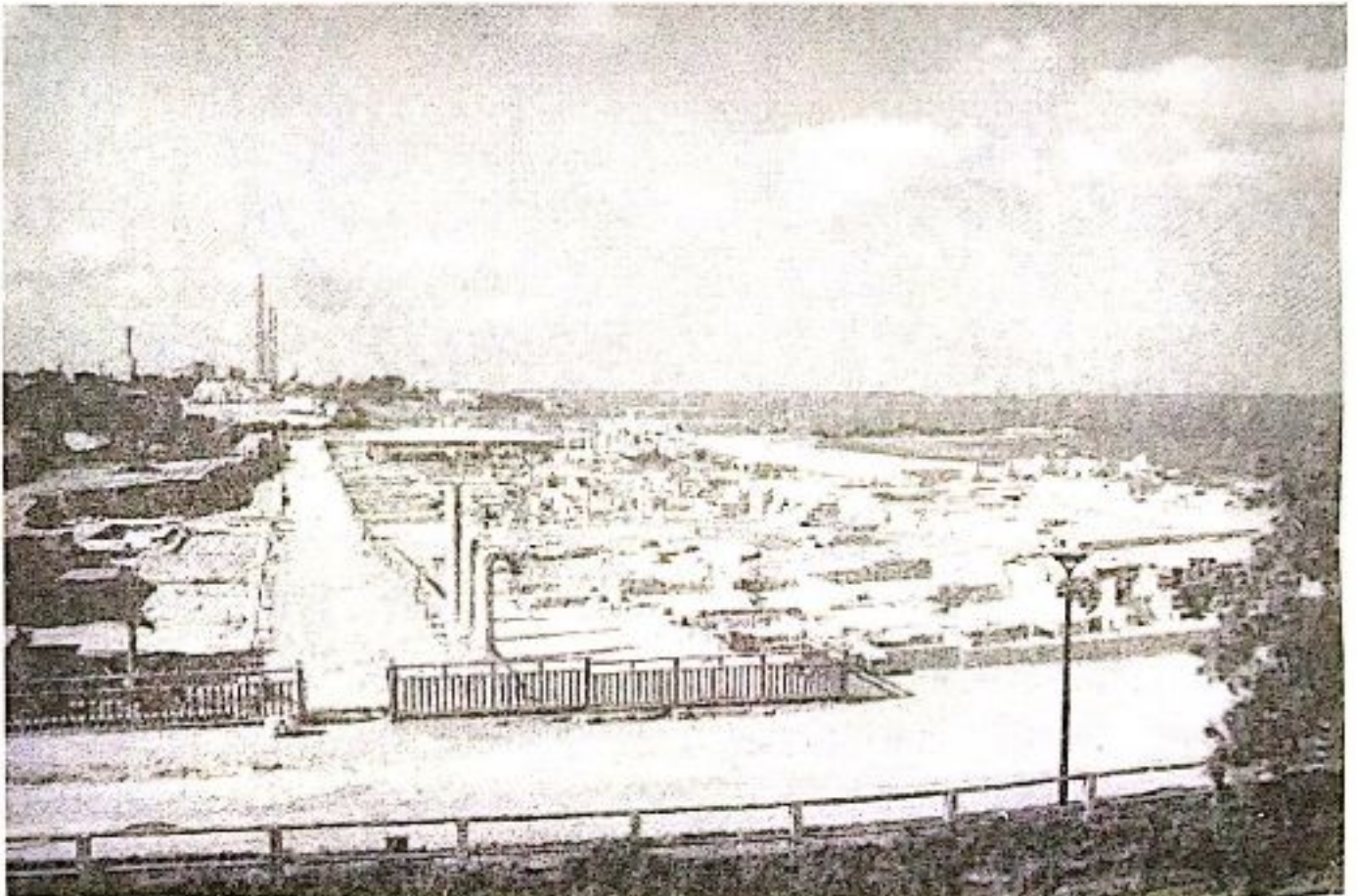


প্রিফেক্ট অ্যান্টনিয়াস ফেলিক্স

এখন আমরা জানি কে তাকে খুন করান। খুনের নির্দেশদাতা ছিলেন তৎকালীন জুদাহ প্রদেশের রোমান প্রকিউরেটর বা প্রিফেক্ট অ্যান্টনিয়াস ফেলিক্স (৫২-৬০)। ফেলিক্স এক গ্রেফতারকৃত ইহুদী ডাকাত এলিয়েৎসার বিন দিনিয়াসের সাথে চুক্তি করেন যে তাকে তিনি মুক্ত করে দেবেন, যদি সে তার কথা শোনে। সেই ডাকাত তার সাথে দেখা করতে এলে ফেলিক্স তাকে বন্দী করে রোমে পাঠিয়ে দেন। কিছুদিন পর ফেলিক্স প্রধান ইমামকে হত্যা করতে চাইলেন।

কারণ জোনাথান বারবার তাকে তিরস্কার করতেন, তিনি নাকি ভালোভাবে শাসন করতে পারেন না ইহুদীদের। জোনাথান হলে আরও ভালো পারতেন, ইত্যাদি। ফেলিক্স তার বন্ধু ডোরাসের সাথে আলাপ করে এক ডাকাতদলকে ঠিক করলেন, যারা তীর্থযাত্রীর বেশে যাবে জেরুজালেমে, কাপড়ের নিচে ছুরি লুকিয়ে, এবং সুযোগ বুঝে খুন করবে জোনাথানকে। তারা তাই করেছিল। বলা হয়, এ ডাকাত দলের নেতা করা হয় সেই রোমে পাঠানো ডাকাত এলিয়েৎসারকে। এই খুনের কখনও বদলা নেয়া হয়নি, তাই এ ডাকাতদল খুনের পরে নিরাপত্তার অভাবে ভোগেনি, ফেলিক্স তাদের জন্য সেই ব্যবস্থা করে দেন।

যাক গে, এবার হেরোদের কথায় ফেরা যাক। হেরোদ আগরিপাহ দ্য ফার্স্ট মারা যাবার পর টানা দুই দশক ধরে চলে প্রিফেক্টদের শাসন, নামে রাজা ছিলেন অন্য কেউ। এ সময়টাতে রোমান শাসক আর ইহুদীদের মাঝে সারাক্ষণ হান্সামা বেঁধেই থাকত। রোমান প্রিফেক্ট ফ্লোরাসের (৬৪-৬৬) আমলে সিজারিয়া ম্যারিটিমা (Παράλιος Καισάρεια)-তে গ্রিক আর ইহুদীদের যুদ্ধ হয়। এই জায়গাটাই ছিল রোমান শাসিত জুদাহ প্রদেশের রাজধানী, জেরুজালেম নয়! ৬৪০ সালে মুসলিম বাহিনীর বিজয়ের পর এ শহর ধ্বংস হয়, এবং গুরুত্ব হারায়। আরবিতে এ শহর কায়সারিয়া (قيسارية) নামে পরিচিত, হিব্রুতে কেসারিয়া (קיסריה)। বর্তমানে ইসরাইলের হাইফা জেলায় পড়েছে এটি, সাবেক রাজধানী তেলআবিব যাওয়ার পথে পড়ে।



দুই হাজার বছর আগে এই সিজারিয়াই ছিল জুদাহ প্রদেশের রাজধানী, আজ তা ধ্বংসপ্রাপ্ত!

যা বলছিলাম, প্রিফেক্ট ফ্লোরাস এ হাঙ্গামায় ইহুদী বিরোধী মনোভাব ধরে রাখলেন। তিনি তার বাহিনীকে জেরুজালেমে দাঙ্গা করতে অনুমতি দিলেন। তারা কয়েকজন গুরুত্বপূর্ণ ইহুদী ব্যক্তিকে হত্যা করে ফেলল। উল্লেখ্য, এ সময় ইহুদীদের মধ্যেও রোমানপন্থী লোকজন ছিল। যেই না প্রিফেক্টের বাহিনী জেরুজালেম ত্যাগ করল, সাথে সাথেই ইহুদী বিদ্রোহীরা সেই রোমানপন্থী ইহুদীদের হত্যা করে ফেলল। সেই সাথে জুদাহ রাজ্যের কিছু রোমান সেনাকেও হত্যা করল তারা। ফলে রোমানদের পক্ষে উঠে দাঁড়াতে আর কোনো ইহুদী সাহস পেল না। এ ব্যাপারটা সামাল দিতে সিরিয়ার রোমান গভর্নর ও তার বাহিনী জেরুজালেম অভিযানের জন্য প্রস্তুত হলো। তারা বাইতুল মুকাদ্দাস অবরোধ করল। কিন্তু ইহুদীদের তীব্র প্রতিরোধের মুখে ফিরে গিয়ে সমুদ্র তীরে আশ্রয় নিতে বাধ্য হলো তারা।

এ ঘটনার মধ্য দিয়ে ইহুদীদের যে আন্দোলন শুরু হয়, তা ‘ইহুদী মহাবিদ্রোহ’ (77-135) বা ‘ইহুদী যুদ্ধ’ নামে পরিচিত। ৬৬ সাল থেকে ৭৩ সাল পর্যন্ত স্থায়ী হয় এ মহাবিদ্রোহ। ঘটনাটা কেন ঘটলো, সেটা ব্যাখ্যা করা যাক।

৬৬ সালে বিদ্রোহ শুরু হবার সময় প্রখ্যাত বা কুখ্যাত রোমান সম্রাট নিরোর (৫৪-৬৮) শাসনের দ্বাদশ বছর চলছে। না, রোম যখন পুড়ছিল, নিরো তখন বাঁশি বাজাচ্ছিলেন না। ওটা লোককথাই। তো, রোমান আর ইহুদীদের মাঝে বেশ অনেক বছর ধরেই চলে আসছিল ধর্মীয় নীতিগত দ্বৈরথ। কফিনের শেষ পেরেক হিসেবে কাজ করে রোমানদের কর-নীতির বিরুদ্ধে ইহুদীদের আন্দোলন। ইহুদীরা রোমান নাগরিকদের ওপর আক্রমণ করে বসে এ আন্দোলনের সময়। স্বভাবতই, একদমই ভালোভাবে নেয়নি ব্যাপারটাকে রোম।

রোমান গভর্নর ফ্লোরাস বাইতুল মুকাদ্দাস লুটপাট করলেন এর প্রতিশোধ হিসেবে। তার দাবি, এ টাকাপয়সা আসলে সম্রাট নিরোর জন্য বরাদ্দ। পরদিন তিনি জেরুজালেম শহরের ওপর আক্রমণ চালিয়ে শহরের গণ্যমান্য ইহুদীদের গ্রেফতার করলেন। ইহুদীরা এতে ক্ষিপ্ত হয়ে ওঠে।

৬ সালেই রোমানরা উত্তরের সামারিয়া, মাঝের জুদাহ আর দক্ষিণের ইদুমিয়া অঞ্চল মিলিয়ে এহুদিয়া রাজ্য ঘোষণা করেছিল। এহুদিয়া রাজ্যের উত্তরে ছিল গালিলি অঞ্চল। এ ভূগোলটুকু মনে রাখতে হবে।

এহুদিয়া রাজ্যের ইহুদীরা বিশাল আকারে বিদ্রোহ শুরু করে এবং এ রাজ্যের রোমান ব্যারাক থেকে তাড়িয়ে দেয় রোমান সেনাদেরকে। রোমানদের পক্ষে

ছিলেন ইহুদীদের রাজা হেরোদ আগরিপাহ দ্য সেকেন্ড। ভয়ে তিনি রোমান কর্মকর্তাদের সাথে পালিয়ে যান জেরুজালেম থেকে।

যখন দেখা গেল বিদ্রোহ নিয়ন্ত্রণের বাইরে চলে যাচ্ছে, তখন সিরিয়ার রোমান সেনানায়ক সেস্টিয়াস গ্যালাস সিরিয়ান বাহিনী নিয়ে এলেন। তার উদ্দেশ্য ছিল বিদ্রোহ দমন করা। শুরুতে বন্দর-নগরী ইয়াফা দখল করার মাধ্যমে কিছুটা সাফল্য পেলেও, বেথ হোরনের যুদ্ধে ইহুদীদের কাছে হেরে যায় সিরিয়ান রোমান বাহিনী। ৬,০০০ রোমান সেনা নিহত হয়।

৬৬ সালে জেরুজালেমে একটি অস্থায়ী সরকার গঠিত হলো। নেতা ছিলেন তিনজন— প্রধান ইমাম আনানুস বেন আনানুস, জোসেফ বেন গুরিয়ন আর জশুয়া বেন গামলা। উত্তরে গালিলি অঞ্চলে বিদ্রোহীদের নেতা হিসেবে নিয়োগ দেয়া হলো ইয়োসেফ বেন মাতিতিয়াহকে, আর দক্ষিণে ইদোমের কমান্ডার করা হলো এলিয়েৎসার বেন হানানিয়াকে।

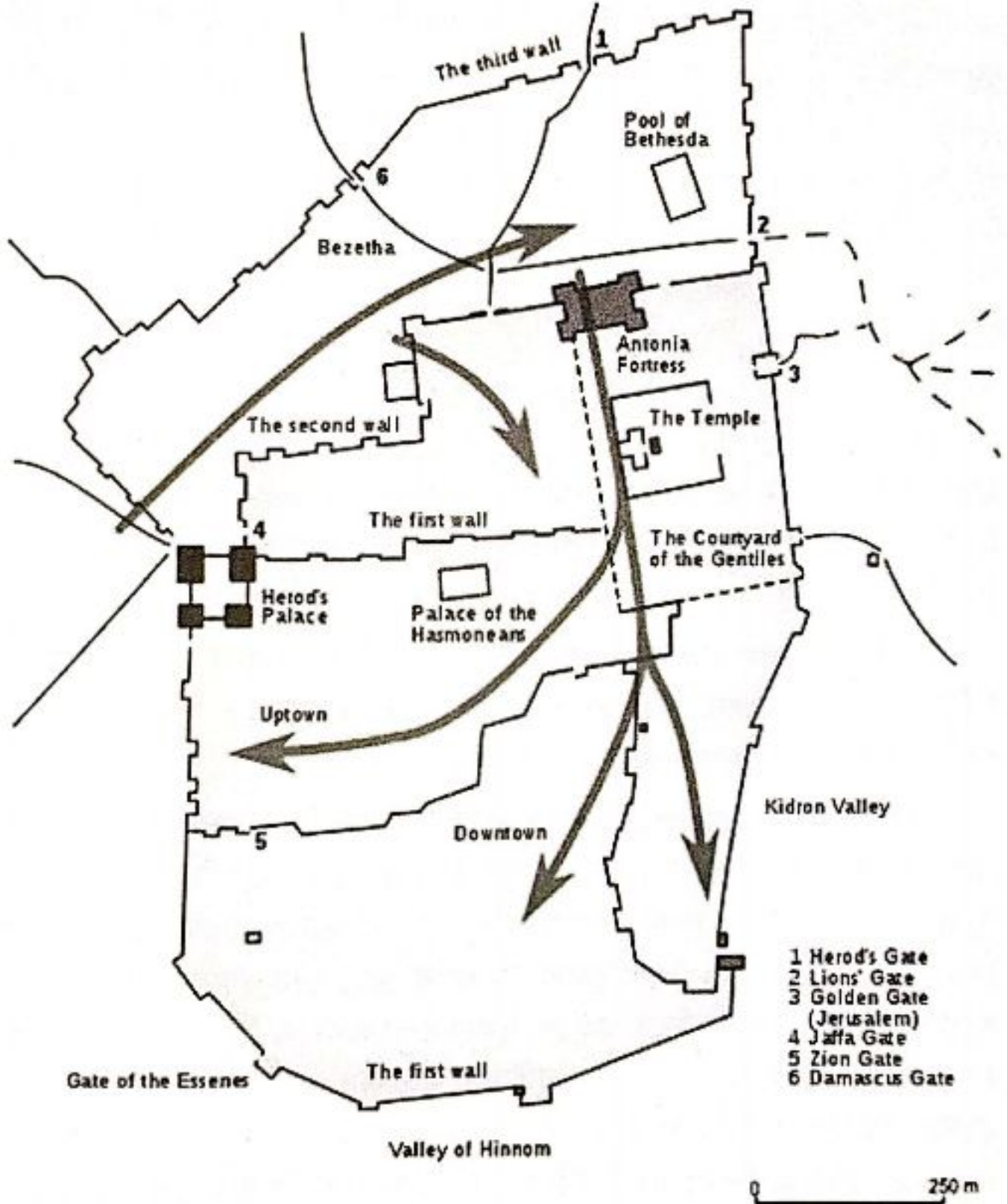
কিছুক্ষণ আগে সিকারি নামের একটি সশস্ত্র দলের কথা বলা হয়েছিল। তারা একবার মেনাহেম বেন ইয়েহুদার নেতৃত্বে চেষ্টা চালায় জেরুজালেম দখল করে নেয়ার, কিন্তু ব্যর্থ হয়। মেনাহেমকে মৃত্যুদণ্ড দেয় নতুন সরকার, সিকারির সকল সদস্যকে জেরুজালেম থেকে বহিষ্কার করা হয়। সাইমন নামের আরেক কৃষক নেতাকেও বহিষ্কার করে সরকার।

কিছুতেই কিছু হচ্ছে না দেখে এবার সম্রাট নিরো এহুদিয়া প্রদেশের বিদ্রোহ দমনের দায়িত্ব দিলেন রোমান জেনারেল ভেসপাসিয়ানের ওপর। ভেসপাসিয়ানের ছেলে টাইটাস তার সেকেন্ড-ইন-কমান্ড। রাজা আগরিপাহ দ্য সেকেন্ডের বাহিনী আর নিজেদের বড় রোমান বাহিনী নিয়ে ভেসপাসিয়ান গালিলি আক্রমণ করলেন ৬৭ সালে। তিনি মূল শহর জেরুজালেমে সরাসরি আক্রমণ চালাতে চাননি, তাই আগে গালিলিকে বেছে নেয়া হয়। কয়েক মাসের মধ্যেই ভেসপাসিয়ান গালিলির প্রধান জায়গাগুলোর নিয়ন্ত্রণ নিয়ে নিলেন। গালিলির বিদ্রোহ দমন করা হয়ে গেল।

গালিলি থেকে তখন জেলট বিদ্রোহীরা পালিয়ে চলে এলো জেরুজালেমে, সাথে হাজার হাজার গালিলির শরণার্থী। জেরুজালেম তখন এক বড় রাজনৈতিক ফ্যাসাদে পড়লো। সদ্য জড়ো হওয়া উত্তরের জেলট বিদ্রোহীদের সাথে জেরুজালেমের সাদুকিদের যুদ্ধে রক্তবন্যা বয়ে গেল। দক্ষিণ থেকে ইদুমীরা এসে জেলটদের সাথে কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে যুদ্ধ করতে লাগলো। প্রধান ইমাম আনানুস

বেন আনানুস নিহত হলেন। দুপক্ষেরই ক্ষয়ক্ষতি হলো ব্যাপক। সেই যে এক কৃষক নেতা সাইমনকে বহিষ্কার করা হয়েছিল, তাকে এবারে সাদুকি নেতারা ডেকে আনলেন। সাইমন এলেন ১৫,০০০ যোদ্ধা নিয়ে জেরুজালেমে। জেলট বিদ্রোহীদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে খুব দ্রুতই শহরের দখল নিয়ে নিলেন তিনি।

এই অভ্যন্তরীণ কোন্দল চলে পুরো ৬৯ সাল জুড়ে।



যেভাবে জয় করে নেয়া হলো জেরুজালেম

ইসরাইলের উত্থান-পতন ৮৩

এই ৬৯ সালটা ভেসপাসিয়ানের জন্য আবার কপাল খুলে যাওয়ার বছর। আগের বছর সম্রাট নিরো আত্মহত্যা করায় রোমের রাজনৈতিক অস্থিরতা তখন তুঙ্গে। ভেসপাসিয়ান ও আরও দুই জেনারেলকে ডেকে পাঠানো হলো খোদ রোমে। সেখানে গিয়ে জানলেন, তিনি এখন রোমান সম্রাট! ভেসপাসিয়ান যেহেতু এখন আর নেই, তাই ছেলে টাইটাসের কাঁধেই পড়লো সেনাবাহিনীর দায়িত্ব। টাইটাস এগিয়ে গেলেন জেরুজালেম দখলের জন্য।

৭০ সালের পাসওভার বা ঈদুল ফিসাখের ঠিক তিন দিন আগে, ১৪ এপ্রিল জেরুজালেম অবরোধ করলেন ভবিষ্যৎ রোমান সম্রাট টাইটাস। তার সেকেন্ড ইন কমান্ড হিসেবে ছিলেন টাইবেরিয়াস জুলিয়াস আলেকজান্ডার।

টাইটাস জেরুজালেমের সীমানের বাইরে শিবির গাড়লেন। মে মাসের শেষ দিকে রোমানরা জেরুজালেমের ভেতরে ঢুকে শহরের নতুন অংশের দখল নিয়ে নিল। এই অংশটা বাইতুল মুকাদাসের উত্তর দিকে। জুলাই মাস শেষ হবার আগেই তারা বাইতুল মুকাদাসের পাশের দুর্গ দখল করে নিল। আগস্টের ৬ তারিখ উপাসনালয়ে সব কুরবানি বন্ধ হয়ে গেল। তার এক সপ্তাহ পরে বাইতুল মুকাদাসের উঠানগুলো পুড়তে শুরু করলো, আর ২৮ আগস্ট পুরো বাইতুল মুকাদাসেই আগুন ধরে গেল যুদ্ধ চলাকালীন। আরেক মাস পর বাইতুল মুকাদাসের পশ্চিমে অবস্থিত মূল শহরটুকু দখল করে নিল রোমানরা। অর্থাৎ, শেষমেশ বহু চেষ্টার পর পুরো জেরুজালেম টাইটাস জয় করে নিলেন।

রোমানদের বাধা দেবার মতো আর কেউ অবশিষ্ট রইলো না জেরুজালেমে। টাইটাস নির্দেশ দিলেন পুরো জেরুজালেম শহর ধ্বংস করে দিতে। বললেন, কেবল হেরোদের প্রাসাদের মিনারগুলো অক্ষত রাখা হবে।

তিশা বেআভ (תִּישָׁא בְּעֵאֵב) দিবস হিসেবে এ দিনটিকে স্মরণ করে ইহুদীরা, যেমন আগুরাকে স্মরণ করা হয়। তিশা বেআভ মানে হিব্রু আভ মাসের নয় তারিখ। এ দিন যেমন ফার্স্ট টেম্পল অফ সলোমন নব্য ব্যাবিলনীয়রা ধ্বংস করে দেয়, ঠিক তেমনই ৭০ সালে রোমানরা ধ্বংস করে দেয় সেকেন্ড টেম্পল অফ সলোমন। অর্থাৎ, একই দিনে বাইতুল মুকাদাসের প্রথম ও দ্বিতীয় সংস্করণ ধ্বংস হয়। আজও সেই আদি নকশায় বাইতুল মুকাদাস ভবন নির্মাণ করা হয়নি। ইহুদীরা অপেক্ষায় আছে থার্ড টেম্পল বা তৃতীয় বাইতুল মুকাদাসের। আপাতত যে ভূমির ওপর এ উপাসনালয় দাঁড়িয়ে ছিল, সেটিকেই বাইতুল মুকাদাস হিসেবে ডাকা হয়, যেখানে আজ মসজিদুল আকসা ও সোনালি গম্বুজের ডোম অফ দ্য রক বা কুব্বাতস সাখরা দাঁড়িয়ে আছে।



আভ মাসের নয় তারিখে ধ্বংসযজ্ঞ চলছে জেরুজালেমে

এ দিনের স্মরণে ২৫ ঘণ্টা রোজা রাখে ইহুদীরা। বাইতুল মুকাদ্দাস ধ্বংসের পাশাপাশি আরও কিছু দুর্যোগ এদিন ঘটেছিল বলে ইহুদীরা বিশ্বাস করে থাকে।

অধ্যায় ৯

মাসাদার ঘটনা ও মহাবিদ্রোহের ইতি



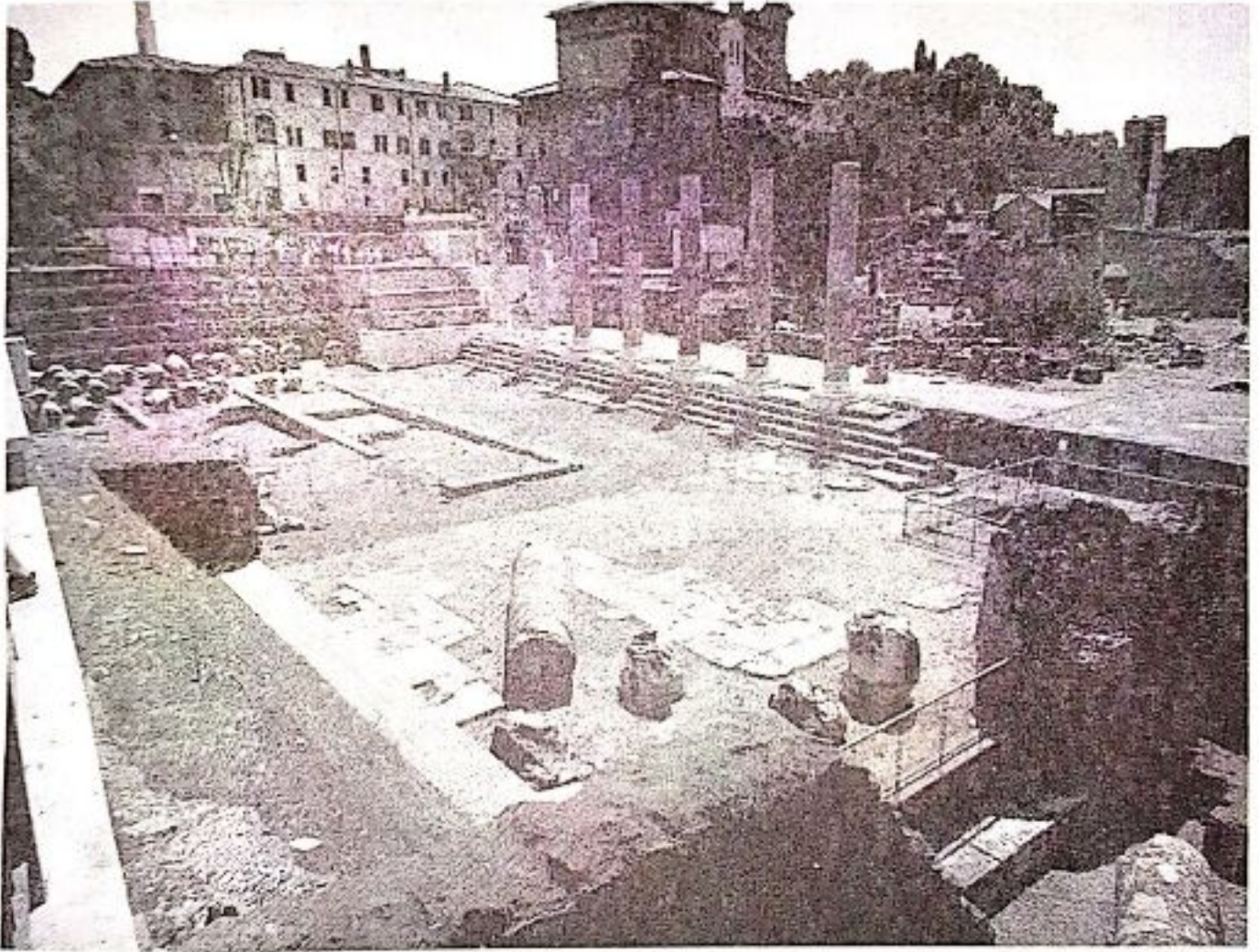
একটা কথা না বললেই নয়। জোসেফাসের মতে, বাইতুল মুকাদাস প্রথমে ভাঙতে নির্দেশ দেননি টাইটাস। প্রথম ক্ষতিটা করে ইহুদীরাই। তারা বাইতুল মুকাদাসের উত্তর-পশ্চিম দিক থেকে আগুন লাগিয়ে দেয়, যেন রোমানদের অগ্রগতি থামানো যায়। কিন্তু যা হবার হয়ে গেছে দেখেই কেবল রোমান সেনারা পরে আর কোনো



শিল্পীর কল্পনায় বিধ্বস্ত জেরুজালেম

রাখ ঢাক রাখেনি। আগুন থেকে সৃষ্ট বিস্ফোরণের তোপে ক্ষতিগ্রস্ত হতে থাকে বাইতুল মুকাদ্দাস, এরপরও ইহুদীরা আরও ক্ষতি করতে থাকে। ব্যাপারটি আশ্চর্যজনক মনে হলেও, তারা আত্মরক্ষার চিন্তা থেকে করছিল কাজটি।

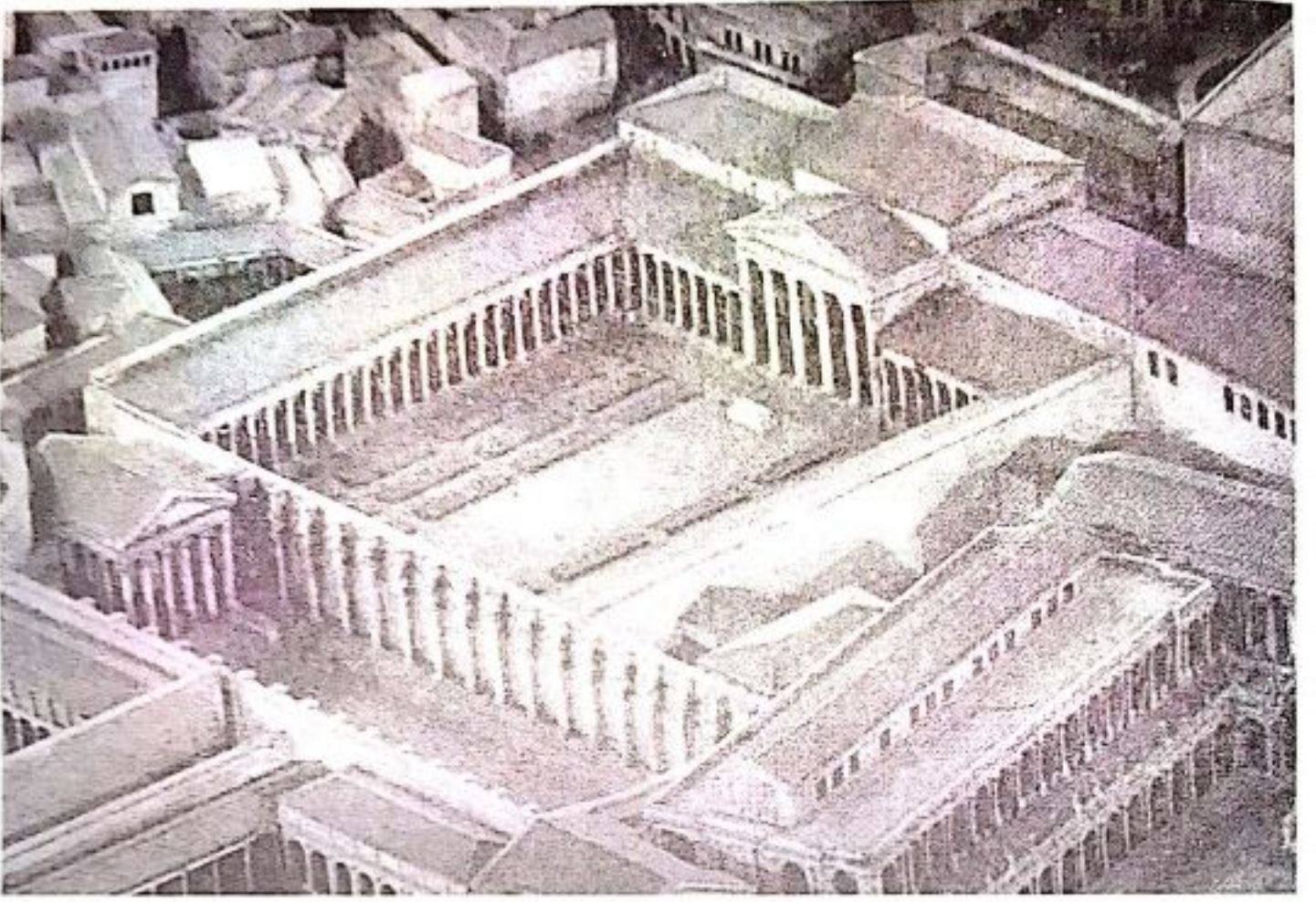
এই পুরো অবরোধ ও পরবর্তী যুদ্ধ মিলিয়ে প্রায় ১১ লাখ মানুষ মারা যায় বলে জোসেফাস জানান। সংখ্যাটা এত বেশি, কারণ জেরুজালেমে ঈদুল ফিসাখ উপলক্ষ্যে কুরবানি দিতে দূর দূরান্ত থেকে লোকজন এসেছিল তখন, আর সেই সময়ই রোমানরা আক্রমণটা চালায়। এতে মারা পড়ে স্বাভাবিকের চেয়ে অনেক বেশি লোক, যাদের অনেকেই জেরুজালেমবাসী নয়।



শান্তি মন্দিরের যা অবশিষ্ট আছে আজ

কেবল সশস্ত্র বিদ্রোহীদেরই নয়, বরং দুর্বল বেসামরিক লোকদেরও রোমানরা হত্যা করে। জেরুজালেমের জীবিত সবাই রোমানদের বন্দীতে পরিণত হলো। কয়েকজন নেতাসহ প্রায় ৯৭,০০০ বন্দীকে দাসত্ব বরণ করতে হয়। এই ৯৭,০০০ জনের মাঝে কয়েক সহস্র লোক গ্ল্যাডিয়েটরে পরিণত হয়, অর্থাৎ তাদের শেষ নিশ্বাস ত্যাগ করতে হয় আবদ্ধ অ্যারিনায় (যেখানে গ্ল্যাডিয়েটর ম্যাচগুলো হতো)। অনেক ইহুদীকে বিখ্যাত কলোসিয়াম বানানোর কাজে লাগিয়ে দেয়া হয় জোর করে, আর অনেককে লাগানো হয় রোমের শান্তি মন্দির বা টেম্পল অফ পিস নির্মাণে। কলোসিয়ামের দিকে ফিরে থাকা মন্দিরটি ছিল রোমান শান্তির

দেবী প্যাক্সের প্রতি উৎসর্গকৃত। ১৭ বছরের নিচে যাদের বয়স, তাদের বিক্রি করে দেয়া হলো।



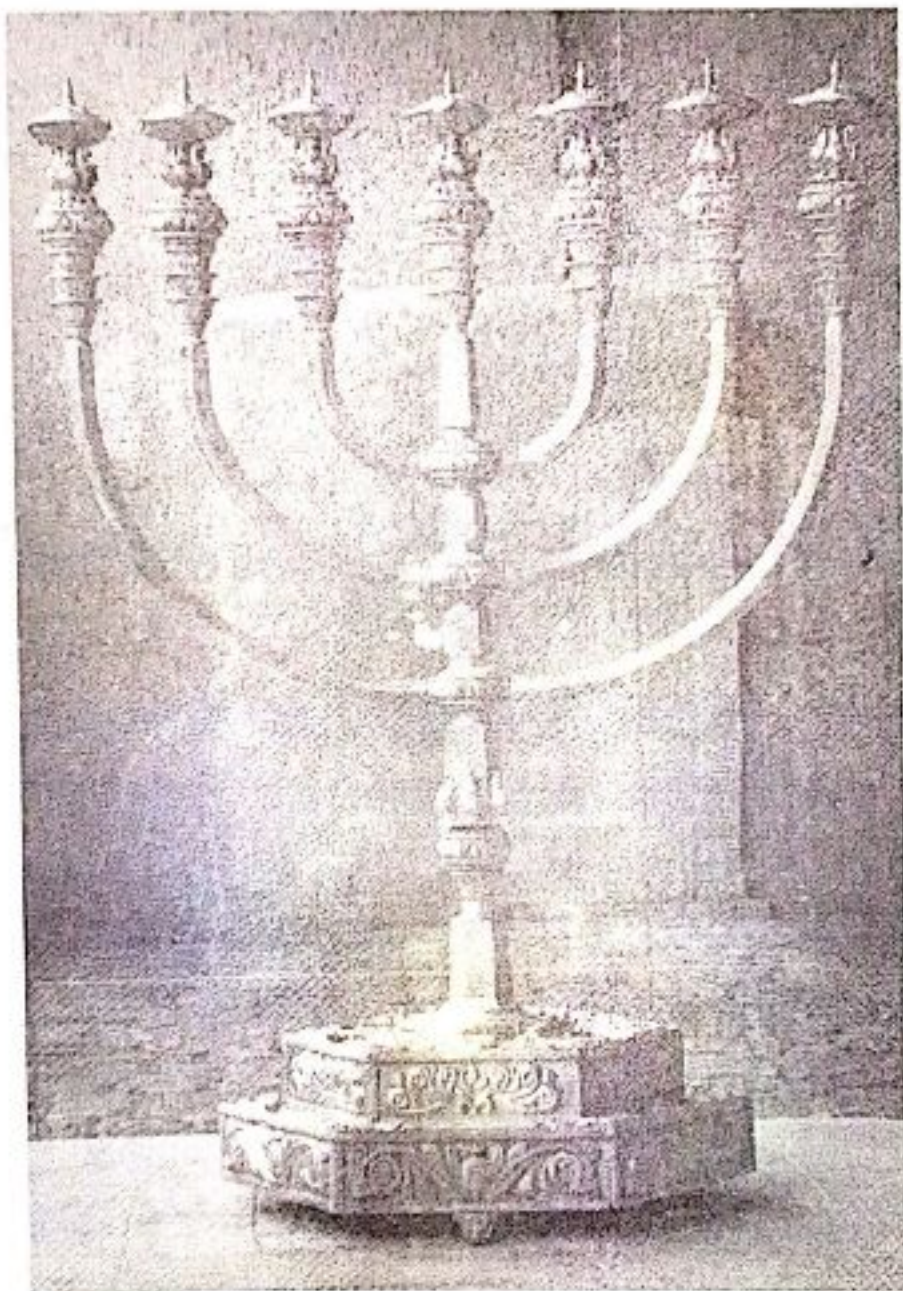
শান্তি মন্দিরের তৎকালীন মডেল



এখনও টিকে আছে রোমের কলোসিয়াম

অবশ্য অনেকেই জোসেফাসের এই লাশের সংখ্যাকে অতিরঞ্জন বলে দাবি করেছেন, কারণ তখন নাকি এত জনসংখ্যা ছিলই না ফিলিস্তিনে।

সে যাই হোক, টাইটাস আর তার সেনারা রোমে ফিরে ইহুদীদের পবিত্র মেনোরা আর অন্যান্য জিনিসপাতি নিয়ে রাস্তায় মিছিল করতে করতে বিজয়োল্লাস করল। এই জিনিসগুলো এর আগ পর্যন্ত রক্ষিত ছিল বাইতুল মুকাদ্দাসের পবিত্রতম কক্ষে, কেবল প্রধান ইমামের চোখে পড়ত এগুলো। আজ সেগুলো রোমের রাস্তায় উন্মুক্ত।



ইহুদীদের মেনোরা

টাইটাসের জেরুজালেম বিজয়কে স্মরণীয় করে রাখার জন্য ‘আর্চ অফ টাইটাস’ বা ‘টাইটাস তোরণ’ নির্মাণ করা হয় রোমে। সম্রাট টাইটাস মারা যাবার পর, ৮১ সালে ছোট ভাই সম্রাট ডমিটিয়ান এ তোরণ নির্মাণ করেন। এ তোরণ রোমান সম্রাট ভেসপাসিয়ান ও টাইটাসের ইহুদীদের ওপর বিজয়ের সदा স্মারক। আর্চের গায়ে সেদিনগুলোর সব ঘটনাই লিপিবদ্ধ করা আছে। আমরা আর্চের গায়ে

আঁকা দেখতে পাই তৎকালীন সময়ের হেরোদের সংস্কার করা বাইতুল মুকাদাসের নানা উপকরণের বাস্তব প্রতিকৃতি। এই আর্চের গায়ে আঁকা মেনোরাকে মডেল ধরেই ইহুদী সমাজে মেনোরা তৈরি করা হয়।



আর্চ অফ টাইটাসের গায়ে দেখা যাচ্ছে সেই মিছিলের ছবি, দেখা যাচ্ছে কাঁধে বহন করা মেনোরা

মেনোরা (menorah) হলো বাইবেলে বর্ণিত সাতটি প্রদীপ সংবলিত প্রাচীন হিব্রু বাতি। খাঁটি সোনা দিয়ে নির্মিত এই বাতি মূসা (আ) শরীয়ত সিন্দুক বা আর্চ অফ দ্য কোভেন্যান্ট রাখার জন্য যে তাঁবু খাটাতেন, তাতে রাখা হতো। পরবর্তীতে রাখা হতো বাইতুল মুকাদাসে। প্রতিদিন এতে দেওয়া হতো টাটকা জলপাই তেল। আজকে ইসরাইলের রাষ্ট্রীয় প্রতীক মেনোরার দুপাশে শান্তির প্রতীক জলপাই পাতা, আর নিচে হিব্রুতে লেখা ইসরাইল (יִשְׂרָאֵל)। ১৯৪৮ সালে ডিজাইন প্রতিযোগিতা আয়োজনের মধ্য দিয়ে এ প্রতীক বাছাই করে নেয়া হয়। তাওরাতের হিজরত কিতাবের ২৫:৩১-৪০ শ্লোকে বিস্তারিত বিবরণ পাওয়া যায় মেনোরার।

জেরুজালেম আর এহুদিয়ার পতনের পর নানা অঞ্চল জুড়ে ইহুদীরা বিক্ষিপ্তভাবে ছড়িয়ে ছিটিয়ে পড়ে। এরকম বিভিন্ন স্থানে টিকে থাকা স্বল্প সংখ্যক ইহুদীর ক্ষুদ্র সমাজকে একে একটি ‘ডায়াসপোরা’ বলা হয়। প্রত্যেক ডায়াসপোরারই ঐতিহ্যের প্রতীক হয়ে দাঁড়ায় টাইটাসের তোরণে আঁকা মেনোরা। এই আর্চ দেখে দেখে পরে আরও অনেক বিজয় তোরণ বানানো হয়েছিল। আর্চ অফ টাইটাস টিকে আছে আজও।

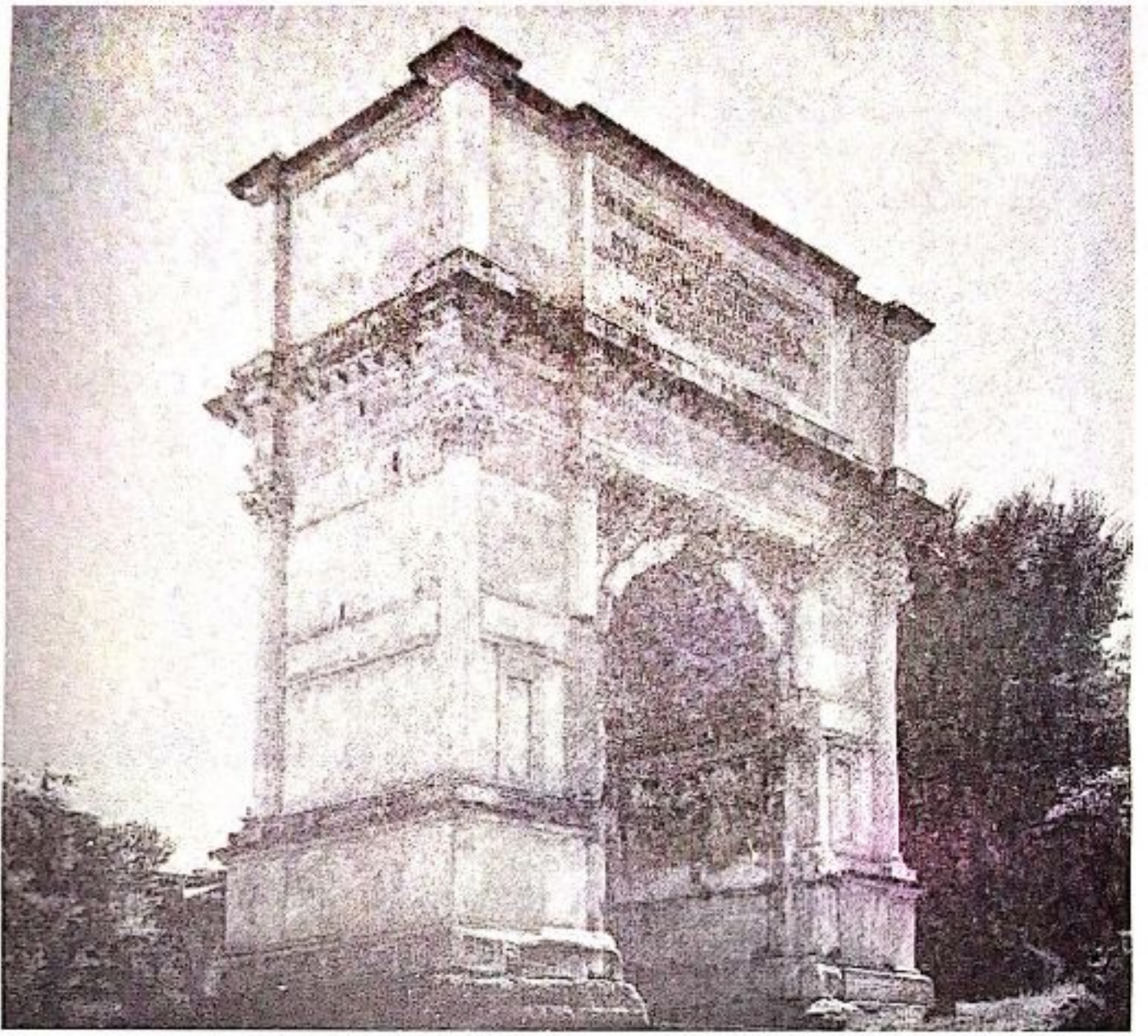


ইসরাইলের রাষ্ট্রীয় প্রতীক মেনোরা

টাইটাসের বিজয়-অনুষ্ঠানগুলো সারা বছর ধরেই চলে নানা শহরজুড়ে। অনুষ্ঠানের সময় এমনও হয়েছে যে ইহুদী বন্দীদের হিংস্র পশুর মুখে ফেলে দিয়ে উদযাপন করা হচ্ছে, আর গ্ল্যাডিয়েটর হিসেবে দাঁড়া করিয়ে দেয়া তো আছেই।

পরের বছরগুলোতে রোমানরা বাকি দুর্গগুলো দখল করে নিলো। তবে এদের মধ্যে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা সম্ভবত ৭৩ সালে মাসাদা দুর্গের পতন।

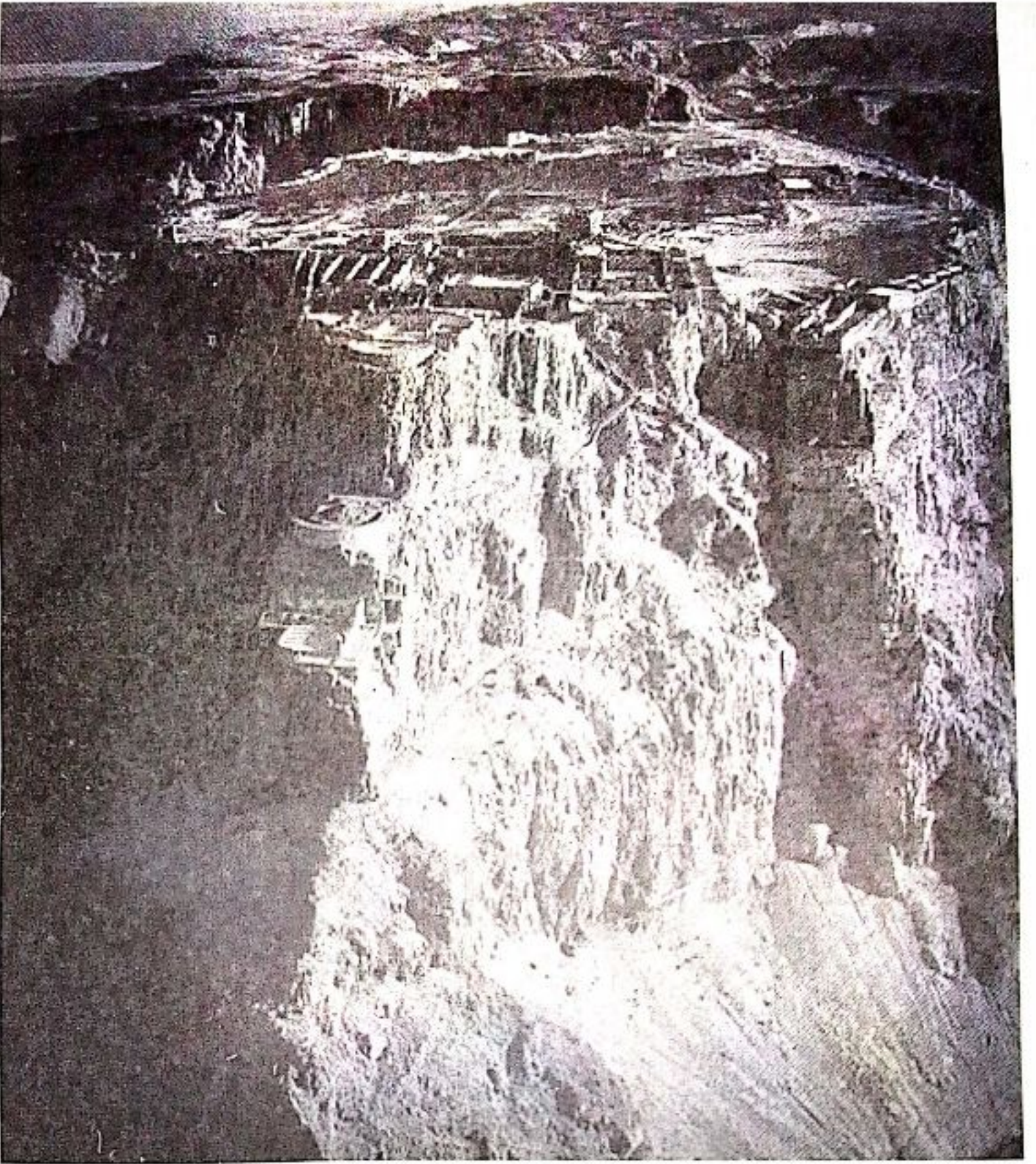
অবশ্য, হিব্রু মেৎসাদা (מְצָדָה) মানেই দুর্গ, সেখান থেকেই মাসাদা বলা হয়। ইসরাইলের দক্ষিণে প্রাচীন মাসাদার অবশেষ এখনও দেখতে পাওয়া যায়। পর্বতচূড়ার এক সমতলে অবস্থিত এ দুর্গটি ইহুদীদের গর্ব করার মতো একটি দুর্গ ছিল। আরাব শহর থেকে ২০ কিলোমিটার দূরে এহুদিয়া মরুভূমির পূর্ব প্রান্তে মৃত সাগরের পাড়ে দাঁড়িয়ে ছিল মাসাদা। ৩৭ থেকে ৩১ খ্রিস্টপূর্বের মাঝে হেরোদ দ্য গ্রেট এই পাহাড়ের ওপর দুটো প্রাসাদ বানিয়েছিলেন নিজের জন্য। এ দুর্গের কাজ ছিল প্রাসাদ দুটোকে নিরাপত্তা দেয়া। একটা ব্যাপার না বললেই নয়। ইহুদীদের একসময়ের গণআত্মহত্যার এ স্থানটি ইসরাইলের সবচেয়ে বিখ্যাত টুরিস্ট স্পটগুলোর একটি। বছরে প্রায় পৌনে দশ লাখ মানুষ এসে ঘুরে যায় জায়গাটি।



এখনও টিকে থাকা সেই আর্চ অফ টাইটাস বা টাইটাস তোরণ

৭৩ সালে, এহুদিয়ার রোমান গভর্নর লুসিয়াস ফ্ল্যাভিয়াস সিলভা একটি রোমান লিজিয়ন নিয়ে রওনা দেন মাসাদার উদ্দেশ্যে। রোমান বাহিনী মাসাদাকে ঘিরে একটি অবরোধ দেয়াল তৈরি করলো। এরপর পশ্চিম দিক থেকে র্যাম্প বসানো হলো। নব্বইয়ের দশকের খননকাজ থেকে নিশ্চিত হওয়া যায়, মাসাদার পতনের সময় যে র্যাম্প বসানো হয়েছিল, তা ছিল ৩৭৫ ফুট দীর্ঘ, বানানো হয়েছিল প্রাকৃতিক পাথর দিয়েই। মাসাদা আসার আগে দুই তিন মাস ধরে এটি বানিয়ে আনা হয়েছিল। এর সাহায্যে রোমানরা সে বছর ১৬ এপ্রিল শেষমেশ দুর্গের দেয়াল ব্যাটারিং র্যাম দিয়ে ভেঙে ফেলতে সমর্থ হয়। অবাক করা হলেও সত্য, আগে বন্দী করা সেই ইহুদীদেরকে ব্যবহার করেছিল রোমানরা এই মাসাদার পতনের কাজে সাহায্য করতে। সৈন্যসহ মোট ১৫,০০০ লোক এ অভিযানে অংশ নেয়।

৯২ ইসরাইলের উত্থান-পতন



পাহাড়চূড়ায় মাসাদার অবশেষ

ঐতিহাসিক জোসেফাসের মতে, রোমানরা অবশেষে যখন দুর্গে প্রবেশ করতে সক্ষম হয়, তখন তারা আবিষ্কার করলো, সবগুলো গুদামে আগুন জ্বলছে। আর ইহুদীরা সবাই আত্মহত্যা করেছে, কিংবা একে অন্যকে খুন করেছে। সব মিলিয়ে ৯৬০ জন। সিকারি দলের নেতারা কোন দুটো বজুতা দিয়ে ইহুদীদেরকে এই

ইসরাইলের উত্থান-পতন ৯৩

আত্মহত্যা লেলিয়ে দিয়েছিলেন, সেটাও আমরা জোসেফাসের বিবরণীতে উল্লেখিত পাই। মাত্র দুজন নারী আর পাঁচজন শিশুকে জীবিত পাওয়া গেল। প্রত্নতাত্ত্বিকদের অভিযানে, অন্তত ২৮টি দেহ পাওয়া যায় এখানে। জোসেফাস ধ্বংসপ্রাপ্ত হাম্মামখানার কথাও উল্লেখ করেছিলেন।



মাসাদার হাম্মাম বা গোসলখানা

বহু বছর পর হযরত মুহাম্মাদ (সা) যখন মদিনার শাসক, তখন সেখানকার ইহুদী গোত্রকে অবরুদ্ধ করা হয়েছিল বিশ্বাসঘাতকতার দায়ে। বনু কুরাইজা নামের সেই ইহুদী গোত্রের নেতারা দুর্গে অবরুদ্ধ অবস্থায় নিজেদের জন্য যে তিনটি বিকল্প উপায় উপস্থাপন করেছিলেন, তাদের একটি ছিল এই মাসাদার মতো গণআত্মহনন।

জেরুজালেমের পতন আর বাইতুল মুকাদাস ধ্বংসের পর, ইহুদীদের বেশ কয়েকটি জায়গা থেকে প্রতিরোধ গড়ে তোলা হচ্ছিল। এর মাঝে প্রধান তিনটি দুর্গতুল্য জায়গা ছিল হেরোদিয়াম, মাক্যারোস (মিকওয়ার) আর এই মাসাদা। প্রথম দুটোর পতন হয় রোমান বাহিনীর হাতে আগেই, আর সবশেষে পতন হয় ৭৩ সালে মাসাদার।

মাসাদার পতনের মধ্য দিয়েই হয় এই মহাবিদ্রোহ তথা প্রথম ইহুদী-রোমান যুদ্ধের ইতি।

অধ্যায় ১০

রোমান শাসনে ইহুদী জীবন



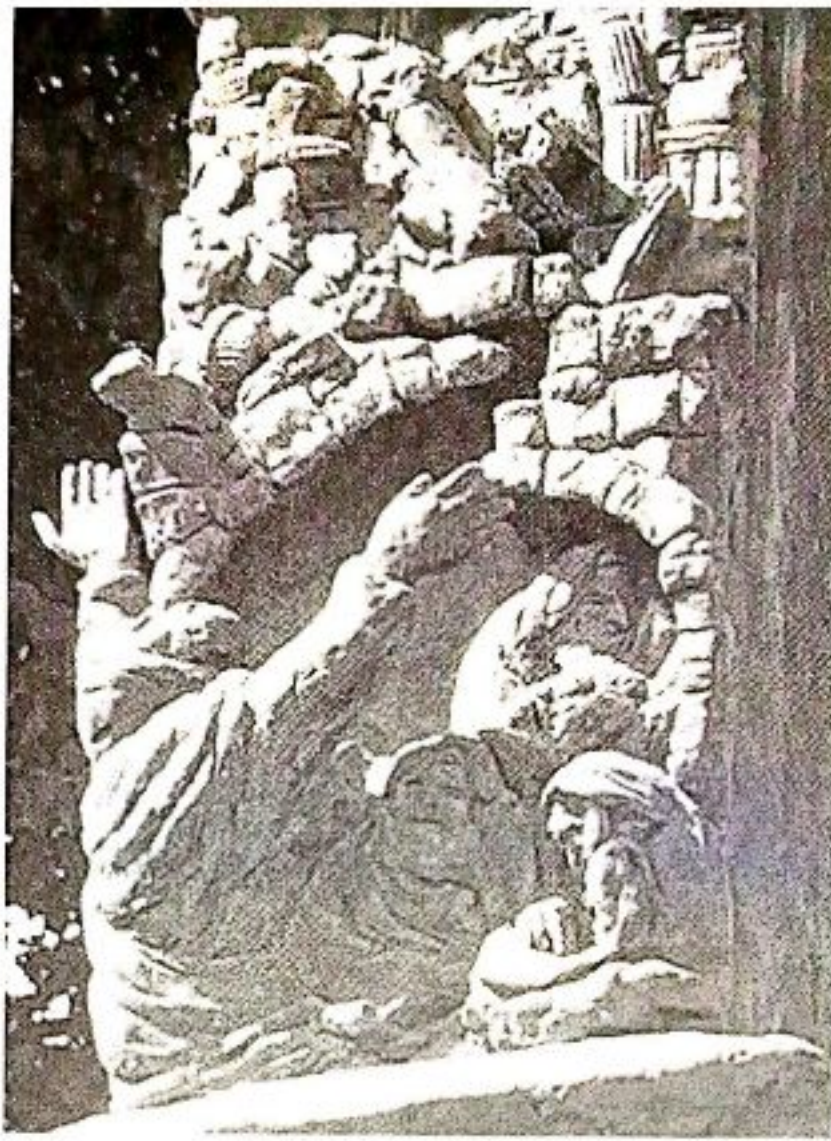
রোমানরা এহুদিয়া বিজয় করে নেয়ার ফলাফল ছিল ব্যাপক ধ্বংসযজ্ঞ আর বিপুল সংখ্যক ইহুদীর দাসত্ববরণ। কিন্তু ইহুদীরা তাতে দমে না গিয়ে প্রায় সাথে সাথেই কাজ শুরু করে দিল যতগুলো ধ্বংসস্তুপকে আবার গড়ে তোলা সম্ভব হয়, সে কাজে। রোমান আক্রমণের পরেও এহুদিয়া প্রদেশে সংখ্যাগরিষ্ঠ কিন্তু ইহুদীরাই রইল।

রোমানরা ইহুদীদের ওপর চড়া কর বসায়, তবে তার বিনিময়ে তারা ইহুদীদেরকে স্বাধীনভাবে ধর্ম কর্ম করতে দেয়। অর্থাৎ বাকিদের মতো পৌত্তলিকতা কিংবা সম্রাট পূজায় অংশ নিতে হবে না ইহুদীদেরকে। কিন্তু এ সময়কালে সাদুকি আর এসেনিরা বিলুপ্ত হয়ে যান, কেবল টিকে থাকেন ফারিসিগণ। তাদের নেতা ছিলেন র্যাবাই (রাব্বি) ইয়োহানান বেন জাক্কাই (১৮০৮-১৩৮০)।

ইহুদীরা উল্লেখযোগ্য কিছু ঐতিহাসিক চরিত্রকে সংক্ষিপ্ত নামে ডাকে নামের শব্দগুলোর আদ্যাক্ষর দিয়ে। যেমন র্যাবাই ইয়োহানান বেন জাক্কাইয়ের আদ্যাক্ষর ‘র ই ব জ’ মিলিয়ে তাকে রিবাজ (১৮৮৮) বলে সম্বোধন করে।

ইহুদীদের মাঝে প্রচলিত আছে, রোমের বিরুদ্ধে ইহুদীদের বিদ্রোহ সূচনা হবার পর জেনারেল ভেসপাসিয়ান তার লোকদের জেরুজালেমের চারপাশে প্রাচীরের বাইরে দাঁড় করিয়ে রাখতেন। তার গুপ্তচরেরা তীরের সাথে কাগজ বেঁধে ভেতরের আলাপসলাপ বাইরে পাঠিয়ে দিত। এদের মাঝে একটি কথা ছিল, র্যাবাই ইয়োহানান সিজারের প্রশংসা করেন।

৯৬ ইসরাইলের উত্থান-পতন



ইসরাইলের পার্লামেন্ট কেনেসেতে খোদাই করা র্যাবাই ইয়োহানান

র্যাবাইয়ের সতর্কবাণী যখন লোকে শুনলো না, তখন তিনি তার শিষ্য এলিয়েৎসার আর ইয়েহোশুয়াকে ডেকে এনে বললেন, “বাছারা, আমাকে এ জায়গা থেকে বের করে নিয়ে যাও। আমাকে একটি কফিনের ভেতর পুরে রাখো, আমি সেখানেই ঘুমাব।” এলিয়েৎসার ধরলেন সেই কফিনের সামনের অংশ, আর ইয়েহোশুয়া ধরলেন পেছনের অংশ। সূর্যাস্ত পর্যন্ত হেঁটে তারা পৌঁছালো জেরুজালেমের সীমানায়। প্রহরীরা জিজ্ঞাসা করলো, কে মারা গিয়েছে? তারা উত্তর দিলেন, “এক মরা লোক। জানোই তো, জেরুজালেমের ভেতর লাশ এক রাতের বেশি রাখার নিয়ম নেই।” প্রহরীরা উত্তর দিল, “মরা লোক হলে তাকে নিয়ে যাও।”

তারা পৌঁছে গেল জেনারেল ভেসপাসিয়ানের কাছে। কফিন খুলে বেরিয়ে এলেন র্যাবাই।

ভেসপাসিয়ান জিজ্ঞেস করলেন, “আপনি কি র্যাবাই ইয়োহানান বিন জাক্কাই? বলুন আমি আপনাকে কী দিতে পারি।”

র‍্যাবাই উত্তর করলেন, “আমি চাই ইবনা (يبنى/بنى) শহর, আপনারা যাকে ইয়ামনিয়া ডাকেন। আমি সেখানে গিয়ে আমার শিষ্যদের শিক্ষা দেব, সেখানে ইহুদী ধর্মের আচার প্রতিষ্ঠা করব।”

ভেসপাসিয়ান উত্তর করলেন, “ঠিক আছে। সেখানে গিয়ে আপনি তাই করুন।”

র‍্যাবাই বললেন, “আমি কি আপনাকে একটা জিনিস জানাতে পারি?”

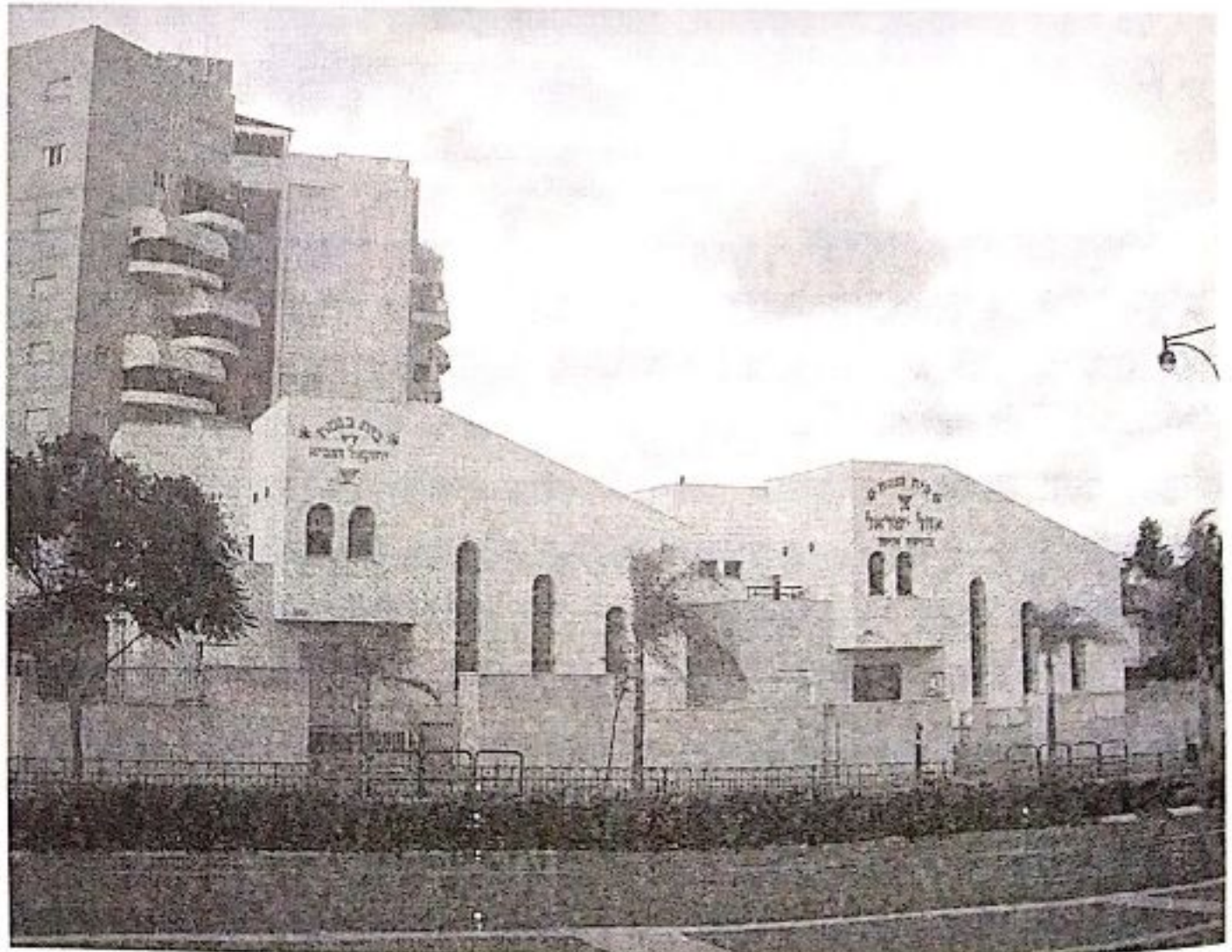
ভেসপাসিয়ান বললেন, “বলুন।”

র‍্যাবাই বললেন, “আপনি রোমান সম্রাট হতে চলেছেন।”

ভেসপাসিয়ান বললেন, “আপনি কীভাবে জানেন সেটা?”

র‍্যাবাই বললেন, “আমাদের কাছে তেমন খবরই পৌঁছেছে পাক কিতাবে, বাইতুল মুকাদাসের পতন কোনো সাধারণ লোকের হাতে হবে না, হবে কোনো সম্রাটের হাতে।”

কথিত আছে, এর দুই কি তিন দিন পরেই ভেসপাসিয়ানের কাছে দূত এসে জানায়, সিজার মারা গিয়েছেন, তার তলব পড়েছে। এরপর তিনি রোমান সম্রাট বনে যান।



আজকের ইবনা শহরের একটি ইহুদী সিনাগগ

র্যাবাই ইয়োহানান কথা মতো সাগর তীরের কাছে ইবনা শহরে গিয়ে তার শিষ্যদের জড়ো করলেন, আর সাথে এলেন উল্লেখযোগ্য ফারিসি বিদ্বানগণ। তাদেরকে তান্নাইম (תנאים) ডাকা হতো, যার মানে ‘শিক্ষক’ (বহুবচন)। তারাই বাইতুল মুকাদ্দাস ধ্বংসের পর ইহুদী ধর্ম টিকিয়ে রাখার কাজ করে যান। র্যাবাই ইয়োহানানের নেতৃত্বে এবং পরবর্তী শতকে র্যাবাই দ্বিতীয় গামালিয়েলের নেতৃত্বে তারা সানহেদ্রিন কাউন্সিল পুনঃপ্রতিষ্ঠা করেন। তারা পাক কিতাবের লেখা বাছাই করে আজকের ওল্ড টেস্টামেন্ট তৈরি করেন, দৈনিক কী কী প্রার্থনা করতে হয় তা আয়োজন করেন, বাইতুল মুকাদ্দাসের অনুপস্থিতিতে বিভিন্ন দায়িত্ব স্থানীয় সিনাগগে সম্পাদন করার ব্যবস্থা করেন। যেমন, ঈদুল ফিসাখ বা পাসওভারের সময় যা যা করতে হয়, কিংবা ইহুদী নববর্ষের দিন শিঙ্গা বাজানো, ইত্যাদি। উল্লেখ্য, ইহুদী উপাসনালয়কে ‘সিনাগগ’ (συναγωγή) বলা হতো গ্রিকে, কিন্তু হিব্রুতে ডাকা হয় ‘বাইত কেনেসেত’ (בית כנסת) বা জামাতের ঘর, কিংবা ‘বেইত থফিলা’ (בית תפילה) বা প্রার্থনার ঘর।

র্যাবাইদের একজন প্রধান ছিলেন যাকে ‘নাসি’ ডাকা হতো, কিন্তু সমস্ত সিদ্ধান্ত সম্মিলিতভাবেই নেয়া হতো। এই কাউন্সিলের সদস্যদের সমাজের নানা স্তর থেকে বাছাই করা হতো। অসংখ্য ছাত্র তাদের কাছে ইহুদী ধর্ম শিক্ষা নিতে আসত।

প্রথম প্রজন্মের ইহুদী স্কলারদের মাঝে যাদের নাম মনে রাখার মতো, তারা হলেন— র্যাবাই এলিয়েৎসার বেন হিরক্যানোস, র্যাবাই এলাৎসার বেন আজারিয়া এবং র্যাবাই ইউশা বেন হানিনা। আর দ্বিতীয় প্রজন্মের স্কলারদের মাঝে ছিলেন র্যাবাই হানানিয়া বেন তারাদিয়োন, র্যাবাই তারফোন আর র্যাবাই ইশময়েল বেন এলিশা। এছাড়াও র্যাবাই আকিভা বেন জোসেফের কথা উল্লেখযোগ্য।

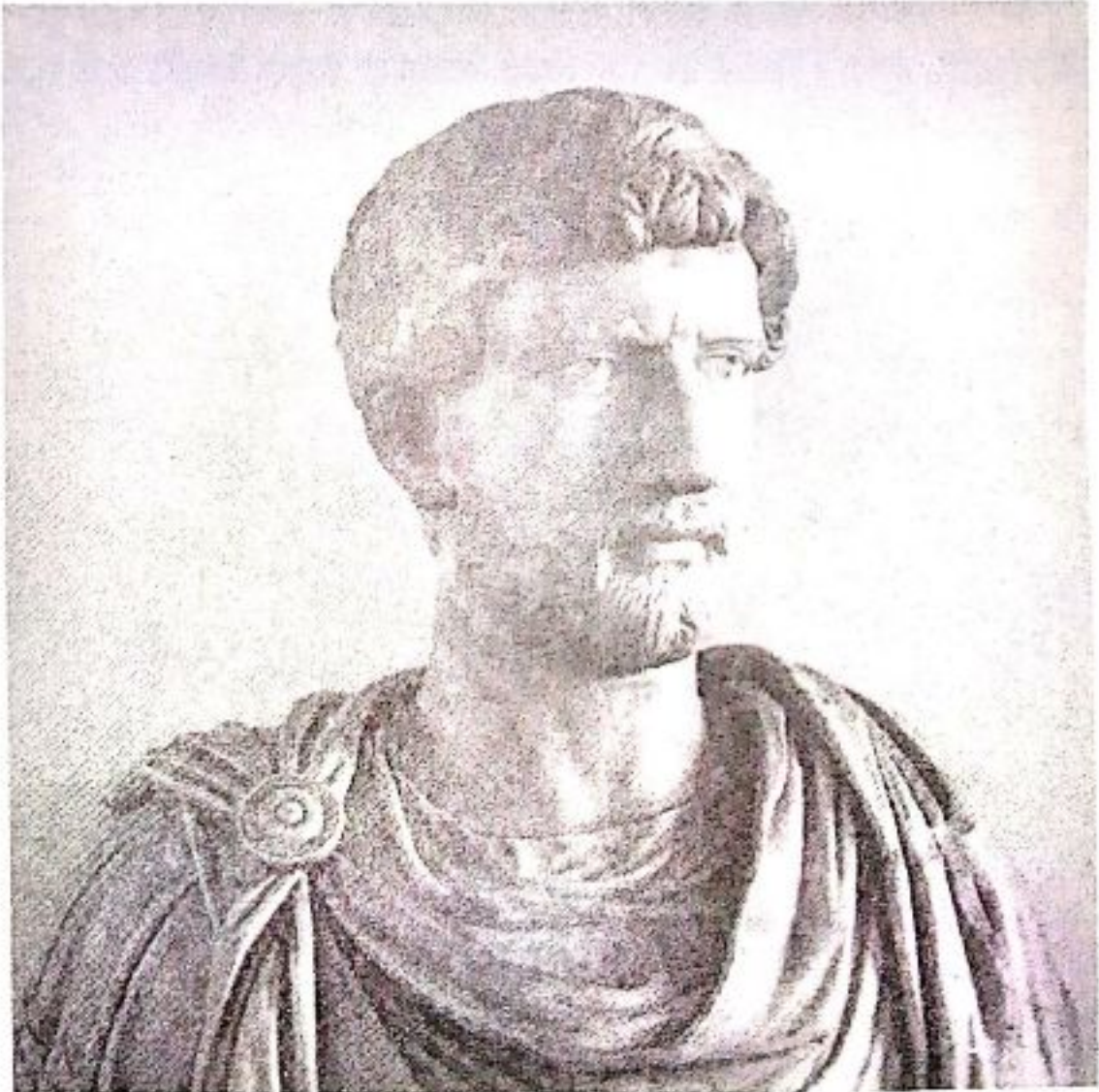
রোমানদের বিশাল জয়ের পরও ইহুদীরা তাদের বিদ্রোহ থামায়নি, মাঝে মাঝেই এখানে সেখানে বিদ্রোহ দেখা দিত। প্রথম শতকের পর দ্বিতীয় শতকেও এর দেখা মেলে।

রোমান সম্রাট ট্রাজান (৯৮-১১৭) পূর্ব দিকে অভিযান চালিয়ে পারস্যের তীর পর্যন্ত জয় করে নেন। তখন ব্যাবিলনের ইহুদীদের মাঝে আন্দোলন শুরু হয়। তাছাড়া, রোমান সাম্রাজ্যের নানা ইহুদী ডায়াসপোরাতেই দাঙ্গা সংঘটিত হতো। ১১৪ থেকে ১১৭ সালের মাঝে আলেকজান্দ্রিয়া, লিবিয়ার পূর্ব দিকের বারকু বা সাইরেনেইক্যা, মিসর আর সাইপ্রাসের ইহুদী কেন্দ্রগুলো ধ্বংস করে দেয়া হয়।



সম্রাট ট্রাজানের স্বর্ণমুদ্রা

তবে সম্রাট ট্রাজান মারা যাওয়ার পর তার উত্তরসূরি সম্রাট হ্যাড্রিয়ান (১১৭-১৩৮) পূর্ব দিকে রাজত্ব সম্প্রসারণের কাজ স্থগিত রাখেন। ফলে ব্যাবিলনের ইহুদী ডায়াসপোরা রোমান প্রভাবমুক্ত অবস্থায় শান্তিতে থাকে।



ভেনিসের জাদুঘরে সম্রাট হ্যাড্রিয়ানের মূর্তি

১০০ ইসরাইলের উত্থান-পতন

অনেকদিন পর সম্রাট হ্যাড্রিয়ান আবারও ইহুদীদের মাঝে গ্রিক হেলেনিজম চালু করতে চাইলেন, যার ফলশ্রুতিতে ১৩২ সালে একটি মেসিয়ানিক আন্দোলন শুরু করেন সিমিয়ন বার কহবা। ইবনা শহরের অন্যান্য ইহুদী নেতারাও এতে সমর্থন দিলেন। এ আন্দোলনের মূল চালিকাশক্তি ছিল এ বিশ্বাস যে আল্লাহ অবশ্যই আবার ইহুদীদেরকে পবিত্র ভূমির নিয়ন্ত্রণ ফিরিয়ে দেবেন, বাইতুল মুকাদ্দাস আবার নির্মিত হবে। কিন্তু যতই চেষ্টা করুক না কেন সেই বিদ্রোহীরা, রোমানরা তাদের দমন করে ফেলল। এ সংক্রান্ত প্রত্নতাত্ত্বিক নিদর্শন খুঁজে পাই আমরা, যেমন সিমিয়নের সরকার এ সম্পর্কে মুদ্রা বের করেছিল। তাছাড়া তিনি তার ডেপুটিদেরকে চিঠিও পাঠিয়েছিলেন, যা এখনও টিকে আছে। তৃতীয় শতকের ইতিহাসবিদ ডায়ো ক্যাসিয়াস লেখেন, এ বিদ্রোহে হাজারো ইহুদীকে হত্যা করে রোমানরা। এহুদিয়া প্রদেশ বিধ্বস্ত হয়ে যায়। ১৩৫ সালে জেরুজালেমের দক্ষিণ-পশ্চিমের বেথারের পতনের মধ্য দিয়ে এ আন্দোলনের পরিসমাপ্তি হয়। সেদিনের তারিখও ছিল হিব্রু আভ মাসের নয় তারিখ। সেই একই তারিখ, যেদিন প্রথম ও দ্বিতীয়বার বাইতুল মুকাদ্দাস ধ্বংস হয়। সিমিয়ন বার কহবা মারা যান এ আন্দোলনে।



ইসরাইলের টাইবেরিয়াসে র্যাবাই আকিভার সমাধি

এ যুদ্ধ বা আন্দোলনের পর ইহুদী ধর্মকে নিষিদ্ধ ঘোষণা করেন সম্রাট হ্যাড্রিয়ান পুরো রাজ্য জুড়েই। কিন্তু ১৩৮ সালে তার মৃত্যুর পর এ নিষেধাজ্ঞা

প্রত্যাহার করে নেয়া হয়। তবে এবার ইহুদীরা রোমান শাসনের প্রতি সহনশীলতা দেখাতে থাকে।

ইহুদীদের শিক্ষাকেন্দ্র ইবনা শহর থেকে সরিয়ে গালিলিতে নিয়ে যাওয়া হয়। র্যাবাই আকিভার নেতৃত্বে সানহেদ্রিন গঠিত হয় উশাতে। এক পর্যায়ে নাসি বা প্রধান হন র্যাবাই সিমিয়ন বেন গামালিয়েল। তার মতো বেশ কয়েকজন পণ্ডিতের অধীনে ইহুদী জীবনের অবিচ্ছেদ্য এক অংশ হিসেবে সানহেদ্রিন কাজ করে যেতে থাকে। বেশ সংগঠিত উপায়ে আইন কানুনের প্রয়োগ ও বিচার কার্য সম্পাদিত হতে থাকে।

তৃতীয় শতকে গালিলিতে ইহুদীদের অর্থনৈতিক অবস্থা বেশ ভালো হয়ে ওঠে। ইহুদীদের তখন রোমান শাসকদের সাথে সুসম্পর্ক চলছে। রোমান সম্রাট সেভেরাস যে সেভেরান রাজবংশ (১৯৩-২৩৫) প্রতিষ্ঠা করেন, তাদের আমলে নাসিদের হাতে ইহুদী কোর্টের জন্য বিচারক নিয়োগের ক্ষমতা দেয়া হয়।



সম্রাট সেভেরাসের পরিবার

এ সময়কার বিখ্যাত নাসি ছিলেন জুদাহ হা-নাসি। [পাঠকদের জন্য : হিব্রুতে শব্দের আগে 'হা' মানে ইংরেজি 'The'] তিনি ইহুদীদের মৌখিক 'হাদিস' বা বচনগুলোকে সম্পাদনা করেছিলেন, যার নাম মিশনাহ (משנה)। মিশনাহতে আছে ছয়টি অংশ। প্রতিটি অংশে আছে অনেকগুলো অধ্যায়, আর প্রতিটি অধ্যায় আলাদা আলাদা বিষয়ের ওপর রচিত। অংশগুলো হলো যথাক্রমে- বীজ, ভোজন, নারী, ক্ষয়ক্ষতি, পবিত্র জিনিস এবং বিগতকরণ।

মিশনাহ সংকলনের সময় সানহেদ্রিন গালিলির নানা শহরে মিলিত হয়, সর্বশেষ রোমান শহর টাইবেরিয়াসে তারা চূড়ান্ত কাজ করেন। নাসি সানহেদ্রিনের গুরু হলেও, অন্যান্য সদস্যরা বিভিন্ন শহরে এর শাখা খোলেন, যেন জীবনের নানা স্তরে মিশনাহর শিক্ষা সবাইকে দেয়া যায়।

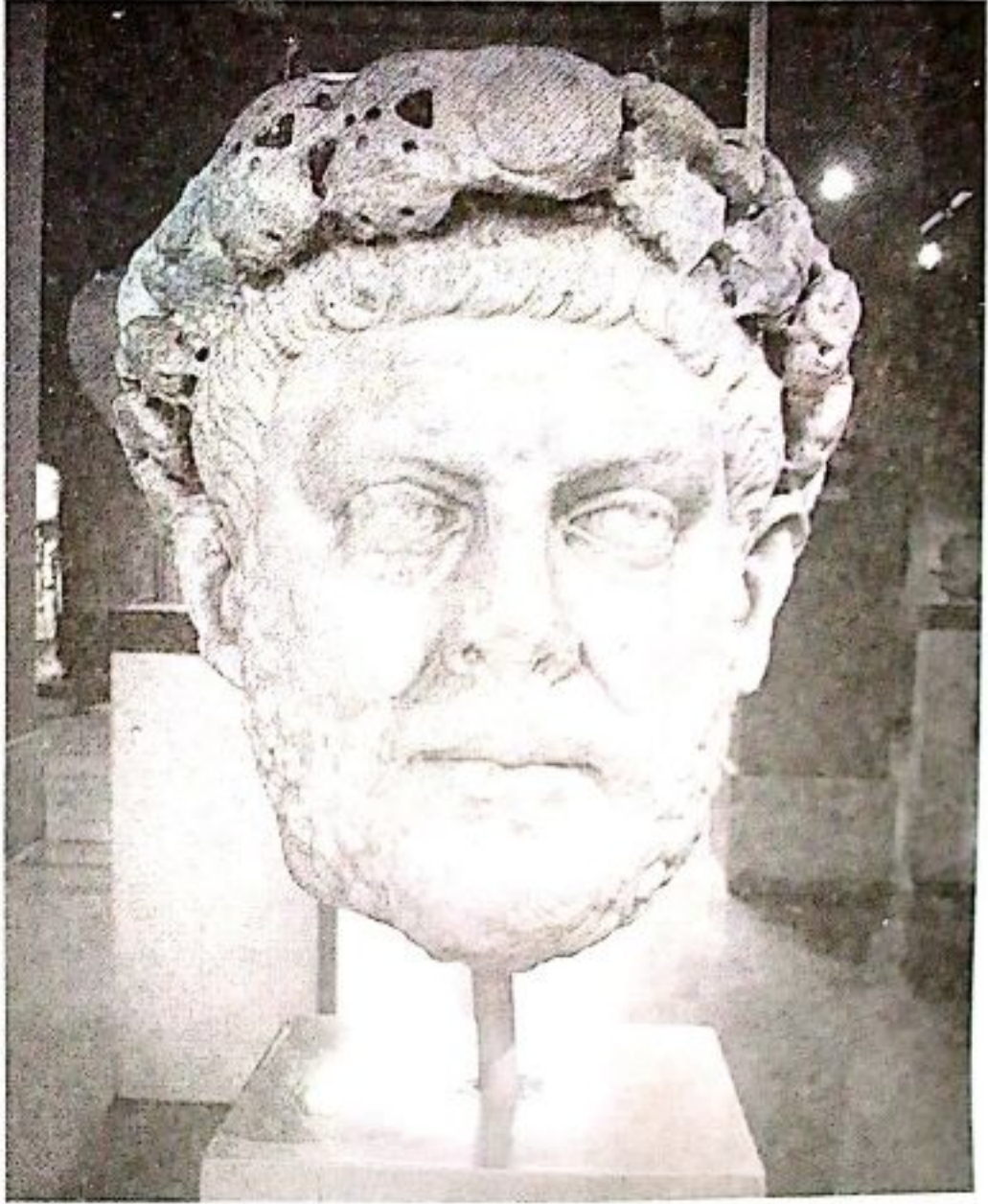


মিশনাহ

২৩০ এর দশকে রোমান সাম্রাজ্য নানা সমস্যায় পড়ে। যেমন মুদ্রাস্ফীতি, জনসংখ্যা হ্রাস, বাহিনীর প্রযুক্তিগত উন্নতির অভাব, ইত্যাদি। পরের কয়েক দশক ধরে রোমান জেনারেলরা ক্ষমতালিপ্সা থেকে কোন্দলে জড়িয়ে পড়লেন, রোমান সরকার কার্যত অকেজো হয়ে পড়লো। অবস্থা খারাপ ছিল ইহুদী সমাজেরও, তাদের মাঝে দুর্ভিক্ষ, মহামারি ও লুটতরাজের সমস্যা দেখা দেয়।

তৃতীয় শতকের শেষে এসে সম্রাট ডায়োক্লিশেন (২৮৪-৩০৫) কিছু সংস্কার প্রচলন করেন, যা রোমান সাম্রাজ্যকে একটু শক্তিশালী করে তোলে। তার

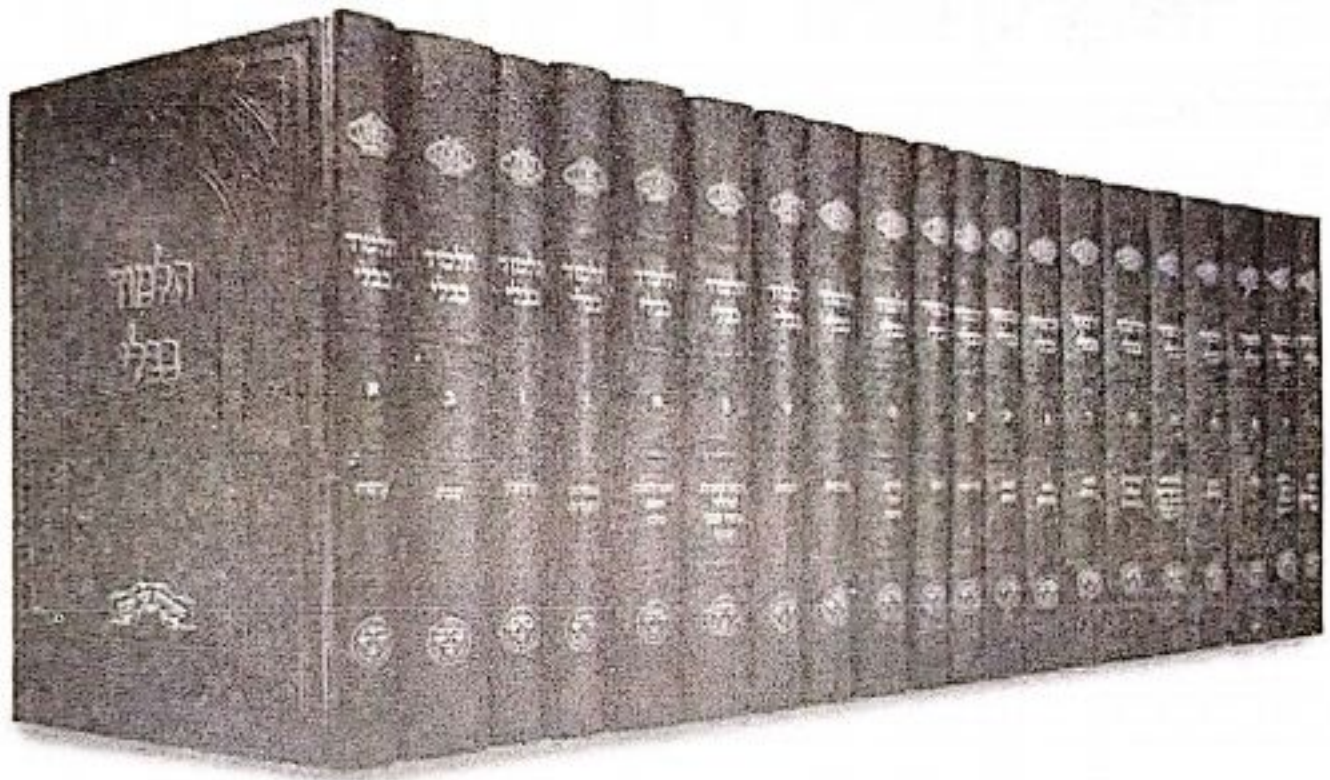
শাসনকালে প্রজাতন্ত্রপ্রথা অনেকটাই স্বৈরাচার দ্বারা প্রতিস্থাপিত হয়। অর্থনৈতিক অবনমন ঠেকাতে কড়া নিয়ম কানুন নিয়ে মাঠে নামেন তিনি। সেই সাথে সম্রাট ডায়োক্লিশেন নব্য বিস্তার লাভ করা খ্রিস্টধর্মের প্রভাব ঠেকাতে প্রাণপণ চেষ্টা করেন। রাজধর্মের জন্য চ্যালেঞ্জ হয়ে দাঁড়িয়েছিল এই নতুন ধর্ম।



সম্রাট ডায়োক্লিশেনের মাথার মূর্তি

তবে ডায়োক্লিশেন মারা যাবার পর তার উত্তরসূরি সম্রাট কনস্ট্যান্টাইন একই বৈরিতা দেখাননি, বরং তিনি আনুষ্ঠানিকভাবে ৩১৩ সালে খ্রিস্টধর্মকে রাজ্যে অনুমতি দেন। এ সময়ের মাঝে শহুরে জনসংখ্যার মধ্যেও বড় একটা অংশের কাছে জনপ্রিয় হয়ে দাঁড়ায় খ্রিস্টধর্ম। চার্চের কাজকর্মে নিজেকে জড়ালেন সম্রাট, আর মারা যাবার ঠিক আগে আগে তিনি নিজে খ্রিস্টধর্মে ব্যাপ্টাইজড হন। পুরো শতাব্দী জুড়ে খ্রিস্টধর্ম ব্যাপক হারে ছড়িয়ে পড়তে লাগলো। চতুর্থ শতকের শুরুর দিকে রোমান সাম্রাজ্যের রাজধর্মই হয়ে দাঁড়ায় খ্রিস্টধর্ম। অবশ্য, এতে ইহুদীদের অধিকারে বাধা পড়েনি কোনো, কিন্তু বিভিন্ন কারণে ইহুদীদের প্রতি বিদ্বেষ সৃষ্টি হয়।

চতুর্থ শতকের গোড়ার দিকে ইসরাইলের ইহুদী স্কলারগণ টাইবেরিয়াস, সিজারিয়া ও সেফোরিস ঘুরে র্যাবাইদের শিক্ষাগুলো সংগ্রহ করেন। মিশনাহর এই বর্ধিত অংশ পরিচিত হয় ‘ফিলিস্তিনি তালমুদ’ নামে। চার অংশ বিশিষ্ট এই বহুখণ্ডের লেখার নানা জায়গা এখন আর খুঁজে পাওয়া যায় না। তাই আমরা জানতে পারি না কতটা নিখুঁত ছিল এর সম্পাদনা। যাই হোক, ব্যাবিলনীয় তালমুদের মতো গুরুত্ব অর্জন করেনি ফিলিস্তিনি তালমুদ। পাঠকদের সুবিধার্থে বলি, তালমুদ (תלמוד) হলো ইহুদীদের আইনগ্রন্থ এবং ধর্মতত্ত্বের উৎস।



ব্যাবিলনীয় তালমুদ

খ্রিস্টধর্ম এতটা উঁচু ক্ষমতায় পৌঁছে যায় এ সময়টাতে যে রোমান সাম্রাজ্যের অধীনে ইহুদী ধর্ম ততটা গুরুত্বই পেত না আর, বিশেষ করে আইনি জটিলতায়। রাজকীয় আইন করে ইহুদী ধর্ম গ্রহণ নিষিদ্ধ করে দেয়া হয়। ইহুদী ও খ্রিস্টানদের মধ্যে বিবাহও নিষিদ্ধ হয় তখন থেকে। পঞ্চম শতকের গোড়া থেকে সরকারি কোনো পদেই ইহুদীরা চাকরি পেত না, আইন করে তা বারণ করে দেয়া হলো। বাকি শতক ধরেও একই আইন চলে আসলো। বিশেষ করে সম্রাট জাস্টিনিয়ান (৫২৫-৫৬৫) এসে এ আইনের ওপর বেশি জোর দিলেন। কারণ হিসেবে দেখানো হলো, তারা চান ইহুদীরা যেন প্রকৃত সত্য অর্থাৎ খ্রিস্টধর্মের আলো খুঁজে পায়। ইহুদীদের নির্মূল করা হয়নি, কারণ খ্রিস্টানরা মনে করত ইহুদীদের অস্তিত্ব আসমানি কিতাবের সত্যতার প্রমাণ। চার্চ শিক্ষা দিত, একদিন না একদিন ইহুদীরা অবশ্যই খ্রিস্টকে মেসায়্যা হিসেবে মেনে নেবে।



সম্রাট জাস্টিনিয়ান প্রথম দিককার সম্রাটদের একজন, মুদ্রায় যাদের হাতে ক্রুশ দেখতে পাওয়া যায়
রোমান সাম্রাজ্যে এভাবেই দিন কাটাতে লাগলো ইহুদীরা।

অধ্যায় ১১

ব্যবিলনের ইহুদী সমাজ



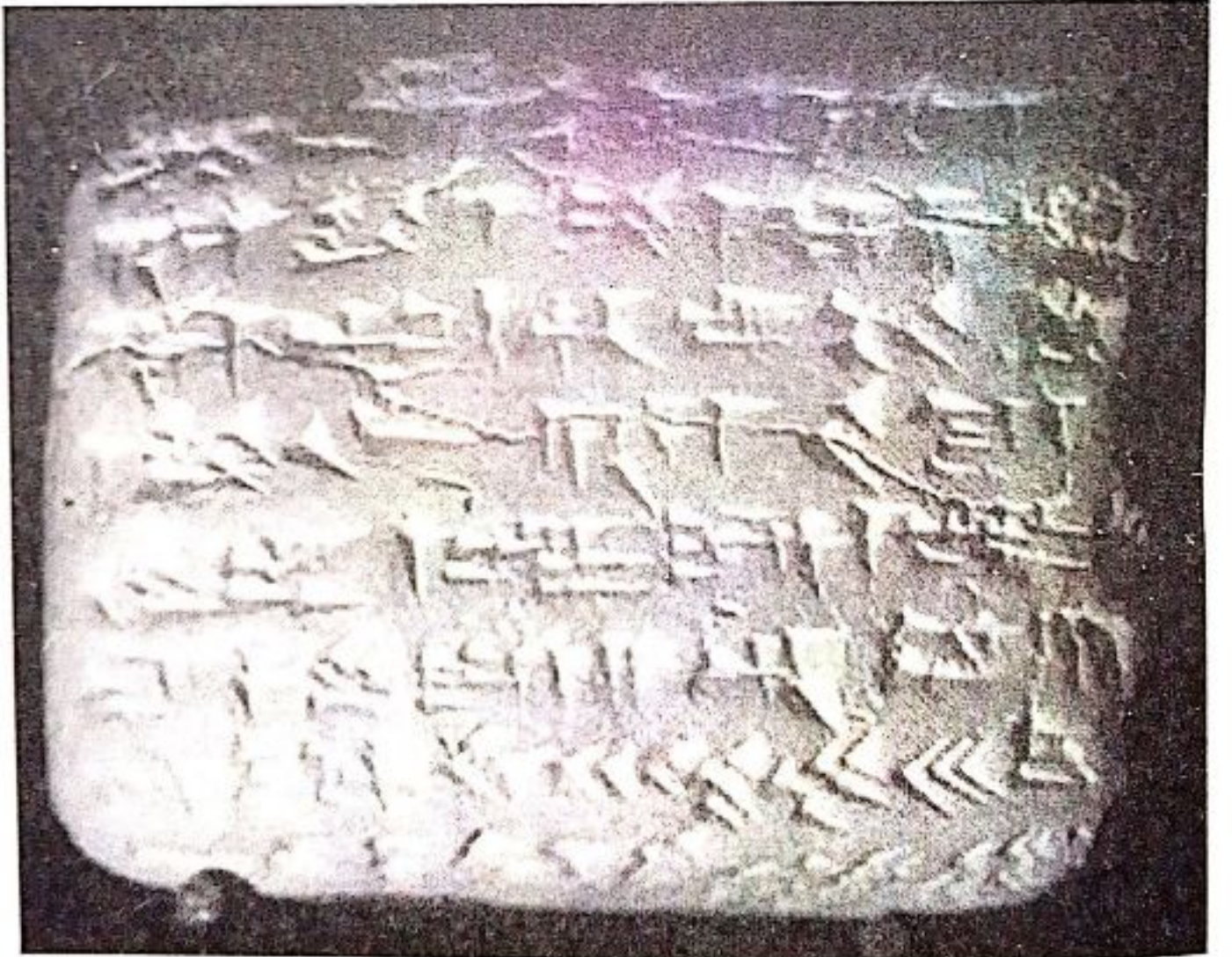
খ্রিস্টের জন্মের পাঁচশ বছরেরও বেশি আগে, সম্রাট দ্বিতীয় নেবুকাদনেজার বা বখতেনাসার (৭৫৪-৫৬১) ছিলেন নব্য ব্যবিলনীয় সাম্রাজ্যের সবচেয়ে শক্তিশালী রাজা। তিনি ইহুদীদেরকে তাদের পবিত্র ভূমি থেকে তাড়িয়ে দেন, তাদের নতুন স্থান হয় ব্যবিলন। সে অনেক আগের কথা। তবে ব্যবিলনে ইহুদীরা নতুন করে তাদের ইহুদী সমাজ কেন্দ্রীভূত করতে শুরু করল। কয়েকশ বছরে সেই সমাজ ভালোই শেকড় গেড়ে বসে মেসোপটেমিয়ার রাজধানী ব্যবিলনে।



সম্রাট দ্বিতীয় নেবুকাদনেজারের রাজকীয় খোদাই

ইসরাইলের উত্থান-পতন ১০৭

খ্রিস্টীয় দ্বিতীয় শতকে এসে মেসোপটেমিয়ার অধিপতি পারস্যরাজ ইহুদীদেরকে সুনজরেই দেখতেন। তিনি তাদের মধ্য থেকে একজন এক্সিলার্ক (Exilarch) বা নির্বাসিত ইহুদীদের নেতা বাছাই করে নেয়ার অনুমতি দেন। মঙ্গোলদের বাগদাদ ধ্বংস করা পর্যন্ত এই এক্সিলার্ক প্রথা চালু ছিল। আরামায়িক বা হিব্রুতে 'রেশ গালুতা' (רֶשׁ גָּלוּתָא) বলা হয়, আর আরবিতে রাস আল-গালুত/জালুত (رأس الجالوت), যার মানে নির্বাসিতদের নেতা। ইহুদীদের ওল্ড টেস্টামেন্টে 'গালুত' বলে ডাকা হতো নির্বাসিতদেরকে। (জেরেমায়া/ইয়ারমিয়া কিতাব ২৯:২২, ২৮:৬, ২৯:১) ইহুদীদের মতে, এমনই একজন এক্সিলার্কের সন্তান ছিলেন শালুম বেন হুশিয়েল, যিনি পারস্য থেকে সত্যধর্মের খোঁজে আরবে উপস্থিত হন, এবং মুহাম্মাদ (সা)-এর কাছে ইসলাম গ্রহণ করেন। ইহুদী বিশ্বাসে তিনি ব্যাবিলনের ৩৭তম এক্সিলার্ক। ইসলাম ধর্মে তিনি সালমান ফার্সি (রা) বা 'পারস্যের সালমান' (سَلْمَانَ الْفَارِسِيِّ) নামে পরিচিত। তবে মতান্তরে তার পূর্বনাম ছিল রুজবেহ (روزبه) খোশনুদান।



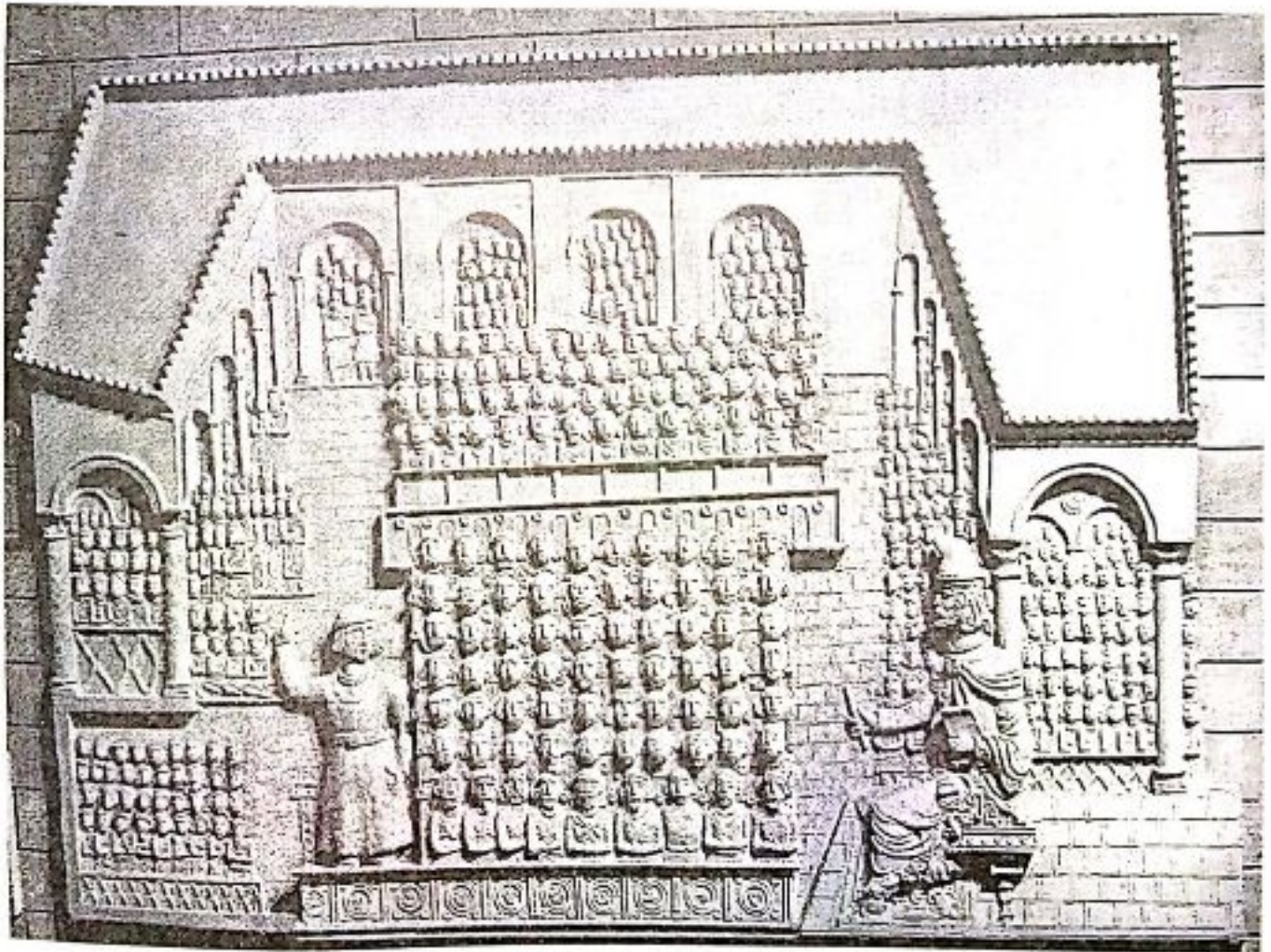
প্রাচীন ফলকে ইহুদীদের জীবনপ্রথা সম্পর্কে জানা যায়

এক্সিলার্ক হবার শর্ত হলো, তার পূর্বপুরুষের কাউকে অবশ্যই কখনো না কখনো জুদাহ রাজ্যের রাজা থাকতে হবে। এক্সিলার্ক ইহুদীদের থেকে কর সংগ্রহ

করতেন সাম্রাজ্যকে দেয়ার জন্য, বিচারক নিয়োগ দিতেন, বিচারকার্য দেখভাল করতেন, পারস্যরাজের দরবারে ইহুদীদের প্রতিনিধি হিসেবে কথা বলতেন। এ শতকের মাঝামাঝিতে এসে ব্যবিলনের ইহুদী শাস্ত্র ছড়িয়ে পড়ে পূর্বদিকের ফিলিস্তিনেও। বার-কহবার যে বিদ্রোহের কথা বলা হচ্ছিল আগে, সে বিদ্রোহের সময় অনেক ইহুদী স্কলাররাই ফিলিস্তিন ছেড়ে ব্যবিলনের বাসিন্দা হয়ে যান এ শাস্ত্রের টানে। আর তাছাড়া রোমান সম্রাট হ্যাড্রিয়ানের হাত থেকে বাঁচার বিষয়টা তো আছেই।

অবশ্য ব্যবিলন থেকেও অনেক স্কলার ফিলিস্তিনি ইহুদী সমাজে গিয়ে জ্ঞান শিক্ষা দিতেন। মিশনাইর যথাযথ সংকলন হয়ে যাওয়ার পর এমন মনীষী বিনিময় বেড়ে যায়। তাদেরকে মিশনাইক মনীষী বলা হয়। আর এর পরের যুগের ইহুদী মনীষীরা ব্যস্ত হয়ে পড়েন ইহুদী আইনপ্রয়োগ সংক্রান্ত নানারকম পাণ্ডিত্যপূর্ণ বিতর্কে। সেটি ব্যবিলন ও ফিলিস্তিন, দুজায়গার ইহুদীদের ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য।

আগে উল্লেখ করা জুদাহ হা-নাসির এক ছাত্র র্যাবাই রাভ তৃতীয় শতকে মধ্য-মেসোপটেমিয়াতে একটি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান খোলেন। একই সময়ে আরেক র্যাবাই নেহার্দিয়াতে আরেকটি ব্যবিলনীয় শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান খোলেন, যেটি ২৫৯ সালে নেহার্দিয়া শহরের সাথে সাথে ধ্বংস হয়ে যায়।



ব্যবিলনের সুরা অ্যাকাডেমিতে পড়াচ্ছেন একজন র্যাবাই

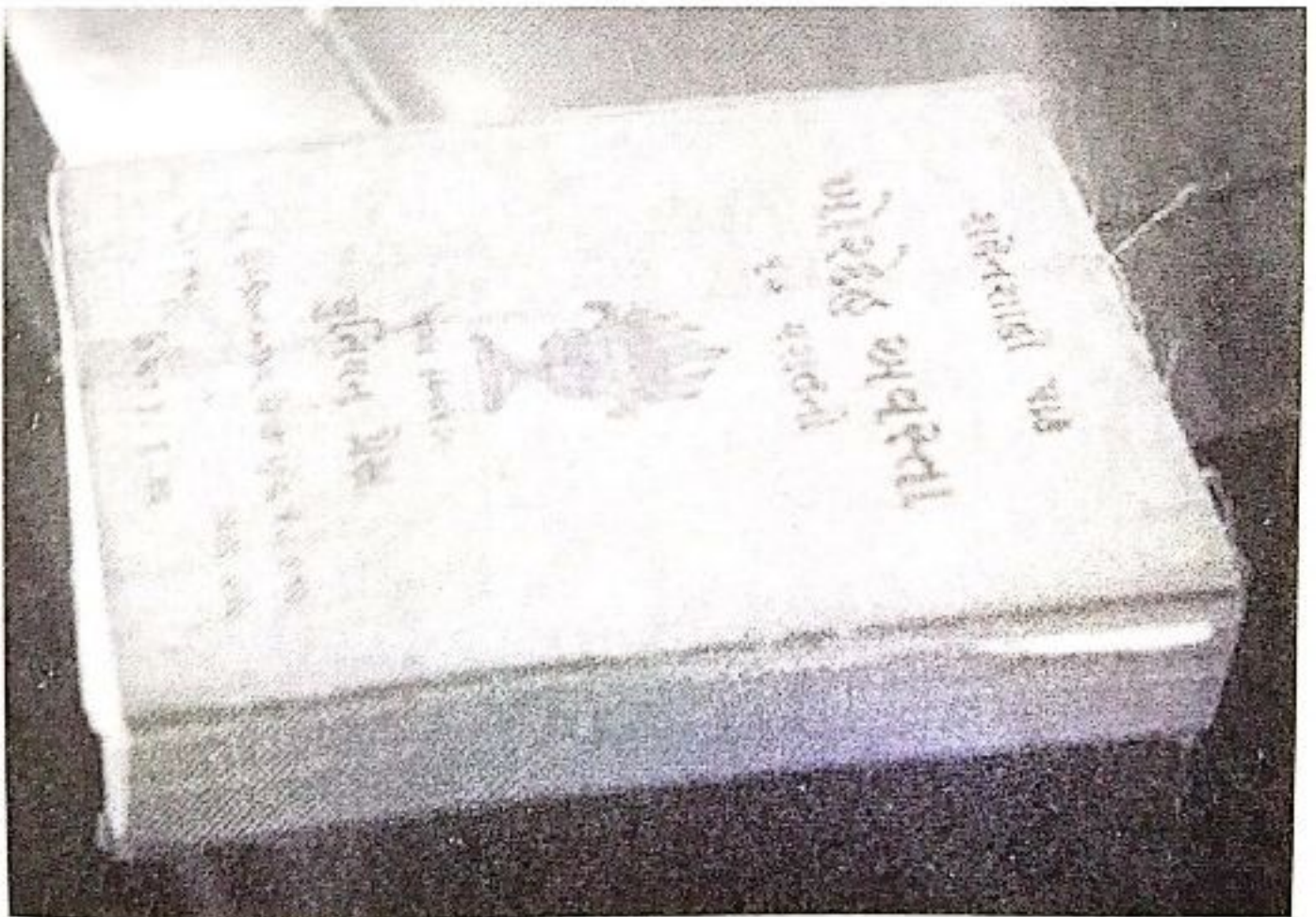
পারস্যের পার্থিয়ান সাম্রাজ্য আরেকটি নামেও পরিচিত ছিল— আর্সাসিদ সাম্রাজ্য (খ্রিস্টপূর্ব ২৪৭-খ্রিস্টাব্দ ২২৪)। পারস্যের দুর্বীর যোদ্ধা ও অগ্নিপূজা ধর্মের একজন পুরোহিত সাসানের নামে প্রতিষ্ঠিত সাসানীয় সাম্রাজ্য আগের পার্থিয়ান সাম্রাজ্যের ইতি টানে। একে ইরানি সাম্রাজ্য নামেও ডাকা হতো, যাদের রাজাদেরকে ‘শাহেনশাহ’ বলা হতো। ইতিহাসের পাতায় এ সাম্রাজ্য নব্যপারসিক সাম্রাজ্য নামেও পরিচিত। তারা অনুসরণ করতেন পারসিকদের নিজস্ব নবী জরথুষ্ট্র’র শিক্ষা।

জরথুষ্ট্র যে কবে জীবিত ছিলেন, সেটা ইতিহাস নিশ্চিত করে বলতে পারে না। কেউ বলেন খ্রিস্টপূর্ব দ্বিতীয় শতক, কেউ বা বলেন খ্রিস্টপূর্ব ষষ্ঠ কি সপ্তম শতক! তার জন্ম কোথায়, তাও জানা নেই। তবে তিনি বাস করতেন ইরানের পূর্বাঞ্চলে। প্রাচীন ইরানি শব্দ ‘জরথুষ্ট্র’ অর্থ করা যায় ‘উটের রাখাল’। মারা যাবার সময় তার বয়স ছিল ৭৭ বছর ৪০ দিন। তার প্রচারিত বিশ্বাসের মাঝে ছিল মৃত্যুর পর বিচার, পুনরুত্থান, দোজখ, বেহেশত, ইত্যাদি। ইসলামি ব্যাখ্যায় জরথুষ্ট্রর অনুসারীদেরকে অনেকক্ষেত্রেই বলা হয়ে থাকে মাজুস (مجوس), ফার্সিতেও কাছাকাছি— ‘মাগুস’ (مگوش), ইংরেজিতে ম্যাজিয়ান। ‘অগ্নিউপাসক’ হিসেবেও অনুবাদ করা হয় এ শব্দকে। কুরআনে মাজুসদের ব্যাপারে বলা হয়েছে, তারা ইহুদী খ্রিস্টানদের মতোই একসময় একেশ্বরবাদী ছিল, শেষ বিচারের দিনে তারা আল্লাহর বিচারের সম্মুখীন হবে। (কুরআন ২২:১৭)

প্রাচীন ইরানি ভাষাকে আবেস্তা বলা হয়। আবেস্তা ভাষায় লেখা ‘জেন্দ আবেস্তা’ হলো জরাথুষ্ট্রবাদের পবিত্র ধর্মগ্রন্থ, যাতে অসৃষ্ট এক মহাপ্রভু আহুরা মাজদার উপাসনা করা হয়। আবেস্তা ভাষায় ‘আহুরা’ মানে উপাস্য, ‘মাজদা’ মানে জ্ঞান। এ ধর্মে প্রধান দুটো পবিত্র উপাদান হলো ‘পানি’ আর ‘আগুন’। এগুলো তাদের কাছে সর্বোত্তম বিশোধক। তাদের অগ্নিমন্দিরে তাই পানি আর আগুন রাখা হতো। অন্য ধর্মগুলো তাদের বিশ্বাসকে অগ্নিউপাসনা বলে ভুল ভাবে, কিন্তু প্রকৃতপক্ষে তাদের প্রাচীন রীতিগুলো সম্পর্কে পড়লে জানা যায়, আগুন তাদের দৈনিক পাঁচবার প্রার্থনার সময় জ্বালিয়ে রাখতে হতো, কিংবা যেকোনো উপাসনার সময়। আগুনকে তারা একটি আত্মিক অন্তর্দৃষ্টি আর জ্ঞান পরিবহনের মাধ্যম হিসেবে বিবেচনা করত। আগুনকে তারা আহুরা মাজদার ঐশ্বরিক উপস্থিতির বহিঃপ্রকাশ হিসেবেও ধরে নিত, কখনও তাই তাদের পবিত্র মন্দিরের আগুনকে নিভতে দিত না।



ইরানের এক জরথুষ্ট্র জাদুঘর



জেন্দ আবেস্টা

সাসানীয় সাম্রাজ্য ক্ষমতা দখলের পর জরথুষ্ট্র ধর্মের একটি সংস্কারকৃত রূপকে রাজ্যের সরকারি ধর্ম হিসেবে প্রচলিত করে। প্রথম সাসানীয় শাহেনশাহ আরদাশির (২২৬-২৪০) নব্য জরথুষ্ট্র ধর্মের পুরোহিতদের চাপ দিলেন ইহুদী ও অন্য ধর্মের অনুসারীদের জরথুষ্ট্র ধর্মে নিয়ে আসতে। তবে তার মৃত্যুর পর শাহেনশাহ শাপুর (২৪১-২৭০) আর চাপ দেননি, বরং তিনি অন্যান্য ধর্মকেও শান্তিমতো রাজ্যে বিস্তার হতে দিয়েছিলেন, এমনকি তিনি আবার ইহুদীদের এম্বিলার্ক প্রথার অনুমতি দেন।



শাহেনশাহ আরদাশির ও শাপুরের মুদ্রা

অবশ্য ইহুদী নেতারা পারস্য সাম্রাজ্যের সকল আইন মানতে বাধ্য ছিলেন। আর কিছু করতে না পেরে ইহুদী নেতা শামুয়েল তার বিখ্যাত নিয়ম বর্ণনা করেছিলেন- “দিনা দে-মালখুত দিনা” অর্থাৎ “সরকারের আইনই হলো ধর্মের আইন”। তবে ফিলিস্তিনের ইহুদী সম্প্রদায়ে কখনই এই নীতি মানা হয়নি, অর্থাৎ রোমান আইনকে ধর্মের আইন হিসেবে মানেনি ইহুদীরা। তবে ফিলিস্তিনের বাইরে থাকা অন্যান্য ডায়াসপোরার ইহুদীরা শামুয়েলের এ নীতিই মেনে নেয়, অর্থাৎ রাজ্যের আইনকেই তারা ধর্মজ্ঞান করে চলতে থাকে।

ব্যবিলনের ইহুদীদের মধ্যে নানা ফেরকা বা উপদলের সৃষ্টি হয়েছিল। তবে তাদের সকলের মূল ধর্মবিশ্বাস ছিল একই। বহুকাল পর্যন্ত ব্যবিলনীয় ইহুদীদের শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান ছিল বেশ বিখ্যাত। আর ফিলিস্তিন অঞ্চলের ইহুদীদের করুণ অবস্থার সময় ব্যবিলনের ইহুদীরাই ধর্মটাকে টেনে নিয়ে গিয়েছিল। তবে আর যাই হোক, জরথুষ্ট্র ধর্মের অনুসারীদের সাথে আর কোনো বড় সমস্যার উল্লেখ আমরা পাই না, যা সমস্যা কেবল রাজাবাদশাহদের সাথেই। উল্লেখ্য, জরথুষ্ট্র ধর্মের অনুসারীদের অগ্নিমন্দির এখনও দেখতে পাওয়া যায়; কারণ আজও জরথুষ্ট্র ধর্ম

টিকে আছে, তাই অগ্নিমন্দিরগুলোও আছে। এ মুহূর্তে পৃথিবীতে ১৭৭টি অগ্নিমন্দির আছে। এর মধ্যে কেবল ২৭টি ভারতের বাহিরে, বাকিগুলো ভারতেই, খোদ মুম্বাইতেই ৪৫টি। ভারতে এমন নিয়ম ছিল আগে যে একজন জরথুষ্ট্র নারী অগ্নিমন্দিরে ঢুকতে পারবেন না যদি তিনি জরথুষ্ট্রর বাইরে কাউকে বিয়ে করেন, তবে সুপ্রিম কোর্টে এ আইনের ব্যাপারে চ্যালেঞ্জ করা হয়।



ইরানের একটি অগ্নিমন্দিরের সারাক্ষণ জ্বালিয়ে রাখা আগুন

একটা সময়ে রোমান সাম্রাজ্যের সরকারি ধর্ম হয়ে দাঁড়ালো খ্রিস্টধর্ম। তখন কিন্তু ঠিকই খ্রিস্টধর্মের অনুসারীদের অত্যাচার করা হতো পারস্যের সাসানীয় সাম্রাজ্যে, ইহুদীদেরকে কখনই নয়। কারণ, পারস্য সাম্রাজ্য তাদের শত্রু হিসেবে বিবেচনা করত খ্রিস্টান রোমান সাম্রাজ্যকে। চতুর্থ ও পঞ্চম শতকে যেখানে সেখানে খ্রিস্টান পাদ্রী ও সাধারণ অনুসারীদের হত্যা করা হতে লাগলো রাজ্য জুড়ে। তবে খুব ক্ষুদ্র একটা সময়ের জন্য (৪৪৫-৪৭৫) ইহুদীদের ওপরও ক্ষেপে যায় পারস্য সরকার। তখন এক্সিলার্ক ব্যবস্থা বাতিল করা হয়, সিনাগগ আর সেই শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানগুলো বন্ধ করে দেয়া হয়, নিষিদ্ধ করা হয় তাওরাত। তবে ষষ্ঠ শতকে আবার পরিস্থিতি ইহুদীদের জন্য ভালোর দিকে যায়।

পারস্য সাম্রাজ্যের ব্যাবিলনে এভাবেই দিনাতিপাত করতে লাগলো ইহুদীরা; আর এরপরই আবির্ভাব ঘটে ইসলামের।

অধ্যায় ১২

ইসলামি সাম্রাজ্যে ইহুদী ধর্ম



ঐতিহাসিক তাবারির বক্তব্য অনুযায়ী, আরবের হেজাজের ইহুদীরা হিব্রুতে কথা বলতো না, বলতো পারস্যের তৎকালীন ভাষায়। এ থেকে বোঝা যায়, সেই গোত্রগুলো এসেছিল ব্যাবিলনীয় ইহুদী সমাজ থেকে। আবার কোনো কোনো ইহুদী গোত্র মূল বনী ইসরাইলি ছিল না, তারা ছিল ধর্মান্তরিত।



হিমইয়ার রাজত্বের মুদ্রা

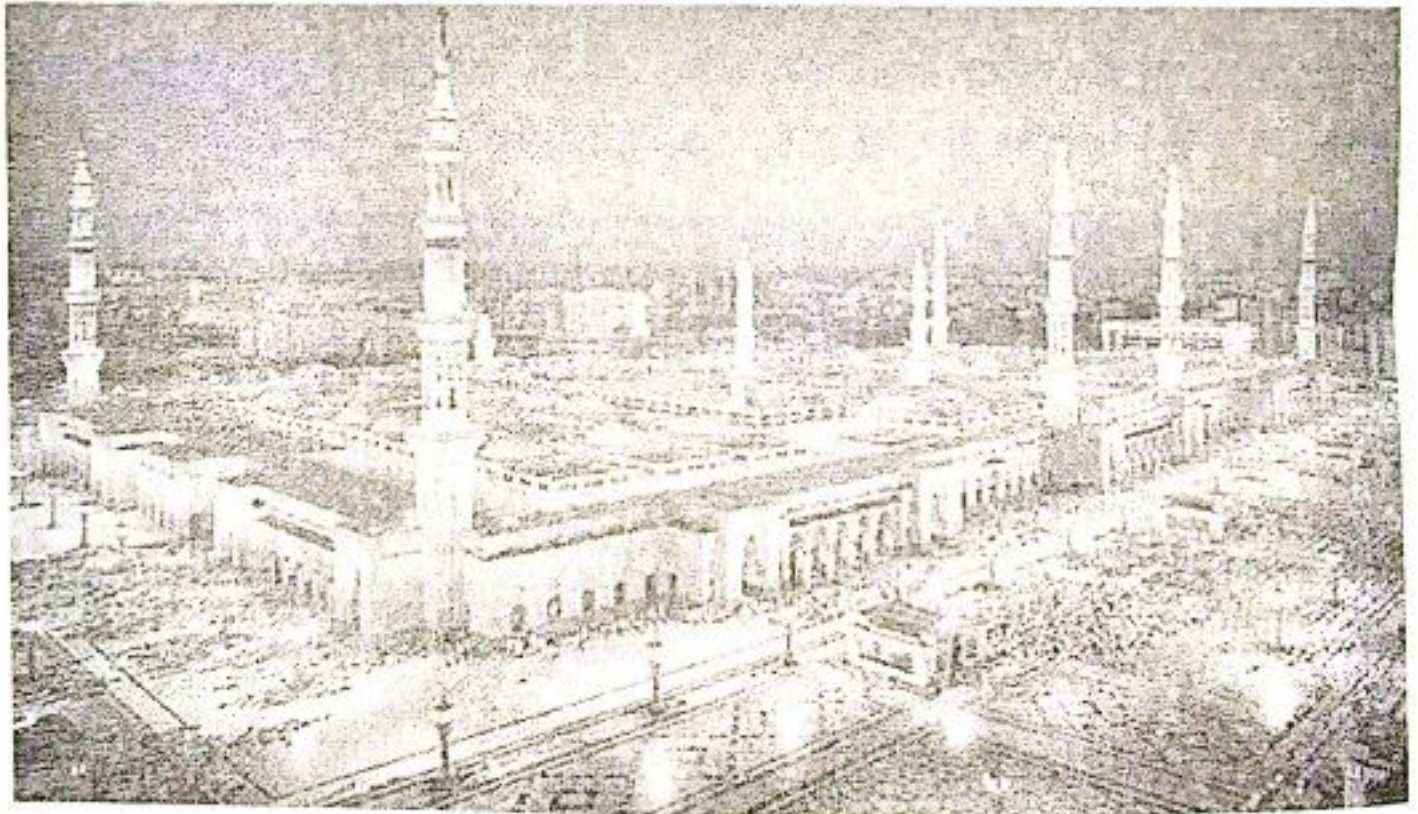
৩৯০ সালের দিকে ইয়েমেনের হিমইয়ার (حمير, Ḥimyar) সাম্রাজ্যের রাজা ছিলেন আবু কারিবা আসাদ কিংবা আবু কারাব (৩৯০-৪২০)। খ্রিস্টান

ইসরাইলের উত্থান-পতন ১১৫

বাইজান্টিন সাম্রাজ্যের সাথে শত্রুতা ছিল হিমইয়ারদের। উভয়ের উদ্দেশ্য ছিল আরবের দখল নিয়ে মসলা ব্যবসায় লাভ পাওয়া। তাছাড়া আরব দখল করলে ভারতে ব্যবসার রুট সুগম হয়। আবু কারিবা ‘তুব্বা’ উপাধিতেও পরিচিত ছিলেন। তুব্বা অর্থ ‘সূর্যকে যে ছায়ার মতো অনুসরণ করে’। নামটা থেকে সূর্যপূজারীর ইঙ্গিত পাওয়া যায়। তাই ধারণা করা হয়, তিনি পৌত্তলিক ছিলেন, যেমনটা ছিল তার হিমইয়ার অঞ্চলের অধিবাসীরা।

তিনি উত্তর আরবে আক্রমণ করলেন আরবকে বাইজান্টিন প্রভাব থেকে মুক্ত করার উদ্দেশ্যে। খ্রিস্টান বাইজান্টিনরা চাইতো পুরো পৌত্তলিক আরবকে খ্রিস্টান বানিয়ে ফেলতে। ইতোমধ্যে আবিসিনিয়াতে খ্রিস্টান ধর্ম তারা প্রতিষ্ঠা করে ফেলেছে। আবিসিনিয়া ছিল ইয়েমেনেরও পরে, মিসরের দক্ষিণে, এখন এর নাম ইথিওপিয়া। বাইজান্টিনরা হিমিয়ারের উত্তরাঞ্চলকেও চেষ্টা করতে লাগল পৌত্তলিক থেকে খ্রিস্টান করার।

সে সময়ে হিমইয়ারের রাজা কারিবা আসাদ সিদ্ধান্ত নিলেন শত্রু বাইজান্টিনদের এ কাজ করতে দেবেন না। কারিবার সেনাবাহিনী উত্তর আরবের ইয়াসরিব তথা মদিনায় পৌঁছাল।



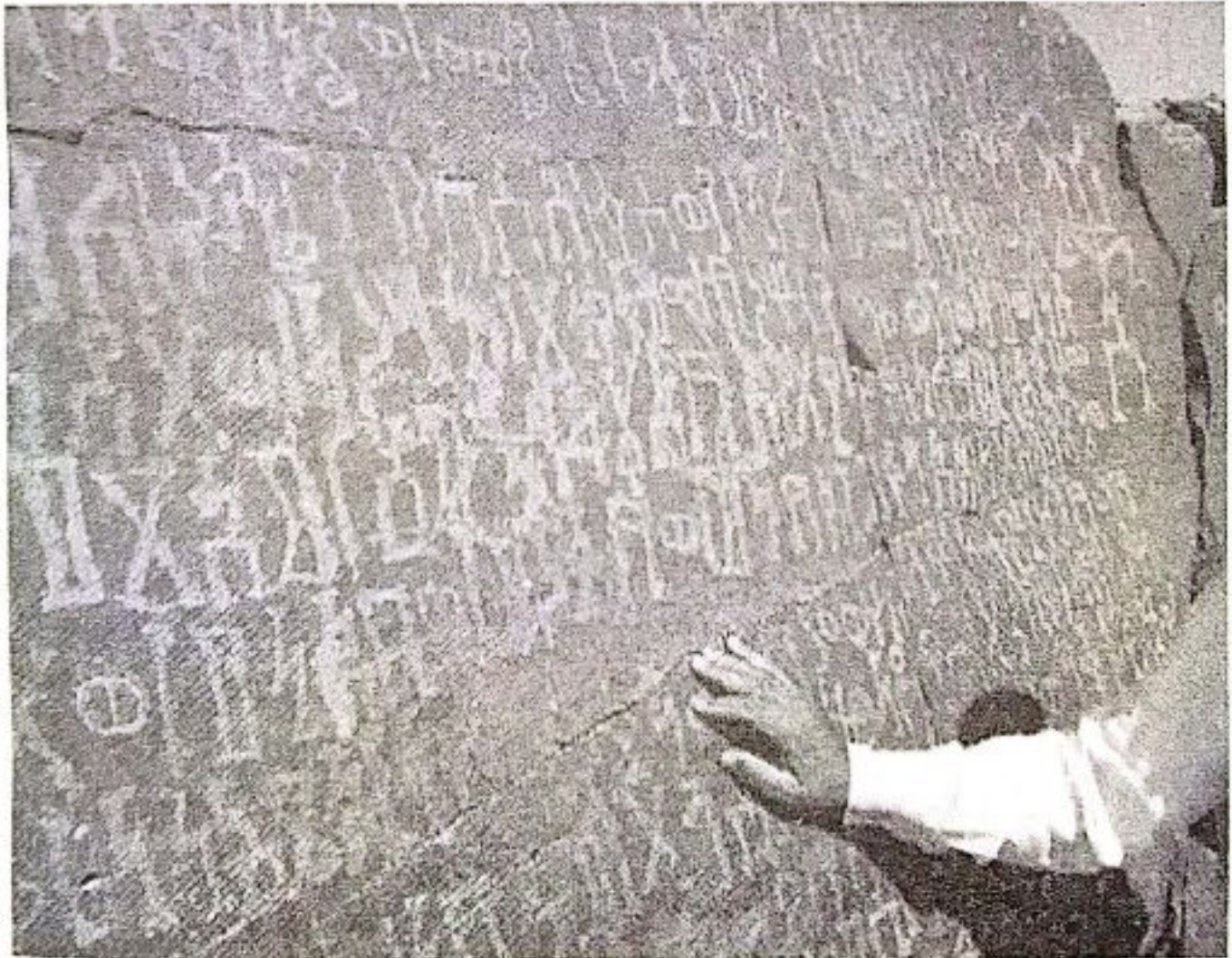
আজকের ইয়াসরিব তথা মদিনা

এখানে তিনি তেমন কোনো প্রতিরোধ পেলেন না। তাই তিনি কোনো বিশ্বাসঘাতকতার আশঙ্কা না করে নিজের ছেলেকে ইয়াসরিবের গভর্নর বানিয়ে দিয়ে চলে গেলেন। কিন্তু বেশিদূর যেতে পারলেন না। তার কাছে খবর পৌঁছাল, ইয়াসরিবের অধিবাসীরা তার ছেলেকে খুন করে ফেলেছে।

ছেলে হারাবার প্রবল শোক নিয়ে তিনি ফিরে গেলেন ইয়াসরিবে। তার মনে তখন জিঘাংসার আগুন জ্বলছে, রক্তে ভাসিয়ে দেবেন ইয়াসরিবকে।

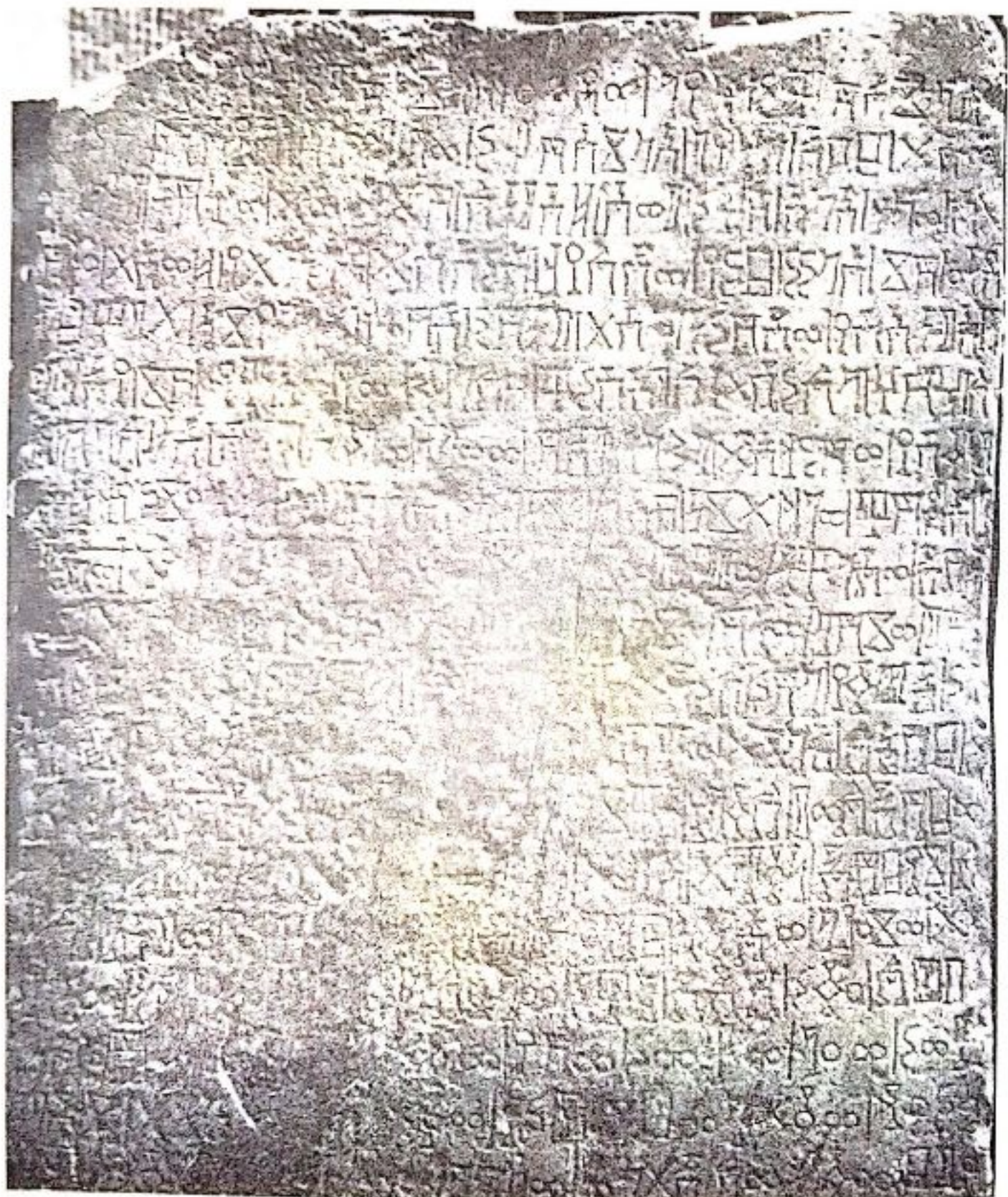
ইয়াসরিবের সব খেজুর গাছ কেটে ফেললেন তিনি। এ গাছগুলোই ছিল ইয়াসরিববাসীদের আয়ের প্রধান উৎস। নগরী অবরোধ করা হলো। নিজ নগরী রক্ষার জন্য ইয়াসরিবের পৌত্তলিকদের সাথে স্থানীয় ইহুদী বাসিন্দারা যুদ্ধ করলো কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে। এ যুদ্ধের মাঝেই কারিবা হঠাৎ অসুস্থ হয়ে পড়লেন।

তখন ইয়াসরিবের দুই ইহুদী বিজ্ঞ লোক এ খবর শুনে রাজা কারিবাকে দেখতে গেলেন। তারা ছিলেন কা'আব আর আসাদ। তারা কারিবাকে ওষুধ দিলেন। কারিবা সুস্থ হয়ে উঠলেন এর ফলে। তখন তারা দুজন অনুনয় করলেন, তিনি যেন ইয়াসরিব আক্রমণ না করে ফিরে যান। কারিবা মুগ্ধ হয়ে গেলেন। তিনি আক্রমণ তো বন্ধ করলেনই, নিজে ইহুদী ধর্ম গ্রহণ করে ফেললেন। তার কথায় পুরো সেনাবাহিনীও নিজেদের পৌত্তলিক ধর্ম বাদ দিয়ে ইহুদী ধর্ম গ্রহণ করলো। অবশ্য, ইহুদী ধর্ম ঠিক ধর্মান্তরিত হয়ে গ্রহণ করার মতো নয়, বরং পৈত্রিক সূত্রে প্রাপ্ত হতে হয়। তবু তারা ইহুদী মতাদর্শ গ্রহণ করে। এরপর ইয়াসরিব ত্যাগ করলেন রাজা কারিবা।



সৌদি আরবের নাজরানে পাওয়া এসব খোদাই জানান দেয় অজানা ইতিহাসের

নিজের রাজ্যে ফিরে এসেই তিনি সবাইকে ইহুদী ধর্ম গ্রহণ করতে বললেন। অনেকে প্রতিবাদ করলেও অনেকে আবার গ্রহণ করে ইহুদী ধর্ম। আবার কোনো কোনো ইতিহাসবিদের মতে, সকলেই ইহুদী ধর্ম গ্রহণ করেছিল। তবে প্রথম মতবাদটিই বেশি প্রচলিত। ইহুদী আর পৌত্তলিকরা এর পর থেকে পাশাপাশি থাকতে লাগল সারা আরবেই। এমনকি, হিমইয়ার রাজ্যেও। কেউ কেউ অবশ্য কারিবার ইহুদী ধর্ম গ্রহণকে উপকথা বলে মন্তব্য করে থাকেন, তবে এটা স্বীকার করে নেন যে, পরবর্তী রাজারা ইহুদী ছিলেন।



ইথিওপিয়ার আব্বুমে পাওয়া প্রাচীন ফলকে লেখা প্রাকইসলামি আরবের ইতিহাস

আরবের বেশ কয়েকটি ইহুদী গোত্রের নাম আমরা নিশ্চিতভাবেই জানতে পারি—

- বনু হারিস (بَنُو الْحَارِث) বা বানু হোরায়েস (חוראס), এরা ইয়েমেনের কাহতানীদের বংশধর, যারা ইহুদী ধর্ম গ্রহণ করে।
- বনু কায়নুকা (بنو قينقاع বা بنو قينقاع), ৭ম শতকের মদিনার তিনটি প্রধান ইহুদী গোত্রের একটি। তারা ধর্মান্তরিত ইহুদী নয়, বনি ইসরাইলের ইহুদীই।
- বনু শুতায়বা।
- বনু সালাবার 'জাফনা'।
- বনু জাওরা।
- বনু জুরায়ক। ইসলামি বিবরণ অনুযায়ী, এ গোত্রের এক ইহুদী জাদুকর লাবিদ বেন আসাম মুহাম্মাদ (সা)-এর ওপর জাদুটোনা করেছিল।
- বনু কুদা (قضاء)। এরা হিমিয়ার রাজ্যের ধর্মান্তরিত ইহুদী।
- বনু কুরাইজা (بنو قريظة বা بنو قريظة), তাদের নিজস্ব দাবি অনুযায়ী, তারা বনী ইসরাইলের ইহুদী, কোহেন (ইহুদী ইমাম বা পুরোহিত) বংশের। হিমিয়ারের রাজাকে থামিয়েছিলেন যে দুজন ইহুদী, তারা বনু কুরাইজার ইহুদী ছিলেন বলে ইবনে ইসহাক বর্ণনা করেন। তারা এই বলে সেই রাজাকে থামিয়েছিলেন যে, “এই মরুদ্যানে কুরাইশদের থেকে আগত এক নবী আসবেন, এ মরুদ্যানই হবে তাঁর আবাস, তাঁর সমাধি।” ইবনে ইসহাক আরও বলেন, হিমিয়ারের রাজা ইহুদী র্যাবাইদের নিয়ে মক্কায় যান, সেখানে ইহুদীরা মক্কার কাবাঘরকে ইব্রাহিম (আ)-এর নির্মিত পবিত্রঘর হিসেবে পরিচয় করিয়ে দেন, তাদের রাজাকে অনুরোধ করেন কাবাঘর তাওয়াফ করতে, মাথা মুগুন করতে, ইত্যাদি। ইয়েমেনেও র্যাবাই দুজনকে নিয়ে যান রাজা, সেখানে ইয়েমেনীদের সামনে এক অলৌকিক কাজ করে দেখান দুজন, তারা আগুন থেকে বেরিয়ে আসেন সম্পূর্ণ স্বাভাবিকভাবে, আগুন তাদের স্পর্শই করেনি। এ ঘটনা দেখে ইয়েমেনীরা ইহুদী ধর্ম গ্রহণ করে। ৭ম শতকের মদিনার প্রধান তিন ইহুদী গোত্রের একটি বনু কুরাইজা।
- বনু হাদল।
- বনু নাজির, এরাও মদিনার প্রধান তিন ইহুদী গোত্রের একটি। কুরাইজার মতো বনু নাজিরও কোহেন বংশের দাবিদার ছিল।

- বনু জু', এরা বনু কায়নুকার উপদল। তারা পালিয়ে গিয়েছিল উত্তর আফ্রিকায়।
- বনু আওফ (بنو عوف), তারা ধর্মান্তরিত ইহুদী।
- বনু আওসের অনেকে ইহুদী ছিলেন, তবে আওস (بنو اوس) ও খাজরাজ (بنو خزرج) গোত্রকে শিয়ারা ইহুদী বলে মন্তব্য করলেও, স্বয়ং ইহুদী মতে, মদিনার এ গোত্র দুটো ইহুদী ছিল না, বরং ইহুদীদের কাছ থেকে মদিনার ক্ষমতা নিয়ে নেয়। লেখকের ব্যক্তিগত মতামত, আওস গোত্রের নাম যেহেতু 'আওস মানাত' (اوس, مناة) বা 'দেবী মানাতের উপহার' থেকে এসেছে, এরকম পৌত্তলিক নাম ইহুদী গোত্রের হতে পারে না। ইসলামের আবির্ভাবের পর এ নামটি 'আওস-আল্লাহ' (اوس الله) নামে পরিবর্তন করা হয়। আর, খাজরাজ গোত্র খ্রিস্টের জন্মের সাত শতাব্দী আগে দক্ষিণ আরব থেকে বিতাড়িত হয়, তারা জর্ডানের নাবাতীয় গোত্র আল-আজদ (الأزد)-এর হয়ে ইয়েমেনের মা'রিব পানির বাঁধ তৈরি করেছিল। তৃতীয় বারের মতো এ বাঁধ ধ্বংসের পর তারা ইয়াসরিবে চলে যায়। নিজেদের তারা ইসমাইল (আ) এর বংশধর বলে দাবি করত। প্রাক-ইসলামি একটি সময়ে তাদের গোত্রের নাম ছিল বনু কায়লা (بنو قيلة)। ইহুদী সূত্র মতে, আওস ও খাজরাজ গোত্র মুহাম্মাদ (সা) মদিনায় আসার কয়েক বছর আগেও (৬১৭ সালে) যুদ্ধ করেছিল, যা বুয়াস যুদ্ধ নামে পরিচিত। বনু খাজরাজের বংশধর নুসায়বা গোত্র (عائلة نسيبة) জেরুজালেমে খ্রিস্টানদের পবিত্র চার্চ অফ দ্য হোলি সেপালকারের জিম্মাদার, তাদের সাথে এ দায়িত্ব সুলতান সালাউদ্দিনের সময় থেকে ভাগাভাগি করে আসছে জুদেহ আল-গৌদিয়া পরিবার। দুটোই মুসলিম পরিবার।

ইহুদীরা এখানে কৃষিকাজের সূচনা করে, এবং খুব দ্রুতই অর্থনৈতিকভাবে উন্নত অবস্থানে চলে যায়। কিন্তু পঞ্চম শতকে ইয়েমেন থেকে আওস ও খাজরাজ গোত্র এসে হাজির হলে ইহুদীরা কর্তৃত্ব হারায়। পরবর্তীতে একেক ইহুদী গোত্র একেক নতুন গোত্রের সাথে মিশ্রিত হয়ে চলে যায়।

আগের অধ্যায়গুলোতে বলা 'ইহুদী বনাম রোমানদের যুদ্ধের' সময়ই নানা ইহুদী গোত্র আরবের হেজাজ এলাকায় এসে বসবাস করতে থাকে। তবে ঠিক তখনই তারা প্রথম আসে কি না, তা নিয়ে মতভেদ আছে ইতিহাসবিদদের মাঝে। কেউ বলেন, ৫৮৬ খ্রিস্টপূর্বাব্দেই জুদাহ রাজ্যের পতনের পর কোনো কোনো গোত্র আরবে পালিয়ে গিয়েছিল! আবার কেউ বলেন জুদাহ যখন রোমানরা দখল

করে নেয়, তখন তারা আরবে যায়। কারও মতে, ইহুদীদের মহাবিদ্রোহের আমলে (৬৬-৭৩ সাল) এ আরব অভিবাসন হয়েছিল; কিংবা ১৩৫ সালের বার-কহবা বিদ্রোহের সময় রোমানদের হাত থেকে পালিয়ে আরবে আশ্রয় নেয় অনেক ইহুদী।



ইয়েমেনের হাক্কানি ইহুদী

পবিত্র কুরআনে বনী ইসরাইলের ব্যাপারে অন্তত ৪৩ বার কথা এসেছে, এতটাই গুরুত্ব তাদেরকে দেয়া হয়েছিল ইসলামে। প্রথম দিককার আয়াতে তাদেরকে ইসলামের প্রতি আহ্বান করা হয়, কোমলভাবে তাদের কিতাবের কথা তোলা হয়। কিন্তু যতই তারা প্রত্যাখ্যান করতে থাকে ইসলাম, ততই পালটে যেতে থাকে ইহুদীদের প্রতি সম্বোধনের সুর, একটি পর্যায়ে সৃষ্টি হয় শত্রুভাবাপন্নতা। ইহুদী ও খ্রিস্টানদেরকে মিত্র হিসেবে নিতে মুসলিমদের নিষেধ করা হয় (কুরআন, সূরা মায়িদা ৫:৫১), যদিও তারাও আহলে কিতাব।

হযরত মুহাম্মাদ (সা) মদিনার শাসক হওয়ার পর তিনি মদিনা সনদ ভাঙার দায়ে প্রথমে বনু নাজির ও এরপর বনু কায়নুকাকে মদিনা থেকে বহিস্কার করেন। তৃতীয় গোত্র বনু কুরাইজার সব পুরুষকে হত্যা করা হয় পরিখার যুদ্ধে (খন্দক যুদ্ধে) মদিনার বিরুদ্ধে গিয়ে মক্কার সাথে হাত মেলানো অর্থাৎ বিশ্বাসঘাতকতার দায়ে। এগুলো মুহাম্মাদ (সা) এর মৃত্যুর ৬ বছর আগে, ৬২৬ সালের মাঝে সংঘটিত হয়। ৬২৮ সালে মুসলিমরা ইহুদী-অধ্যুষিত খায়বার জয় করে নেয়।



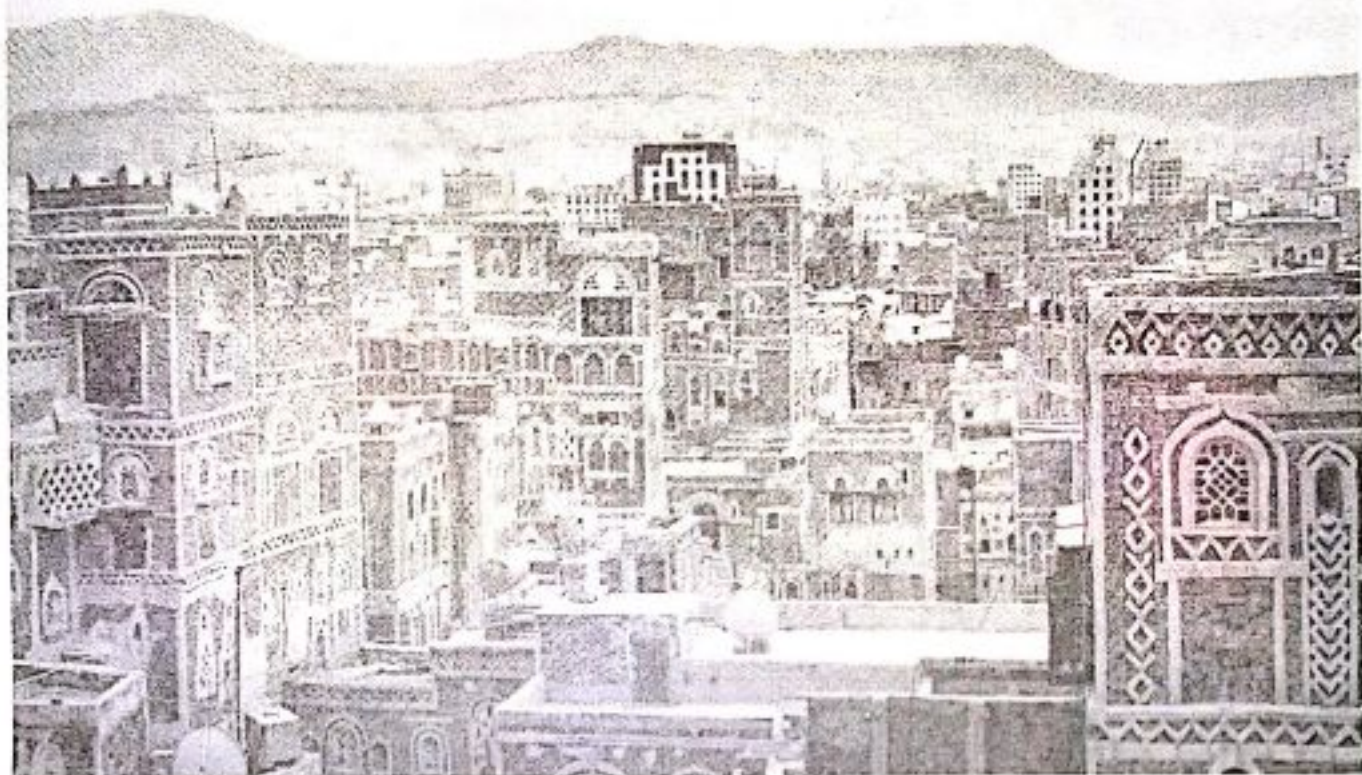
খায়বারের দুর্গ

ইসলামি ইতিহাসে এ ঘটনাগুলোর বিস্তারিত উল্লেখ রয়েছে। কিন্তু ইহুদীরা তাদের ইতিহাসে এগুলো পারতপক্ষে এড়িয়ে যায়, কিংবা খুবই সংক্ষেপে উল্লেখ করা হয়। বরং ইহুদীরা জোর দেয় কীভাবে তাদের কোন গোত্র আরবে পৌঁছালো, ইসলামি খেলাফতের সময় বা তারপর তাদের জীবনকাল এই নতুন শাসনাধীনে কেমন চলেছিল, এসবের ওপর।

ইয়েমেনের রাজধানী তখন ছিল ‘সানা’, ইয়েমেনি ইহুদীদেরকে (اليمنيون — اليهود বা סנא'יים) তাই সানায়ী ইহুদীও ডাকা হয়। তারা অন্যান্য ইহুদী জাত অর্থাৎ আশকেনাজি, সেফার্দি ইত্যাদি ইহুদীদের থেকে আলাদা, এদের সম্পর্কে পরে আলাপ করা হবে। তবে এটুকু জেনে রাখা যায়, ইয়েমেনি ইহুদীরা পড়ে ‘মিজরাহি’ (מזרחי) বা ‘পূবদেশী’ ইহুদীদের কাতারে। তাদের কথা যে কারণে এলো-সানায়ী ইহুদীদের কাছ থেকে জানা যায়, খ্রিস্টপূর্ব কয়েক শতাব্দী আগে যখন ব্যবিলনের হাতে প্রথম বাইতুল মুকাদ্দাস বা ফার্স্ট টেম্পল ধ্বংস হয়ে যায়, তারও বেয়াল্লিশ বছর আগে তারা ইয়েমেন এলাকায় এসে স্থায়ী হয়েছিল।

জেরেমায়া বা নবী ইয়ারামিয়ার বরাত দিয়ে ‘আ জার্নি টু ইয়েমেন অ্যান্ড ইটস জ্যুস’ বইতে জানানো হয়, প্রায় ৭৫,০০০ ইহুদী ইয়েমেনে চলে গিয়েছিল, যাদের মাঝে লেবীয় ইমাম বা পুরোহিতরাও ছিলেন। ‘জ্যুয়িশ কমিউনিটিজ ইন এক্সোটিক প্রেসেস’ বইতে দক্ষিণ ইয়েমেনের হাক্কান গোত্র থেকে আমরা জানতে পারি, জুদাহ রাজ্য থেকে আসা ইহুদীরা সেকেন্ড টেম্পল ধ্বংসের আগে এখানে বসত গাড়ে। তবে তারা এসেছিলো রোমান বাহিনীর সাথে, রাজা হেরোদ রোমান

সেনাদের সাহায্য করার জন্য যেসব ইহুদীকে এ অঞ্চলে পাঠিয়েছিলেন, তারা আর ফিরে যায়নি, এখানেই থেকে যায়।



আজকের সানা



জুদাহ থেকে চলে আসা ইহুদীরা

ইসরাইলের উত্থান-পতন ১২৩

কথিত আছে, বনু আওস ও বনু খাজরাজ ইয়াসরিবে এসে স্থায়ী হয় কিছু ভবিষ্যদ্বাণী শুনে যে, আরব থেকে এক নতুন নবী আসবেন এবং তিনি ইয়াসরিবেই আসবেন। ৪৭০ সালে পারস্যের রাজা ফিরোজ নির্বাসিত ইহুদীদের মাঝে এক্সিলার্ক প্রথা বিলুপ্ত করার চেষ্টা করেন। তখন ব্যাবিলনের ত্রিশতম এক্সিলার্ক দ্বিতীয় মার-জুত্রাকে ত্রুশবিদ্ধ করা হয় মাহুজা সেতুর ওপর। তার বিরুদ্ধে অভিযোগ ছিল, তিনি ইহুদীদের স্বাধীনতা চেয়েছিলেন। যেদিন তাকে ত্রুশবিদ্ধ করা হয়, সেদিনই তার ছেলে তৃতীয় মার-জুত্রার জন্ম। তাকে গোপনে বড় করে তোলা হয়। আঠারো বছর বয়সে তাকে নিয়ে যাওয়া হয় ইসরাইলে। সেখানে তিনি সানহেদ্রিনের প্রধান হয়েছিলেন বলে কথিত আছে। এক্সিলার্ক নিধন থেকে পালাতে এই মার-জুত্রার ছেলে এক্সিলার্ক পঞ্চম হুনা নিজের মেয়ে ও কিছু মানুষ নিয়ে পালিয়ে ইয়াসরিবে চলে গিয়েছিলেন নিরাপত্তার জন্য। এসবই ইহুদী নথি মোতাবেক। মুহাম্মাদ (সা) যখন ইয়াসরিবে এলেন, তখন তাদের প্রতীক্ষিত নবী হওয়া সত্ত্বেও ইহুদীরা তাঁকে গ্রহণ করেনি, কারণ তিনি বনী ইসরাইলি ছিলেন না, ছিলেন বনী ইসমাইলি, যাকে তারা দাসীর বংশধর বলে মনে করত। (ইহুদীরা মনে করে ইসমাইল (আ) এর মাতা হাজেরা ছিলেন দাসী।) ইহুদীদের নিজস্ব উৎসগুলোতে উল্লেখ না থাকলেও ইসলামি কিতাবগুলো অনুযায়ী, মুহাম্মাদ (সা)-এর জন্মের আগে পরে এবং মদিনায় আগমনের পরে অনেক ইহুদী পণ্ডিতই ভবিষ্যদ্বাণীর সাথে মিলিয়েছিলেন মুহাম্মাদ (সা)-কে।



ইয়েমেনি ইহুদীদের একাংশ

৬৩২ সালে মারা যান হযরত মুহাম্মাদ (সা)। তার মৃত্যুর পর শুরু হয় খলিফাদের শাসন। ৬৪৪ সালের মাঝে মুসলিমদের অধিকারে আসে সিরিয়া, ইসরাইল, মিসর, ইরাক এবং পারস্য। ওদিকে পঞ্চম শতকে পশ্চিমা রোমান সাম্রাজ্যের পতন হলেও পূর্ব রোমান সাম্রাজ্য বহাল তবিয়ে টিকে ছিল, তবে তাদেরকে ডাকা হতো ‘বাইজান্টিন (Βασιλεία) সাম্রাজ্য’ বলে। বহু বছর পরে, ১৪৫৩ সালে মুসলিম অটোমান অর্থাৎ উসমানী খিলাফতের কাছে পতন হয় বাইজান্টিনদের। যতদিন টিকে ছিল, ক্ষমতার সাথে টিকে ছিল তারা। তবে যে সময়ের কথা বলা হচ্ছে, তখন সবে ইসলামের যাত্রা শুরু, সেই উদীয়মান মুসলিম বাহিনীর কাছেই তুলোধুনো হয় বাইজান্টিন বাহিনী। মুসলিমদের আক্রমণে বাইজান্টিনদের পূর্ব ফ্রন্ট ধ্বংসে পড়ে এবং এপাশ থেকে সীমানা কমে গিয়ে এশিয়া মাইনর অর্থাৎ আনাতোলিয়া বা আধুনিক তুরস্কের সীমানার দিকে ঠেকে। এই মুসলিম বাহিনীর হাতে পতন হয় পরাক্রমশালী পারস্য সাম্রাজ্যেরও।

পরের ষোল বছরে উমাইয়া খলিফাদের আমলে ইসলামি সাম্রাজ্যের সীমানা আরও বাড়তে শুরু করে। অষ্টম শতকের শুরুতে জিব্রাল্টার প্রণালী পেরিয়ে ইসলাম ইউরোপে তারিক ইবনে জিয়াদের হাত ধরে প্রথম পা রাখে। সত্যি বলতে, তারিকের পাহাড় বা ‘জাবাল-আল-তারিক’ থেকেই ‘জিব্রাল্টার’ নামটি এসেছে। বর্তমান স্পেনে (পর্তুগালের তৎকালীন আঞ্চলিক নাম আন্দালুস) ছড়িয়ে পড়ে ইসলাম।



জিব্রাল্টার

তবে মুসলিমদের মাঝেই ক্ষমতার অন্তর্দ্বন্দ্ব শুরু হয়ে যায়। ৭৫০ সালে উমাইয়াদের সরিয়ে ক্ষমতা দখল করে আব্বাসীরা। আব্বাসীয় খিলাফাতের রাজধানী দামেস্ক থেকে সরিয়ে নিয়ে যাওয়া হয় বাগদাদে। এ সময় হাদিস সংকলন করা হয় এবং জ্ঞান বিজ্ঞানের নানা শাখা থেকে শুরু করে আইন ও সামরিক ক্ষেত্রেও উন্নতি করে মুসলিমরা।

কিন্তু সাম্রাজ্যের ইহুদীদের কী অবস্থা তখন? ইহুদীদেরকে গণধর্মাত্মক জোর করা হয়নি। তাদেরকে তাদের ধর্ম পালনের স্বাধীনতা দেয়া হয়। সামরিক বাহিনীতে যোগ দিতেও বাধ্য করা হয়নি। বিনিময়ে তাদেরকে ইসলামি কর্তৃত্ব স্বীকার করে নিতে হবে। ৮০০ সালে এ নিয়ে ‘উমার চুক্তি’ (عهد عمر) সম্পাদিত হয়।



দ্বিতীয় উমারের মুদ্রা

উমার চুক্তিতে ইসলামি শাসনাধীন সিরিয়া, মেসোপটেমিয়া বা জেরুজালেমের যেসব নাগরিক মুসলিম নন, তাদের সাথে রাষ্ট্রের সম্পর্ক নিয়ে বিভিন্ন শর্ত উপস্থাপিত হয়। এই অমুসলিমদেরকে ‘যিম্মি’ (ذمي) বা ‘আহলে কিতাবি লোক’ বলা হয়। তারা মুসলিম রাষ্ট্রে মুসলিমদের নিরাপত্তার অধীনে থাকবে। খলিফা দ্বিতীয় উমারের সম্মানে এ নাম দেয়া হয় চুক্তির। তবে উমার (রা) জেরুজালেমের বাসিন্দাদের ব্যাপারে যে নিরাপত্তার প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন, সেটি আর এই ‘উমার চুক্তি’ এক নয়। এ চুক্তিতে যিম্মি অমুসলিমদের নানা অধিকার তুলে ধরা হয়। ইহুদীদের ব্যাপারেও একই অধিকার ছিল, তবে নিষেধাজ্ঞাগুলো ছিল এমন- নতুন করে সিনাগগ বানানো যাবে না আর, মুসলিমদের চেয়ে উঁচু ঘর বানানো যাবে না। শিঙ্গা বাজালে নিচু স্বরে বাজাতে

হবে, জোরে প্রার্থনা করা যাবে না, মুসলিমদের সাথে কবর হবে না, মুসলিমদের ব্যাপারে মিথ্যা বলা যাবে না, মুসলিমদের মতো পোশাক পরা যাবে না, অস্ত্র রাখা যাবে না, ইত্যাদি। তবে খ্রিস্টানদের কাছে এগুলো নতুন হলেও ইহুদীদের কাছে ছিল পরিচিত। ইহুদী ও খ্রিস্টানদেরকে তখন জিজিয়া অর্থাৎ কর দিতে হতো।

তবে ইহুদীদের মতেই, মুসলিম শাসনামলে ইহুদীরা বেশ শান্তিতে ছিল, তারা নিজেদের উন্নতি সাধন করতে সক্ষম হয়। নানা শহরে ইহুদীরা রং করা, তাঁত বোনা, রেশমি কাপড় তৈরি, ধাতুর কাজ, ইত্যাদি শিখে নেয়, এবং বেশ পারদর্শিতা অর্জন করে। আন্তর্জাতিক ব্যবসাতেও তারা সফলতা লাভ করতে থাকে।

রাজনৈতিক পরিস্থিতি অনুকূলে থাকায় ব্যবিলনের ইহুদী সমাজ থেকেও ইহুদীরা মুসলিম সাম্রাজ্যে অভিবাসী হয়ে আসতে লাগলো। বেশ কয়েকজন ইহুদী ব্যবসায়ী ইসলামি সাম্রাজ্যের বাইরেও ব্যবসা করতে শুরু করে।

বাইজান্টিন সাম্রাজ্যের যে প্রদেশগুলো মুসলিমদের হাতে চলে আসে, সেখানকার ইহুদীরা মুসলিম শাসনকে সাদরে গ্রহণ করে। খ্রিস্টানদের হাতে শোষিত হবার বদলে ইসলামি আইনের কাঠামোর মধ্যে থাকতে পছন্দ করত ইহুদীরা। প্রাচীন পারস্যের (সাসানীয়) সাম্রাজ্যে ইহুদীরা যেমন কাঠামোবদ্ধ জীবন যাপন করতে পারত, মুসলিম শাসনেও তারা সে জীবন ফিরে পায়।

উমাইয়া ও আব্বাসীয় খলিফারা ইহুদীদের ব্যবিলনীয় এক্সিলার্ক প্রথা মেনে নেন। এক্সিলার্করা খলিফার দরবারে ইহুদীদের প্রতিনিধি হিসেবে যেতেন, জিজিয়া প্রদান করতেন, ইহুদীদের বিচারব্যবস্থা দেখভাল করতেন। আব্বাসীয় শাসনামলে, এক্সিলার্কদের সাথে ক্ষমতায় ভাগ বসান ইহুদী অ্যাকাডেমিগুলোর র্যাবাইরা। প্রত্যেক অ্যাকাডেমির প্রধানকে ডাকা হতো গাওন (גאון), যার অর্থ 'প্রতিভাবান'। ইহুদী ধর্মীয় আইনপ্রণেতাদেরকে একত্রে 'হালাখা' (הלכה) বলা হতো, অর্থাৎ 'ইহুদী আইন বা জীবনব্যবস্থা'।

এই গাওনদেরকে বাছাই করা হতো ব্যবিলনের বনেদী ইহুদী পরিবার থেকে। অষ্টম শতকে গাওনদের নিয়োগ দিতেন এক্সিলার্করা, কিন্তু ধীরে ধীরে পরিস্থিতি বদলাতে লাগলো। গাওনরাই নিয়োগ দিতেন এক্সিলার্কদেরকে, এতটাই স্বাধীন হয়ে গেলেন তারা। দশম শতকে ব্যবিলন থেকে সরিয়ে অ্যাকাডেমিগুলো বাগদাদে নিয়ে আসা হয়। একাদশ শতকে গিয়ে ব্যবিলনের চাইতে বাগদাদের ইহুদী সমাজের সম্মান বেড়ে গেল, ইহুদীদের জ্ঞানবিজ্ঞান সব বাগদাদকেন্দ্রিক হতে শুরু করলো।



হালাখা

এই মুসলিম শাসনের সময়ই খাজার ও কারাইট ইহুদীদের আবির্ভাব ঘটে।

অধ্যায় ১৩

খাজার ও কারাইট ইহুদীদের আবির্ভাব



খাজার ইহুদীদের নিয়ে বলতে গেলে শুরুতেই বলে নেয়া প্রয়োজন, এটিকে ইহুদীরা সীমিত পরিসরে স্বীকার করলেও বড় পরিসরে একে বানোয়াট বলে অভিহিত করে। এ সংক্রান্ত গবেষকদের অধিকাংশই খাজার তত্ত্বকে ভুল বলে থাকেন, আবার মাঝে মাঝে অনেকে পক্ষিও বলে থাকেন। ইহুদীরা একে ‘খাজার মিথ’ বলে, এবং এ তত্ত্বকে ব্যবহার করে অ্যান্টি-সেমেটিক ও অ্যান্টি-জায়োনিস্ট মতবাদকে জোর গলায় সমর্থন করা হয়, তাই আন্তর্জাতিকভাবেই এই তত্ত্বকে ভালো চোখে দেখা হয় না। কেন? কারণ, এ তত্ত্ব বলে, বর্তমান ইহুদীদের একটি বড় অংশ তুর্ক খাজার বংশের ধর্মান্তরিত ইহুদী, এবং মূল বনী ইসরাইলের সাথে তাদের কোনো সম্পর্ক নেই। এর ফলে, পবিত্র ভূমির ওপর তাদের কোনো অধিকার থাকে না। স্বভাবতই, ইহুদীরা তাই এ তত্ত্বের বিরোধী।

প্রশ্ন হলো, খাজার কী? এ বিষয়ে একটু জেনে নেয়া যাক।

‘খাজার’ (خزر) বা ‘হাজার’-কে হিব্রুতে ‘কুজার’ বলা হয়, বহুবচনে ‘কুজারিম’ (קוזריים)। এরা মূলত তুর্ক জাতির অংশ, যারা উত্তর, মধ্য ও পশ্চিম ইউরেশিয়ায় বাস করে বা করত। এই তুর্কের অন্তর্গত আজকের কাজাখ, উজবেক, কির্গিজ, তুর্কি লোকেরা, এছাড়াও আগেকার দিনের হান, সেলজুক, উসমানীয়, তৈমুরীয় প্রমুখ। খাজারও ছিল এমনই এক তুর্ক। তারা ছিলো আধা-

যাযাবর কিছু গোত্রের সমষ্টি। আজকের রাশিয়া, দক্ষিণ ইউক্রেন, ক্রিমিয়া ও কাজাখস্তানের অংশ নিয়ে তাদের বিস্তার ছিল। আজও কাসপিয়ান সাগরকে স্থানীয় আজেরবাইজানি ভাষায় ‘খাজার সাগর’ ডাকা হয়। ব্যবসায়িক ও রাজনৈতিক দিক থেকে খাজাররা ছিল বড় শক্তিশালী। ৬৫০ সাল থেকে ৯৬৯ সাল পর্যন্ত তারা মাথা উঁচু করে ছিল।



একজন খাজার যোদ্ধা

খাজারদের ধর্ম কিন্তু খ্রিস্টান ছিল না, বরং আকাশদেবতা তেংরির পূজা করত তারা, তাদের মাঝে প্রচলিত ছিল শামানপ্রথা। তবে খ্রিস্টান বাইজান্টিন সাম্রাজ্যের পক্ষ নিয়ে তারা পারস্যের সাসানীয় সাম্রাজ্যের বিরুদ্ধে লড়ত। বহুদিন মুসলিম অঞ্চলের সাথে বাইজান্টিন সাম্রাজ্যের দূরত্ব বাড়িয়ে মধ্যবর্তী অঞ্চল হিসেবে কাজ করে গিয়েছে খাজাররা। তবে ৯০০ সালের দিকে বাইজান্টিনদের সাথে মিত্রতা শেষ হয়ে যায় খাজারদের। ‘আলান’ বা ‘আলানোই’ (Alanoi) নামের উত্তর ককেশাসের ইরানি যাযাবর জাতিকে হাত করে বাইজান্টিনরা। আলানদেরকে দিয়ে তারা চেষ্টা করেছিল খাজারদের আক্রমণ করে দুর্বল করে দিতে। ৯৬৫ থেকে ৯৬৯ সালের মাঝে কোনো এক সময় স্লাভিকদের কাছে স্বাধীনতা হারায় খাজাররা। তাদের জনসংখ্যা ছিল প্রায় চৌদ্দ লক্ষ। ঘটনাটা ঘটে এখানেই।

স্প্যানিশ ইহুদী ডাক্তার ও দার্শনিক জুদাহ হালেভি (יְהוֹדָה הלֵבִי) এবং স্প্যানিশ ইহুদী জ্যোতির্বিদ, ইতিহাসবিদ ও দার্শনিক আব্রাহাম ইবনে দাউদ (אַבְרָהָם בֶּן דָּוִד) এরকম সময় খাজারদের শাসক জনগোষ্ঠীকে বুঝিয়ে সুজিয়ে ইহুদী ধর্ম গ্রহণ করান।



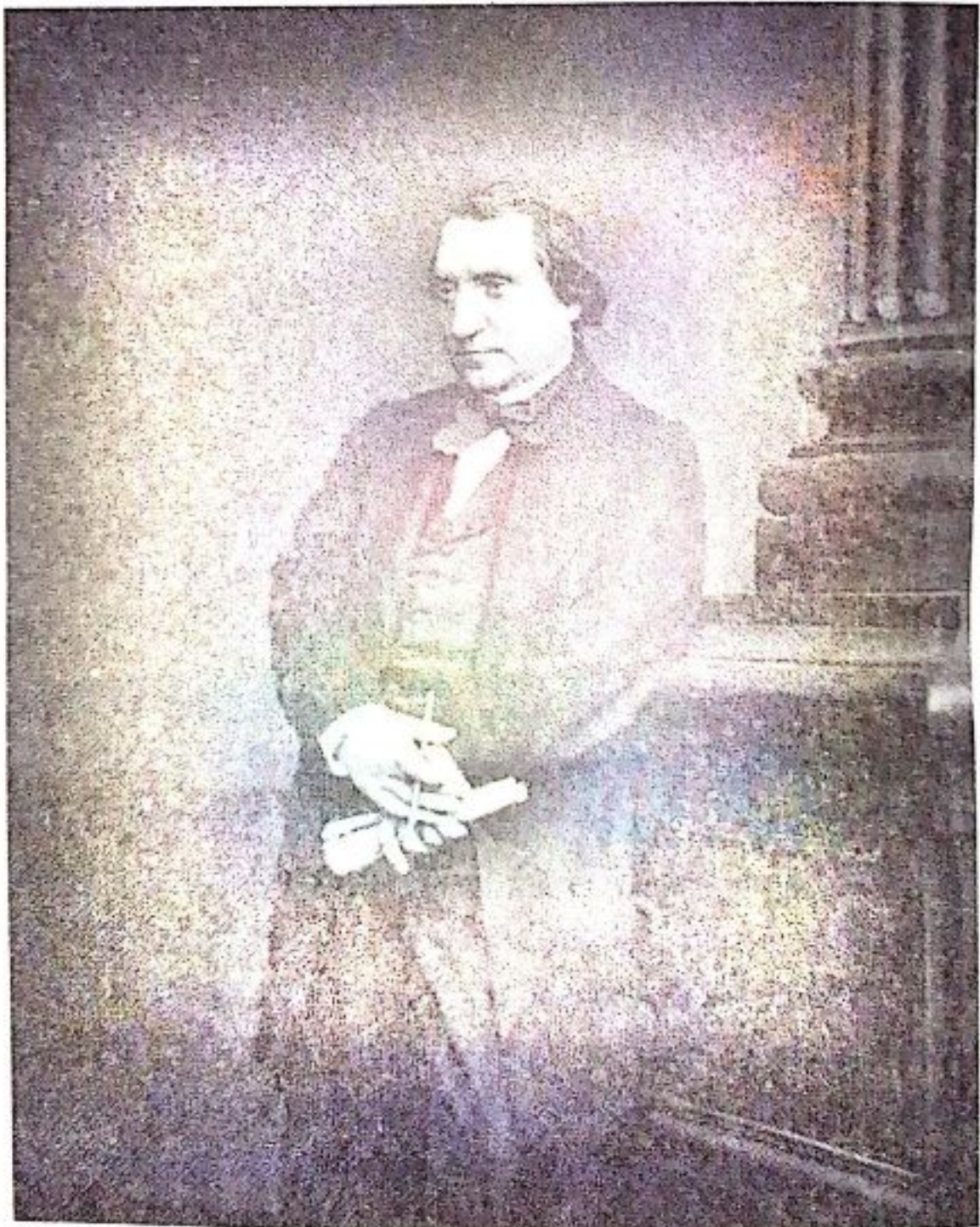
আব্রাহাম ইবনে দাউদ

এ পর্যন্ত সব ঠিক আছে। এই ইহুদী ধর্ম গ্রহণের অংশটুকু ইহুদীদের নিজস্ব ইতিহাসেই আছে। সমস্যাটা এর পর থেকে।

বলা হয়, ইউক্রেনের র্যাবাই আইজ্যাক বায়ের লেভিনসন উনিশ শতকে প্রথম আশকেনাজি ইহুদীদের সাথে খাজারদের সম্পৃক্ততা নিয়ে কথা বলেন। তিনি জানান, ইউরোপীয় আশকেনাজি ইহুদীরা আগে রুশ ভাষায় কথা বলত। এরপর তারা হিব্রু ও আরামায়িক ঘেঁষা জার্মান একটি ভাষা অর্থাৎ ‘ইদিশ’ (יידיש) ভাষায় কথা বলতে শুরু করে। ইদিশ (Yiddish) ভাষার উদ্ভব মধ্য ইউরোপে নবম শতকে হয়েছিল।

আরেক ইহুদী আব্রাহাম এলিয়াছ হারকাভিও একই সন্দেহের কথা ব্যক্ত করেন। তবে খাজার তত্ত্ব সবচেয়ে বড় করে তুলে ধরেন ফরাসি সেমিটিক স্কলার আর্নেস্ট রেনান। তিনি ১৮৮৩ সালের ২৭ জানুয়ারি প্যারিসের একটি লেকচারে

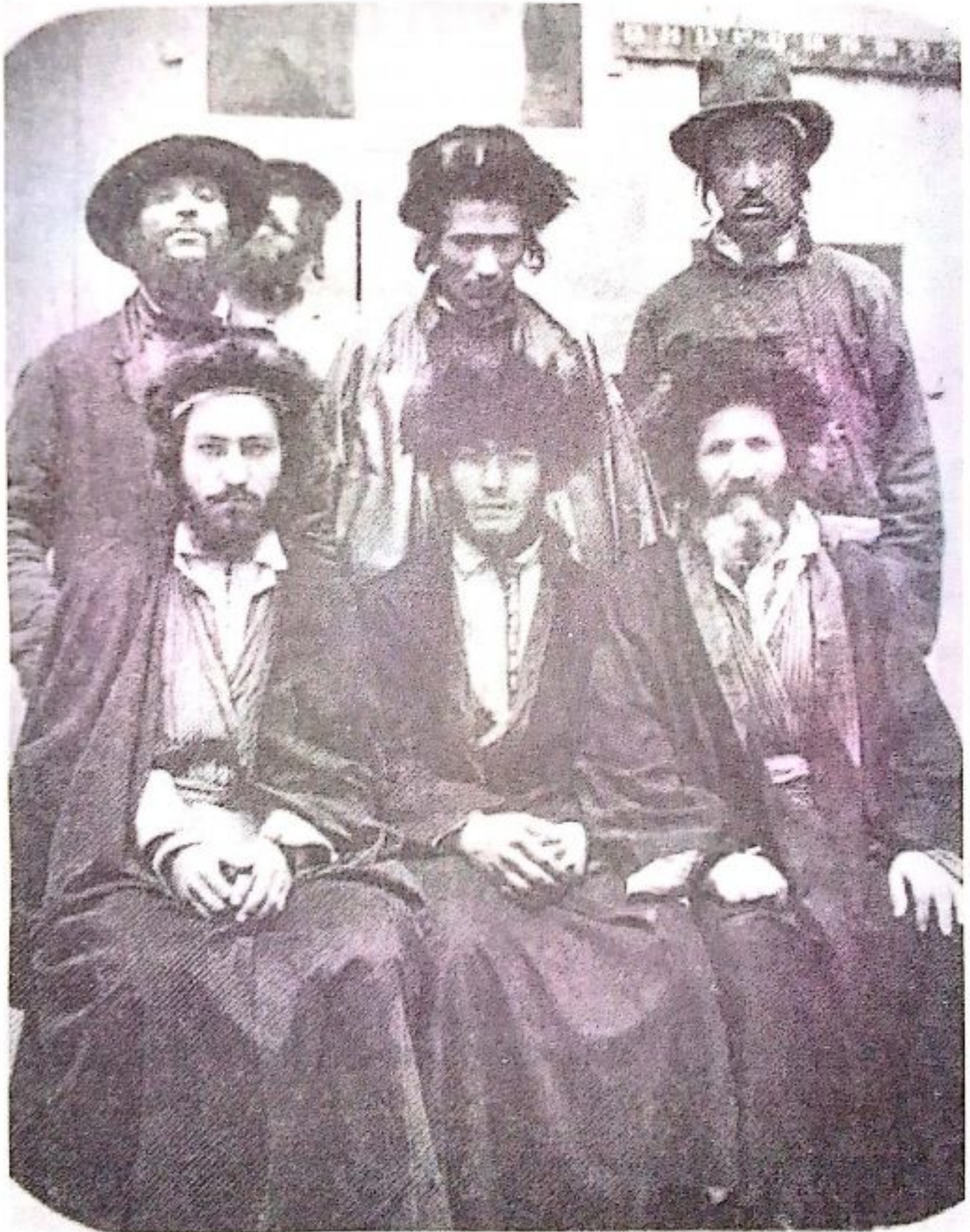
প্রমাণ করতে চেষ্টা করেন, ইহুদীদের আজকের অবস্থানে আসতে ধর্মান্তর কত বড় ভূমিকা রেখেছে, এবং এজন্য দায়ী সবচেয়ে বেশি খাজাররা। কিন্তু খুব দ্রুতই রুশ জাতীয়তা ও আশেকানাজি পরিচয় হুমকির মুখে পড়তে পারে ভেবে ধামাচাপা দিয়ে দেয়া হয় এ তত্ত্ব। অনেকদিন পরে ১৯৭৬ সালে আর্থার কেস্টলারের 'দ্য থার্টিন্থ ট্রাইব' নামের বই প্রকাশের পর খাজার তত্ত্ব আবার জনসম্মুখে আসে। ২০১২ সালে এরান এলহাইক নামের একজন আমেরিকান-ইসরাইলি জেনেটিসিস্ট এ তত্ত্বকে ভুল প্রমাণের চেষ্টা করেন, ফলে খাজার তত্ত্ব আবার মিডিয়ার সামনে আসে। জেনেটিক স্টাডি অনুযায়ী, খাজারদের উৎসের চিহ্ন আশেকেনাজি ইহুদীদের মাঝে পাওয়া যায়নি, পাওয়া গিয়েছিল ভূমধ্যসাগরীয় ও দক্ষিণ ইউরোপীয় উৎস। এটিও অবশ্য তাদের বনী ইসরাইলি হওয়া প্রমাণ করে না।



আর্নেস্ট রেনান, খাজার তত্ত্বের প্রবক্তা

মোদ্দা কথা, ইহুদী মত হলো, খাজারদের শাসক শ্রেণী ইহুদী ধর্ম গ্রহণ করে থাকলেও, খাজার জনগণ বিপুল সংখ্যায় এমনটি করেনি। তাই ইউরোপীয় ইহুদীরাও আসলে বনী ইসরাইল, তাদের পবিত্র ভূমিতে অধিকার আছে। যদিও মূল অধিকার তাদের পূর্বে পবিত্র ভূমিতে বসবাস করা ফিলিস্তিনিদের।

এতবার আশকেনাজি ইহুদীর কথা বলা হলো, এবার আসা যাক সে কথায়।



১৮৭৬ সালে তোলা ছবিতে কয়েকজন আশকেনাজি ইহুদী

ইহুদী কিতাব (পয়দায়েশ ১০) অনুযায়ী, নবী নূহ (আ) এর একজন বংশধর ছিলেন আশকেনাজ (אשכנז)। ইউরেশিয়ার স্লাভিক অঞ্চলে তার রাজত্ব ছিল। মধ্যযুগের ইহুদীরা এ এলাকাকে পশ্চিম জার্মানির রাইনল্যান্ড বলে অভিহিত করতে থাকে। তাই ইউরোপের এ অঞ্চলে বিকশিত ইহুদী সংস্কৃতিকে আশকেনাজি বলা হয়। তারা সেখানে ব্যাবিলন ও পবিত্র ভূমির সংস্কৃতির সাথে ইউরোপীয় সংস্কৃতির মিশ্রণ ঘটায়। শতাব্দীর পর শতাব্দী তারা হিব্রু ভাষাকে পবিত্র মনে করত, কিন্তু কথা বলত ইদিশ ভাষায়। প্রথম সহস্রাব্দের শেষ দিকে তাদের উৎপত্তি। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের হলোকাস্ট প্রায় প্রত্যেক আশকেনাজি ইহুদী পরিবারের ক্ষতিসাধন করে, প্রায় প্রত্যেক পরিবার থেকেই কেউ না কেউ মারা যায়।

একাদশ শতকে মোট ইহুদী জনসংখ্যার ৩% ছিল আশকেনাজি ইহুদী, আর বিশ শতকে ১৯৩০ সালের দিকে মোট ইহুদী জনসংখ্যার ৯২% ছিল আশকেনাজি। আজকের দুনিয়ায় মোট ইহুদীর অন্তত ৭৫% আশকেনাজি ইহুদী।

আশকেনাজির পাশাপাশি আছে মিজরাহি (מזרחי) ইহুদী, যাদের কথা আগে বলা হয়েছে এ বইতেই। তারা সেই আদিকাল থেকে অর্থাৎ ওল্ড টেস্টামেন্টের যুগ থেকেই মধ্যপ্রাচ্য ও উত্তর আফ্রিকার বাসিন্দা বংশগতভাবে। তারা বংশগতভাবে আদি ইহুদী, অর্থাৎ ধর্মান্তরিত নয়।



ইসরাইলের মিজরাহি ইহুদী

আন্দালুস অর্থাৎ আজকের স্পেন ও পর্তুগালের দিকে বসবাস করতে থাকা হিসপানিক ইহুদীদের বলা হয় সেফার্দী ইহুদী। তারা খ্রিস্টানদের হাতে অত্যাচারিত হয়ে আন্দালুস থেকে বিতাড়িত হয় পঞ্চদশ শতকে, এবং ছড়িয়ে

পড়ে পৃথিবী জুড়ে। যেমন, উত্তর আফ্রিকা, মরক্কো, আলজেরিয়া, তিউনিসিয়া, লিবিয়া, মিসর, ফ্রান্স, ইতালি, গ্রিস, বুলগেরিয়া, তুরস্ক, মধ্যপ্রাচ্য, লেবানন, সিরিয়া, ইরাক, ইরান, আমেরিকা, ইত্যাদি অঞ্চলে। অবশ্য আমেরিকায় আশাকেনাজি ইহুদীর তুলনায় সেফার্দী ইহুদী কমই। আন্দালুসের ঘটনায় আমরা একটু পরেই আসছি।



তুরস্কের এক সেফার্দী ইহুদী পরিবার

অষ্টম শতকে পারস্যের ইহুদী সমাজে মেসায়ার আন্দোলন শুরু হয়ে যায়, অর্থাৎ তারা দাবি করতে থাকে যে মেসায়ার আগমন নিকটবর্তী। তারা মুসলিম শাসকদের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করতে থাকে। অবশ্য খুব দ্রুতই এসব আন্দোলনকে দমিয়ে ফেলা হলো। কিন্তু এর চেয়েও গুরুতর সমস্যার শুরু হলো এ শতকের শেষ দিকে। কারাইট নামের একদল ইহুদীর উদ্ভব হয়, যারা র্যাবাইদের সম্পূর্ণ বিরোধী।

বর্তমানে মুসলিম সমাজে আহলে কুরআন নামে একটি দলকে দেখা যায়, যারা মনে করেন কেবল কুরআন পালনেই ইসলামের শতভাগ আদায় সম্ভব। হাদিস বা কোনো ইসলামি আলেম ফতোয়ার শরণাপন্ন হওয়া এক্ষেত্রে জরুরি নয়। ঠিক তেমনই ছিল ইহুদী কারাইটরা। তারা কেবল তাওরাত পড়ত, তাদের মতে এর বাইরে আর কিছুই প্রয়োজন নেই। ‘কারাইম’ (קראים) মানে ‘পঠনকারীগণ’। তাদের মতে হালাখার সব কিছু পাওয়া যাবে তাওরাতেই। র্যাবাইদের প্রয়োজন নেই। তাওরাতের আক্ষরিক অনুবাদেই মুক্তি নিহিত।

ব্যবিলনে এ দলের প্রতিষ্ঠা করেন আনান বেন ডেভিড ৭৬০ সালের দিকে। তার এম্বিলার্ক হবার সম্ভাবনা ছিল, কিন্তু করা হয়নি শেষমেশ।

কারাইটদের বিশ্বাস ইসলামের রীতিনীতি থেকেও ধার করা ছিল, ইহুদীদের তালমুদের বাইরের বিষয়াদিও তাতে ঢুকে যায়। ইহুদী ধর্মে হারাম খাবারের তালিকায় যা যা আছে, তার চেয়েও বাড়ানোর চেষ্টা করেন আনান বেন ডেভিড, তিনি খৎনা করার রীতিকেও আরও নিয়ম কানুন যোগ করে কঠিন করে ফেলেন। শনিবার অর্থাৎ সাব্বাথ দিবসের কার্যকলাপকেও কঠিন করতে পিছপা হননি তিনি, র্যাবাইদের থেকেও কঠিন করে তোলেন আনান বেন ডেভিড। মোট কথা, বেশ কঠিন ছিল কারাইটদের রীতিনীতি।



আজকের বিলুপ্তপ্রায় কারাইট ইহুদী সমাজ

আনান মারা যাবার পর নতুন নতুন কারাইট নেতার আবির্ভাব হলো। আনানের অনুসারী সংখ্যায় কমই ছিল, তাদেরকে ‘আনানাইট’ ডাকা হতো। নবম শতকের গোড়ার দিকে বাগদাদের কাছে উকবারাতে ইশময়েল প্রতিষ্ঠা করেন কারাইটদের ‘উকবারাইট’ দল। একই শহরে কয়েক বছর পর আরেকটি দলের জন্ম হয়, এবার জন্মদাতা মিশাওয়াহ আল-উকবারি। এভাবে আবু ইমরান আল-তিফলিসি আর ফিলিস্তিনের ইহুদী মালিক আল-রামলি’র হাতেও দল সৃষ্টি হয়। নবম শতকের শেষ দিকে দেখা গেল, কারাইজম ধর্মমতটা অনেকগুলো দলের সমষ্টি। মূলধারার কারাইজমের নেতা ছিলেন বেনজামিন বেন মোজেস

নাহাওয়েন্দি, তিনি বিশ্বাস করতেন পাক কিতাবের লেখার স্বাধীন পঠন প্রয়োজন। তারা র্যাবাইদের নীতি মানতেন না, তাদের আইন পালন করতেন না। একটা সময়ে খোদ জেরুজালেমেই কারাইটদের নিজস্ব র্যাবাইনিকাল শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান তৈরি হয়ে গেল।

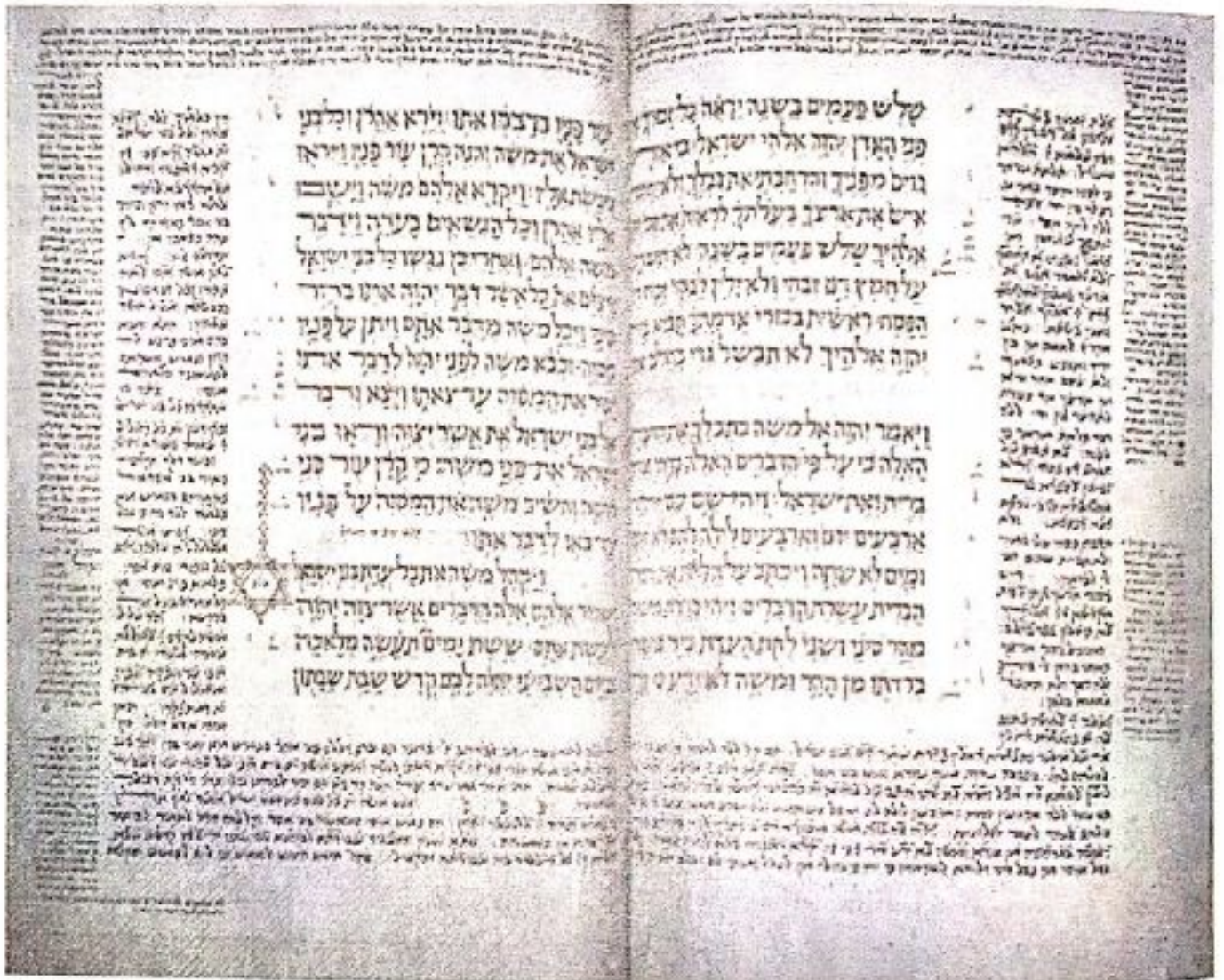
ইহুদী ধর্মের মূলধারার র্যাবাইরা বসে থাকলেন না, তারা কারাইজম বিশ্বাসকে বাতিল আখ্যা দিলেন। এর অনুসারীরা ইহুদী নয় আর, এমনটিই ছিল তাদের ঘোষণা। কারাইটদের সাথে বিতর্কে প্রথম যে গণ্যমান্য ব্যক্তি লিপ্ত হন তিনি ছিলেন একজন গাওন, অর্থাৎ র্যাবাইনিকাল অ্যাকাডেমির প্রধান। তার নাম সাদিয়া গাওন, পুরো নাম সাদিয়া বেন ইয়োসেফ গাওন। তিনি আনান বেন ডেভিডের বিরুদ্ধে একটি বই রচনা করেন; তার জ্ঞান আর বইপত্র অন্যান্য কারাইট-বিরোধীরা অনুসরণ করতে শুরু করে।



সাদিয়া গাওন

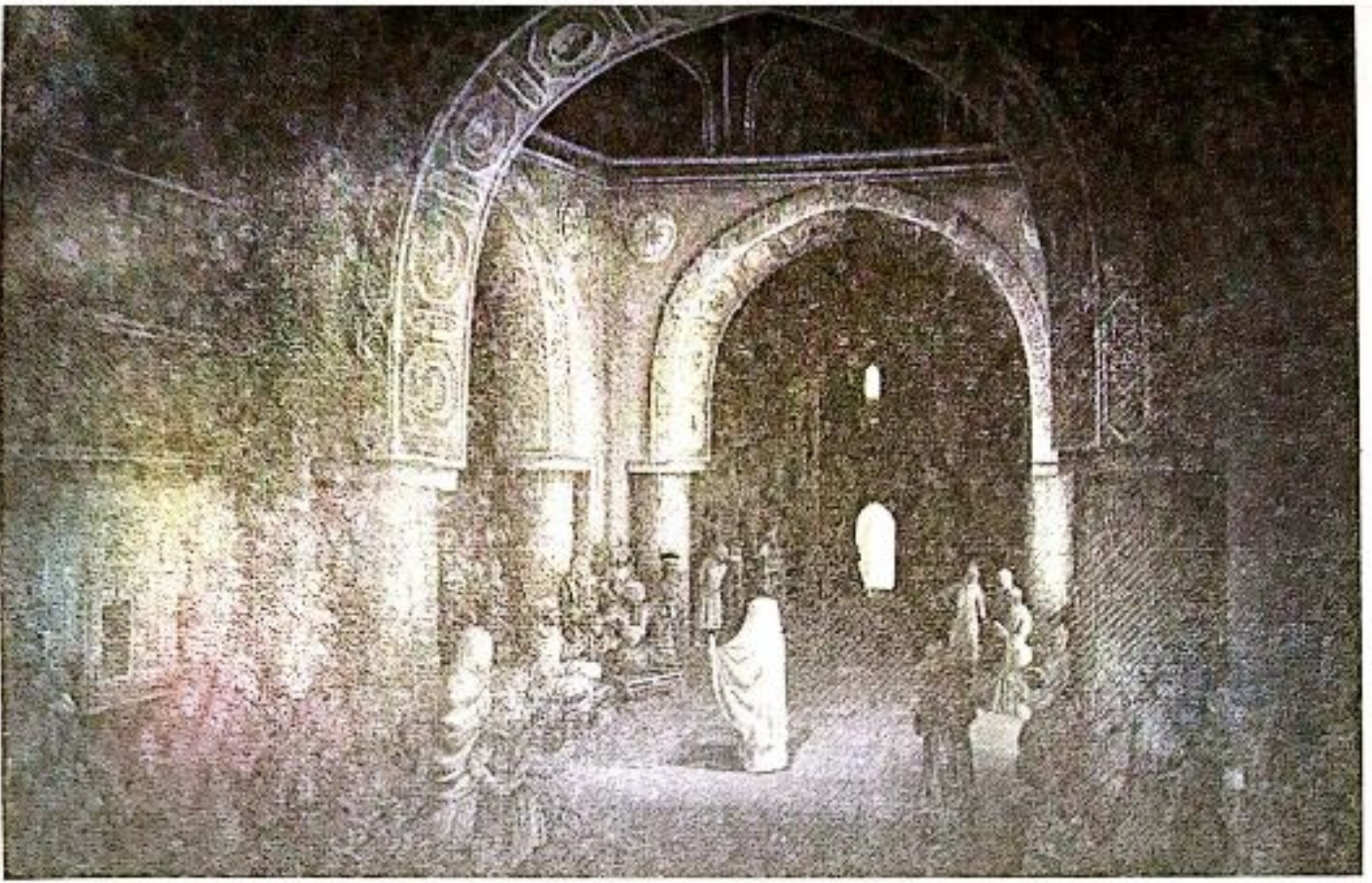
এ যুগের সাদিয়া গাওন এতটাই প্রভাবশালী বিদ্বান ছিলেন যে, এতদিন পরে এসেও তার বইপত্র রেফারেন্স হিসেবে ব্যবহার করা হয়, এবং ইহুদীরা শ্রদ্ধার সাথে মান্য করে। তিনি মিসরে জন্মগ্রহণ করেছিলেন, তবে ২৩ বছর বয়সে ৯১৫ সালের দিকে ফিলিস্তিনে চলে যান। তিনি সেখানে ইহুদী স্কলার আবু কাসির আল-কাতিবের অধীনে পড়ালেখা করেন। ৯২৬ সালে তিনি স্থায়ীভাবে বসবাস শুরু করেন ব্যাবিলনিয়াতে। সেখানকার ইহুদী সুরা অ্যাকাডেমির সদস্য হন তিনি।

এর আগে ৯২২ সালে হিব্রু পঞ্জিকা নিয়ে গণ্ডগোল দেখা দেয়, যা পুরো ইহুদী রীতিনীতিকে হুমকির মুখে ফেলে। বিষয়টা একটু খুলে বলা যাক। ৩৫৯ সাল থেকে হিব্রু পঞ্জিকা কিছু নিয়মের ওপর ভিত্তি করে চলে আসছিল, তাঁদের গতিবিধির ওপর নজর রেখে নয়। এর মাঝে একটি নিয়ম ছিল এমন- রশ হাশানাহ (ראש השנה) অর্থাৎ ইহুদী নববর্ষের সূচনার দিনে অতি অবশ্যই অমাবস্যার শুরু হতে হবে দুপুরের আগে। কিন্তু সেবার কোনোভাবেই তা হচ্ছে না, মধ্যদুপুরের অন্তত ৩৫ মিনিট পর শুরু হচ্ছে অমাবস্যা। যদি এটা মানতে হয়, তাহলে মঙ্গলবারের বদলে ঈদুল ফিসাখের বার পড়বে রবিবার, যেটা মানা যায় না।



সাদিয়া গাওনের কাজ

সাদিয়া তখন আলোপ্লোতে, তিনি যাত্রাপথে এ গণ্ডগোলের কথা শুনতে পেলেন। সাদিয়া ব্যাবিলনে গিয়ে তার জ্ঞান দিয়ে সমাধান করে দিলেন এ সমস্যা। তৎকালীন এক্সিলার্ক ডেভিড বেন জাক্বাই আর অ্যাকাডেমির স্কলারদের কাছে জানিয়ে আসলেন। ৯২৮ সালে এক্সিলার্ক ডেভিডের ওকালতিতেই প্রথম বিদেশী হিসেবে সাদিয়া ব্যাবিলনের অ্যাকাডেমির গাওন হলেন। ইয়েমেনের ইহুদীদের ওপর সাদিয়া গাওনের প্রভাব ছিল নজিরবিহীন।



দশম শতকের বাগদাদে খলিফা আন্তরিকভাবে বরণ করছেন সাদিয়া গাওন ও এক্সিলার্ক ডেভিড বেন জাক্বাইকে © Beth Hatefutsoth Permanent

সাদিয়া গাওন তাওরাতের অনুবাদ করেন ইহুদী আরবিতে, অর্থাৎ হিব্রু হরফে আরবি লিখে। সাথে তিনি ইহুদী আরবিতে তাফসিরও করে দেন। অবশ্য তিনি তার বইগুলো হিব্রুতে যেমন লিখতেন, তেমন আরবিতেও লিখতেন। ফলে আরবের ইহুদীরা আরও সহজে তাওরাত পাঠ করতে শুরু করল।

৯৪২ সালে ৬০ বছর বয়সে ব্যাবিলনে অসুস্থ হয়ে মারা যান সাদিয়া গাওন।

কারাইটদের কথায় ফিরে আসা যাক। প্রথম ক্রুসেডের সময় জেরুজালেমের ইহুদী সমাজ ধ্বংস হয়ে যাওয়ার পর কারাইটদের জ্ঞানচর্চা চলে যায় বাইজান্টিন সাম্রাজ্যে। আর এরপর সেখান থেকে ইহুদীরা চলে যায় বর্তমান রাশিয়ার ক্রিমিয়া, পোল্যান্ড আর লিথুনিয়াতে। অবশ্য মিসরের কারাইটরা বহাল তবীয়তেই টিকে থাকে। তবে একাদশ শতকের পর কারাইট আন্দোলন আর টিকে থাকেনি, ধীরে ধীরে তাদের শক্তি নিঃশেষ হয়ে আসে। ক্ষুদ্র একটি অংশ হিসেবেই তারা বাস করতে থাকে ইহুদী সমাজে, মূলধারার ইহুদীরাও আর তাদের পাত্তা দেয়নি।

תורינו הדדת יקרת עפרת הגהרת מרין ורבינו מרין נגיד יע
 ראשנו מנהיג דורינו הורינו והדרינו אברהם הרב המוכהק הפטי
 החוקר המערבי דול הרבנים יחיד הדור וכלאו ממזרחי יעלש
 ונבוא הנגיד הגדול נגיד עם יע צבאות ידום הדור ונגיד לכבודו
 פרימסה אשראך בערצפין כידכאן עבד וחריד במלכהם ועמלהם
 מדה מן אטון כלמה יחרגווא יום מא למבלג מקדארה במסה
 עשרה דינאר כאקדצהם יחיה בעץ אשוראך יאקאמה
 עגדהם מדה וגמיעהם עארפין בהא כלמה קוואוא ארכאן יום
 מא כצרת ארכאן לא טך אהה נפוסהם פי יד הדא למבלג
 לעאחבה פועהם מן יכר הדא ומנהם יגלחהו בהלא אנה
 יחאסס אכאקין יפריא פריא מא אדיליון פולד
 ושכיל פולא מן השמים

אנאב

מן עמנו מלש יקרת בנדיג מא אכאקין
 אמר מן מנדר יואל ומנהם יגלחהו בהלא אנה
 במלכיו יואל שבעה במנהם יגלחהו בהלא אנה
 שבעה במנהם יגלחהו בהלא אנה

হিব্রু হরফে আরবি

অধ্যায় ১৪

আন্দালুসিয়ার দিনগুলিতে



৭৫০ সালের দিকে উমাইয়াদের হাত থেকে মুসলিম বিশ্বের ক্ষমতা চলে যায় আব্বাসীয় খিলাফাতের হাতে। তবে স্পেনে (মোটামুটি ‘আন্দালুসিয়া’ বলা যায়) স্বাধীন উমাইয়া শাসন চলতে লাগলো। যত সময় এগুতে লাগলো, সীমান্তবর্তী এলাকাগুলোর ওপর আব্বাসীয়দের নিয়ন্ত্রণ কমে যেতে লাগলো। ৮৫০ সালের পর তুর্কি যোদ্ধাদের সহায়তায় আব্বাসীয়রা ক্ষমতা বজায় রাখে, খলিফার অধীনে তুর্কি জেনারেলরাও ছিল ক্ষমতাবান। ৯০৯ সালে তিউনিসিয়ার শিয়া ফাতিমিরা উত্তর আফ্রিকা দখল করে নেয়। ৯৬৯ সালে তারা জয় করে নেয় মিসর আর ফিলিস্তিন। দশম শতকের শেষ দিকে ইসলামি সাম্রাজ্য নানা সুপারপাওয়ারে ভাগ হয়ে যায়, যেমন সুন্নি আব্বাসীয় আর শিয়া ফাতিমি খেলাফত। তাদের মাঝে দ্বৈরথ লেগেই থাকত।

ইসলামি সাম্রাজ্যের এই শিয়া-সুন্নি বিভেদ ও অনৈক্যের সাথে সাথে র‍্যাবাইনিক ইহুদীবাদের কুদিন আসতে থাকে। এতদিন পর্যন্ত ব্যাবিলনের অ্যাকাডেমিয়া সব ইহুদীদের ওপর কর্তৃত্ব করত, কিন্তু এখন সেটি নানা জায়গায় বিকেন্দ্রীকরণ হতে থাকে। স্থানীয় নানা শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে ইহুদীরা তাদের শাস্ত্র শিক্ষা দিতে লাগলো। র‍্যাবাইরা বেশি গুরুত্ব দিতে লাগলেন পবিত্র ভূমির ওপর, টাইবেরিয়াসে র‍্যাবাইনিক অ্যাকাডেমি গঠিত হলো। সেখানে বেন আশের আর বেন নাফথালির মতো স্কলাররা ছিলেন যারা ‘মাসোরা’ (מסורה) অর্থাৎ ‘মৌখিক তাওরাতের পরম্পরা’-তে সিদ্ধহস্ত ছিলেন। তারা হিব্রু যতিচিহ্ন ও জের জবর

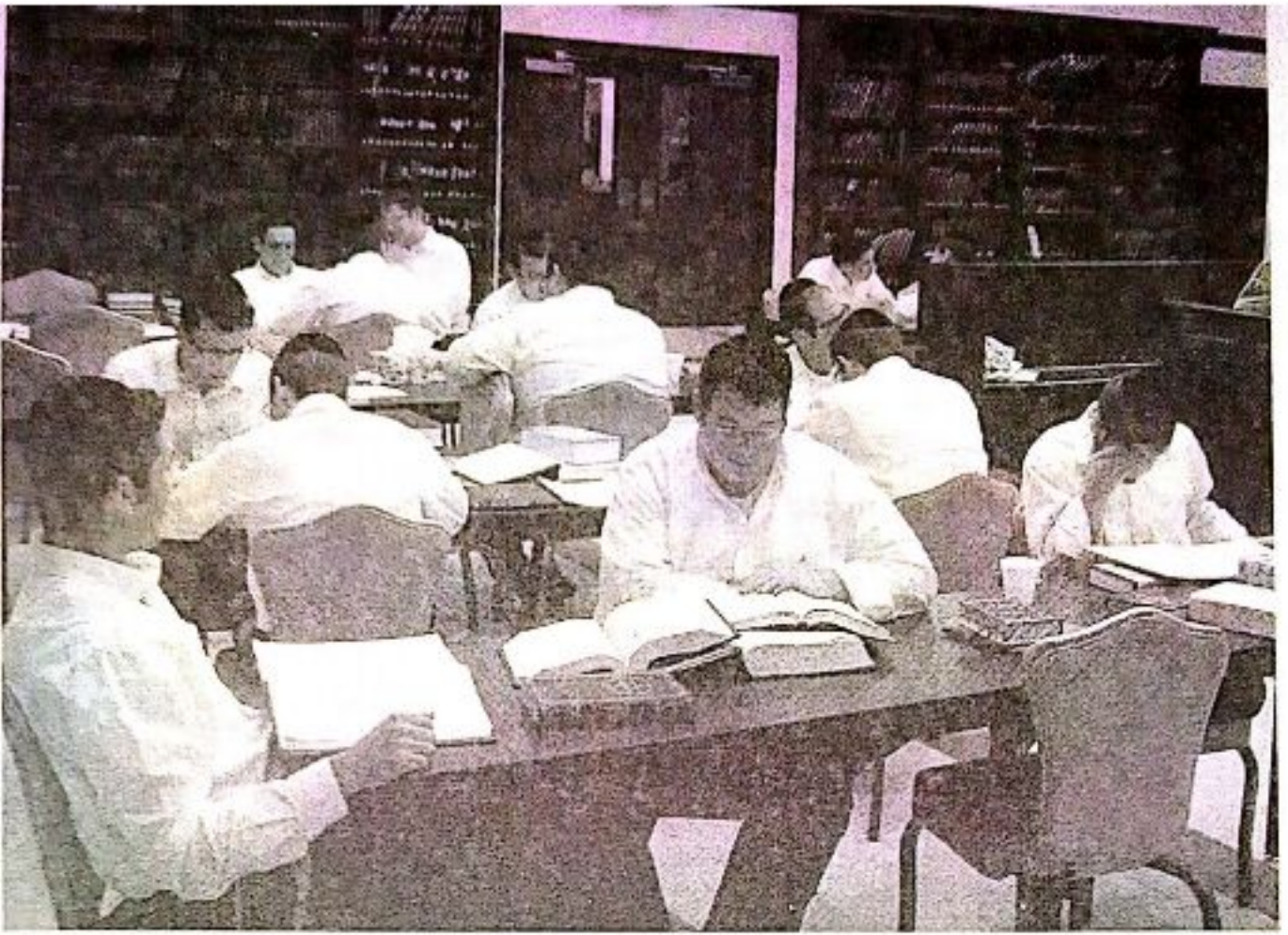
পেশের সমতুল্য চিহ্নগুলো যোগ করেন হিব্রু বাইবেলে। তাদেরকে ‘মাসোরী’
স্কলার বলা হয়।

নবম শতকে ব্যাবাইদের অ্যাকাডেমিকে রামলায় নিয়ে যাওয়া হয়, আর
এরপর জেরুজালেমে। মিসর, ইয়েমেন আর সিরিয়ার ইহুদী সমাজের সমর্থন ছিল
জেরুজালেমের প্রতিষ্ঠানের প্রতি, কিন্তু একাদশ শতকে তুর্কি আর খ্রিস্টান
আক্রমণের কারণে এর প্রভাব কমতে থাকে।



প্রাক-মাসোরি হিব্রু লেখা, তখন কোনো অতিরিক্ত চিহ্ন ব্যবহার করা হতো না

মিসরের ইহুদী সমাজেরও পরিবর্তন আসে এ সময়টাতে। ফাতিমিদের
অধীনেও ভালো ছিল ইহুদীরা। দশম শতকের শেষ নাগাদ কায়রোতে একটি
‘ইয়েশিভাহ’ (ישיבה) অর্থাৎ ইহুদী মাদ্রাসা প্রতিষ্ঠা করা হয়, এখানে তাওরাত,
হালাখা বা ইহুদী আইন, তালমুদ, ইত্যাদি শিক্ষা দেয়া হতো।



ইহুদীদের বর্তমান ইয়েশিভাহ

তিউনিসিয়ার মরুশহর কায়রাওয়ানেও গড়ে ওঠে ইহুদী শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান। কারা প্রতিষ্ঠা করতেন এগুলো? মূলত ধনী ইহুদীদের পাশাপাশি প্রখ্যাত তালমুদবেত্তাদের সহায়তায় গড়ে ওঠে এগুলো, তারা ইহুদী বিজ্ঞানী আর দার্শনিকদের সহায় ছিলেন। মরক্কোর ফেজ শহরে সে সময়ের সবচেয়ে প্রখ্যাত স্কলারের আবির্ভাব ঘটে, যার নাম আইজ্যাক আলফাসি (১০১৩-১১০৩)। তিনি গবেষণা আর সংকলন করেন ইহুদী আইনসমগ্র।

কিঞ্চ সত্যি বলতে, ইহুদীরা এ সময় সর্বোচ্চ উন্নতি করে স্পেনে তথা আন্দালুসিয়ায়। দশম শতকের স্প্যানিশ রাজদরবারে উমাইয়া খলিফা তৃতীয় আব্দ আল-রাহমান (৯১২-৯৬১) এবং দ্বিতীয় হাকাহ (৯৬১-৯৭২) দরবারের চিকিৎসক হিসেবে নিয়োগ দেন ইহুদী কূটনীতিক হিসদাই ইবনে শাপরুতকে (৯১৫-৯৭০)। তিনি একই সাথে স্থানীয় ইহুদী সমাজের নেতাও ছিলেন, নানা ইহুদী প্রতিষ্ঠানে টাকা দিতে তিনি। উমাইয়া খেলাফতের রাজধানী তখন ছিল কর্ডোভাতে। ইহুদী সমাজ উন্নতির শিখতে পৌঁছায় কর্ডোভায়, সেখানে জমায়েত হয় নানা ইহুদী কবি, ব্যাকরণবিদ, আর ইয়েশিভাহ ছাত্রের।

একাদশ শতকে উমাইয়া খেলাফত ভেঙে যেতে শুরু করলে, মুসলিম সমাজের স্থানীয় শাসকরা তাদের দরবারে ইহুদীদের নিয়োগ দিতে শুরু করে। এর

মধ্যে একজন ইহুদী ছিলেন গ্রানাদার সামুয়েল ইবনে নাগরেলা (৯৯৩-১০৫৬)। তিনি গণিত আর দর্শনে বিজ্ঞ ছিলেন, হিব্রু আর আরবিতে চমৎকার লেখালেখি করতেন। তিরিশ বছর ধরে তিনি গ্রানাদার উজির পদে ছিলেন। সামরিক নানা অভিযানে জয়লাভ করেন তিনি, সে নিয়ে হিব্রু কবিতাও রচনা করে ফেলেন। তিনি ছাড়াও আরও কয়েকজন ইহুদী স্কলার সে সময় স্পেনের বাসিন্দা ছিলেন, তারা বাস করতেন সেভিয়া, সারাগোসা, টলেডো, লুসেনা আর কালাদায়ুদ অঞ্চলে।

১০৮৬ সালে আল-মুরাবিতুন (المُرَابِطُونَ) (আলমোরাভিডরা) উত্তর আফ্রিকা থেকে এসে স্পেনের খ্রিস্টানদের আক্রমণ করে, আর সেই সাথে ইহুদীদেরকেও। প্রধানত সুন্নি এই সাম্রাজ্য আব্দুল্লাহ ইবনে ইয়াসিনের হাতে শুরু হয়। একে ‘বর্বর’ মুসলিম সাম্রাজ্যও বলা হয়, শব্দটা আসলে গ্রিক ‘বারবারোস’ (βάρβαρος) থেকে এসেছে, যার মানেই ‘বর্বর’। তাদের সাম্রাজ্য টিকে ছিল ১১৪৭ সাল পর্যন্ত।



আলমোরাভিড দিনার

ইহুদীরা অবশ্য এর আগেই খুব শ্রীষ্মই তাদের আগের নিরাপত্তা ফিরে পেল। ইহুদীদের পরের প্রজন্মো জন্ম নেন জনপ্রিয় কয়েকজন কবি, দার্শনিক, আর ধর্মীয় ব্যক্তিত্ব।

১০৮৬ সালে খ্রিস্টানদের হাতে আন্দালুসের পতন যখন প্রায় অবশ্যজ্ঞাবী হয়ে পড়ে, তখন আলমোরাভিডদের প্রচেষ্টায় কাস্টিল আর আরাগনের যৌথ খ্রিস্টান বাহিনীকে ঠেকিয়ে দেয়া হয়। কিন্তু দ্বাদশ শতকের মাঝামাঝিতে এসে ইহুদীদের স্বর্ণযুগ শেষ হয়ে গেল। তখন খ্রিস্টানদের হাতে স্পেন আসলেই পতিত হতে পারে, এমনটা ভেবে স্পেনকে বাঁচাতে মরক্কো থেকে ‘বর্বর’ আল-মোহাদ খিলাফাত (الموحّدون) এসে পড়ে স্পেনে, তারা ১১৪৭ সালে মরক্কোর মারাক্কেশ (مراكش) শহরে খতম করে আলমোরাভিডদের অষ্টম ও শেষ রাজা ইসহাক ইবনে আলিকে। এরপর থেকে মরক্কো ও আন্দালুসের শাসক আলমোহাদ খেলাফত।



আলমোহাদ শাসক আবু ইয়াকুব ইউসুফের আমলের মুদ্রা

আলমোহাদরা ইহুদী সমাজেও উৎপাত করল। ইহুদীদের জোরপূর্বক ইসলাম গ্রহণ করতে হলো, তাদের অ্যাকাডেমি আর সিনাগগ বন্ধ করে দেয়া হলো। কিছু ইহুদী গোপনে নিজের ধর্ম পালন করতে লাগলো। বাকিরা মধ্যপ্রাচ্যে বা অন্য খ্রিস্টান শাসিত স্প্যানিশ এলাকায় চলে গেল।

ত্রয়োদশ শতকের শুরুতে আলমোহাদদের ক্ষমতা শেষ হয়ে এলো। কারণ তখন খ্রিস্টান বাহিনীগুলো স্পেনের প্রাক্তন মুসলিম অধ্যুষিত বেশিরভাগ এলাকাই দখলে নিয়ে নিল।

মুসলিম জাহানের অন্যান্য এলাকাতেও ইহুদীদের পরিস্থিতি বদলে যেতে থাকলো। আলমোহাদদের ইহুদী উৎপাতের সময় অনেকেই মিসরে পালিয়ে যায়, যার মধ্যে অন্যতম ছিলেন প্রখ্যাত সেফার্ডি ইহুদী র‍্যাবাই ও দার্শনিক মোজেস মাইমনিদিজ (১১৩৮-১২০৪)। তার আসল নাম আবু ইমরান ‘মূসা বিন মায়মুন’ বিন উবাইদুল্লাহ আল-কুরতাবি (بن ميمون بن عبيد الله القرطبي ابو عمران)

(মুসী)। তিনি তার ইহুদী আইন নিয়ে গবেষণার জন্য বিখ্যাত ছিলেন। মিসরের ইহুদী সমাজের প্রধান হিসেবে অধিষ্ঠিত হন তিনি। আজকে তাকে ইহুদী ধর্মের সর্বকালের শ্রেষ্ঠ র‍্যাবাইদের একজন বলা হয়। তার চৌদ্দ খণ্ডের ‘মিশনেহ তোরাহ’ তালমুদি আইনের ভিত্তিপ্রস্তর হিসেবে কাজ করে। মৌখিক তাওরাতের একজন স্কলারও ছিলেন তিনি। মুসলিম বিজ্ঞানী আল-ফারাবি, ইবনে সিনা আর ইবনে রুশদের দ্বারা প্রভাবিত ছিলেন তিনি। মাইমনিদিস কিন্তু সুলতান সালাউদ্দিন তথা সালাদিনের ব্যক্তিগত চিকিৎসক হিসেবেও কাজ করেছিলেন! তিনি ইসলামের শেষ নবী হযরত মুহাম্মাদ (সা)-কে নবী না মানলেও তাকে মেসায়্যা আগমনের ঘোষক বা পথ তৈরিকারক হিসেবে বলতেন, ঠিক যেমন খ্রিস্টধর্মে মেসায়্যা বা খ্রিস্ট ঈসা (আ)-এর ক্ষেত্রে ঘোষক বা পথ তৈরিকারক জন দ্য ব্যাপটিস্ট বা ইয়াহিয়া (আ)।



মোজেস মাইমনিদিজ

ক্রুসেডের সময় ইহুদী সমাজের একটি অংশ বেঁচে গিয়েছিল ফিলিস্তিনে। পবিত্র ভূমি ভ্রমণ করতে যাওয়া ইহুদীরা তাদের সাথে যোগ দিলে সে জনসংখ্যা আবারও বাড়ে।

উত্তর আফ্রিকার ইহুদী সমাজ সুন্দরমতোই তাদের ধর্মপালন চালিয়ে গেল আলমোহাদদের প্রস্থানের পর। আগের চেয়ে বরং উন্নতিই করলো। স্পেনের খ্রিস্টান আরাগন রাজ্যের সাথে সাহারা মরু দিয়ে সোনার ব্যবসার মাধ্যমে এ অঞ্চলের নানা ইহুদী ব্যবসায়ী সম্পর্ক স্থাপন করল।

অন্যদিকে ব্যাবিলনিয়ার সর্বশেষ গুরুত্বপূর্ণ গাওন শেরিরা বার হানিনা (۷۱ ۸۷۷۷ ۸۷۷۷) ১০৩৮ সালে মারা যাবার পরও ইহুদী সমাজ ভালোই টিকে ছিল। কিন্তু ত্রয়োদশ শতকে (১২৫৮) হলাকু খান বাগদাদ ধ্বংস করেন, এটা বাগধারার মতো করে আমরা সবাই জানি। মঙ্গোলদের এই ব্যাবিলনিয়া অর্থাৎ ইরাক ধ্বংস করে দেয়ার মধ্য দিয়ে এ অঞ্চলের ইহুদীবাদ এক কথায় ধ্বংসেই যায়।



হলাকু খান বাগদাদ ধ্বংস করে দেন

অধ্যায় ১৫

মধ্যযুগের খ্রিস্টান ইউরোপে



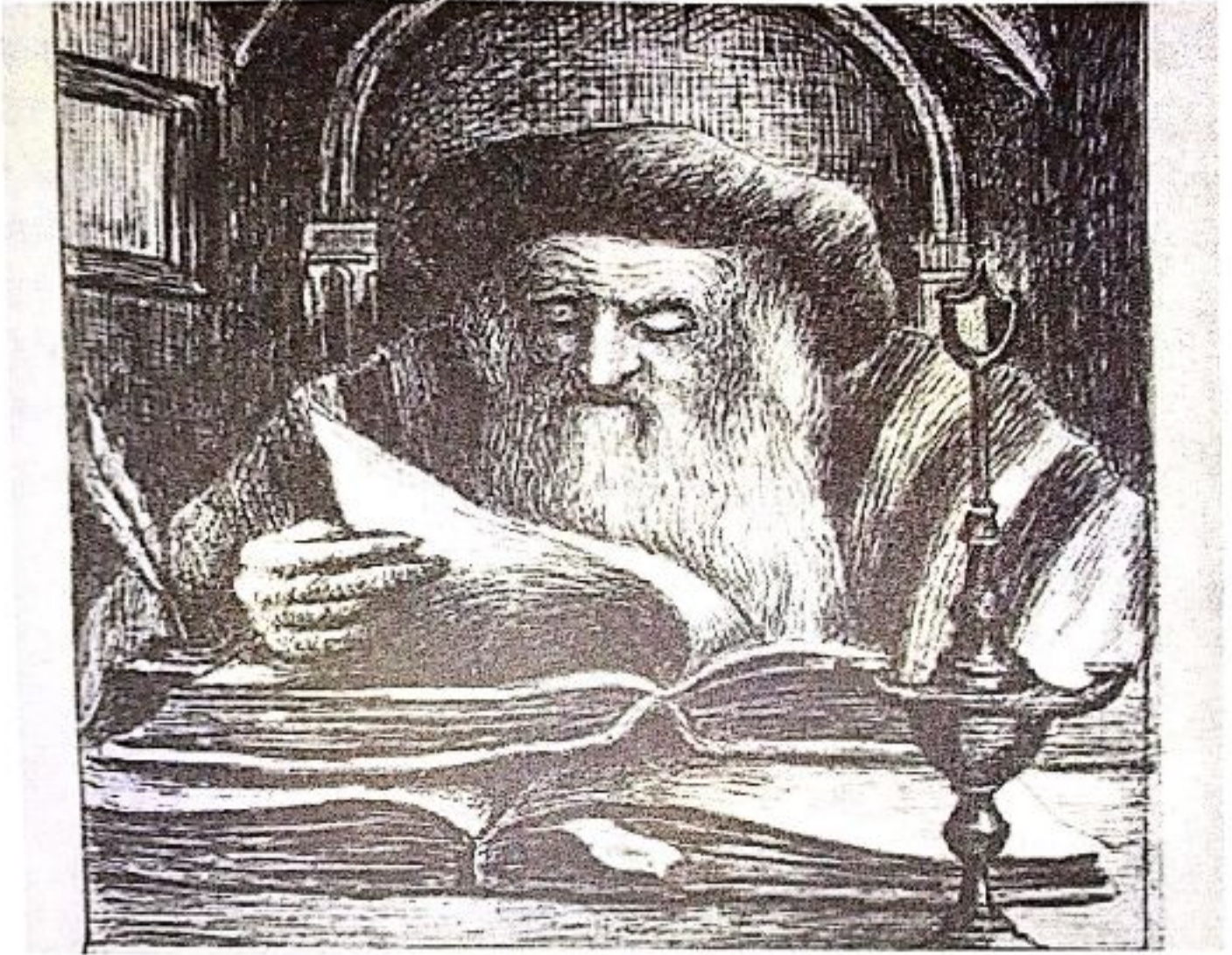
সপ্তম শতকে মুসলিমরা যখন তাদের অভিযানগুলো পরিচালনা করতে শুরু করে, তখনও কিন্তু তারা পুরো ইউরোপে সাম্রাজ্য বিস্তার করতে পারেনি, তাদের বিজয় মধ্যপ্রাচ্যের দিকেই সীমাবদ্ধ ছিল তখন পর্যন্ত। ইউরোপের দেশগুলো তাই বাইজান্টিন সাম্রাজ্যের মতো খ্রিস্টান শাসনের অধীনে ছিল। একই কথা প্রযোজ্য সেখানকার ইহুদীদের ক্ষেত্রেও।

পশ্চিম ইউরোপের ইহুদী সমাজ তখন ছোট ছোট ছিটমহলের মতো স্বয়ংসম্পূর্ণ এলাকা গড়ে নিয়ে বসবাস করত। স্থানীয় ব্যবসার কাজে তারা তখন একদম সিদ্ধহস্ত। ইসলামি সাম্রাজ্যে ইহুদীদের এক্সিলার্ক প্রথা চালু থাকলেও খ্রিস্টান সাম্রাজ্যে তা ছিল না একদমই। ফলে পুরো খ্রিস্টান সাম্রাজ্যের সকল ইহুদীদের কেন্দ্রীয় নেতার অভাবে একেক এলাকার ইহুদী সমাজ সম্পূর্ণ একক ইউনিট হিসেবে বসবাস করত।

আশকেনাজি ইহুদীদের এরকম ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র সমাজকে ডাকা হতো একেকটি ‘ক্বাহাল’ (קהל) বলে। একেক ক্বাহালের নিজস্ব নিয়মরীতি, নিজস্ব বিচার আদালত। ১৮৪০ সালের দিকে এসে বিলুপ্ত হওয়ার আগ পর্যন্ত আশকেনাজি ইহুদীদের এমন স্বায়ত্তশাসিত ক্বাহাল সরকার প্রচলিত ছিল। এই ক্বাহাল সমাজে স্বাধীনভাবে বিভিন্ন ইহুদী বিদ্যালয় গড়ে ওঠে নানা জায়গায়, যেমন ধরুন রাইন নদীর আশপাশের পশ্চিম জার্মানি তথা রাইনল্যান্ডের মাইনৎস (Mainz) ও ওয়ার্মস (Worms), আর উত্তর ফ্রান্সের ত্রোয়া (Troyes) ও সাঁস (Sens) এলাকায়।

১৪৮ ইসরাইলের উত্থান-পতন

মাইনৎস থেকে বিখ্যাত ইহুদী স্কলার র্যাবাই গেরশোম (৯৬০-১০২৮) এবং ত্রোয়া থেকে মধ্যযুগের বিখ্যাত ব্যাখ্যাবিদ সলোমন বেন আইজ্যাকের আবির্ভাব হয়েছিল। এই সলোমন পরিচিত ‘রাশি’ (Rashi) নামে, যার গ্রন্থগুলো আজও পঠিত।



সলোমন বেন আইজ্যাক তথা রাশি

পরের প্রজন্মগুলোতে তালমুদের অধ্যয়ন বেড়ে যায়। রাশির পরিবারের কয়েকজনের পাশাপাশি উত্তর ফ্রান্স ও জার্মানির স্কলাররা নতুন আঙ্গিকে তালমুদের ব্যাখ্যা দিতে শুরু করেন। পঞ্চম ও ষষ্ঠ শতকের ইসরাইলি কবিতার ছন্দের অনুকরণে আশকেনাজি ইহুদীরা এ সময় কবিতা রচনা করতে শুরু করে। তবে ক্বাহাল নিয়ে ষড়যন্ত্র তত্ত্বের অভাব ছিল না। উনিশ শতকে জ্যাকব ব্রাফম্যান নামের এক রুশ ইহুদী সেখানকার মিনস্ক ক্বাহালের ট্যাক্স এজেন্টদের সাথে বিতণ্ডায় জড়িয়ে ইহুদী ধর্ম ত্যাগ করেন এবং এক পর্যায়ে ধর্মান্তরিত হয়ে রুশ অর্থোডক্স চার্চের সদস্য হন। তিনি প্রতিশোধ নেয়ার জন্য উঠে পড়ে লাগেন, এবং একাধিক বই রচনা করেন ১৮৬৮ ও ১৮৬৯ সালে। বইগুলোতে তিনি বলেন, ক্বাহাল একটি আন্তর্জাতিক নেটওয়ার্ক, যার উদ্দেশ্য হলো খ্রিস্টানদের ধনসম্পদ ইহুদীদের নিজেদের করে নেয়া। এই তত্ত্ব লুফে নেয় রাশিয়ার ইহুদী-বিরোধী

প্রকাশনাগুলো। ১৮৮১ সালে ব্রাফমানের ক্বাহাল তত্ত্ব মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রেও পৌঁছে যায়। সেখানকার সেঞ্চুরি ম্যাগাজিনে তার তত্ত্ব অনূদিত হয়। এর ওপর ভিত্তি করে রচিত হয় 'দ্য প্রোটোকলস অফ দ্য এল্ডার্স অফ জায়োন' নামের ইহুদী ষড়যন্ত্রতত্ত্ব বইটি। ১৯৩৩ সালে ক্বাহালের সাথে ইলুমিনাতিরও সংযোগ দেখানোর চেষ্টা করা হয়।

PRÆMONITUS PRÆMUNITUS

The Protocols

of the

WISE MEN OF ZION



Translated from
The Russian to the English Language for the
Information of all TRUE AMERICANS
& to Confound Enemies of Democracy &
the REPUBLIC also to Demonstrate
the Possible Fulfillment of Biblical
Prophecy as to
WORLD DOMINATION
by the
CHOSEN PEOPLE

Published by The Beckwith Company at 299
Madison Avenue, City of New York

সে যাক, বলছিলাম একাদশ শতকের ইউরোপের ক্রুসেডের কথা। সেখানকার এমন অনুকূল পরিবেশ আর জ্ঞানের বিকাশের মধ্যেও মাঝে মাঝে দেখা দিত ইহুদীবিদ্বেষ। ১০৯৫ সালে পোপ দ্বিতীয় আর্বার্থ যখন ফার্স্ট ক্রুসেডের ঘোষণা দেন, তখন জার্মানির ওয়ার্মস আর মাইনৎসের মতো শহরের ইহুদীদের ওপর খ্রিস্টীয় জনতা ঝাঁপিয়ে পড়ে। এসব ক্রুসেডের ইহুদীরা খ্রিস্টধর্মে ধর্মান্তরের চেয়ে মৃত্যুকে বরণ করে নেয়া ভালো মনে করলো। তাই দলে দলে ইহুদীরা মারা পড়তে লাগলো। ৭০০ ইহুদী হত্যার কথা জানা যায় মাইনৎসে। ইহুদী মায়েরা নিজ হাতে শিশুসন্তানদের কোলে নিয়ে হত্যা করে, এমন বর্ণনাও আছে। যেন 'খতনাহীন' জাতির নির্দয়তার শিকার না হতে হয়। ['ম্যাসাকার অ্যাট মাইনৎস জুয়িশ কমিউনিটি', পৃষ্ঠা ৪০] এমন না যে এসব হত্যাকাণ্ড রাষ্ট্র করেছে, ধর্মোদ্ধ জনতাই করেছে। পরবর্তীতে রাষ্ট্র জোরপূর্বক ধর্মান্তরিত ইহুদীদেরকে তাদের পুরাতন ধর্মে ফেরত যেতে দেয়।



শেখপয়ারের মার্চেন্ট অফ ভেনিসে খলনায়ক হিসেবে দেখানো হয় সুদখোর ইহুদী শাইলককে

ইসরাইলের উত্থান-পতন ১৫১

খ্রিস্টান ইউরোপে একে একে নানা ব্যবসাকার্য থেকে ইহুদীদেরকে জোর করে বের করে দেয়া হচ্ছিল। পরের দুই শতকে ইহুদীরা উচ্চ সুদে ঋণ দেয়ার ব্যবসায় জড়িয়ে পড়ে বেশি করে। এই কড়া সুদে নেয়া ঋণ ফেরত দিতে না পারা খ্রিস্টান জনগোষ্ঠী ভয়ংকর রকমের রেগে যায় ইহুদী মহাজনদের ওপর। এই অর্থনৈতিক কারণের সাথে মধ্যযুগে ইহুদীদের ওপর ক্ষোভের কারণ হিসেবে নতুন করে যোগ হয় ধর্মীয় কারণ। ইহুদীরা যে খ্রিস্টের হত্যাকারী, এই বোধোদয় বুঝি খ্রিস্টানদের নতুন করে হলো; এ কারণ দেখিয়ে সকল ইহুদীকেই এক কাতারে ফেলে দেয়া হলো ইউরোপে।

১১৪৪ সালের দিকে ইংল্যান্ডের নরউইচে রটে গেল, ঈদুল ফিসাখ বা পাসওভারের উৎসবে ইহুদীরা যে রুটি বানায়, তাতে তারা খ্রিস্টান শিশুদের রক্ত ব্যবহার করে। শিশু হত্যাকারী হিসেবে ইহুদীদেরকে দায়ী করা হলো। ১১৭১ সালে ফ্রান্সে এবং ১২৫৫ সালে ইংল্যান্ডের লিংকনে আবারও একই অভিযোগ আনা হয় ইহুদীদের ব্যাপারে।



ইউক্যারিস্ট হোস্ট

যীশুর দ্য লাস্ট সাপারের স্মরণে খ্রিস্টানদের ইউক্যারিস্ট আয়োজনে পবিত্রজ্ঞান করে রুটি খাওয়া হয় আর মদ পান করা হয়। যাকে থ্যাংক্স গিভিংও বলা হয়। খ্রিস্টীয় বিশ্বাস, ইউক্যারিস্ট আয়োজনে সেই মদ আর রুটি যীশুর আক্ষরিক রক্ত-মাংস তুল্য। মোটেও রূপক নয়। এই রুটিকে ‘হোস্ট’ বলা হয়।

এই হোস্টকে অসম্মান করা মানে যীশুকেই অসম্মান করা। ত্রয়োদশ শতকের দিকে ইহুদীদের ব্যাপারে প্রায়ই অভিযোগ করা হতো, তারা হোস্টকে ক্ষতবিক্ষত করেছে যীশুর দেহে অত্যাচার করার জন্য।

তাছাড়া, ঋণের বন্ধকের বদৌলতে চার্চগুলোর মালিকানা ইহুদীদের কাছে চলে যেতে থাকায় ক্ষুব্ধ হতে থাকে খ্রিস্টানরা। ১২১৫ সালে চতুর্থ ল্যাটেরান কাউন্সিল অর্থাৎ রোমান চার্চের কাউন্সিলে ঘোষণা করা হলো, এখন থেকে ইহুদী পুরুষ ও নারীদের নির্দিষ্ট পোশাক পরতে হবে, যেন তাদের দেখলেই চেনা যায়। ইস্টারের পবিত্র সপ্তাহে তারা বাইরে বেরুতে পারবে না। যারা বের হবে, তাদের জন্য অপেক্ষা করবে কড়া শাস্তি।

১২১৬ সালে স্প্যানিশ খ্রিস্টান রাজক সেইন্ট ডমিনিক একটি সংঘ বা অর্ডারের সূচনা করেন, যার নাম ছিল ‘অর্ডার অফ প্রিচারস’। এর সদস্যদের বলা হতো ডমিনিকান। ফ্রান্সে শুরু হওয়া এ ডমিনিকান অর্ডারের ব্যাপারে সম্মতি ছিল পোপ তৃতীয় অনারিয়াসের। এ অর্ডারের সদস্যরা ছিল ফ্রায়ার, নান আর সিস্টাররাও। গসপেল প্রচার আর খ্রিস্টধর্মের বিরোধীদের এক হাত নেয়ার দায়িত্ব হাতে তুলে নেয় তারা। ডমিনিকানরা আছে এখনও, ২০১৮ সালেই ৫,৭৪৭ জন ডমিনিকান সদস্যের কথা জানা যায়। তবে যে যুগের কথা বলা হচ্ছে, অর্থাৎ ত্রয়োদশ শতকে ডমিনিকান অর্ডার ইহুদী সমাজের বিরুদ্ধে উঠে পড়ে লেগে যায়। তারা তালমুদে যীশুর নামে খারাপ কথা থাকার দায়ে তালমুদের সকল কপি পুড়িয়ে দেয়।



ডমিনিকান অর্ডারের চিহ্ন

খ্রিস্টান দেশগুলো থেকে ইহুদীদের বের করে দেয়ার নজিরও আছে। যেমন, ১১৮২ সালে ফ্রান্সের রাজা ফিলিপ অগাস্টাস প্যারিসের কাছের রাজ এলাকা থেকে সকল ইহুদীকে বহিস্কার করেন। তিনি ইহুদীদের সম্পত্তি বাতিল করেন, খ্রিস্টানদের ফেরত না দেয়া সকল ঋণ মওকুফ ঘোষণা করেন। ১১৯৮ সালে ইহুদীদেরকে অবশ্য আবার ফিরিয়ে আনা হয়। তবে তাদেরকে তখন অতিরিক্ত রাজকীয় কর বহন করতে হতো। একটা পর্যায়ে তারা রাজার সম্পত্তিতেই পরিণত হয়।

পরের শতকে, ইংল্যান্ডে ইহুদীদের ওপর উচ্চ কর আরোপ করা হয় এবং ১২৯০ সালে ইংল্যান্ডের পুরো ইহুদী সমাজকেই বহিস্কার করা হয়। কয়েক বছর পর ফ্রান্সের রাজা চতুর্থ ফিলিপও একই কাজ করলেন তার দেশের ক্ষেত্রে।



ফ্রান্সের রাজা চতুর্থ ফিলিপ

ত্রয়োদশ শতকের শেষ দিকে জার্মানির ইহুদীদের ওপর আক্রমণ বেড়ে গেল। তাদের সম্মানিত র‍্যাবাই মেয়ারকে ধরে নিয়ে যাওয়া হয়। তিনি জেলখানায় মারা যান। ১২ বছর পর, জার্মান লোকেরা ইহুদীদের ১৪০টি এলাকা ধ্বংস করে দেয়।

পরের শতকে একটি অদ্ভুত অভিযোগ আনা হয় ইহুদীদের নামে। তারাই নাকি প্লেগ এনেছে, তাদের কারণেই নাকি ইউরোপে ব্ল্যাক ডেথ হয়েছে! পরের দুই শতক জুড়ে যখন তখন ইহুদীদের ওপর চড়াও হওয়াটা খুব স্বাভাবিক হয়ে দাঁড়ায় ইউরোপে, যেমন স্বাভাবিক হয়ে দাঁড়ায় তাদের খুন করে ফেলাটাও।

Di et audiam incendio postea facere mentionem.



Anno .m. ccc. lxx. septuaginta
erunt iudei et in carceribus
et pulsionibus vniuersaliter

et qd. penitentium in pueris. in con-
tibus in aquis tenere prohibebatur
prout poterant et hoc fecerunt

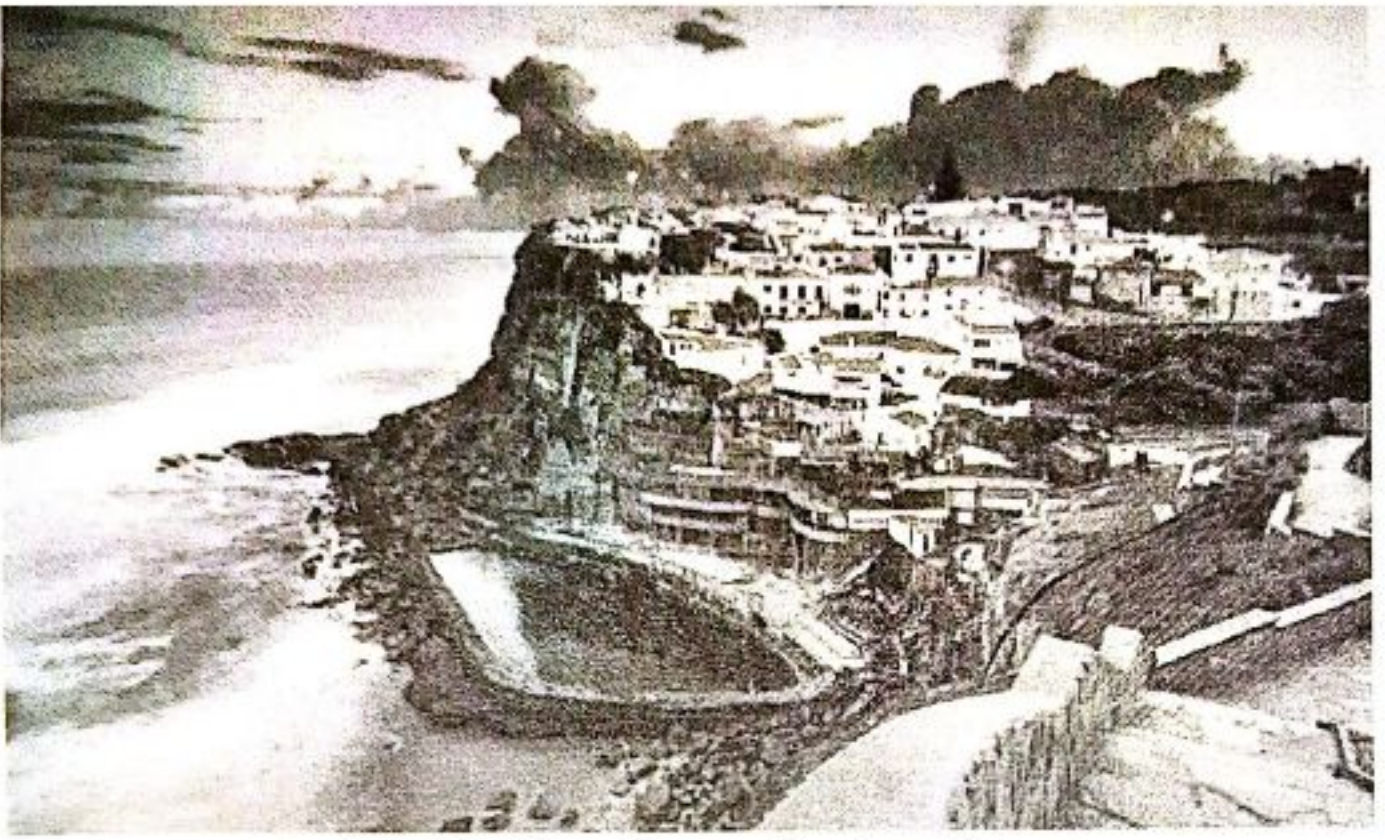
ব্ল্যাক ডেথের সময় নির্যাতন করা হয় ইহুদীদের

স্পেনের খ্রিস্টান রাজত্বে



স্পেন, পর্তুগাল আর এন্ডোরা মিলিয়ে আইবেরীয় বা ইবেরীয় উপদ্বীপ। এটি ইউরোপের দ্বিতীয় বৃহত্তম উপদ্বীপ। খ্রিস্টানরা আইবেরিয়া দখল করে নেয়ার পর স্পেনের সেফার্দী ইহুদীরা মুসলিম ভূমিতে এসে ইউরোপীয় অভ্যাসগুলোর অনেক কিছুই ধরে রাখে। ইহুদীরা নানা রকমের পেশার কাজ করত তখন। দোকানদারি, কারিগর, ওষুধপত্র, মহাজনি, ইত্যাদি। তাদের সমাজে শ্রেণীবৈষম্য ঢুকে যায়, অনেক ইহুদীই তখন বেশ গরিব। তবে একটি ছোট অংশ রাজদরবারে কাজ করতেন প্রশাসনিক ও অর্থনৈতিক উপদেষ্টা হিসেবে।

স্প্যানিশ ইহুদী আর উত্তর ইউরোপের ইহুদীদের মাঝে কিছু মিল ছিল। স্বায়ত্তশাসিত ছোট ছোট ধর্মীয় সমাজকে আরবিতে ‘আলজামা’ বলা হতো, ঠিক যেমনটা হিব্রুতে ‘ক্বাহাল’ বলা হতো। স্পেন আর পর্তুগালের পুরনো নথিপত্র ঘাঁটলে আমরা এ ‘আলজামা’-র হদিস পাই। সেখানে মুসলিমদেরকে ‘মুর’ (The Moors) বলা হতো। ইহুদী ও মুরদের সমাজকে আলজামা বলে ডাকা হতো। প্রত্যেক আলজামারই অর্থনৈতিক আর বিচারভিত্তিক স্বাধীনতা ছিল। তবে খ্রিস্টান শাসনের চেয়ে মুসলিম শাসনের অধীনে ত্রয়োদশ শতকের ইহুদীরা বেশি উন্নতি করে, সোজা কথায়, তারা বেশি আরামে ছিল। ইসলামি শাসনতন্ত্রের অধীনে, স্প্যানিশ বা আন্দালুসিয়ার ইহুদীরা নানা বিষয়ে পড়ালেখা করতে থাকে, হোক সেটা ধর্মীয় কিংবা বিজ্ঞানভিত্তিক। যে সময়টার কথা বলা হচ্ছে, তখনও ফার্দিনান্দ আর ইসাবেলার নৃশংসতা শুরু হয়নি।



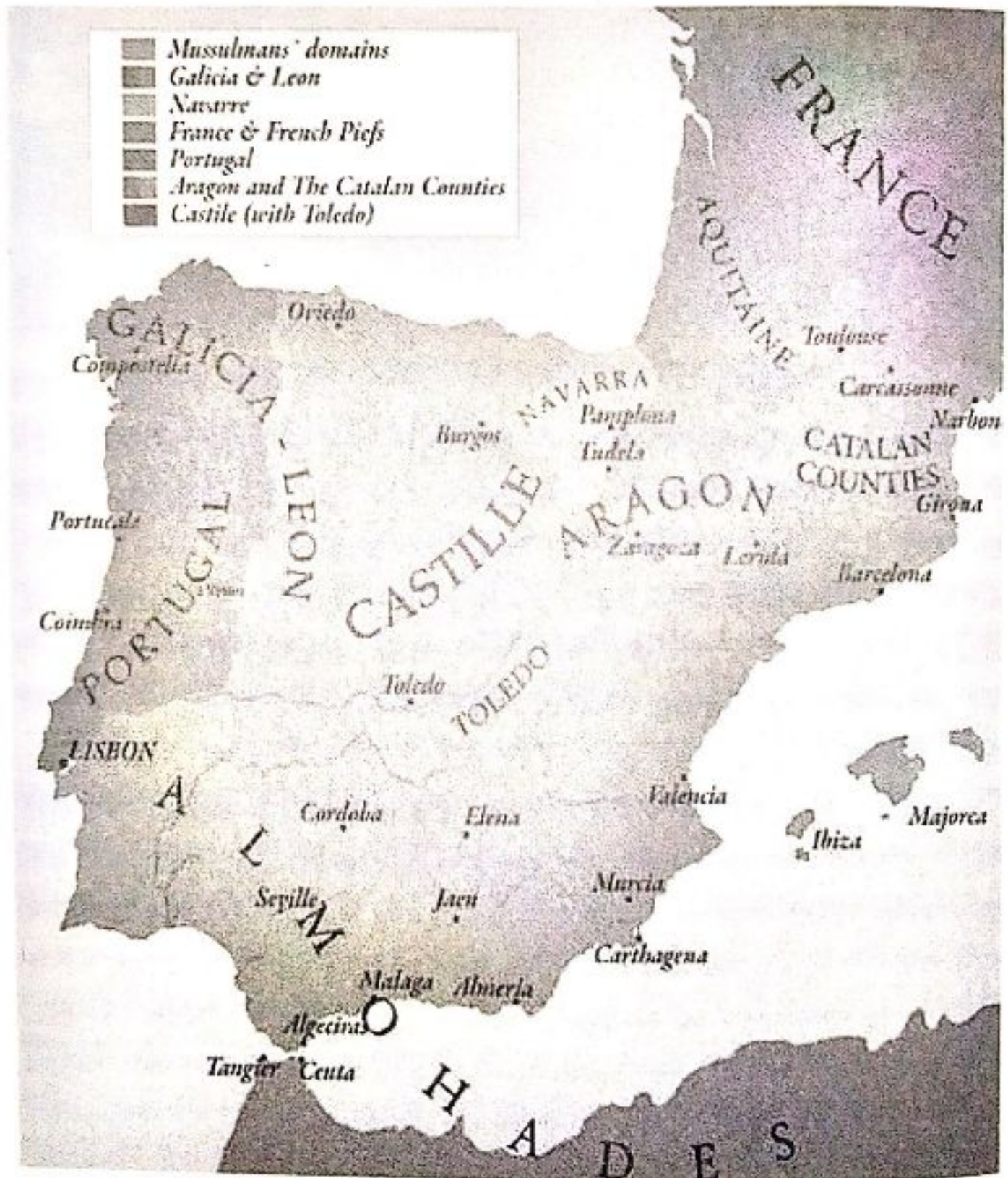
বর্তমান আইবেরীয় পেনিনসুলার তীরবর্তী একটি অঞ্চল

কিছু চতুর্দশ শতকের শেষ দিকে রাজনৈতিক অস্থিরতা বেড়ে যায়। আইবেরীয় অঞ্চলের ক্যাস্টিল (Castile) এবং অ্যারাগন (Aragon) নামের শক্তিশালী দুটো খ্রিস্টান রাজ্যে ইহুদীদেরকে পাইকারিভাবে হত্যা করা শুরু হয়। প্রাণভয়ে হাজার হাজার ইহুদী ১৩৯১ সালে খ্রিস্টধর্ম গ্রহণ করে। দুই দশক পর, ১৪১২ সালে স্প্যানিশ শাসকেরা ক্যাস্টিলীয় আইন প্রয়োগ করতে শুরু করেন, যার ফলশ্রুতিতে খ্রিস্টানদের থেকে ইহুদীদের বসতবাড়ি আর এলাকা আলাদা করে দেয়া হয়।

১৪১৩-১৪১৪ সালে স্পেনের অ্যারাগনের কাতালনিয়াতে অবস্থিত তরতোসা শহরে খ্রিস্টান আর ইহুদীদের মাঝে একটি বাহাস বা বিতর্কের আয়োজন করা হয়। অবশ্য, ইহুদী সূত্রে এ বাহাসকে স্বাধীন বাহাস বলা হয় না, বরং ইহুদীদের দমন করার ষড়যন্ত্রই বলা হয়। এই বাহাসের আলোচ্য বিষয় ছিল ‘মেসায়া’ বা ‘খ্রিস্ট’। ইহুদীদের দিক থেকে অংশ নেন প্রোফিয়াত দুরান, ইয়োসেফ আলবো, আর র্যাবাইনিক স্কলার মোশে বেন আব্বাস এবং আসত্রক হা-লেভি, প্রমুখ; একেকজন একেক ইহুদী সমাজ থেকে আসা। অন্যদিকে খ্রিস্টানদের মধ্য থেকে যারা অংশ নিয়েছিলেন, তাদের মধ্যে বিখ্যাত ছিলেন ভিনসেন্ট ফেরার। বিতর্কের ফলাফল ঘোষণা করা হয় খ্রিস্টানদের পক্ষে। ফলে, অ্যান্টিপোপ বেনেডিক্ট আদেশ করেন যে ইহুদীদের সকল তালমুদের কপি সেপ্সর করার জন্য কর্তৃপক্ষের হাতে

ইসরাইলের উত্থান-পতন ১৫৭

তুলে দিতে হবে। ইহুদীদের ওপর ধর্মান্তরের চাপ তো চলতেই থাকে, তবে সেটা সরকারিভাবে না। তবে আগে যাদেরকে জোর করে খ্রিস্টান করা হয়েছিল, তাদেরকে স্বাধীনতা দেয়া হলো, তারা চাইলে নিজ ধর্মে ফিরে যেতে পারে এখন। খ্রিস্টান সেই বিতর্কিত ভিনসেন্ট ইহুদী সমাজে গিয়ে গিয়ে তার ধর্মীয় বক্তৃতা দিতে থাকলেন। তাকে পরবর্তীতে ক্যাথোলিক চার্চ সেইন্ট হিসেবে ঘোষণা করে—সেইন্ট ভিনসেন্ট।



মানচিত্রে তৎকালীন ক্যাস্টিল ও অ্যারাগন



তরতোসা বাহাস ©Johann von Armsheim, 1483

তরতোসার বাহাসের পর যারা খ্রিস্টান হয়ে গেল, তাদের অনেকেই সরকারি উচ্চপদে চাকরি পেল। ইহুদী থেকে যারা খ্রিস্টান হয়েছিল তাদেরকে ডাকা হতো ‘কনভার্সো’ (converso)। আর যারা নিজের ধর্ম ধরে রাখলো, তারা নতুন করে ইহুদী সমাজকে সংস্কার করতে লাগলো। আলজামাগুলো নতুন করে গড়া হলো, ক্যাস্টিলের নানা জায়গায় নতুন নতুন ইহুদী সমাজের উত্থান হলো।

পঞ্চদশ শতকে ইহুদী-বিরোধী অনুভূতি আবারও জেগে উঠলো স্প্যানিশ খ্রিস্টানদের মাঝে। প্রথম দিকে এই ঘৃণা কেবল কনভার্সোদের বিরুদ্ধেই ছিল, ইহুদী থেকে খ্রিস্টান হওয়া এ লোকগুলো কর সংগ্রাহকের কাজ করত। তাদের প্রতি এ বিরুদ্ধাচারণের পেছনে যুক্তি হিসেবে বলা হতো, এরা মন থেকে খ্রিস্টান হয়নি। যারা গোপনে ইহুদী রয়ে গেছে বলে প্রমাণ পাওয়া যেত বা সন্দেহ করা হতো তাদেরকে ‘মারানো’ (marrano) বলা হতো। এটা কেবল ইহুদীদের

ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য না, বরং নির্যাতিত মুসলিমদের ক্ষেত্রেও একই কথা। তাদের মাঝেও যারা প্রকাশ্যে খ্রিস্টধর্ম গ্রহণ করেছে নির্যাতনের হাত থেকে বাঁচতে, কিন্তু গোপনে ইসলাম পালন করে গিয়েছে, তাদেরকেও ‘মারানো’ ডাকা হতো।

১৪৭৪ সাল থেকে ক্যাস্টিলের রানী ছিলেন ইসাবেলা, আর ১৪৭৯ সাল থেকে অ্যারাগনের রাজা হন ফার্দিনান্দ। এ দুজনে স্বামী স্ত্রী হওয়াতে, ইসাবেলা যেমন একই সাথে অ্যারাগনের রানী ছিলেন, তেমনই ফার্দিনান্দ ছিলেন ক্যাস্টিলের রাজা, অন্তত ১৫০৪ সালে ইসাবেলা মারা যাওয়া পর্যন্ত। এরা দুজন খ্রিস্টান ব্যানারে একত্রিত করেন স্পেনকে, এ কারণে অনেকসময় ইসাবেলাকে স্পেনের প্রথম রানীও বলা হয়। তাদেরকে একত্রে ক্যাথোলিক মনार्ক (সম্রাট-সম্রাজ্ঞী) ডাকা হতো, পোপ চতুর্থ আলেকজান্ডার তাদেরকে এ উপাধি দেন। গত শতকে, ১৯৭৪ সালে তাদেরকে ক্যাথোলিক চার্চ ‘দৈশ্বরের সেবক’ উপাধি দেয়। তাদের কথা আনার কারণ, একটু আগে বলা সেই ‘মারানো’ ইস্যুতে তারা নাক গলাতে শুরু করেন রাজা-রানী হিসেবে। সরকারিভাবে ১৪৮০ সালে এ দুজন ‘মারানো’ হবার অভিযোগ সত্য কি না, তা যাচাইয়ের নামে ইতিহাসের কালো অধ্যায় ‘ইনকুইজিশন’-এর সূচনা করেন।



থানাদাতে রানী ইসাবেলার ভাস্কর্য ©Felipe Bigarny

মুসলিমদের পাশাপাশি হাজার হাজার ইহুদী থেকে খ্রিস্টান হওয়া কনভার্সোকে সন্দেহের বশেই শাস্তি দেয়া শুরু হলো। যারা অনুতপ্ত হলো না, তাদেরকে পুড়িয়ে মারা হলো। ১৪৮০-র দশকে, কয়েকজন ‘মারানো’ এক খ্রিস্টান বালককে খুন করে তার হৃৎপিণ্ড দিয়ে জাদুবিদ্যা করতে গিয়েছিল-এমন অদ্ভুত অভিযোগ এনে জোর করে ইনকুইজিশনে জবানবন্দী আদায় করা হয়েছিল।



গ্রানাদার সাবাতিনি গার্ডেসে ফার্দিনান্ডের ভাস্কর্য

সাম্রাজ্য জুড়ে ইনকুইজিশন শুরুর আগেই ১৪৭৮ সালে ক্যাস্টিলীয় ইনকুইজিশন শুরু হয়ে গিয়েছিল, এবং তাতে পোপের আদেশ বা সম্মতি ছিল। এর চার বছর পর সেভিয়াতে (Seville) প্রথম ট্রাইবুনাঁল কাজ শুরু করে।

ইসরাইলের উত্থান-পতন ১৬১

ট্রাইবুনালের অনুরোধে, ত্রিশ দিনের 'এডিঙ্ট অফ গ্রেস' ঘোষণা করা হলো- এ ত্রিশ দিনের মধ্যে কেউ যদি নিজে এসে অপরাধ স্বীকার করে, তাহলে তাকে অত্যাচার নির্যাতন করা হবে না। তবে তাকে অন্যদের পরিচয় ফাঁস করে দিতে হবে। আর আগের পাপের প্রায়শ্চিত্ত হিসেবে তাদেরকে চাবুকের বাড়ি, লাল-হলুদ (কিংবা কালো) সামেনিতো পোশাক পরে থাকতে হবে, অথবা তাদের সম্পত্তি সরকারের হাতে তুলে দিতে হবে।



ইনকুইজিশনে সাজা পাওয়া সামেনিতো পোশাক পরা একজন

যাদেরকে ‘মারানো’ হিসেবে সন্দেহ করা হতো, এবং অত্যাচারের মুখেও স্বীকার করত না, তাদের শেষ ঠিকানা ছিল আগুনে পুড়ে মরা। অনেক খ্রিস্টানই ভূয়সী প্রশংসা করলো এ নীতির। তাতে নির্দোষ লোক মারা গেলে তাদের কী আসে যায়! ষোড়শ শতকে ফ্রাঞ্চেস্কো পেগনা ঘোষণা করলেন, যদি নির্দোষ লোক এই ইনকুইজিশনে মারাও যায়, তবে তারা খ্রিস্টান শহীদ হবেন।

সরকারি হিসেবে, দেড় লাখ লোককে ইনকুইজিশনে ‘জিজ্ঞাসাবাদ’ করা হয়, আর মৃত্যুদণ্ড দেয়া হয় ৩,০০০ থেকে ৫,০০০ ইহুদী ও মুসলিমকে। তবে আসল সংখ্যাটা ঢের বেশি হবে। যারা শাস্তি পায়, তাদের পরিবারের কেউ কোনোদিন রূপা বা সোনার অলংকার পরতে পারবে না, সরকারি চাকরিও পাবে না— এমন নির্দেশ ছিল।

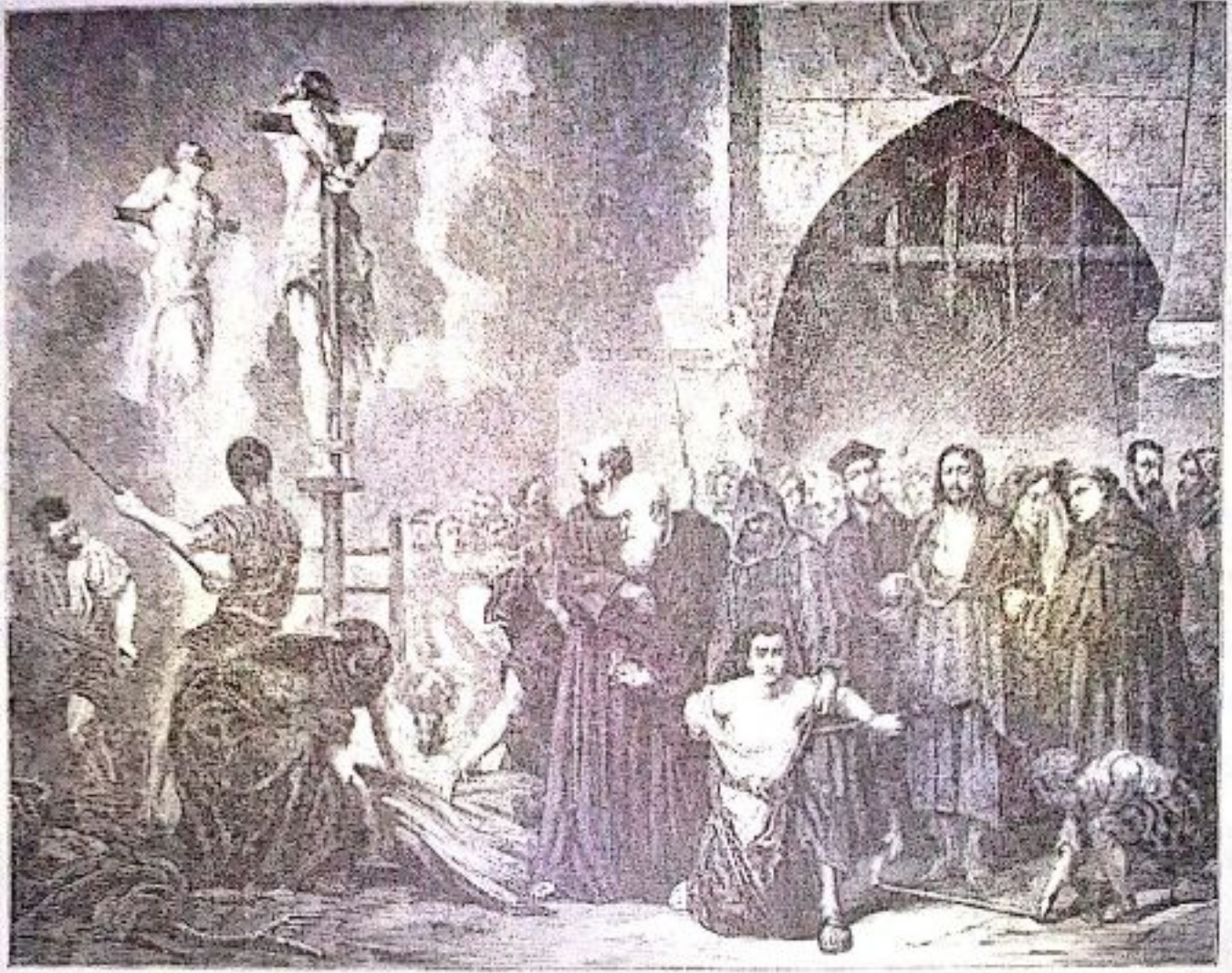
সেভিয়াতে যারা কনভার্সো ছিল। তাদের অনেকেই নিজেদের নাম থেকে সন্দেহ দূর করার জন্য তাদের খ্রিস্টীয় বিশ্বাসকে জোরসে প্রচার করতে লাগল। ধনীদেবের জন্য ব্যাপারটা বরং আরও সহজ ছিল। যেমন মেসা নামের একজন ধনী কনভার্সো নবীদের ভাস্কর্য বানিয়ে সাজিয়ে ফেলে, অবশ্যই একজন ইহুদী এমনটি করতে পারে না, কারণ ইহুদী ধর্মে মূর্তি বা ভাস্কর্য নির্মাণ নিষেধ। এর দ্বারা সে প্রমাণ করতে চাইলো, সে আর ইহুদী নেই।



ফার্দিনান্দ ও ইসাবেলার সমাধি

ইহুদীদের হিসেবে অন্তত ৭০০ জনকে ‘হেরেটিক’ আখ্যা দিয়ে আগুনে পোড়ানো হয়। এটা ১৪৮২ সাল পর্যন্ত হিসেব। ১৪৮৩ সালে পুরো স্পেনের প্রধান ইনকুইজিটর হিসেবে নিয়োগ পান টমাস দে টর্কেমাডা, তিনি সারা দেশ জুড়েই ট্রাইব্যুনাল বসান। অবশ্য অ্যারাগনে ইনকুইজিশন বিরোধী আন্দোলন দেখা দেয়, সেখানকার ইনকুইজিটরকে হত্যা করার চেষ্টাও করা হয়। ১৪৮৬ থেকে ১৪৯০ সাল পর্যন্ত ৪,৮৫০ জন ইহুদী কনভার্সো চার্চে পুরোপুরি নিজেকে বিলিয়ে দেয় এই ইনকুইজিশনের পর। আগুনে পোড়ানো হয় প্রায় ২০০ জন মানুষকে।

ইনকুইজিটররা জনসম্মুখে 'মারানো'দের শাস্তি দিতে পছন্দ করত। এ অনুষ্ঠানগুলোকে 'অটো দা ফে' ডাকা হতো। এগুলো শুরু হতো একটি ধর্মীয় বক্তৃতা দিয়ে, এরপর শাস্তির পালা।



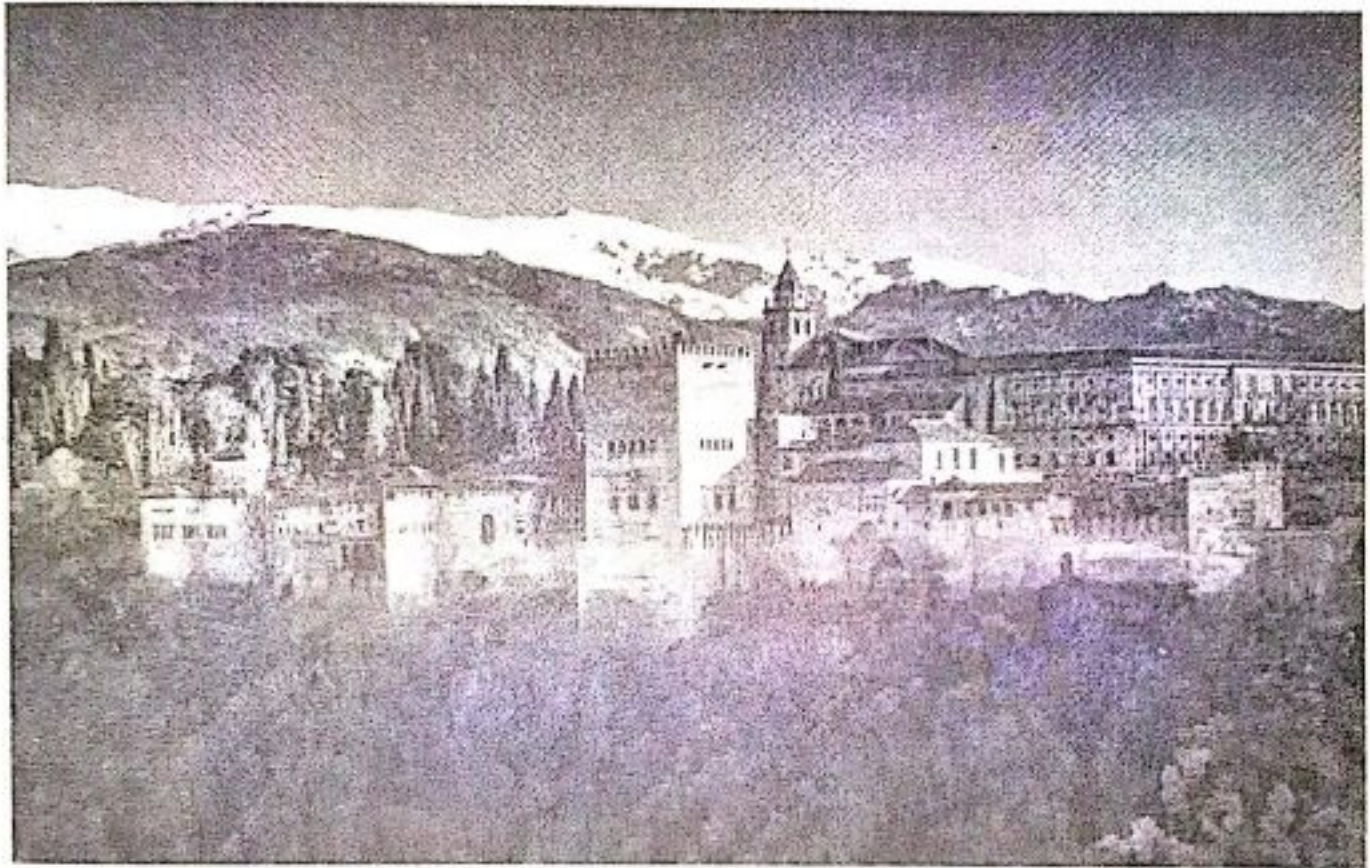
অটো দা ফে

তবে আগুনে পোড়ানোর ঘটনাগুলো দেখভাল করত আরেকটি সেকুলার কমিটি। ১৪৮১ সালে প্রথম এমন একটি পোড়ানোর ঘটনা পাওয়া যায়। ইহুদী হিসেবে মোট প্রায় ৩০,০০০ জন আগুনে পুড়ে মারা যায়। তাহলে মুসলিমসহ আসল সংখ্যাটি কত বেশি হবে, তা চিন্তার বাইরে। ইহুদী ও মুসলিমদের ওপর এ অত্যাচার থামে, যখন তারা স্পেন ত্যাগ করতে শুরু করে। এরকম সময়ের প্রেক্ষাপটেই একটি কাল্পনিক ঘটনাকে ব্যবহার করে 'এপ্রিল ফুল' তত্ত্ব মুসলিম সমাজে ছড়িয়ে পড়ে গত শতকের শেষ দিকে, ইতিহাসের পাতায় যার কোনো বর্ণনা নেই।

সত্যি কথা হলো, স্পেনের মুসলমানদের পুড়িয়ে মারার সাথে এপ্রিল ফুলের কোনো সম্পর্ক নেই। যতই মুখরোচক আর আবেগী ঘটনা মনে হোক না কেন, সেটি ছড়ানো একটি মিথ্যাচার প্রচারেরই শামিল। বরং পাঠকের দায়িত্ব সত্যটাকে জানান দেওয়া। আগুনে পুড়িয়ে মারার ঘটনা এমনিতেই হতো, আর সেটা

ইনকুইজিশনের শাস্তি হিসেবে। তবে এমনিতে গণ পোড়ানোর সেই ঘটনা অসত্য।

১৪৯২ সালের পহেলা এপ্রিল এমন কিছুই হয়নি। বরং এর তিন মাস আগে, জানুয়ারির ২ তারিখ গ্রানাদার আমির দ্বাদশ মুহাম্মাদ রানী ইসাবেলার হাতে চাবি তুলে দিতে বাধ্য হন। পতন হয় গ্রানাদার আলহামরা (Alhambra) প্রাসাদের। যদিও মুসলিম ইতিহাস এ বইয়ের অংশ নয়, তবুও প্রাসঙ্গিকভাবে কিছু আলাপ করা যায়।



আলহামরা প্রাসাদ

এপ্রিল ফুল প্রাংকের গুরুটা ভিন্ন। পহেলা এপ্রিল তারিখে কাউকে পোড়ানো না হলেও স্পেনে যে আগে ও পরে অত্যাচার অনেক হয়েছে, এটা খুবই সত্য। এবং এ অত্যাচারে ক্যাথোলিক পোপের সমর্থন ছিল, সেটাও সত্য।

৭১১ সালে মুসলিমরা অধিকার করে নেয় স্পেন। না, স্পেন বলা ঠিক হচ্ছে না, স্পেনের একটা অংশ; তখন তো আর স্পেন নাম ছিল না। এ অভিযানের নেতৃত্ব দিয়েছিলেন খলিফার নির্দেশে উমাইয়া কমান্ডার তারিক বিন জিয়াদ, তার কথা একটু আগে বলা হয়েছিল। এমন না যে তিনি একই বিনা সাহায্যে এই অসাধ্য সাধন করে ফেলেন। তাকে স্পেনের অন্যরাই সাহায্য করেছে। স্পেনের ক্ষমতায় তখন ছিলেন রডেরিক, তিনি এক সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি জুলিয়ানের মেয়েকে ধর্ষণ করেন। ক্রুদ্ধ জুলিয়ান তখন তারিককে (মানে, আরবদেরকে) আমন্ত্রণ করেন স্পেন অধিকার করে নিতে, তিনি তাদেরকে গোপনে জিব্রাল্টার পার করে দেবেন।

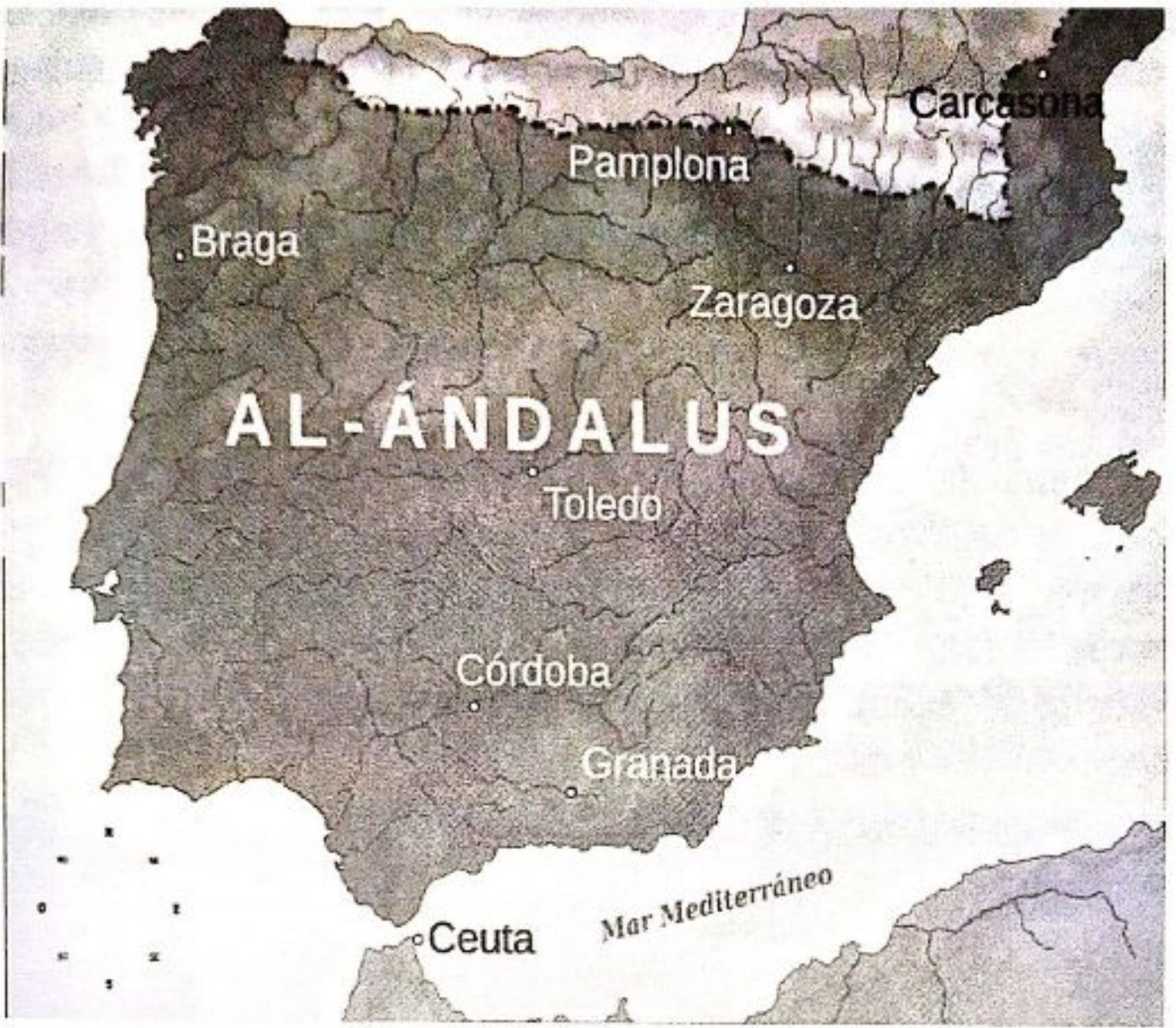
ইসরাইলের উত্থান-পতন ১৬৫

জুলিয়ানের কাছে কিছু বাণিজ্য জাহাজ আর স্প্যানিশ দুর্গ ছিল। মোটামুটি ১২,০০০ সেনা নিয়ে তারিক বিন জিয়াদ রডেরিকের এক লাখের সেনাবাহিনীকে পরাজিত করেন। রডেরিক নিহত হন, 'ভিসিগথ রাজ্য' হাতে আসে মুসলিমদের। এরপর জুলিয়ানের পরামর্শে গ্রানাদা, কর্দোভা ইত্যাদি জয় করতে তারিক সেনা পাঠান। সেই ছিল শুরু।



ভিসিগথ রাজা রডেরিক

স্পেন-পর্তুগালের এ অঞ্চলকে মুসলিমরা ডাকতো 'আন্দালুস'। মোটামুটি ১৪৯২ পর্যন্ত এ অঞ্চলের ক্ষমতা হাতে থাকে মুসলিমদের। এ সময় 'আহলে কিতাব' হিসেবে খ্রিস্টান ও ইহুদীদের সাথেই সহাবস্থানে থাকে মুসলিমরা, ৭০০ বছরেরও বেশি। তবে বেশ আগে থেকেই ধীরে ধীরে নানা অঞ্চল হারাতে থাকে মুসলিমরা, ক্যাথোলিক খ্রিস্টানদের হাতে। আর ক্রুসেড তো চলছিলই। ক্রুসেডের তিনটি ফ্রন্টের একটি ছিল স্পেন ও মাগরিব (উত্তর-পূর্ব আফ্রিকা)।



৭১৯ সালের আন্দালুসের মানচিত্র

এখানেই সেই দুজনের নাম চলে আসে— ক্যাস্টিলের ইসাবেলা আর অ্যারাগনের ফার্দিনান্দ, সহস্র প্রাণ বধকারী, হাজারো মুসলিম, ইহুদী ও প্রটেস্টান্ট খ্রিস্টানের রক্তে রাঙানো ছিল তাদের হাত; যার বর্ণনা এতক্ষণ দেয়া হলো। তারা জোরদার করেন বহু আগে শুরু হওয়া ‘রিকনকুইস্টা’, অর্থাৎ মুসলিমদের হাত থেকে স্পেন পুনরুদ্ধার অভিযান। একে একে বিভিন্ন অঞ্চল পুনর্দখল করতে করতে শেষে বাকি থাকে গ্রানাদা। গ্রানাদার নেতৃত্ব বিভক্ত ছিল, সেটা গ্রানাদার জন্য ছিল একটা বড় সমস্যা। তারপরেও ১৪৮২ থেকে ১৪৯২, দশ বছর লাগে গ্রানাদা পুরোপুরি হাতে আসতে ইসাবেলার।

ইসাবেলা কেন বলা হচ্ছে? কারণ, বেশি উদ্যমটা তারই ছিল, স্বামী ফার্দিনান্দ সাহায্য করেছিলেন ঋণ আর নেভি সাপোর্ট বা গোলাবারুদ দিয়ে। সিরিয়াল কিলিংয়ের মতো করে সিরিয়াল জেনোসাইড শুরু করেছিলেন তারা, ১৪৯৯ সালের আগে থেকেই পরিমিত আকারে ধারাবাহিকভাবে করে যাওয়া এ জেনোসাইডের শিকার ছিলেন আন্দালুসিয়ার মুসলিম আর ইহুদীরা। তৎকালীন ক্যাথোলিকদের

ইসরাইলের উত্থান-পতন ১৬৭

নয়নমণি হলেও ভিক্তিমদের কাছে তিনি 'ক্যাস্টিলের কসাই' ইসাবেলা। তিনি ও ফার্দিনান্দ যে জেনোসাইড বা গণহত্যা করছিলেন, সেটাকে বলতে হয় Ethnic Cleansing, অর্থাৎ একদম জাতিবিনাশ। সেই সাথে ক্যাথোলিকদের বাইরে থেকে নিয়ে আসা হয় গ্রানাদাতে ক্যাথোলিক জনসংখ্যা বাড়াবার জন্য, এই সেটলাররাই পরে ইসাবেলার কাজকে সহজ করে দেয়। অনেকটা যেমন, ফিলিস্তিনে ইহুদীরা এলো সেটলার হিসেবে, পরে রাষ্ট্রটাই হয়ে গেল ইসরাইল রাষ্ট্র। ক্যাথোলিকদের সাথে এ লড়াইতে ইহুদী আর মুসলিমরা একত্রিত হয়েছিল, কিন্তু শেষরক্ষা হয়নি।

১৪৯১ সালের ২৫ নভেম্বর স্বাক্ষরিত হয় গ্রানাদা চুক্তি। তাতে দুমাস সময় দেয়া হয় শহরটিকে। শর্তাবলি মেনে নিয়ে ১৪৯২ সালের ২ জানুয়ারি দ্বাদশ মুহাম্মাদ শহরটি ছেড়ে দেন ইসাবেলার কাছে। কারণ তাদের আর প্রতিরোধের ক্ষমতাটিও ছিল না। আলহামরা প্রাসাদে সেদিনই খ্রিস্টান সেনারা ঢুকে পড়ে, পাছে কোনো প্রতিরোধের সম্মুখীন হতে হয়। কিন্তু কোনো প্রতিরোধ আসেনি মুসলিমদের দিক থেকে।



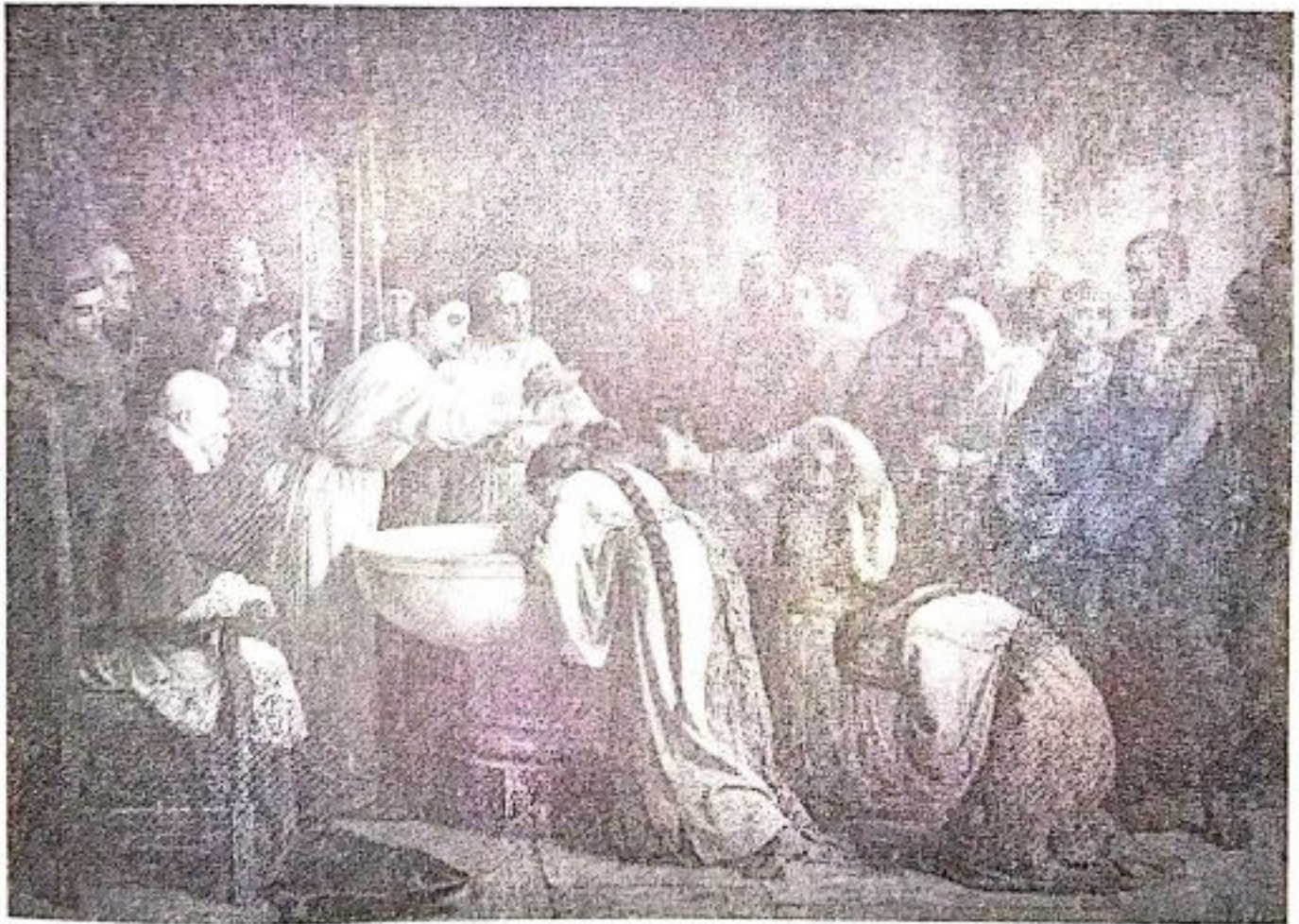
ইসাবেলা ও ফার্দিনান্দের কাছে গ্রানাদা সমর্পণ ©Francisco Pradilla Ortiz

কনস্ট্যান্টিনোপলের জয় (১৪৫৩) মুসলিম ইতিহাসে যত বড় একটা বিষয়, খ্রিস্টান ইতিহাসে তত বড় হিসেবেই দেখা হয় গ্রানাদা পুনরুদ্ধারকে (১৪৯২)। অন্তত পাল্টা ধাওয়ার মতো।

গ্রানাদা চুক্তির শর্ত আপাতদৃষ্টিতে মুসলিমদের অনুকূলে ছিল বলে মনে হচ্ছিল, তাই দ্বাদশ মুহাম্মাদ হয়তো গ্রানাদা ছেড়ে দিয়েছিলেন শেষমেশ :

- তিন বছর পর্যন্ত মুসলিমরা নিজ দেশে ফিরে যেতে পারবে। কেউ বাধা দেবে না।
- গোলাবারুদ অনুমোদিত না হলেও, অন্যান্য অস্ত্র রাখতে পারবে মুসলিমরা। এক মাস পর্যন্ত।
- কোনো মুসলিমকে ধর্মান্তরিত হতে জোর করা হবে না এ সময়ের মাঝে। এমনকি যেসব খ্রিস্টান মুসলিম হয়েছিলেন, তাদেরকেও আগের ধর্মে ফিরে আসতে বলা হবে না।
- দ্বাদশ মুহাম্মাদকে অর্থকড়ি আর পাহাড়ি এলাকায় আলপুজারাসের শাসনক্ষমতা দেয়া হয়। (তিনি অবশ্য পরের বছরই মরক্কো চলে যান।)

আরও ছিল কিছু বিষয়। পরবর্তী সাতটি বছরে মুসলিম জনসংখ্যা কমে আসে অনেক। তবে কাগজে কলমে মুসলিমদের অধিকার ছিল ইসলাম পালনের।



জোরপূর্বক খ্রিস্টান করার দৃশ্য দেখা যাচ্ছে এ তৈলচিত্রে ©Edwin Long

কিছু প্রাথমিক নির্যাতনটা ছিল ইহুদীদের জন্য। চার মাসের মাঝে সকল ইহুদীকে চলে যেতে হবে। নয়তো জোরপূর্বক খ্রিস্টান হতে হবে। আর যারা চলে যেতে চেয়েছিলো, তারাও তাদের বাড়িঘর ধনসম্পদ এগুলো বিক্রি করতে

ইসরাইলের উত্থান-পতন ১৬৯

পারেনি। যারা ধর্ম পাল্টাবেও না, চলেও যাবে না, তাদের জন্য ছিল বিনা বিচারে মৃত্যুদণ্ড। ২ লাখ ইহুদী ধর্ম পাল্টায়।

এত কিছু বলার কারণ, ইতিহাসের কষ্টিপাথরে এপ্রিল ফুলের মিথ্যে গল্পটা যাচাই। ১৪৯২ সালের ১ এপ্রিল অন্তত পুড়িয়ে মারা হয়নি কাউকে ওভাবে।

১৪৯২ সালে পাঁচ কি ছয় লাখ মুসলিম ছিল আন্দালুসে, কিন্তু এর দুবছর আগেও জানা যায় মুসলিম জনসংখ্যা প্রায় দ্বিগুণ ছিল, কোথায় গেলেন তারা? ধারাবাহিক জেনোসাইডের শিকার সম্ভবত। ইহুদীদের সংখ্যাও কমে যায়।



টলেডোর আর্চবিশপ সিসনেরোস

১৪৯৯ সালে শুরু হয় আসল ঘটনা। টলেডোর আর্চবিশপ সিসনেরোস জোরপূর্বক চেষ্টা করতে থাকেন সব নাগরিকদেরকে খ্রিস্টধর্ম গ্রহণ করাতে। বাধা হিসেবে দাঁড়ায় মুসলিম সম্প্রদায়। ফলে তাদের ঘর-বাড়ি কিংবা মসজিদ যেখানেই পাওয়া যায়, ক্যাথোলিকেরা কচুকাটা করতে শুরু করে। জোর করে তাদের বাড়ির আঙিনায় শূকর হত্যা করে রক্ত ও উচ্ছিষ্ট ছড়ানো হয়। মুসলিমদের পবিত্র রাতগুলোতে খ্রিস্টান যুবকেরা মদ পান করে মসজিদ এবং মুসলমানদের বাড়িতে কুলি করতো দাঙ্গাকে প্রণোদনা দিতে। ক্ষিপ্ত কোনো মুসলমান বিদ্রোহ করলে সাথে সাথে তাকে হত্যা করা হতো। মুসলিম ও ইহুদী নারীদের তুলে নিয়ে

নির্যাতন চলতে থাকে সমান তালে। মুসলিমদের বিদ্রোহের অজুহাতে গ্রানাদা চুক্তিতে কথা দেয়া সকল শিথিলতা আর সুবিধা কেড়ে নেয়া হয়। তখন থেকে ধর্মান্তর-প্রচেষ্টা দ্বিগুণ হয়ে যায়। আর কখনও কখনও সেটা সরাসরি হত্যানীতি।

১৫০১ সালে গ্রানাদায় ‘আনুষ্ঠানিকভাবে’ আর কোনো মুসলিম রইলো না। তারা কোথায় গেল? অনেকেই নিহত, আর অনেকেই রাজ্যত্যাগ করেছিলো, স্পেন থেকে মরক্কো কিংবা আফ্রিকার নানা দেশে তাদের পালিয়ে যাবার দলিল রয়েছে। এ ‘সাফল্যে’ অনুপ্রাণিত হয়ে ইসাবেলা গ্রানাদার বাইরেও শুরু করেন ধর্মান্তরকরণ। একমাত্র অ্যারাগনের রাজারা দীর্ঘকাল পর্যন্ত মুসলিমদের ধর্মান্তর করতে বাধা দেন, তারা ইসাবেলার বিরুদ্ধাচরণ করেন। কিন্তু সেটাও শেষ হতে বাধ্য হয় ১৫২৪ সালে। ১৫২৫ সালে আইন জারি করা হয়, ইসলাম বলে আর কিছু থাকবে না স্পেনজুড়ে। অবশ্য মুসলিম যে ছিল না স্পেনে তা নয়, বাইরে খ্রিস্টান রীতিনীতি পালন দেখালেও ঘরের ভেতরে তারা ইসলাম পালন করতো। একে ক্রিপ্টো-ইসলাম (গুপ্ত-ইসলাম) বলা হতো। মরক্কো পালিয়ে যাওয়া একজন প্রাক্তন ক্রিপ্টোমুসলিম আহমদ ইবনে কাসিমের লেখা গ্রন্থ ‘কিতাব নাসির আল-দ্বীন’-এ আমরা স্পেনের তৎকালীন মুসলিমদের গোপন জীবন সম্পর্কে ধারণা পাই। অবশ্য ১৫০৪ সালের ক্রিপ্টো-ইসলাম জারি করার ফতোয়া অনেকে অস্বীকার করেন। অন্তত দেড় থেকে সাড়ে তিন লাখ মুসলিম উধাও হয়ে যান ইতিহাসের পাতা থেকে।



ফার্দিনান্দ ও ইসাবেলার মুদ্রা

মানব সভ্যতার ইতিহাসের কালোতম অধ্যায়গুলোর একটি এটি। নারীদের গণধর্ষণ থেকে শুরু করে আগুনে পুড়িয়ে মারা, ত্রুশে পেরেক ঠুকে মারা, ভারী পাথর দিয়ে শরীরের অঙ্গ খেঁতলে দেয়া, জ্যান্ত মানুষকে করাত দিয়ে চিরে ফেলা,

ইসরাইলের উত্থান-পতন ১৭১

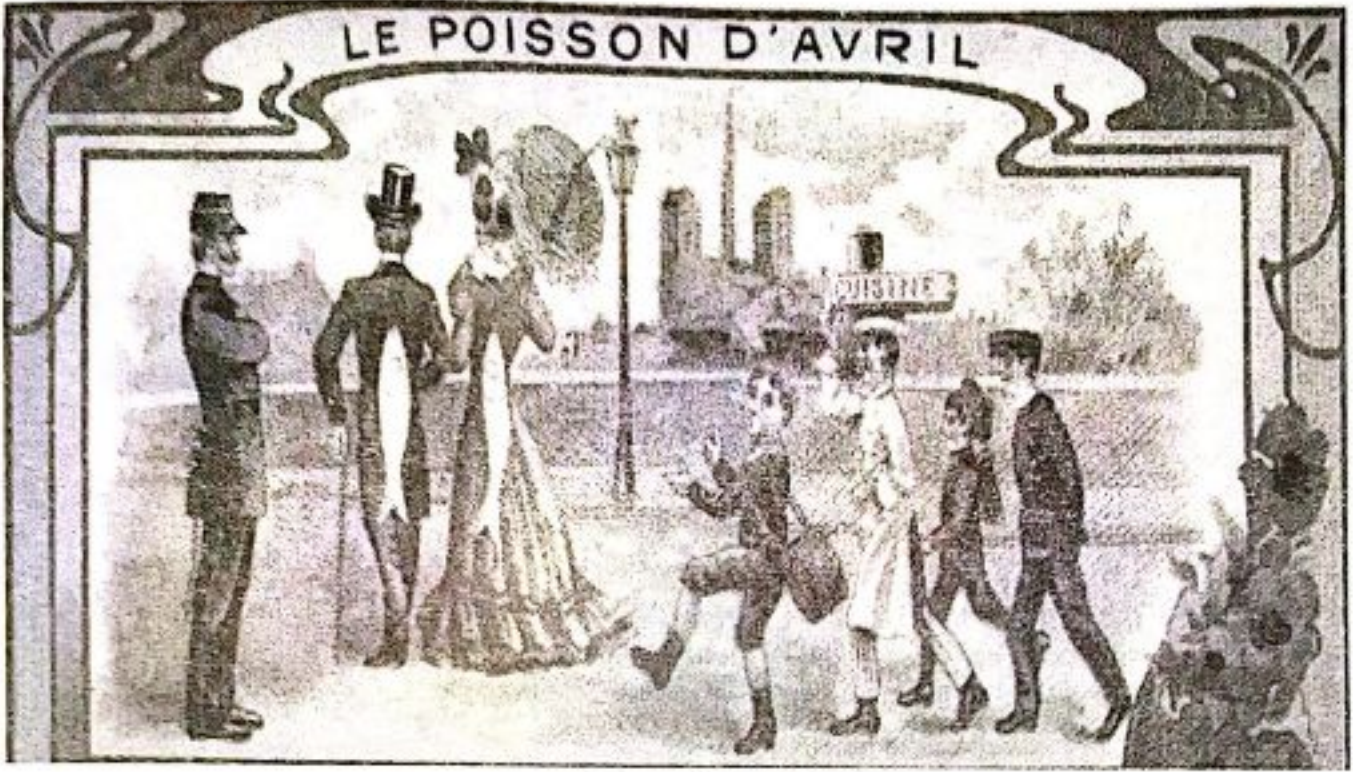
শরীর থেকে জীবন্ত মানুষের চামড়া ছিলে নেয়া, গরম পানি ও তেল ঢেলে শরীর ঝলসে দেয়া, সাঁড়াশি দিয়ে দাঁত উপড়ানো কিংবা মাথার চুল ও মুখের দাড়ি ছিড়ে নেয়া, প্রকাশ্যে জননাঙ্গ কর্তন, নারীদের গোপনাঙ্গে মোটা কাঠের গজাল ঢুকিয়ে হত্যা করা, মা-বাবার সামনে শিশুদের পুড়িয়ে মারার মতো কুকর্ম ইসাবেলা-ফার্দিনান্ডের প্রণোদনায় শুরু হয়েছিল।



ইনকুইজিশন ছিল এক বিভীষিকা

ফ্রান্সে ষোড়শ শতকে মার্চের ২৫ তারিখে নববর্ষ উদযাপিত হতো বসন্তের আগমনে। উৎসবটা এক সপ্তাহ ধরে চলত, এপ্রিলের ১ তারিখ পর্যন্ত। কিন্তু ১৫৬৪ সালে পোপ গ্রেগরির প্রভাবে ক্যালেন্ডার পরিবর্তন হলো, গ্রেগরিয়ান ক্যালেন্ডারে বসন্তের বদলে পহেলা জানুয়ারিতেই নববর্ষ উদযাপন করতে হবে, এই ছিল রাজা নবম চার্লসের আদেশ। রক্ষণশীলরা ব্যাপারটার বিরোধিতা করতে চাইলেন, কিন্তু কে শোনে কার কথা। নববর্ষ স্থায়ী হলো পহেলা জানুয়ারি। আর সেই যে ২৫ মার্চ থেকে এক সপ্তাহ? সেটি থাকলো বসন্তবরণ হিসেবে। যারা এ পুরনো উৎসব পালন করত, তাদেরকে নতুন ধারার ফরাসিরা টিটকারি দিত, প্র্যাংক বা মজা করত, নির্বোধ সব উপহার দিত আর পার্টির আমন্ত্রণপত্র পাঠাতো; গিয়ে দেখা যেত সেখানে আসলে কোনো পার্টি নেই। চলতো ১ এপ্রিল পর্যন্ত। এই প্র্যাংকের শিকারদের বলা হতো এপ্রিল ফুলের ভিক্তিম। অবশ্য তখন এ প্র্যাংককে ডাকা হতো ‘এপ্রিল ফিশ’ (poisson d'avril)। ফিশ কেন? কারণ, সে সময় সূর্য মৎস্য রাশির ইতি ঘটিয়ে নতুন রাশিতে ঢুকেছে। ইংল্যান্ডেও পরবর্তীতে

চলে আসে এ প্র্যাংক ডে, আর ইংলিশ, স্কটিশ ও ফ্রেঞ্চরা নিয়ে আসে আমেরিকায়।



poisson d'avril

এপ্রিল ফুলের উৎপত্তি নিয়ে আরও বেশ কিছু তত্ত্ব আছে, তবে আগুনে পোড়ানোটা সত্য নয়।

জানা মতে, ১৯৯৭ সালের ২৮ মার্চ একটি ইমেইলের মাধ্যমে প্রথম এ ভূয়া কাহিনী ছড়িয়ে দেয়া হয়।

শেষ কথা, আগুনে স্প্যানিশ মুসলমান পোড়াবার তত্ত্ব বিশ্বাস করানোটাই বরং সবচেয়ে বড় এপ্রিল ফুল প্র্যাংক।

লক্ষ প্রাণের খুনী কুখ্যাত ইসাবেলা আর ফার্দিনান্দ একটি কারণে আবার ইউরোপীয় ইতিহাসে বিখ্যাত। তারা ক্রিস্টোফার কলোম্বাসের আমেরিকা ভ্রমণের অর্থায়ন করেছিলেন, তাই তাদের নাম ইউরোপিয়ানদের আমেরিকা আবিষ্কারের ইতিহাসে ভালোর খাতায় লিপিবদ্ধ। সেই সালটাও ১৪৯২!

রানী ইসাবেলা ‘আলহামরা ডিক্রি’ নামের একটি ফরমানে সই করেন এপ্রিলের এক তারিখ নয়, তার একদিন আগে, মার্চের ৩১ তারিখ। সেখানে জোর করে ইহুদী বিতাড়ন কিংবা তাদেরকে ধর্মান্তরের আদেশ ছিল। এ ডিক্রি একই সাথে মুসলিমদেরও কফিনে পেরেকের মতোই ছিল।

* MUSLIM GLOBAL NETWORK * ISLAMIC GATEWAY
<<<<monin@indra.com>>>>
*

--

Bismillah Walhamdulillah Was Salaatu Was Salaam 'ala Rasulillah

Subject: don't be fooled by APRIL FOOL !

Date: 28 March 1997 06:35

Al Jum'a, 19 Dhul-Qa'dah 1417(ah) -- (28 Mar 1997 ce)

salaams,

The Fall of Granada, Spain and 1st April - APRIL FOOL

In Spain, after centuries of Muslim rule*, the Moors were overwhelmed by the Christian Army. However, the Moors were fortified in their homes. The Christian armies wanted to get rid of the Muslims somehow. They told the Muslims that they could leave their homes safely and could take only the necessary things from their homes. They were told they could sail away in the ships anchored on the quay side. The Muslims did wonder if this play was a trick. The Muslims were requested to go to the quay side to check the ships. They did so and were convinced. They then made preparations to leave. The next day, 1st April, they took their essential belongings and walked towards the quay side.

The Christians looted their homes and then set fire to them. Before the Muslims got to the ships, the Christians had set fire to the ships as well. The Christians then attacked the Muslims and killed them all:

men, women and children. They then celebrated this carnage. This then became a ritual that was celebrated every year and that has been carried on until this day not only in Spain but in other countries, too. The Muslims celebrate 1st April as well as playing jokes on others on this day through sheer ignorance of the story. We should bring out the facts of the story to all in order to put a stop to the practice of celebrating this bloody and shameful episode.

সেই ভুয়া এপ্রিল ফুল মেইল

In the name of the Lord, Amen. We, the King and Queen of Castile and Leon, by the grace of God, have caused this our letter to be written, in which we declare that we have given our full power and authority to our beloved son, the Prince of Asturias, and to our beloved daughter, the Princess of Asturias, to execute and fulfill all the things that we have commanded them to do, in accordance with the laws and customs of our Kingdoms.

In witness whereof, we have caused this our letter to be written, and signed with our hands and seals, in the city of Alcala de Henares, the first day of the month of May, in the year of our Lord one thousand three hundred and seventy-two.



ইসাবেলার সাইন করা সেই Alhambra Decree (Edict of Expulsion)

এপ্রিল ফুলের মতো একটি নগণ্য ব্যাপার দিয়ে স্পেন অর্থাৎ তৎকালীন আন্দালুসিয়ার কান্নাকে হালকা করার প্রচেষ্টা আসলে খুবই হাস্যকর প্রচেষ্টা। সারা ইতিহাসে খোঁজ নেই, কিন্তু আবেগান্বিত জনতা কেবল পহেলা এপ্রিলের আগুন দেয়ার ভুয়া ইতিহাস নিয়ে কাদা ছোঁড়াছুঁড়িতে ব্যস্ত থাকে। অথচ স্পেনে মুসলিম ও ইহুদীদের ওপর অত্যাচার হয়েছিল দীর্ঘ একটি সময় জুড়ে, একটি দিনকে কেন্দ্র করে নয়।

অধ্যায় ১৭

উসমানি সাম্রাজ্যে ইহুদীরা

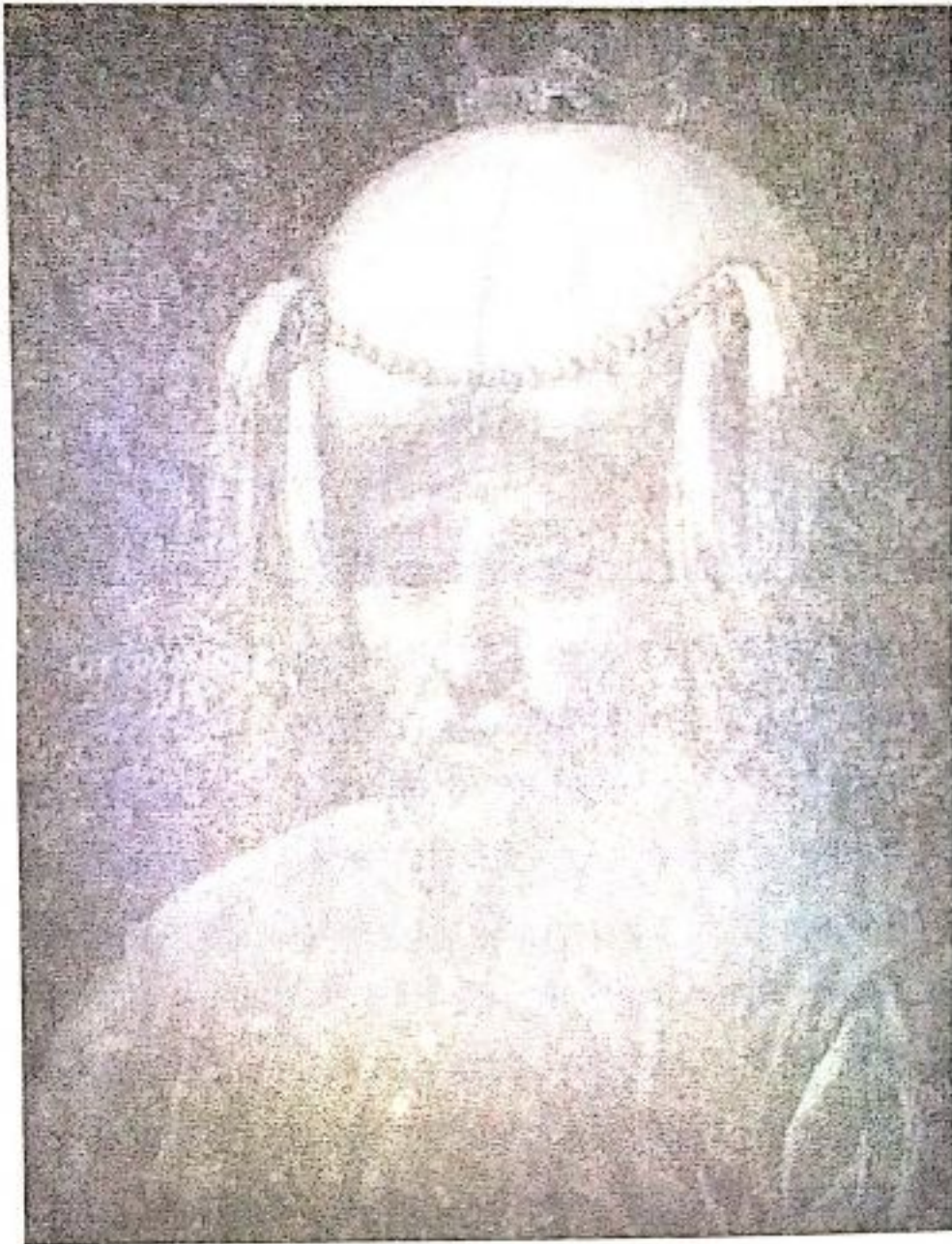


শুরুতে একটু ধারণা নিয়ে নেয়া যাক উসমানি সাম্রাজ্যের গোড়াপত্তন নিয়ে। যারা তুর্কি ভাষার অঘুজ (اوغز) উপভাষায় কথা বলতো, তারা হলো অঘুজ তুর্কি। ‘অঘুজ’ মানে ‘গোত্র’। অষ্টম শতকেই তারা মধ্য এশিয়াতে একটি চমৎকার সংঘবদ্ধ গোত্র সমাজ বানিয়ে ফেলেছিল। পরবর্তীতে, তাদেরই একজন যোদ্ধা নেতা ছিলেন সেলজুক বেগ (سلجوق بیگ), যিনি মারা গিয়েছিলেন একাদশ শতকের শুরুর দিকে, ধারণা করা হয় ১০০৭ বা ১০০৯ সালের দিকে। তিনি ছিলেন বিখ্যাত সুন্নি মুসলিম সেলজুক সাম্রাজ্য বা আলে সেলজুকের (ال سلجوق) প্রতিষ্ঠাতা। ক্ষমতার তুঙ্গে থাকা অবস্থায় সেলজুক সাম্রাজ্যের বিস্তৃতি ছিল পশ্চিম আনাতোলিয়া ও লেভান্ত (সিরিয়া, লেবানন, জর্ডান, ফিলিস্তিন, দক্ষিণ-পূর্ব তুরস্ক) থেকে শুরু করে পূর্ব দিকে আফগান পর্বতমালা ‘হিন্দু কুশ’ পর্যন্ত; আর ওদিকে মধ্য এশিয়া থেকে শুরু করে দক্ষিণে পারস্য উপসাগর পর্যন্ত। মোট কথা, প্রায় চল্লিশ লাখ বর্গ কিলোমিটারের বিশাল সাম্রাজ্য।

এই সেলজুক সাম্রাজ্যের একটি অংশবিশেষ ছিল আনাতোলিয়া ও উত্তর সিরিয়া অঞ্চল নিয়ে গঠিত সালতানাত-ই-রুম। ১২৩১ সালের দিকে সালতানাত-ই-রুমের পশ্চিমাঞ্চলের সীমান্তবর্তী এলাকার দায়িত্ব পান অঘুজ তুর্কি বংশোদ্ভূত উসমানের পিতা আর্তুরুল (ارتغرل) গাজী, জায়গাটা ছিল উত্তর-পশ্চিম আনাতোলিয়া (‘গ’ এর উচ্চারণ উহ্য, ঠিক যেমন এর্দোগান নয়, এর্দোয়ান)। এ দায়িত্ব লাভ করেন সুলতান প্রথম আলাউদ্দীন কায়কোবাদের কাছ থেকে।

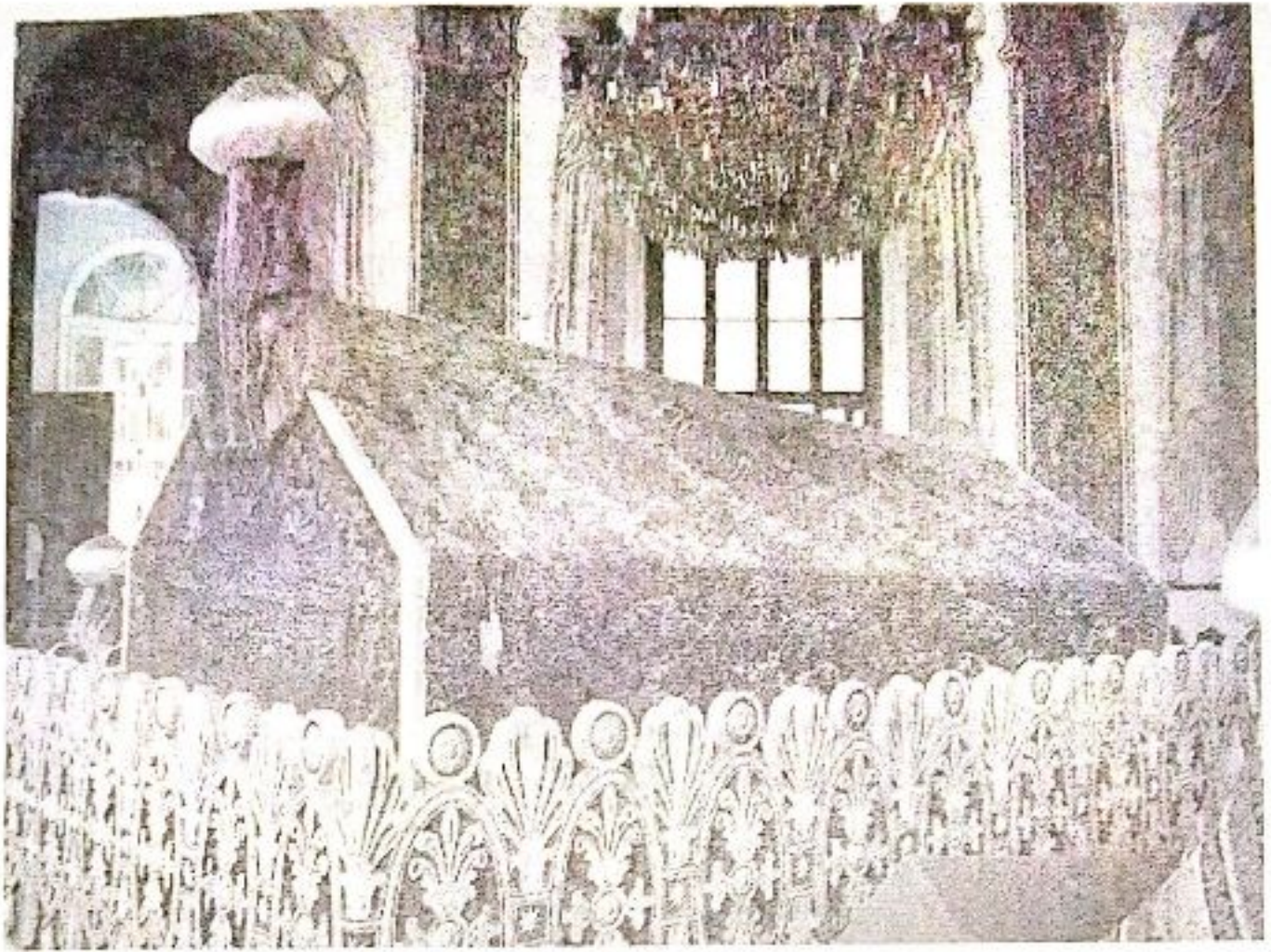
ইসরাইলের উত্থান-পতন ১৭৭

এরপর ১২৮১ সাল থেকে ১২৮৮ সালের মধ্যে কোনো এক সময় উসমান গাজী (غازی عثمان) তার পিতার কাছ থেকে কাঙ্গি গোত্রের খানের দায়িত্ব বুঝে নেন। ১২৯৯-১৩০০ সালের দিকে সেলজুক সুলতান তৃতীয় আলাউদ্দীন কায়কোবাদ তাকে স্বাধীন সুলতান হিসেবে ‘সাত ঘোড়ার লেজওয়ালা’ প্রতীক দান করেন।



প্রথম উসমানের কল্পিত পোর্ট্রেট ©Paolo Veronese

তিনিই উসমানি রাজবংশের প্রতিষ্ঠাতা, যাকে পশ্চিমা ভাষায় বলা হয় অটোমান সাম্রাজ্য; উসমান নামটিই পরিণত হয়েছিল ‘অটোমান’-এ। পশ্চিমা দুনিয়ায় তুর্কি সাম্রাজ্য, তুরস্ক আর অটোমান সাম্রাজ্য একে অন্যের প্রতিশব্দ হিসেবেই ব্যবহৃত হতো তখন। ১৯২০-২৩ সালে এসে আংকারা তুর্কি সরকার সরকারিভাবে কেবল ‘তুরস্ক’ (টার্কি) নামকে বেছে নেয়, তুর্কি ভাষায় যার উচ্চারণ ‘তুর্কিয়ে’। প্রথম উসমানের সময় এই সাম্রাজ্য ছিল বেশ ছোট, যা তুঙ্গে পৌঁছায় সুলতান সুলেমানের সময়। এক পর্যায়ে বিশালাকার ধারণ করা এ সাম্রাজ্য প্রথম বিশ্বযুদ্ধের মাধ্যমে তার অন্তিম মুহূর্তে পৌঁছে যায়।

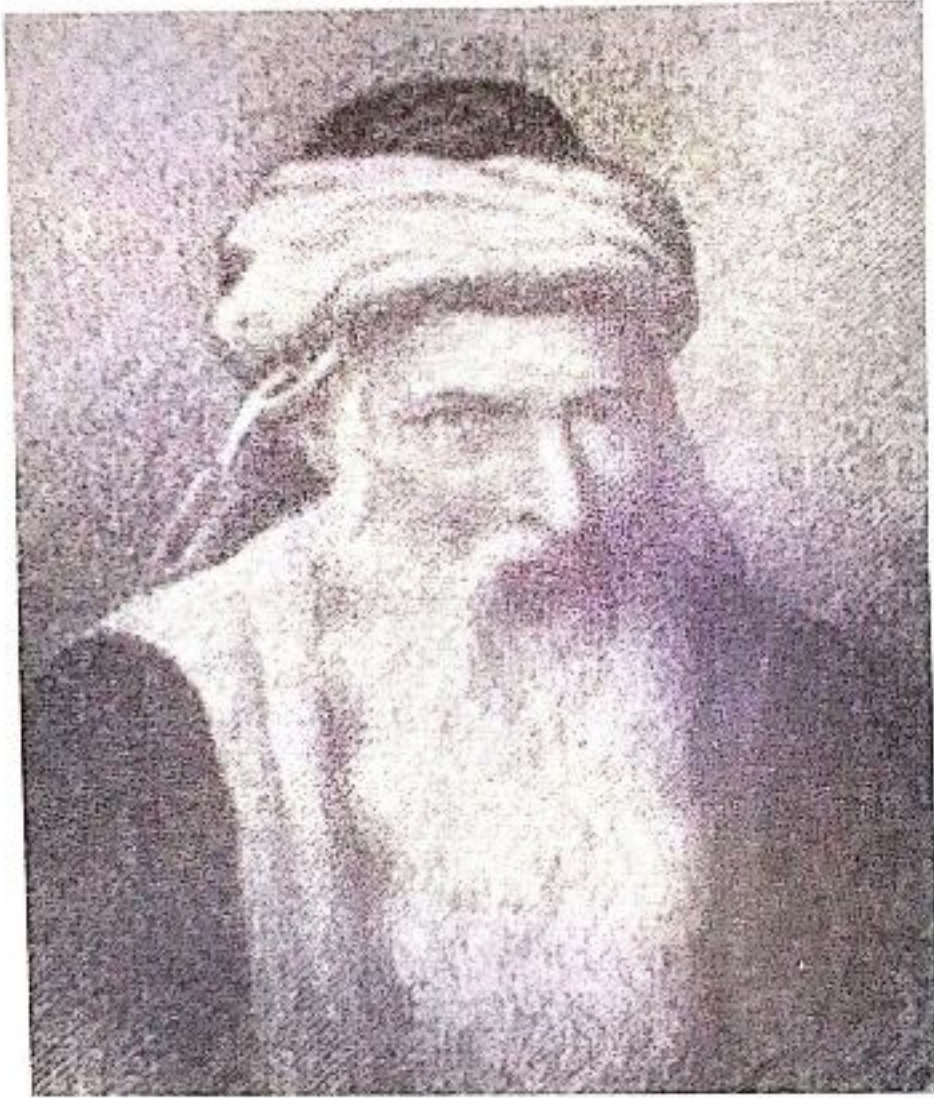


প্রথম উসমানের সমাধি, ভূমিকম্পে ক্ষতিগ্রস্ত হবার পর পুনর্নির্মিত

পঞ্চদশ শতকের দিকে উসমানি সাম্রাজ্য বিশ্ব রাজনীতির এক বড় ক্ষমতায় পরিণত হয়। তখন অনেক আশকেনাজি ইহুদীরা উসমানি বা অটোমান এলাকায় বসত গাড়ে। অবশ্য এর আগে থেকেই আনাতোলিয়াতে হেলেনিস্টিক ও বাইজান্টিন ইহুদীদের বসত ছিল। পরের শতাব্দীতে অবশ্য স্প্যানিশ আর পর্তুগিজ ইনকুইজিশন থেকে পালিয়ে আসা ইহুদী ‘মারানো’রা এসে আশ্রয় নেয় অটোমান ভূমিতে। আর স্প্যানিশ ইহুদীরা ১৪৯২ সালে বিতাড়িত হবার পর আরও বেশি করে অটোমান সাম্রাজ্যে আশ্রয় নেয়। এ সাম্রাজ্যের যে শহরগুলোতে ইহুদীরা স্বাধীনভাবে বসবাস ও উন্নতি করতে থাকে তার মাঝে আছে— গ্রিস, কায়রো, দামেস্ক, কনস্ট্যান্টিনোপল, বলকান অঞ্চল, ইত্যাদি।

এ সেফার্ডি অভিবাসী ইহুদীদের কেউ কেউ বেশ উন্নতি করে উসমানি দরবারেও সুযোগ পেয়ে যায়। যেমন ধরুন আমরা ডোনা গ্রাসিয়ার (১৫১০-১৫৬৯) কথা জানি। তিনি থাকতেন কনস্ট্যান্টিনোপলে, সেখানকার ইহুদী সমাজের একজন নেত্রী আর পৃষ্ঠপোষক ছিলেন ডোনা। এই নারীর ভাইপো জোসেফ নাসি (১৫২৪-১৫৭৯) উসমানি দরবারের এক গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তি ছিলেন, তিনি টাইবেরিয়াসে আবাস গড়া ইহুদী তাঁতি সমাজের পৃষ্ঠপোষক ছিলেন। এ আবাস গড়তে তিনি সাহায্য করেছিলেন। সত্যি বলতে, এই টাইবেরিয়াসের

কমিউনিটি গড়াই হয়েছিল মেসায়ার আগমনের চিন্তায়। পরবর্তীতে তাদের কাজই ইসরাইল রাষ্ট্রের জন্মের পর সাহায্য করে তাদের ইহুদী আধ্যাত্মিক কর্মকাণ্ড নতুন করে ঢেলে সাজানোর ব্যাপারে। উসমানি রাজ্যের নানা জায়গায় ইহুদীদের অ্যাকাডেমি গড়ে তোলা হয়। যেমন, কায়রো, কনস্ট্যান্টিনোপল এবং সালোনিকা। এ সময়ের একজন গুরুত্বপূর্ণ ইহুদী স্বলার ছিলেন জোসেফ কারো (১৪৮৮-১৫৭৫)।



জোসেফ কারো

একটু আগে বলা সেই মেসায়ার আগমনের প্রতীক্ষায় থাকা ইহুদী সমাজের আধ্যাত্মিক উত্তরসূরীরা ফিলিস্তিনের সাফেদ এলাকায় ছোট সমাজ গড়ে তোলে। ষোড়শ শতকে এই সমাজ তাঁতের কাজে সিদ্ধহস্ত হয়ে পড়ে, আর সেই সাথে কাব্বালা তথা ইহুদী জাদুবিদ্যা বা আধ্যাত্মিক শাস্ত্রের কাজ চালিয়ে যেতে থাকে। সাফেদে মেসায়ার আগমন প্রত্যাশী নানা কবিতা রচনা করা হতো।

তুর্কি শহর বুরসাতে অটোমান সাম্রাজ্যের প্রথম ইহুদী সিনাগগ প্রতিষ্ঠা করা হয়, যার নাম ছিল এৎস হা-হায়িম (עץ חיים), মানে জীবনবৃক্ষ। ১৩২৪ সালে এটি অটোমান কর্তৃপক্ষের হাতে আসে। সিনাগগটি কিন্তু আজও ব্যবহৃত হচ্ছে! অবশ্য এ শহরে সর্বশেষ ২০১১ সালে মাত্র ১৪০ জন ইহুদীর খোঁজ পাওয়া যায়।



অটোমান সাম্রাজ্যের একটি ইহুদী বিবাহ অনুষ্ঠান

কনস্ট্যান্টিনোপল বিজয়ী অটোমান সুলতান মেহমেদ বা মুহাম্মাদের উত্তরসূরি দ্বিতীয় বায়েজিদের (১৪৮১-১৫১২) আমলে বড় সংখ্যক ইহুদী স্পেন আর পর্তুগাল থেকে পালিয়ে চলে আসে। ইহুদী ইতিহাস অনুযায়ী, অটোমান সাম্রাজ্য যখন খ্রিস্টানদের সাথে যুদ্ধরত, তখন ব্যবসায়িক বড় রকমের কাজগুলো অলিখিতভাবে ইহুদীদের ওপরই ন্যস্ত ছিল মূলত। ইহুদীদেরকে তারা দেখত অটোমানদের মিত্র, কূটনীতিক এবং গুপ্তচর হিসেবে। তাদের নানা দিকের নৈপুণ্য ও মেধাকে অটোমান সাম্রাজ্যে কাজে লাগানো হতো প্রায়ই। যেমন, ১৪৯৩ সালে দুজন ইহুদী প্রিন্টিং প্রেস অর্থাৎ ছাপাখানা স্থাপন করে, তারা ছিল ডেভিড ও সামুয়েল ইবনে নাহমিয়াস। এই নতুন প্রযুক্তির কারণে বইপত্রের প্রাচুর্য দেখা দিল অটোমান সাম্রাজ্যে। বিশেষ করে ধর্মীয় ও সরকারি কাগজপত্র উৎপাদনের ক্ষেত্রে বেশ কাজে দিল ছাপাখানা। এছাড়া নানা ডাক্তার আর কূটনীতিক তো ছিলই।

ষোড়শ শতকে অটোমানদের প্রাণকেন্দ্র ইস্তাম্বুলে অর্থনীতির চালকদের মধ্যে শীর্ষস্থানীয় যারা ছিল, তাদের বেশিরভাগই হয় গ্রিক নয়তো ইহুদী। এই ইহুদীরা ছিল মূলত সেই স্পেন থেকে পালিয়ে আসা ইহুদী পরিবার। তারা সাথে করে

ইসরাইলের উত্থান-পতন ১৮১

বাপদাদার ধন সম্পদ তুলে এনেছিল। তা দিয়েই তারা ধনী বনে যায় অটোমান সাম্রাজ্যে। তাদের মাঝে মেনদেজ পরিবার ইহুদী ‘মারানো’ ব্যাংকিং পরিবারগুলোর মধ্যে উল্লেখযোগ্য। সুলতান সুলেমানের দেয়া নিরাপত্তার অধীনে তারা ১৫৫২ সালে ইস্তাম্বুলে আস্তানা গাড়ে এবং ব্যবসা করে। এই মেনদেজ পরিবারের একজন আলভারো মেনদেজ ১৫৮৮ সালে ইস্তাম্বুলে নিয়ে এসেছিলেন পঁচাশি হাজার ডুকাটের মতো বিশাল অঙ্ক! তাদের তাই দ্রুত সমাজের উঁচু স্তরে পৌঁছে যাওয়া অবাক হওয়ার মতো কিছু নয়।



রোমান সম্রাট হ্যাড্রিয়ানের প্রতিষ্ঠা করা তুরস্কের প্রাচীন শহর অ্যাড্রিয়ানোপল বা আজকের এডিনা শহরের একটি সিনাগগ

উসমানি সাম্রাজ্যে ইহুদীদের মর্যাদা ছিল ‘যিম্মি’ (ذمی) হিসেবে, মানে চুক্তিবদ্ধ জাতি, যারা আসমানি কিতাব পেয়েছিল, কিন্তু মুসলিম নয়। এ সাম্রাজ্যে ইহুদীদের ওপর কোনো আলাদা নিয়ম আরোপ করা হয়নি, তা ঠিক নয়। যেমন ধরুন, ইহুদীদেরকে বিশেষ কর দিতে হতো, তাদেরকে বিশেষ কাপড় পরে চলাফেরা করতে হতো যেন দেখলে চেনা যায়। পাশাপাশি, তারা বন্দুক সাথে রাখতে পারতো না, ঘোড়ায় চড়তে পারতো না, নতুন করে সিনাগগ বানাতে পারতো না, উন্মুক্ত স্থানে উপাসনা করতে পারতো না, ইত্যাদি নানা বিধিনিষেধ তো ছিলই। তবুও এটা বলতেই হয়, তুলনামূলকভাবে অটোমান সাম্রাজ্য ইহুদীদের আরামেই থাকতে দিয়েছিল, অত্যাচারে ফেলেনি।



অটোমান সাম্রাজ্যের একজন ইহুদীর চিত্র; দেখলেই যে কেউ যেন চিনতে পারে, সে ইহুদী।

বহু বছর টিকে থাকা অটোমান সাম্রাজ্যের ইস্তাম্বুল বিশ্ববিদ্যালয়েই পড়ালেখা করেছিলেন ইহুদী ইসরাইলের রাষ্ট্রের প্রতিষ্ঠাতা ডেভিড বেনগুরিয়ন। নাম যা-ই থাকুক না কেন, এ শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানটি প্রতিষ্ঠা করেছিলেন স্বয়ং সুলতান দ্বিতীয় মেহমেদ ১৪৫৩ সালে। অনেকে একে কনস্ট্যান্টিনোপল বিশ্ববিদ্যালয়ও ডেকে থাকেন বটে!



ডেভিড বেনগুরিয়ন, ইসরাইলের প্রতিষ্ঠাতা

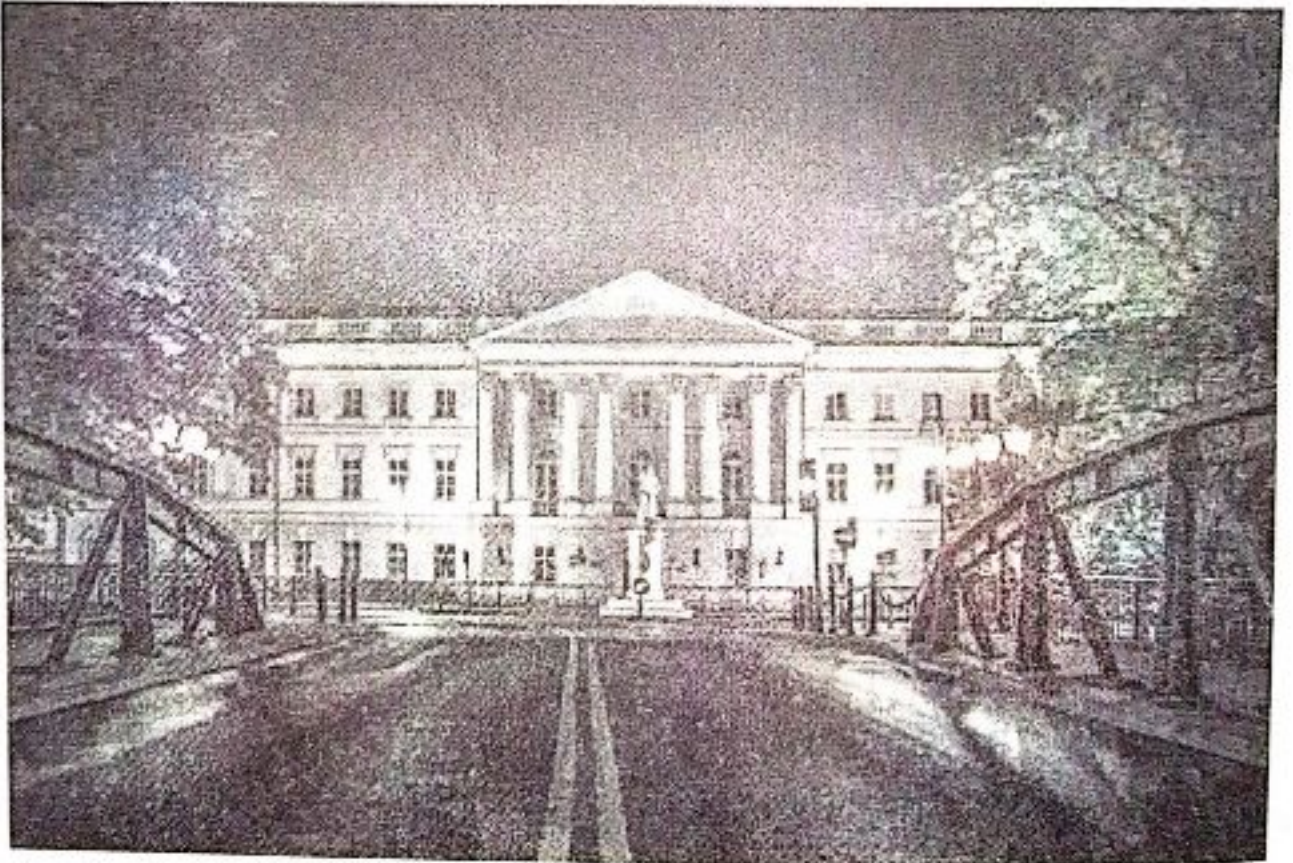
ইসরাইলের উত্থান-পতন ১৮৩

অধ্যায় ১৮

মধ্যযুগ থেকে আধুনিক ইউরোপে



স্পেন, মধ্যপ্রাচ্য এবং বর্তমান রাশিয়ার ক্রাইমিয়া যে জায়গা, সেখান থেকে মধ্যযুগে আশকেনাজি ইহুদীরা ধীরে ধীরে পোল্যান্ডে চলে আসতে থাকে। পোল্যান্ডের কালিশের যুবরাজ ১২৬৪ সালে ঘোষণা দিলেন, সকল ইহুদী আইনি প্রতিরক্ষার অধীনে থাকবে। পরবর্তী শতকে রাজা তৃতীয় কাসিমির পুরো পোল্যান্ড জুড়েই এ আজ্ঞা জারি করে দিলেন। সেই থেকে পোল্যান্ড ইহুদীদের অভয়ারণ্য।



পোল্যান্ডের কালিশ, যেখান থেকে ইহুদীদের অভয়ারণ্য হয়ে দাঁড়ায় পোল্যান্ড

১৮৪ ইসরাইলের উত্থান-পতন

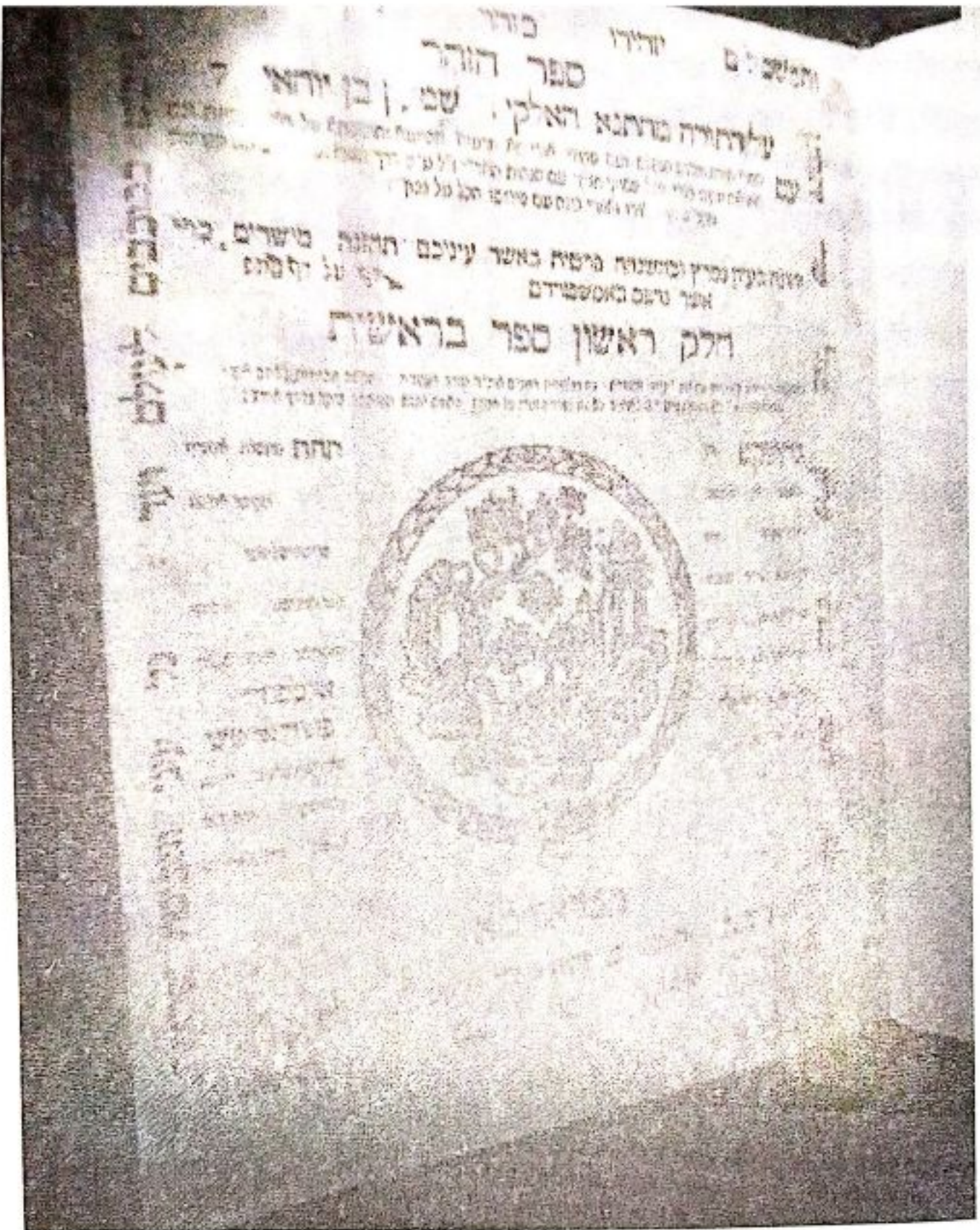
১৩৮৮ সালে লিথুয়ানিয়ার গ্র্যান্ড ডিউকও একই রকম সুবিধা দিলেন ইহুদীদেরকে। এ দুটো দেশে তাই ইহুদীরা নিরাপদেই বাস করতে লাগলো ইউরোপে। পোলিশ ইহুদীরা কর সংগ্রাহক, বিভিন্ন জমিদার বাড়ির ব্যবস্থাপক, ইত্যাদি পদে চাকরি করতে লাগলো। সেই সাথে বিভিন্ন কৃষিকাজ, উৎপাদন, রপ্তানি, ইত্যাদি কাজেও নিয়োজিত ছিল তারা। তবে তাদের সাথে যে বৈষম্য করা হতো না, তা নয়। যেমন, তাদেরকে আলাদা পোশাক পরতে বাধ্য করা হতো। আর মাঝে মাঝে খ্রিস্টীয় প্রথায় বাধা দানের অভিযোগে অভিযুক্ত করা হতো তাদেরকে।

পঞ্চদশ শতকের দিকে পোল্যান্ডে ১০ হাজার থেকে ১৫ হাজার ইহুদী ছিল। পরের শতকে সংখ্যাটি হয়ে দাঁড়ায় দেড় লাখ! ষোড়শ ও সপ্তদশ শতকে পোলিশ জমিদারেরা তাদের জমির দেখাশোনার জন্য নিয়োগ দিতেন ইহুদীদের, তারা কর তুলতো। অভিজাতদের নিজস্ব শহরেও কর তোলার কাজ করতো তারা।

পোল্যান্ড হয়ে উঠলো ইহুদীদের জ্ঞানচর্চার এক চারণভূমি। তবে সপ্তদশ শতকে এসে ইহুদী সমাজের প্রায় এক চতুর্থাংশ হত্যাকাণ্ডের শিকার হয় ইউক্রেনীয় কোস্যাকদের হাতে। এরপর পোল্যান্ডে তাদের অবস্থান অস্থিতিশীল হয়ে দাঁড়ায়। কিন্তু লিথুয়ানিয়াতে বেশ স্বাভাবিকভাবেই জীবন কাটাতে লাগলো ইহুদীরা। মধ্যযুগে স্পেন ও দক্ষিণ-পূর্ব ফ্রান্সের প্রোভেন্সের ইহুদীদের হাতে তাদের কাব্বালা ও দর্শন উন্নতি লাভ করে। ১৫০০ সালের দিকে ফেরার, মাস্ত্রিয়া, ভেনিস, পাদুয়া, ফ্লোরেন্স ও রোমে ইহুদীদের সমাজ ছিল গমগমে। ইতালির রেনেসাঁর যুগে কিছু কিছু ইহুদী বনেদি ইতালীয়দের মতোই জীবন যাপন করতে লাগলো, ইতালীয় মানবতাকর্মীদের সাথে তাদের বেশ খাতির তখন। সেই ইতালীয়রা ইহুদীদের কাব্বালার পাঠ্যবই জোহার (Zohar) দ্বারা অনুপ্রাণিত হয়ে খ্রিস্টীয় কাব্বালা নিয়ে লেখালেখি শুরু করে দেয়। আবার রেনেসাঁর প্রভাবও পড়ে ইহুদীদের মাঝে। মোট কথা, ইতালি তখন ইহুদী প্রিন্টিং, সিনাগগ (উপাসনালয়) সঙ্গীত ও অন্যান্য উন্নতির প্রাণকেন্দ্র। হিব্রু নাটকের জন্য ইতালিতে ইহুদী থিয়েটার গড়ে তোলেন লিও দেসোমো (১৫২৭-১৫৯২)।

তবে এরপরই শুরু হয় ইহুদীদের বিপদ— খ্রিস্টীয় ইহুদী নিধন আর বিতাড়ন। ষোড়শ শতকে কাউন্টার রিফরমেশন চার্চ ইহুদী সমাজকে আলাদা করে ফেলতে চায়। ১৫৫৩ সালে ইহুদীদের পবিত্র গ্রন্থ তালমুদ পোড়ানো হয়, এবং দুবছর পরে পোপ চতুর্থ পল ইহুদীদেরকে আলাদা গেটোতে বসবাসের আদেশ জারি করেন। ইহুদীদের সংস্কৃতি গ্রহণ করা মারানোদেরকেও আগুনে পুড়িয়ে মারা হয়। চার্চের অধীনে থাকা এলাকাগুলো থেকে বের করে দেয়া হলো ইহুদীদেরকে।

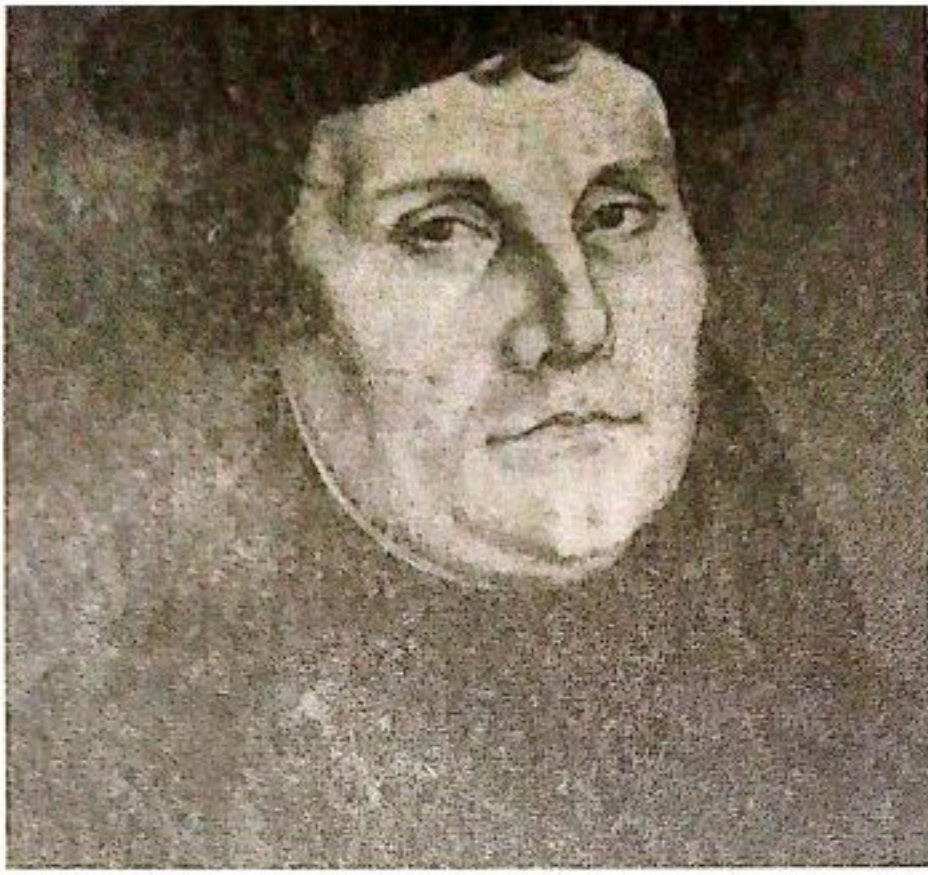
ইসরাইলের উত্থান-পতন ১৮৫



১৮০৯ সালের একটি জোহার

ওদিকে জার্মানিতে প্রোটেষ্ট্যান্ট খ্রিস্টানদের তোপ বাড়ছে, আর সেই সাথে বাড়ছে সেখানকার ইহুদীদের ওপর চাপ। প্রথম দিকে জার্মান ধর্মযাজক মার্টিন লুথার (১৪৮৩-১৫৪৬) ইহুদীদের সাথে ভালো সম্পর্ক রাখলেও দ্রুতই তিনি বুঝতে পারেন, এদের ধর্মান্তরিত হবার কোনো সম্ভাবনা দেখা যাচ্ছে না। তখনই তিনি ইহুদীদের প্রতি খারাপ মনোভাব দেখাতে শুরু করেন।

১৮৬ ইসরাইলের উত্থান-পতন



যাজক মার্টিন লুথার

ইহুদীদের তৎকালীন আণকর্তা ছিল তাদের ব্যবসায়ীরা, যারা বিভিন্ন জার্মান যুবরাজ এবং গণ্যমান্যদের সাথে সুসম্পর্ক রাখতো। তাদের বরাতে কখনও কখনও ইহুদীদের ওপর শোণদৃষ্টি পড়া বাদ যেত আরকি।

সপ্তদশ শতকে হল্যান্ডের অ্যামস্টারডামে এসে পৌঁছে আশকেনাজি ইহুদীরা, সেখানে তারা নানা ব্যবসায়িক কাজ শুরু করে দেয়। সপ্তদশ শতক শেষ হবার আগেই সেখানে প্রায় ১০,০০০ ইহুদী হয়ে যায়। তারা স্টক এক্সচেঞ্জ থেকে শুরু করে চিনি, তামাক, হীরা, বীমা, পণ্য উৎপাদন, নাটক, প্রিন্টিং, ব্যাংকিং, ইত্যাদি কাজ করত। তবে ইহুদীরা হল্যান্ডে নাগরিকত্ব পায়নি, তাই কখনও স্বাধীনভাবে ধর্মপালনের অধিকারও পায়নি।

অষ্টম শতকে ইহুদীদের ইউরোপীয় সমাজের অবস্থা কাহিল হয়ে দাঁড়ায়। তুর্কি সেফার্ডি ইহুদী সাব্বাতাই জেভি (১২৫৬-১৩৩৬) কনস্ট্যান্টিনোপলে আসেন ১৬৬৬ সালের ফেব্রুয়ারিতে। প্রধান উজির ফাজিল আহমেদ পাশার আদেশে তাকে গ্রেফতার করা হয়। বন্দী অবস্থাতেই তিনি ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করলে প্রায় ৩০০ ইহুদী পরিবারও একই কাজ করে। তার এহেন কর্ম ইউরোপীয় ইহুদীদের ব্যাপক হতাশ করে ফেলে। এ বইতেই কিছু আগে হাসিদী (חסידות) দলের কথা বলেছি, হিব্রু ‘হাসিদ’ শব্দের অর্থ ‘ধার্মিক’। জেভির ইসলাম গ্রহণের পর অনেকেই মূলধারার র্যাবাইকেন্দ্রিক ইহুদী ধর্ম বাদ দিয়ে নিজকেন্দ্রিক হাসিদী

ইসরাইলের উত্থান-পতন ১৮৭

ইহুদী হয়ে যায়। এটি হাসিদী আন্দোলন নামেও পরিচিত। অবশ্য মূলধারার ইহুদীরা দ্রুতই ১৭৮১ সালের মাঝে হাসিদী ইহুদীদের সাথে সম্পর্ক ছিন্ন করে।

১৭৭০ সালের দিকে খ্রিস্টান ইউরোপের ইহুদী জনসংখ্যা ছিল প্রায় ২০ লাখ। ইংল্যান্ড ও হল্যান্ডে তাদের জীবন আরামের হলেও মধ্য ইউরোপে অবস্থা ছিল খারাপ। যে করেই হোক, ইহুদীদের এমন কাপড় পরতে হতো, যেন দেখলেই বোঝা যায় তার ধর্ম-পরিচয় ইহুদী। তবে ওই শতকের আশির দশকে ইহুদীদেরকে কিছুটা কম ঝামেলা পোহাতে হয়।

রোমান সম্রাট দ্বিতীয় জোসেফ (১৭৪১-৯০) ১৭৮১ সালে ইহুদীদের বাধ্যতামূলক ভিন্ন পোশাক বা চিহ্ন ধারণ করার প্রথা বাতিল করেন। এর পরের বছর তিনি ভিয়েনাতে ইহুদীদের যেকোনো ব্যবসায় অংশ নেয়ার অধিকার দেন ইহুদী সমাজের বাইরেও। তখন থেকে ইহুদীরা তাদের সন্তানদেরকে সরকারি স্কুলেও পড়াতে পারতো, নিজেদের স্কুলও বানাতে পারতো। ১৭৮৪ সালে জার্মানির সেনাবাহিনীতে ইহুদীরা চাকরিও পেয়ে যায়।

ধীরে ধীরে ফ্রান্সেও পরিস্থিতি স্বাভাবিক হয়ে আসতে থাকে। অবশ্য প্যারিস এবং দক্ষিণ ও দক্ষিণ-পশ্চিম ফ্রান্সের সেফার্দী ইহুদীরা আরামে থাকলেও, বাদবাকি ফরাসি জায়গার আশকেনাজি ইহুদীরা তখনও নানা বৈষম্যের শিকার হতো। ১৭৯০ সালে দক্ষিণ-পশ্চিম ফ্রান্সের সেফার্দী ইহুদীদের নাগরিকত্ব দেয়া হয়। ১৭৯৬ সালে হল্যান্ডেও তাদেরকে নাগরিক করা হয়। পরের বছর পাদুয়া ও রোমে ইহুদীদের গেটোতে থাকবার নীতি উঠিয়ে দেয়া হয়।

সম্রাট নেপোলিয়ন ১৮০৪ সালে সকল নাগরিকের জন্য সমান অধিকার ঘোষণা করেন। ফলে ইহুদীরা তখন পূর্ণ স্বাধীনতা পেয়ে যায়, তবে নেপোলিয়ন পরে ইহুদীদের কিছুটা নিয়ন্ত্রণে রাখতে চেয়েছিলেন। ১৮০৬ সালে তিনি কিছু প্রশ্ন উত্থাপন করেন ইহুদীদের নিয়ে। ইহুদীদের বিবাহ ও বিচ্ছেদ রীতি কি ফরাসি নীতির সাথে সাংঘর্ষিক? ইহুদীরা কি খ্রিস্টানদের বিয়ে করতে পারবে? ফরাসি ইহুদীরা কি দেশপ্রেমিক? তারা কি ফ্রান্সকে তাদের নিজেদের দেশ বলে মনে করে? এর জবাবে সংসদ জানায়, ইহুদী রীতি আর ফরাসি রীতি সাংঘর্ষিক নয়। পরের বছর নেপোলিয়ন ইহুদীদের সানহেদ্রিনের সদস্যদের তলব করলেন, নিশ্চিত করতে জিজ্ঞেস করলেন, তারা কি সংসদের বক্তব্যের সাথে একমত? তারা বললেন, হ্যাঁ একমত। তখন নেপোলিয়ন ১৮০৮ সালে দুটো নিয়ম করলেন ইহুদীদের নিয়ে। এক, তিনি কয়েকজন ইহুদী আইনপ্রণেতা রাখলেন, যারা ফরাসি সরকারের অধীনে থেকে এসব বিষয় দেখভাল করবেন। আর দুই, ইহুদীদের প্রতি যারা ঋণী ছিলো, সেই ঋণগুলো তিনি বাতিল করে দিলেন, এবং তাদের জন্য ব্যবসায়িক রীতি নিয়ন্ত্রণ করে দিলেন।



১৮০৭ সালের ৯ ফেব্রুয়ারি প্যারিসে ইহুদীদের সানহেদ্রিন (সুপ্রিম কোর্ট) বসে

নেপোলিয়ন হেরে যাবার পর ক্ষমতা ছেড়ে দিলেন, এবং তখন ভিয়েনা কংগ্রেস নতুন করে ইউরোপের মানচিত্র আঁকলো ১৮১৪ ও ১৮১৫ সালে। এর সাথে সাথে কংগ্রেস ইহুদীদের জীবনধারা উন্নত করার সুযোগ দেয়ার কথাও বলে দিল। কিন্তু জার্মান সরকার তা না মেনে, ইহুদীদের আগের স্বাধীনতা বাতিল করে আবার তাদের ওপর যত রকম নিয়ম জারি করা যায়, তা করে দিলো। ১৮১৯ সালে জার্মানে ইহুদীদের ওপর আক্রমণ চালানো হয়। অবশ্য ১৮৩০ সালের দিকে ইহুদীদের ব্যাপারে অনেকে শিথিলতা আসে, অনেকে পক্ষেও কথা বলতে থাকে তাদের।

১৮৪৮ সালে শুরু হলো ফরাসি বিপ্লব। এর ফলশ্রুতিতে প্রুশিয়া, অস্ট্রিয়া, হাঙ্গেরি, ইতালি ও বোহেমিয়ার শাসকেরা এমন সংবিধান জারি করতে বাধ্য হয়, যেখানে সবার স্বাধীনতাই আগের চেয়ে বেশি ছিল। ফলে ইহুদীদের লাভই হলো। অবশ্য, বিপ্লব পুরোপুরি শেষ হবার আগ পর্যন্ত এই সংবিধানগুলো কার্যকর হয়নি। ১৮৬৯ সালে উত্তর জার্মান ফেডারেশন ইহুদীদের ব্যাপারে সমস্ত বিধিনিষেধ তুলে দেয়ার ঘোষণা দিল সংবিধানে। এরপর ১৮৭১ সালে অস্ট্রিয়া ও পুরো জার্মানি হোয়েনজলার্ন রাজপরিবারের অধীনে খ্রিস্টীয় জার্মান রাইখের (সাম্রাজ্যের) অধীনে চলে আসে, তখন থেকে পুরো রাজ্য জুড়েই ইহুদীদের আর কোনোই বাধা থাকলো না। হোক সেটা চাকরি, ব্যবসা, বিবাহ কিংবা ভোটের অধিকার।

প্রশ্ন জাগতে পারে, ইউরোপে কিছু হলেই এত ক্ষেপে যেতে কেন লোকে ইহুদীদের ওপর? খ্রিস্টীয় সাধারণ সমাজে যীশুর ত্রুশবিদ্বের ঘটনা নিয়ে এমনিতেই ইহুদীদের প্রতি একটা ঘৃণা কাজ করতো বটে, কিন্তু তার চেয়েও বেশি

ইসরাইলের উত্থান-পতন ১৮৯

রাগের কারণ ছিল তাদের মহাজনি সুদ প্রথা। চড়া সুদে ঋণ দেয়ার রীতি অনেকের এতই বিপদ ডেকে আনে যে খুব দ্রুতই ইহুদীরা চক্ষুশূল হয়ে পড়ে। শেক্সপিয়রের 'মার্চেন্ট অফ ভেনিস'-এর শাইলক চরিত্র থেকে মোটামুটি ভালই আন্দাজ করা যায় ইহুদীদের প্রতি সাধারণ মনোভাব তখন কেমন ছিল। নেপোলিয়ন তো আইন করেই ইহুদী কর্তৃক ঋণ প্রদান রীতি বাতিল করেন।



নেপোলিয়ন ইহুদীদেরকে স্বাধীনভাবে উপাসনার অধিকার দিচ্ছেন ১৮০৬ সালে

অন্যদিকে পূর্ব দিকে রুশ অঞ্চলগুলোতে ইহুদীরা স্বাধীনভাবে ব্যবসা করতে থাকলেও ক্যাথারিন দ্য গ্রেট ১৭৯১ সালে মধ্য রাশিয়াতে ইহুদীদের থাকা নিষিদ্ধ করে দিলেন। তখন থেকে কেবল দক্ষিণ ইউক্রেনে থাকতে পারবে ইহুদীরা। ১৮০৪ সালে জার প্রথম আলেকজান্ডার (১৮০১-২৫) পশ্চিম রাশিয়ার কোন কোন জায়গায় ইহুদীরা থাকতে পারবে, সেটা চিহ্নিত করে দিলেন। তিনি কয়েকবার চেষ্টা করেছিলেন পুরো দেশ থেকেই ইহুদীদের তাড়িয়ে দিতে। ১৮১৭ সালে তিনি নতুন এক রীতি করলেন, ইসরাইলি খ্রিস্টান সংঘ থেকে ধর্মান্তরিত ইহুদীদেরকে (মানে যারা ব্যাপ্টাইজ হয়ে খ্রিস্টান হলো), তাদেরকে আর্থিক ও অন্যান্য সহায়তা করা হবে। ১৮২৪ সালে গ্রামগুলো থেকে ইহুদীদের বের করে দেয়া শুরু হলো। তবে সে বছরই জার প্রথম আলেকজান্ডার মারা গেলেন এবং ক্ষমতা পেলেন জার

প্রথম নিকোলাস (১৮২৫-৫৫)। তিনি আবার ইহুদীদের প্রতি প্রচণ্ড ক্ষেপা। তিনি নিয়ম জারি করলেন, ইহুদী ছেলেদেরকে অবশ্যই ২৫ বছরের জন্য সেনাবাহিনীতে যোগদান করতে হবে, যদি না তারা ধর্মান্তরিত হয়ে খ্রিস্টান হয়ে যায়। তিনি ১৮৩০ সাল পর্যন্ত বিভিন্ন গ্রাম ও প্রদেশ থেকে ইহুদী বিতারণ করেন। ১৮৩৫ সালে পশ্চিম রাশিয়ার ইহুদীদের ব্যাপারে আইন পুনঃসংস্কার করা হলো। ১৮৪৪ সালে সম্রাট নিকোলাস ইহুদীদের সমাজকে পুলিশি নজরে রাখার আদেশ দিলেন। ১৮৫০ ও ১৮৫১ সালে সরকার চেষ্টা করলো ইহুদী পোশাক আশাক, ধর্মীয় জুলফি, ইত্যাদি নিষিদ্ধ করতে।



জার প্রথম আলেকজান্ডার

১৮৫১ সালে রাশিয়ার সকল ইহুদীকে আর্থিক শ্রেণীকরণ করা শুরু হলো, যেন কাকে দিয়ে কোন কাজ করানো যায়, তা ঠিক করা যায়। যেমন কেউ কামার, কেউ কৃষক, কেউ বণিক, ইত্যাদি। অবশ্য ১৮৫৩-৫৪ সালের ক্রাইমিয়ান যুদ্ধের পর জার দ্বিতীয় আলেকজান্ডার (১৮৫৫-৮১) এসব নীতি বাদ দেন। ফলে সেইন্ট পিটার্সবার্গ এবং মস্কোর মতো জায়গাতেও ইহুদীদের দেখা যেতে লাগলো। সীমিত সংখ্যক ইহুদীদেরকে তখন আইনি পেশাতেও যোগ দেয়ার অনুমতি দেয়া হয়। উনিশ শতকের ষাট ও সত্তরের দশকে অনেক ইহুদীই তখন রাশিয়ার অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে অবদান রাখতে শুরু করলো।

উনিশ শতকের শেষ দিকে যদিও ইউরোপীয় ইহুদীরা স্বাধীন জীবন কাটাতে পেরেছে, তারপরও সত্তরের দশক থেকেই জার্মানিতে আবার মাথা চাড়া দিয়ে ওঠে ইহুদী-বিরোধী মতবাদ।

একটি কথা না বললেই নয়, পশ্চিমাারা একে অ্যান্টি-সেমিটিজম বলতে পছন্দ করে, তবে এ টার্মটি ভুল। কেন? কারণ, সেমেটিক ধর্ম বলতে ইসলাম ও খ্রিস্টধর্মও বোঝায়। তাই কেবল ইহুদী ধর্মের বিরুদ্ধে কিছু বললে তাকে 'অ্যান্টি-সেমিটিজম' বলা হবে, কিন্তু খ্রিস্ট ধর্ম বা ইসলাম ধর্মের বেলায় নয়, এটি ভাষাগত দিক দিয়েই ভুল।

অধ্যায় ১৯

ইহুদী জাতি এবং সুদপ্রথা



ইহুদীদের মহাজনি সুদের কথা যখন চলেই এলো, চলুন জেনে নেয়া যাক তাদের ধর্ম এ ব্যাপারে কী বলে। ইহুদী ধর্মের পালিত আইন হলো, তারা নিজেদের মাঝে সুদ দিয়ে ঋণ দিতে নিতে পারবে না। তবে অ-ইহুদী বিদেশি, অর্থাৎ যাদেরকে তারা জেন্টাইল বলে, তাদেরকে দেয়া যাবে সুদে ঋণ। ইহুদী ভাইদেরকে দিতে হবে বিনা সুদে, আর সেটি হবে তাদের জন্য পুণ্যের কাজ, হিব্রুতে যাকে বলে ‘সেদাকা’ (נָטָה), আরবিতে যা সাদাকা (صدقة)।

তাওরাতের বরাতে, “তুমি সুদের জন্য, রূপার সুদ, খাদ্য সামগ্রীর সুদ, কোনো দ্রব্যের সুদ পাবার জন্য তোমার ভাইকে ঋণ দেবে না। সুদের জন্য বিদেশীকে ঋণ দিতে পার, কিন্তু সুদের জন্য তোমার ভাইকে ঋণ দেবে না।” (তাওরাত, দ্বিতীয় বিবরণ, ২৩:১৯-২০)

ইহুদী পণ্ডিত মাইমনিদিজের মতে, অ-ইহুদী ব্যক্তিকে ঋণ দিলে তার সাথে সুদ ধার্য করা কেবল উচিতই নয়, বরং অবশ্য কর্তব্য একজন ইহুদীর জন্য।

শেক্সপিয়ারের ‘দ্য মার্চেন্ট অফ ভেনিস’ (১৬০০) নাটকের কথায় যদি আসি, এখানে নাট্যকার কিছু রূপকের আশ্রয় নিয়েছিলেন। কারণ তিনি যে সময়ের ইংল্যান্ডকে দেখিয়েছেন, তখন সেই দেশে কোনো ইহুদীর উপস্থিতিই ছিল না। কারণ, ইংল্যান্ড থেকে ১২৯০ সালে রাজা প্রথম এডওয়ার্ড সব ইহুদীকে বের করে দেন। অন্তত ১৬৫৩ সালের দিকে ক্রমওয়েল যুগ শুরু হবার আগে আইনত কোনো ইহুদী ইংল্যান্ডে আসতে পারেনি।

ইসরাইলের উত্থান-পতন ১৯৩



ত্রয়োদশ শতকের এ পাণ্ডুলিপিতে আমরা দেখতে পাই ইহুদীদের মারা বা বিতাড়নের একটি দৃশ্য অংকিত রয়েছে

নাটকে শেক্সপিয়ার ইংল্যান্ডের ইতিহাসে মধ্যযুগীয় ইহুদীদের চড়া সুদে ঋণ দানকে নিয়ে এসেছেন খলনায়কের চরিত্রে ইহুদী শাইলককে দিয়ে, আর শেষে আমরা দেখতে পাই শাইলক হেরে গিয়ে খ্রিস্টধর্ম গ্রহণ করছে। এর মধ্য দিয়ে খুব সহজেই ইহুদীদের প্রতি তৎকালীন খ্রিস্টানদের মনোভাব কেমন ছিল, সেটা ধরতে পারা যায়।



শিল্পীর তুলিতে হেরে যাবার পর শাইলক

অধ্যায় ২০

ইহুদীদের আমেরিকা গমন



বেশ তো আলাপ হলো ইউরোপীয় ইহুদীদের নিয়ে। কিন্তু এই ফাঁকে আমেরিকায় ইহুদীরা পাড়ি জমালো কবে? সে প্রসঙ্গেই আসা যাক এবার।

আমেরিকা মহাদেশে ইহুদীরা ছিল সেই ইউরোপীয় ঔপনিবেশিক যুগ থেকেই। তবে তাদের অভিবাসনের মূল কারণ ছিল আমেরিকায় নতুন সুযোগকে কাজে লাগানো। আর সবচেয়ে বেশি পরিমাণ ইহুদী আমেরিকায় পাড়ি দেয় যখন থেকে ইউরোপে ইহুদী বিরোধী মনোভাব বেশি চাঙ্গা হয়ে ওঠে।

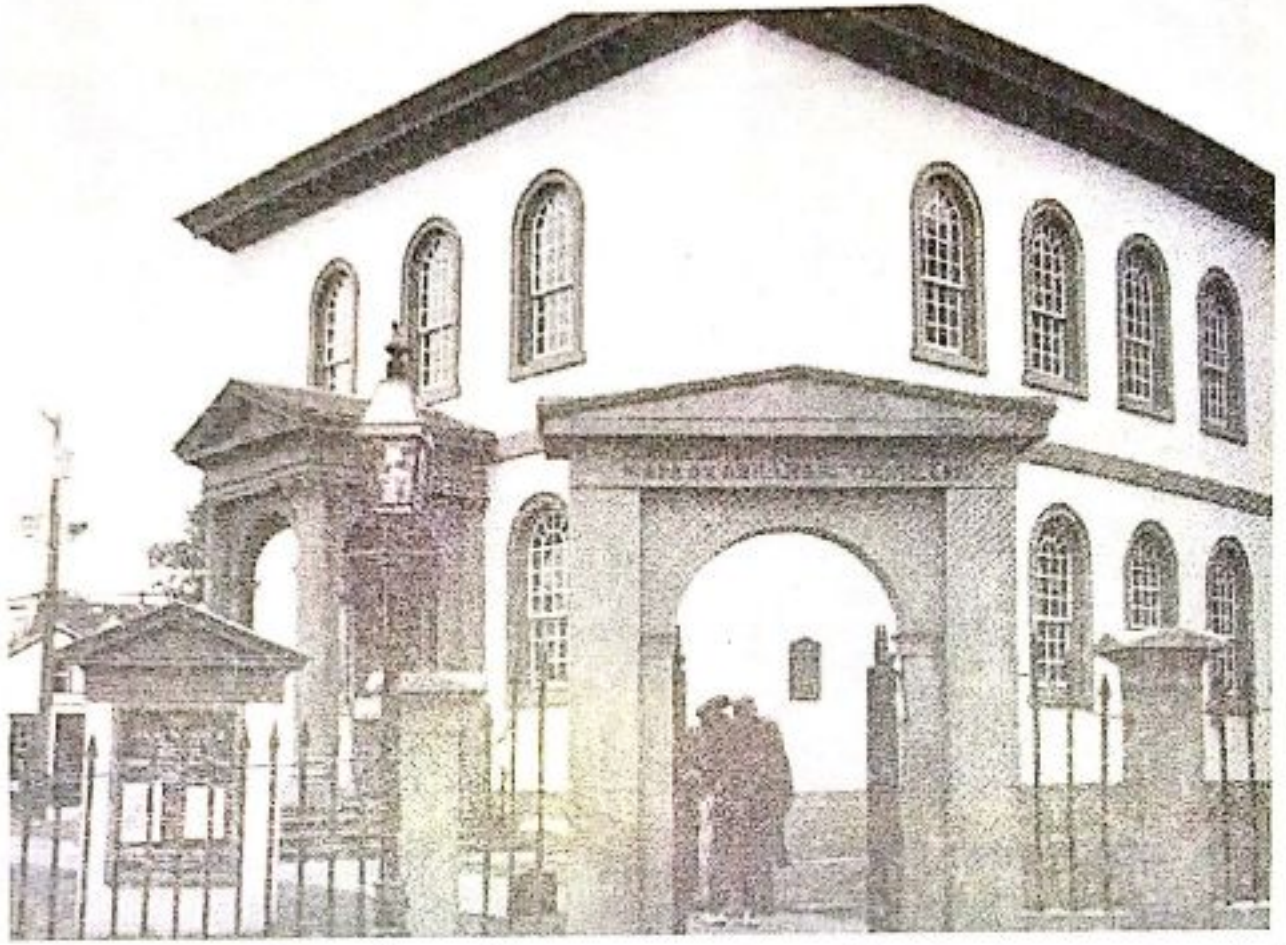
১৭৯০ সালে মোটে ১,০০০ কি ২,০০০ ইহুদী ছিলো আমেরিকায়, যারা ব্রিটেন এবং হল্যান্ড থেকে ওখানে গিয়েছে। তারা বেশিরভাগই ছিল সেফার্ডি ইহুদী। কিন্তু ১৮৪০ সালের মাঝে সেই সংখ্যা ১৫,০০০-এ উন্নীত হয়। ১৮৩০ সালের আগ পর্যন্ত তাদের অবস্থান মূলত চার্লসটন অর্থাৎ সাউথ ক্যারোলাইনায় ছিল।

১৮৮০ সালে দেখা যায়, আমেরিকান ইহুদী জনসংখ্যা প্রায় আড়াই লাখ! এরা বেশিরভাগই আশকেনাজি ইহুদী। উনিশ শতকের মাঝামাঝি তারা এসেছে জার্মান অঞ্চলগুলো থেকে। তারা মূলত ব্যবসা, পণ্য উৎপাদন এবং গুকনো কাপড়ের কাজ কারবার করত।

১৮৮০ সাল থেকে ১৯১৪ সালে প্রথম বিশ্বযুদ্ধ শুরু হওয়ার আগ পর্যন্ত পূর্ব ইউরোপ থেকে প্রায় ২০ লাখ আশকেনাজি ইহুদী আমেরিকায় চলে আসে। মূলত তারা রাশিয়া, পোল্যান্ড, লিথুয়ানিয়া, বেলারুশ, ইউক্রেন ও মলদোভা অঞ্চল

ইসরাইলের উত্থান-পতন ১৯৫

থেকে আসা। পোল্যান্ড থেকে আসা ইহুদীরা নিউইয়র্ক শহরে গার্মেন্ট ব্যবসায়
লেগে পড়ে। আমেরিকায় তারাই জায়োনিষ্ট আন্দোলন জনপ্রিয় করে।



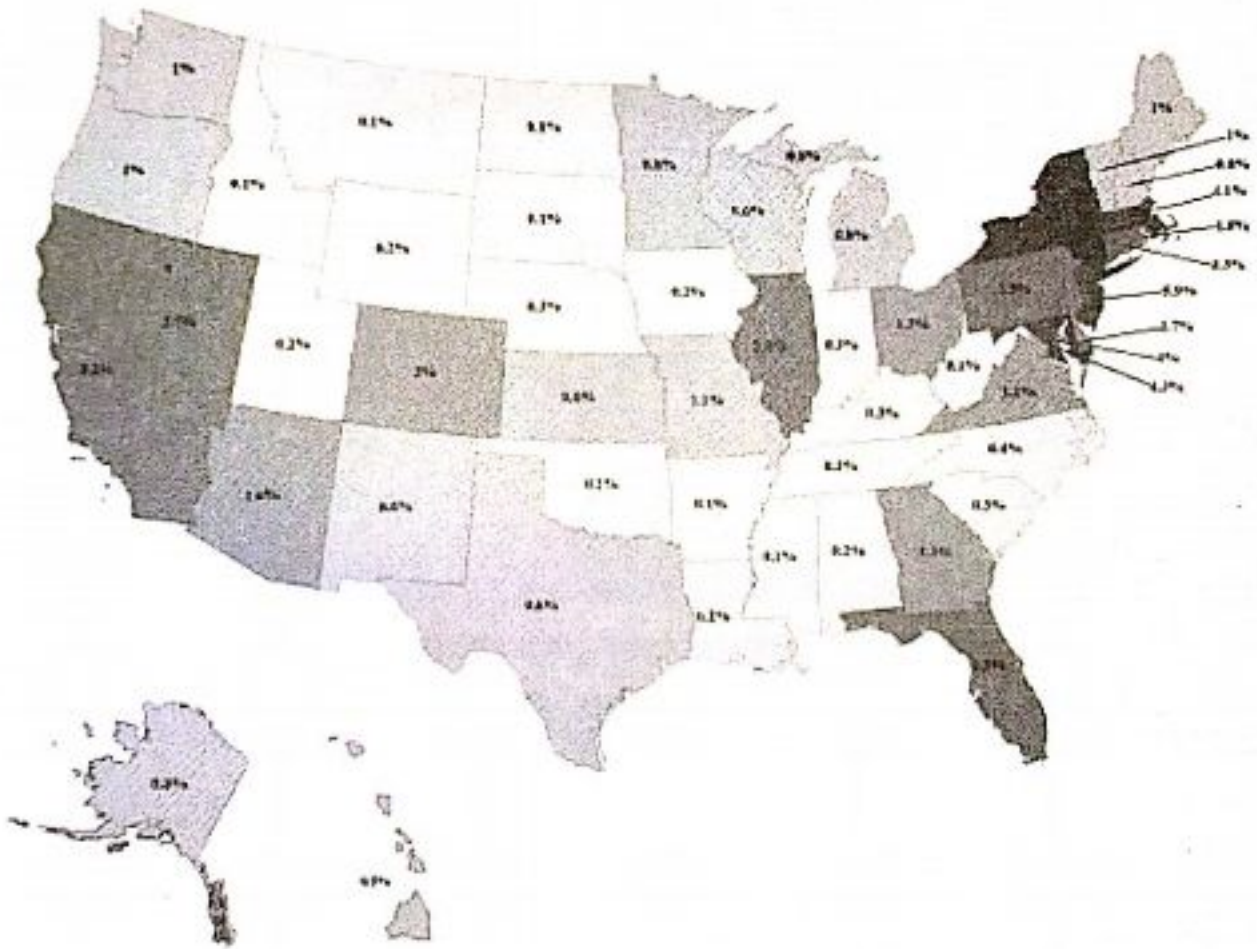
রোড আইল্যান্ডের এ সিনাগগটি আমেরিকার সবচেয়ে পুরাতন সিনাগগ, যা ১৭৫৯ সালে বানানো
হয়; নাম- টৌরো সিনাগগ।



১৭১৪ সালে নির্মিত এ বাসাটি আমেরিকার সবচেয়ে পুরাতন ইহুদী অধিকৃত বাসা, গোমেজ মিল
হাউজের মালিক ছিলেন একজন পর্তুগাল থেকে আসা সেফার্দী ইহুদী। অবস্থান-নিউইয়র্ক শহরের
মার্লবোরোতে।

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের আগেই ইহুদীরা আমেরিকার সংস্কৃতির অংশ হয়ে যায়। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে প্রায় ৫ লাখ আমেরিকান ইহুদী দেশটির হয়ে যুদ্ধে যোগ দানের জন্য নাম লেখায়, যাদের বয়স ছিল ১৮ থেকে ৫০ বছরের মাঝে। লসঅ্যাঞ্জেলেস ও মায়ামি শহরে ইহুদীদের সংখ্যা ছিল সবচেয়ে বেশি। ইহুদীরা স্কুল কলেজগামী হওয়ায় খ্রিস্টানদের সাথে পরিচয় ও বিবাহ শুরু হয়।

চল্লিশের দশকে আমেরিকার জনসংখ্যার ৩.৭% ছিল ইহুদী। করোনা মহামারির আগে, ২০১৯ সালে ইহুদী জনসংখ্যা দাঁড়ায় ৭১ লক্ষে, যা জাতীয় লোকসংখ্যার ২%। নিউইয়র্ক, লস অ্যাঞ্জেলেস, মায়ামি, ওয়াশিংটন ডিসি, শিকাগো এবং ফিলাডেলফিয়া শহরে ইহুদীর সংখ্যা বেশি। নোবেল পুরস্কার জেতা আমেরিকানদের মাঝে ৩৭% ইহুদী।



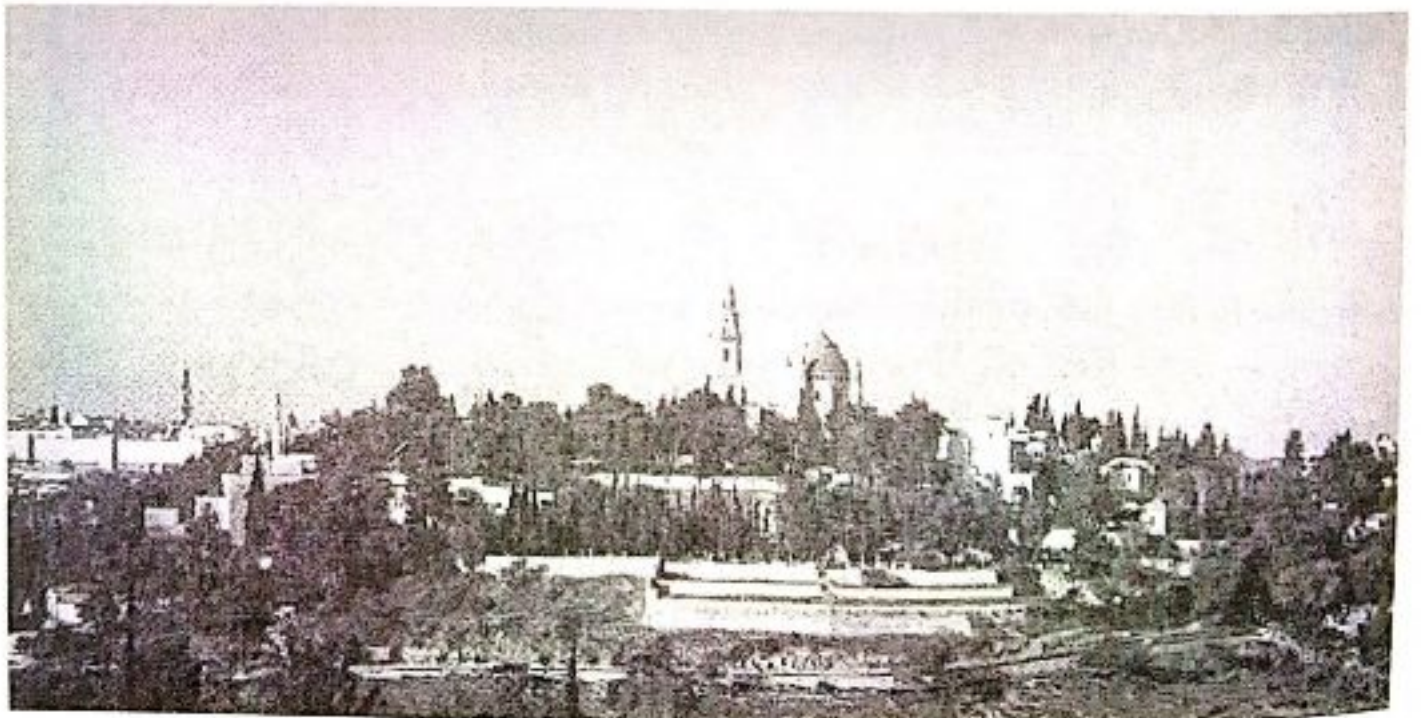
আমেরিকার কোন অঙ্গরাজ্যের জনসংখ্যার কত শতাংশ ইহুদী, তা এ মানচিত্রে চোখ বোলালে বোঝা যাবে

অধ্যায় ২১

জায়োনিষ্ট আন্দোলনের সূচনা



জেরুজালেম নগরীতে ছোট বিশেষ এক পাহাড় আছে। ‘পাহাড়’ না বলে অবশ্য ‘টিলা’ বলাটাই বেশি সঠিক। নিচের ছবিতে যেমনটা দেখতে পাচ্ছেন— সুন্দর উঁচু নিচু পাহাড়ি এলাকা, এটাই সেই পাহাড়, বা টিলা। একে ডাকা হয় ‘হার সিওন’। হিব্রু ভাষায় ‘হার’ (הר) মানে ‘পাহাড়’, আর ‘সিয়ন’ (ציון) মানে যে কী, সেটা হিব্রুভাষীরাই সঠিক জানে না, আমাদের তো জানার প্রশ্নই আসে না। এই ‘সিয়ন’ বা ‘জিয়ন’ পাহাড়কে ইংরেজিতে বলা হয় ‘মাউন্ট জায়োন’। আরবিতে ‘জাবালে স্বহ-ইউন’ (جبل صهيون)।



মাউন্ট জায়োন

১৯৮ ইসরাইলের উত্থান-পতন

মাউন্ট জায়োনের ভেতরে এক কক্ষেই যীশু তার শিষ্যদের সাথে শেষ ভোজ বা 'দ্য লাস্ট সাপার' করেছিলেন বলে মনে করা হয়। এই সেই 'জায়োন', যাকে নিয়ে এত রক্তপাত। এই সেই জায়োন, ইহুদীরা যাকে 'পবিত্র ভূমি' বা হোলি ল্যান্ডের কেন্দ্র হিসেবে জানে, যার কোলে রয়েছে— অন্তত তাদের বিশ্বাসমতে— হযরত দাউদ (আ)-এর সমাধি, বা ডেভিড'স টুম্ব। এই সেই জায়োন, যেখান থেকে জায়োনিজমের উৎপত্তি; যে জায়োনিজমের ফসল হলো যুগ যুগ ধরে চলে আসা ইসরাইল-ফিলিস্তিন রক্তপাত।



দাউদ (আ)-এর কবর বলে মনে করা হয় একে

১৮৭০ ও ১৮৮০-র দশকে ইউরোপের ইহুদী সমাজ জোরেসোরেই আলাপ করতে লাগলো প্রাচীন ইসরাইল ভূমিতে ফিরে যাবার ব্যাপারে। সেখানে গিয়ে তারা আদি মাতৃভূমি পুনঃপ্রতিষ্ঠা করতে চায়। হিব্রু বাইবেলে জেরুজালেমে ফেরত যাওয়া নিয়ে করা ভবিষ্যদ্বাণীকে বাস্তবে পরিণত করা ছিল তাদের আরেকটি উদ্দেশ্য; প্রথম বাইতুল মুকাদ্দাস বা টেম্পল অফ সলোমন ভাঙার পর রাজা সাইরাসের পৃষ্ঠপোষকতায় ইহুদীদের জেরুজালেমে ফিরে আসাকে উজাইর (আ) ও নেহেমিয়া (আ) বলেছিলেন 'শিভাৎ সিওন' (יְהוֹשֻׁעַ בֶּן יוֹסִיָּהּ)। আরেকটি শিভাৎ সিওনের খোঁজে ছিল ইউরোপীয় ইহুদীরা।

১৮৮১ সালে 'হোভেভেই সিওন' (יְהוֹשֻׁעַ בֶּן יוֹסִיָּהּ) অর্থাৎ 'জায়োনপ্রেমী' বা 'হিব্রাত সিওন' নামে এক বা একাধিক সংঘ প্রতিষ্ঠিত হয়। মূলত রুশ সাম্রাজ্যে ইহুদী বিরোধী মনোভাবের প্রত্যুত্তরে এগুলোর জন্ম। ১৮৮২ সালে বর্তমান

তেলআবিব শহরের ৫ মাইল দক্ষিণে রিশন লেসিওন (רִשׁוֹן לֵצִיּוֹן) নামে একটি শহর গড়ে তোলে এই হোভেভেই সিওনের সদস্যরা, যারা অভিবাসন করে ওই অঞ্চলে চলে যায়। এটি ছিল অটোমান ফিলিস্তিনের দ্বিতীয় ইহুদী শহর। এর আগের গ্রাম ১৮৭৮ সালে তেলআবিবের কাছে গড়ে ওঠে। এর নাম ছিল পেতাহ তিকভা, কিন্তু ১৮৮৩ সালের আগে সেটি শহরে পরিণত হয়নি।



বর্তমান রিশন লেসিওন শহর



১৮৯০ এর দশকের রিশন লেসিওন শহর, নাকি গ্রাম বলা উচিত?

১৮৮২ সালের দিকে রাশিয়া থেকে পালিয়ে আসে 'বিলু' (ב"ל) আন্দোলনের নেতারা। তাদের দাবি হলো, ইসরাইল ভূমিতে কৃষিকাজের মাধ্যমে স্থায়িত্ব অর্জন করতে হবে। এর সদস্যদের বলা হতো 'বিলুইম'।



১৮৮২ সালের বিলু চার্টার

১৮৮৪ সালের নভেম্বরে বিভিন্ন দেশ থেকে হোভেভেই সিওনের সদস্যরা তৎকালীন জার্মানির (বর্তমান পোল্যান্ডের) কাতোভিস শহরে মিলিত হয়। সেখানে

তাদের আলোচনার বিষয়বস্তু ছিল একটি ইহুদী রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার পরিকল্পনা করা। রাশিয়া থেকে ২২ জনসহ মোট ৩২ জন সদস্য ছিল এ কনফারেন্সে। প্রথম জায়োনিস্ট কংগ্রেসেরও ১৩ বছর আগের কথা এটি।



কাতোভিস কনফারেন্সে অংশগ্রহণকারীগণ

ইসরাইল রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার যে জায়োনিস্ট আন্দোলন, তার শুরুটা যে স্ক্যান্ডালের মাধ্যমে হয়েছিল, সেটা সম্পর্কে খুব কম লোকই জানেন। এটাকে “ড্রায়ফাস স্ক্যান্ডাল” বা “ড্রায়ফাস অ্যাফেয়ার” (Dreyfus affair) বলা হয়। ঘটনাটা এরকম, ১৮৯৪ সালের ডিসেম্বরে ফরাসি বাহিনীর আর্টিলারি অফিসার ক্যাপ্টেন আলফ্রেড ড্রায়ফাসকে বিশ্বাসঘাতকতার দায়ে অভিযুক্ত করা হয় এবং উত্তর আটলান্টিকের ডেভিলস আইল্যান্ডে যাবজ্জীবন দণ্ড দেয়া হয়। অভিযোগ হলো, তিনি নাকি প্যারিসের জার্মান এমবাসিতে ফ্রেঞ্চ মিলিটারির গোপন তথ্য পাচার করছিলেন। সমস্যাটা হলো, ড্রায়ফাস ছিলেন ইহুদী, এবং ইহুদীরা তখন প্রতিবাদ শুরু করে। দুবছরের মাথায় তদন্তে বেরিয়ে এলো, আসলে তথ্য পাচার করছিলেন অন্য এক আর্মি মেজর, ড্রায়ফাস নন। ফ্রেঞ্চ আর্মি নতুন তথ্য-প্রমাণ ধামাচাপা দিতে চেষ্টা করে। কিন্তু এক পর্যায়ে ফরাসি রাষ্ট্রপতির ক্ষমাও জুটে যায় ড্রায়ফাসের, সুপ্রিম কোর্টও তাকে নির্দোষ ঘোষণা করে। তিনি আর্মিতে মেজর হিসেবে যোগ দেন এবং প্রথম বিশ্বযুদ্ধে অংশও নেন। ড্রায়ফাসের ঘটনা ওখানেই শেষ।

কিন্তু এই স্কাভাল থেকে জনৈক ভদ্রলোক এই সিদ্ধান্তে আসেন যে, ইহুদীদের ইউরোপে আর থাকা যাবে না। এই ভদ্রলোকের নাম থিওডোর হার্জেল (Theodor Herzl), অস্ট্রিয়া-হাঙ্গেরির একজন ইহুদী সাংবাদিক ও লেখক। তাকে ‘আধুনিক ইসরাইল রাষ্ট্রের জনক’ হিসেবে বিবেচনা করা হয়।



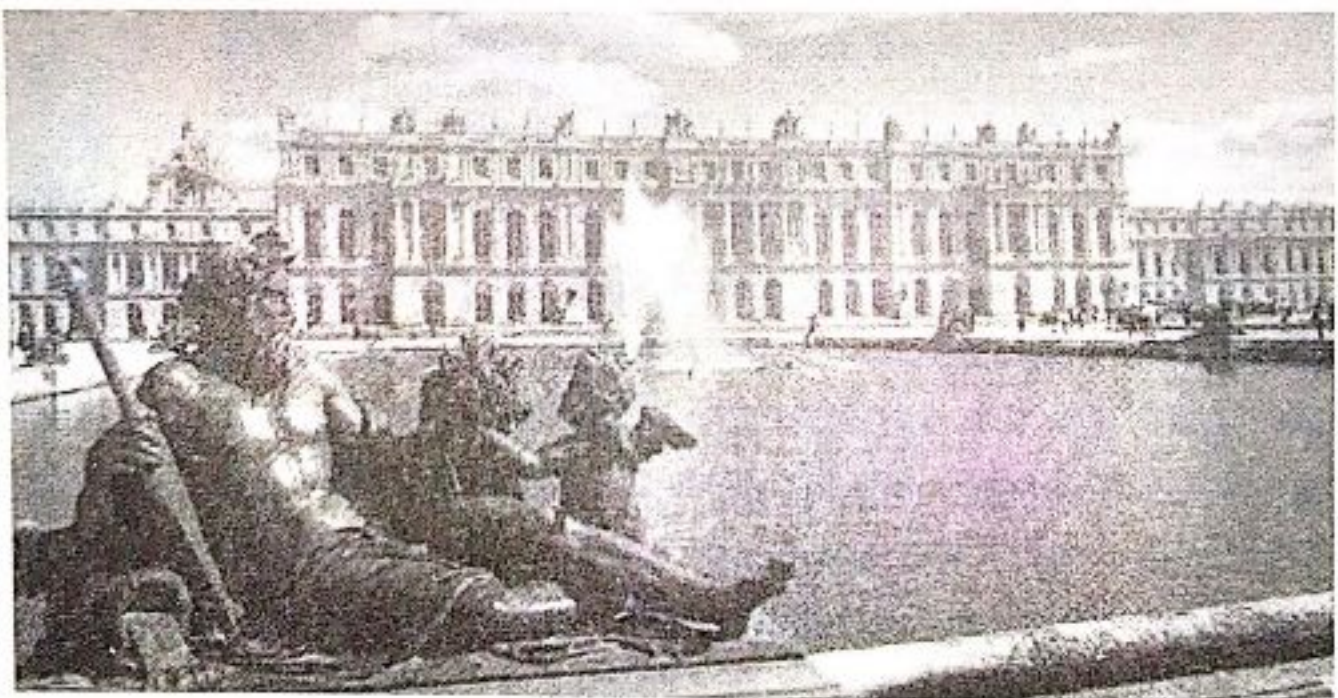
১৯০১ সালে তোলা ছবিতে থিওডোর হার্জেল

“ইহুদী রাষ্ট্র” (দ্য জুয়িশ স্টেট) নামে তার জার্মান ভাষায় লেখা বইতে হার্জেল লিখেন, ক্রমবর্ধমান ইউরোপীয় ইহুদীবিদ্বেষের একমাত্র সমাধান আলাদা এক ইহুদী রাষ্ট্র। ১৮৯৭ সালে জায়োনিষ্ট সংঘ গড়ে তোলা হয়। প্রথম জায়োনিষ্ট কংগ্রেসে লক্ষ্য ধার্য করা হয়, ফিলিস্তিনে ইহুদী আবাসভূমি গড়ে তুলতে হবে। প্রথমে ফিলিস্তিনের নাম আসেনি, এর আগে এশিয়া, আফ্রিকা বা দক্ষিণ আমেরিকার যেকোনো জায়গায় ইহুদী রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার প্রস্তাব আসে। কিন্তু ১৯৭ জন ইহুদী প্রতিনিধিই একমত হন ফিলিস্তিনের ব্যাপারে।

১৯০২ সালের মাঝে ৩৫,০০০ ইহুদী চলে আসে ফিলিস্তিনে, যেটা বর্তমানে ‘ইসরাইল’ নামে পরিচিত। তখন সেটা অবশ্য মুসলিম অধিকারে। এটাকে বলা হয় ‘প্রথম আলিয়া’। আলিয়া হলো ইহুদী পুনর্বাসন, যখন অনেক ইহুদী একসাথে সরে আসে। তখন মুসলিম-প্রধান ফিলিস্তিনে দেখা গেল, জেরুজালেমের সিংহভাগই হঠাৎ করে ফিরে আসা ইহুদী।

১৯০৫ থেকে ১৯১৪ সাল পর্যন্ত ফিলিস্তিন অঞ্চলে ইহুদীদের জনসংখ্যা ছিল মোটে কয়েক হাজার। কিন্তু প্রথম বিশ্বযুদ্ধ চলাকালীন সময়ে ব্রিটিশদের সহযোগিতায় ফিলিস্তিনে ইহুদীদের সংখ্যা দাঁড়ায় ২০ হাজার! ১৯১৪ সালের মার্চের দ্বিতীয় আলিয়া হয়ে গেল, ৪০,০০০ ইহুদী এ এলাকায় চলে এলো। প্রথম বিশ্বযুদ্ধে ইহুদীরা সমর্থন দেয় জার্মানিকে, কারণ তারা শত্রু রাশিয়ার বিরুদ্ধে লড়ছিল। ভাগ্যের পরিহাসে, পরের বিশ্বযুদ্ধেই এই জার্মানি ইহুদীদের একদম নিশ্চিহ্ন করতে নেমে পড়েছিল!

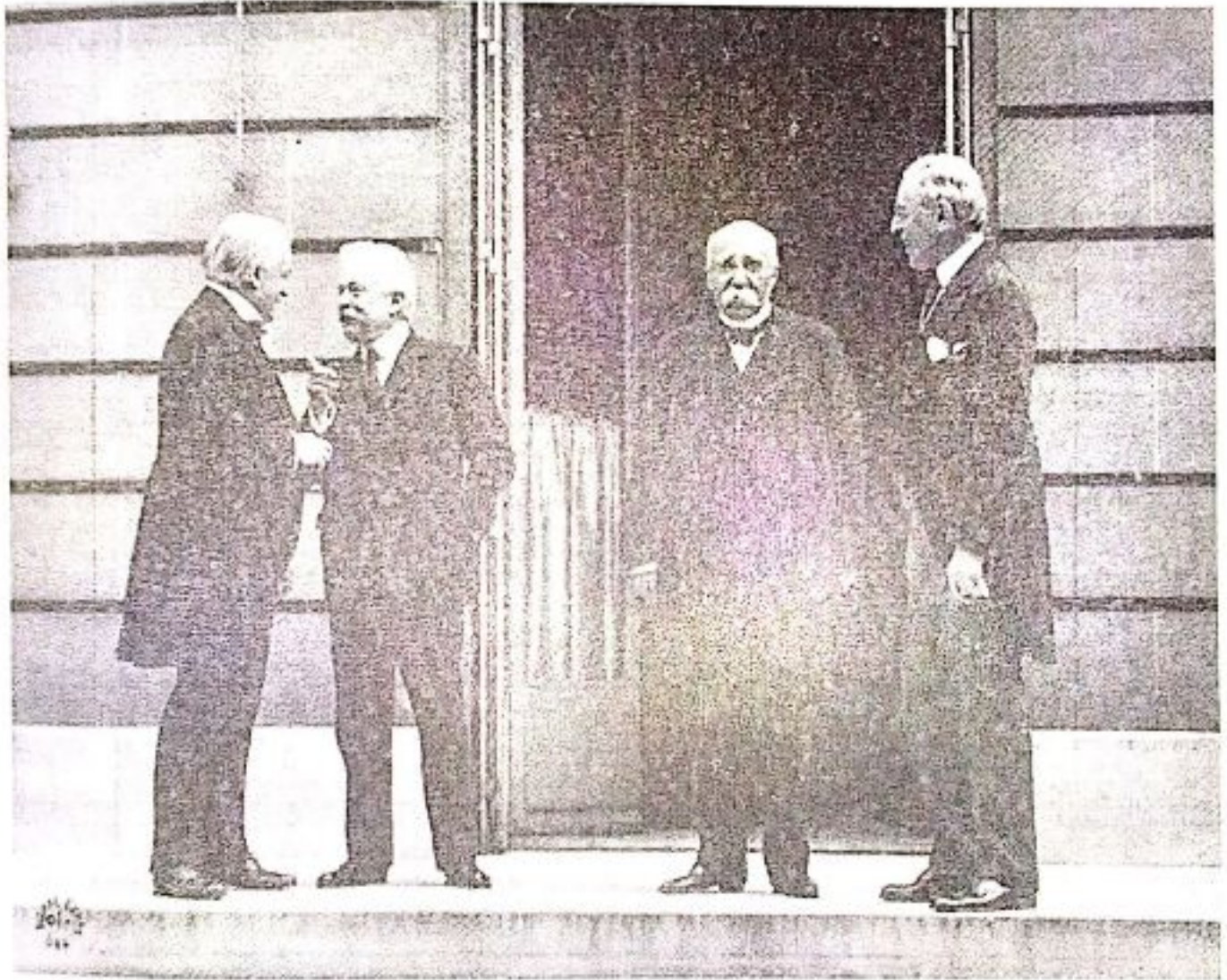
প্রথম বিশ্বযুদ্ধ শেষ হয় ১৯১৮ সালে, আর তাতে হেরে যায় কেন্দ্রীয় শক্তি (অক্ষশক্তি) বা সেন্ট্রাল পাওয়ার্স। এই বিজিত কেন্দ্রীয় শক্তির অধীনে ছিল জার্মান সাম্রাজ্য, অস্ট্রিয়া, হাঙ্গেরি, মুসলিম অটোমান সাম্রাজ্য (উসমানি সাম্রাজ্য) আর বুলগেরিয়া। যুদ্ধে জিতে যায় মিত্রশক্তি (অ্যালাইড)। আসলে ১৯১৮ সালের ১১ নভেম্বর অস্ত্রবিরতি হলেও, কাগজে কলমে যুদ্ধের ইতি ঘটে ১৯১৯ সালের ২৮ জুন। সেদিন প্যারিস থেকে ২০ কিলোমিটার দূরে ফ্রান্সের রাজপ্রাসাদ ভের্সাই প্রাসাদে স্বাক্ষরিত হয় ভের্সাই চুক্তি, যেখানে জার্মানি আর মিত্রশক্তির যুদ্ধের ইতি টানা হয়। ঠিক পাঁচ বছর আগে এক অস্ট্রিয়ান আর্চডিউকের গুপ্তহত্যার কারণে প্রথম বিশ্বযুদ্ধ শুরু হয়েছিল।



এই সেই ভের্সাই প্রাসাদ, যেখানে স্বাক্ষরিত হয় ভের্সাই চুক্তি

বিশ্বযুদ্ধের পরপর মিত্রশক্তি ১৯১৯ সালে ফ্রান্সের রাজধানী প্যারিসে একটি সম্মেলন আয়োজন করে, একে ‘প্যারিস পিস কনফারেন্স’ বা ‘প্যারিস শান্তি সম্মেলন’ বলা হয় (যার ফল ছিল এ ভের্সাই চুক্তি)। সেখানে যোগদান করেন ৩২টিরও বেশি দেশ থেকে আসা কূটনীতিকগণ। এ সম্মেলনের উদ্দেশ্য ছিল, এই ২০৪ ইসরাইলের উত্থান-পতন

যুদ্ধে হেরে গেল যে দেশগুলো, তাদের সাথে কী করা যায়, সে ব্যাপারে সিদ্ধান্ত নেয়া। পরাজিত কেন্দ্রীয় শক্তির দেশগুলোর জন্য বিভিন্ন শর্ত তৈরি করা হয় এ সম্মেলনে। পুরো যুদ্ধের জন্য দায়ী করা হয় জার্মানিকে। দেশটিকে যুদ্ধের কারণে হওয়া ক্ষয়ক্ষতির দায়ভার বহনের জন্য জরিমানা করা হয়। জার্মানি প্রচণ্ড অপমানিত হলেও ১৯৩১ সাল পর্যন্ত একটি বড় অংকের ক্ষতিপূরণ দিয়েছিল। তবে এর ফলে স্বভাবতই ইউরোপের অন্য দেশগুলোর প্রতি জার্মানদের মনে ঘৃণা তৈরি হয়।



এই চার মহারথীই সিদ্ধান্তগুলো নেন প্যারিস শান্তি সম্মেলনে, এরা হলেন (বাম থেকে যথাক্রমে) যুক্তরাজ্যের ডেভিড লয়েড জর্জ, ইতালির ভিন্সেঞ্জো এমানুয়েলে ওরলান্দো, ফ্রান্সের জর্জ ক্রেমঁসো এবং যুক্তরাষ্ট্রের উদ্ভো উইলসন

প্যারিস শান্তি সম্মেলনে নেয়া দুটো বড় সিদ্ধান্ত আমাদের এ বইয়ের পটভূমি বোঝার জন্য গুরুত্বপূর্ণ। সিদ্ধান্ত এক, একটি আন্তর্জাতিক প্রতিষ্ঠান তৈরি করা হবে, যার নাম হবে ‘লিগ অফ ন্যাশনস’। আর দুই, জার্মানি আর অটোমান সাম্রাজ্যের অধীনে যুদ্ধ শেষ হওয়ার আগ পর্যন্ত যে যে বিদেশী এলাকাগুলো ছিল, সেগুলো মিত্রশক্তির মাঝে বিলি করে দেয়া, বিশেষ করে ফ্রান্স আর ব্রিটেনের মাঝে।

জাতিসংঘ সৃষ্টির আগে পুরো বিশ্বজুড়ে আন্তর্জাতিক যে সংঘের উপস্থিতি ছিল, সেটিই লিগ অফ ন্যাশনস (League of Nations), যাকে সংক্ষেপে LON-ও ডাকা হতো। প্যারিস শান্তি সম্মেলনের ফলশ্রুতিতে ১৯২০ সালের ১০ জানুয়ারি জন্ম নেয় এ লিগ। জাতিসংঘ জন্ম নেবার আগ পর্যন্ত, অর্থাৎ ১৯৪৬ সাল পর্যন্ত লিগ অফ ন্যাশনস তার কাজ চালিয়ে যায়। এর পতাকায় ব্রিটিশদের ভাষা ইংরেজি আর ফ্রান্সের ভাষা ফরাসিতে নাম লেখা ছিল (Société des Nations), যেমনটি এখানে দেখতে পাওয়া যাচ্ছে—



লিগ অফ ন্যাশনসের পতাকা

তো যা বলছিলাম, যুদ্ধে পরাজিত দেশগুলোর বিদেশী অধিকৃত এলাকাগুলোকে বিলি করে দেবার কথা। এই এলাকাগুলোকে বলা হতো লিগ অফ ন্যাশনস ম্যান্ডেট। একেকটি ম্যান্ডেট একেক জয়ী দেশের অধীনে চলে গেল। তাদের দায়িত্ব— লিগ অফ ন্যাশনসের হয়ে এ জায়গাগুলোর দেখাশোনা করা, সেখানকার লোকদের অধিকার সংরক্ষণ করা। এই ম্যান্ডেটতন্ত্র তৈরি করা হয় লিগ অফ ন্যাশনস চুক্তিপত্রের আর্টিকেল ২২ অনুযায়ী। লিগ অফ ন্যাশনসের পর এগুলো জাতিসংঘের অধীনে চলে গিয়েছিল।

তিনটি শ্রেণী বা ক্লাসে ভাগ করা হয় ম্যান্ডেটগুলোকে। মোট ১৬টি ম্যান্ডেট। পশ্চিম এশিয়া কভার করা ক্লাস-এ'তে ৫টি, আফ্রিকা কভার করা ক্লাস-বি'তে ৭টি এবং প্রশান্ত মহাসাগরীয় অঞ্চল কভার করা ক্লাস সি'তে আছে ৪টি ম্যান্ডেট। আমাদের আলোচ্য বিষয় ক্লাস-এ, অর্থাৎ পশ্চিম এশিয়া। এতে আছে সিরিয়া, ট্রান্সজর্ডান, মেসোপটেমিয়া, লেবানন আর ফিলিস্তিন।

সবচেয়ে বড় প্রশ্ন হয়ে দাঁড়ায়, ফিলিস্তিন কার অধিকারে যাবে?

MANDATE FOR PALESTINE,

TOGETHER WITH A

NOTE BY THE SECRETARY-GENERAL
RELATING TO ITS APPLICATION

TO THE

TERRITORY KNOWN AS TRANS-JORDAN,

under the provisions of Article 25.

*Presented to Parliament by Command of His Majesty.
December, 1922.*



LONDON:
PRINTED BY HIS MAJESTY'S STATIONERY OFFICE

The Government Printer and Designer of the United Kingdom
H.M. STATIONERY OFFICE is at the following addresses:
LONDON: 25, Abchurch Lane, W.C. 4, and 25, Tottenham Court Road, London, W. 1.
GLoucester: 1, High Street. BIRMINGHAM: 1, 11, and 13, Corporation Street. EDINBURGH: 1, 11, and 13, Corporation Street. GLASGOW: 1, 11, and 13, Corporation Street. LIVERPOOL: 1, 11, and 13, Corporation Street. MANCHESTER: 1, 11, and 13, Corporation Street. NEWCASTLE: 1, 11, and 13, Corporation Street. SHEFFIELD: 1, 11, and 13, Corporation Street. YORK: 1, 11, and 13, Corporation Street.

Price 3d. net.

Cmd 1765

লিগ অফ ন্যাশনসের প্যালেস্টাইন ম্যান্ডেট

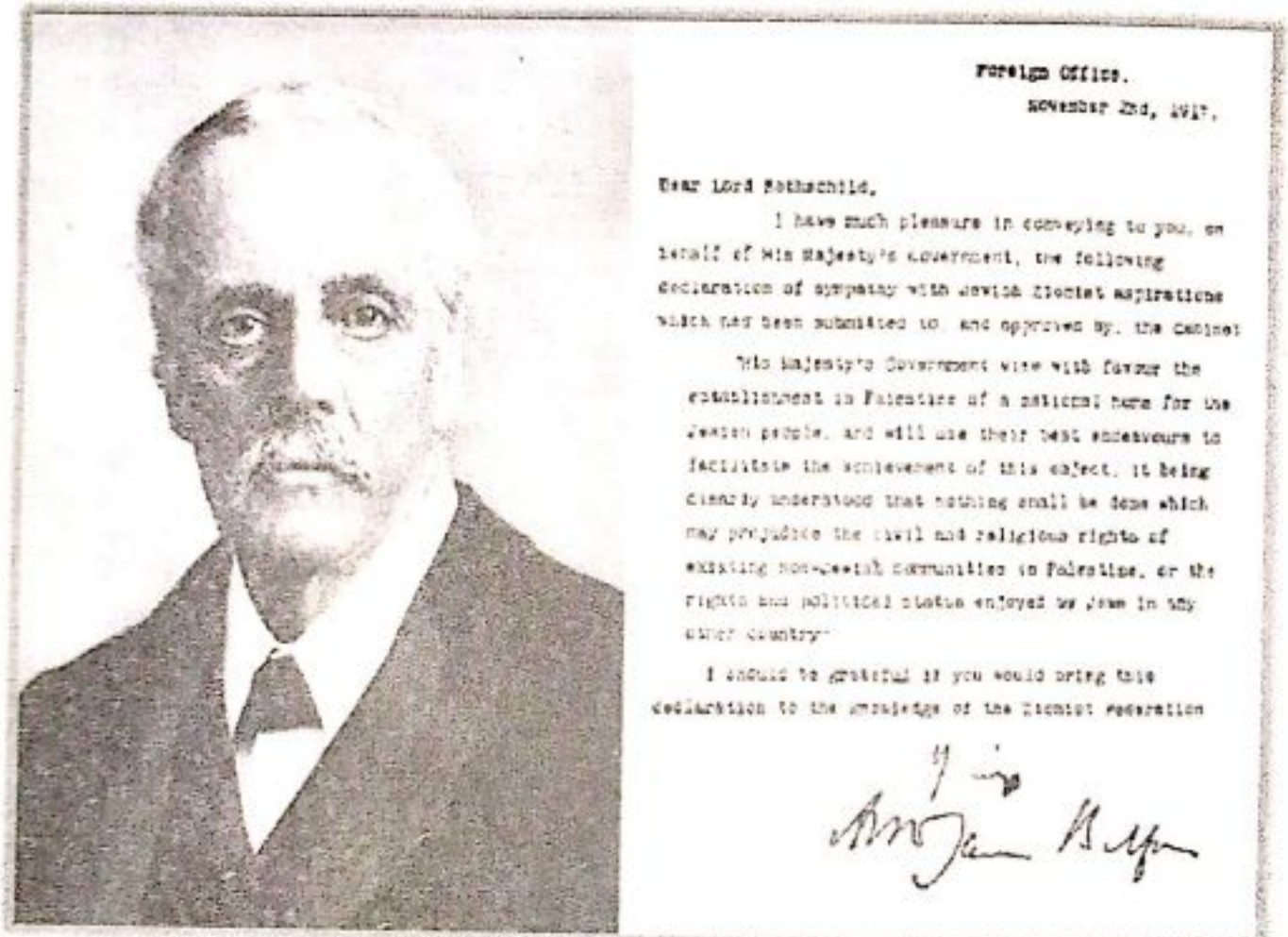
প্রথম বিশ্বযুদ্ধ যখন শুরু হয়েছিল, তখন মুসলিম-প্রধান ফিলিস্তিন অটোমান সাম্রাজ্যের অধীনে, খুব কম সংখ্যক ইহুদীই সেখানে বসবাস করত। তখন থেকেই ব্রিটিশ ওয়ার কেবিনেট চিন্তা করা শুরু করে ফিলিস্তিনের ভবিষ্যৎ নিয়ে। তৈরি করা হয় 'ব্যালফোর ঘোষণা', যাকে ইসরাইল রাষ্ট্র সৃষ্টির ভিত্তি হিসেবে ধরা হয়।

এই ঘোষণাটি মূলত একটি চিঠি, তাতে তারিখ দেয়া- ২ নভেম্বর, ১৯১৭। চিঠিটি ব্রিটিশ পররাষ্ট্র সচিব আর্থার ব্যালফোর সেখানকার ইহুদী সমাজের নেতা

ইসরাইলের উত্থান-পতন ২০৭

লর্ড রথসচাইল্ডকে পাঠান। উদ্দেশ্য ছিল ব্রিটেন আর আয়ারল্যান্ডের জায়োনিস্ট সংঘে প্রচার করা। জায়োনিস্ট বলতে বোঝায়, ইহুদীদের নিজস্ব এলাকা প্রতিষ্ঠা এবং সারা দুনিয়ায় ইহুদীদের প্রতিরক্ষার আন্দোলন।

ব্যালফোর ঘোষণায় বলা হয়, ব্রিটিশ সরকার ফিলিস্তিনে ইহুদীদের জন্য জাতীয় আবাসভূমি তৈরি করতে সায় দিচ্ছে, এবং এর জন্য সর্বাত্মক চেষ্টা করবে। তবে এতে করে যেন সেখানকার অ-ইহুদী সম্প্রদায়ের অধিকার ক্ষুণ্ণ না হয়, সেদিকে নজর দিতে হবে। অন্যান্য দেশে বসবাসরত ইহুদীদের অধিকারও যেন অক্ষুণ্ণ থাকে, সেটিও খেয়াল করতে হবে।



আর্থার ব্যালফোর ও তার ঘোষণা

ব্যালফোর ঘোষণায় ইহুদী আবাসভূমি বললেও সেটি আলাদা রাষ্ট্র হবে কিনা, সেটা বলা নেই। ব্রিটিশ সরকার ইচ্ছে করেই সেটি চেপে যায়। তারা আলাদা করে নিশ্চিত করে যে, ফিলিস্তিনকে ইহুদী আবাসভূমি বললেও তারা কখনও চায়নি, পুরো ফিলিস্তিন জুড়েই ইহুদী আবাস হোক।

আজকে যা সৌদি আরব, তখন তা হেজাজ নামের পরিচিত ছিল। সেখানকার ক্ষমতা ছিল হাশেমি পরিবারের অধীনে। হাশেমিদের নেতা শরিফ হুসাইন বিন আলী ১৯১৫-১৯১৬ সালে দশটি চিঠি আদানপ্রদান করেন মিসরের ব্রিটিশ হাই কমিশনারের সাথে। ১৯১৫ সালের ২৪ অক্টোবর যে চিঠি পাঠানো হয়, তাতে

স্পষ্ট করে লেখা- যদি বিশ্বযুদ্ধে অটোমানদের বিরুদ্ধে মক্কার নেতা শরিফ একটি বিদ্রোহ শুরু করতে পারে, তাহলে যুদ্ধ শেষে ব্রিটিশ সরকার আরবদের স্বাধীনতা দেবে। মিত্রশক্তির বিরোধী পক্ষ ছিল অটোমানরা। যুদ্ধে জিততে হলে তাদের বিরুদ্ধে জনমত গড়ে তোলা ব্রিটিশ সরকারের জন্য খুব জরুরি ছিল। কারণ, তাদের শাসিত খোদ ভারতবর্ষেই ৭ কোটি মুসলিম তখন, তারা নৈতিকভাবে সমর্থন দেয় অটোমান খেলাফতকে; এরকম অনেকেই যোগ দিয়েছে ভারতীয় সেনাবাহিনীতে, এদেরকে বিশ্বযুদ্ধে ব্যবহার করা হবে। কিন্তু তারা যদি দেখে যে মক্কা নিজেই অটোমানদেরকে সমর্থন দেয় না, বরং মিত্রশক্তিকে দেয়, তাহলে এই বিশাল জনসংখ্যাকে নিজেদের পক্ষে পাবে ব্রিটিশ সরকার।



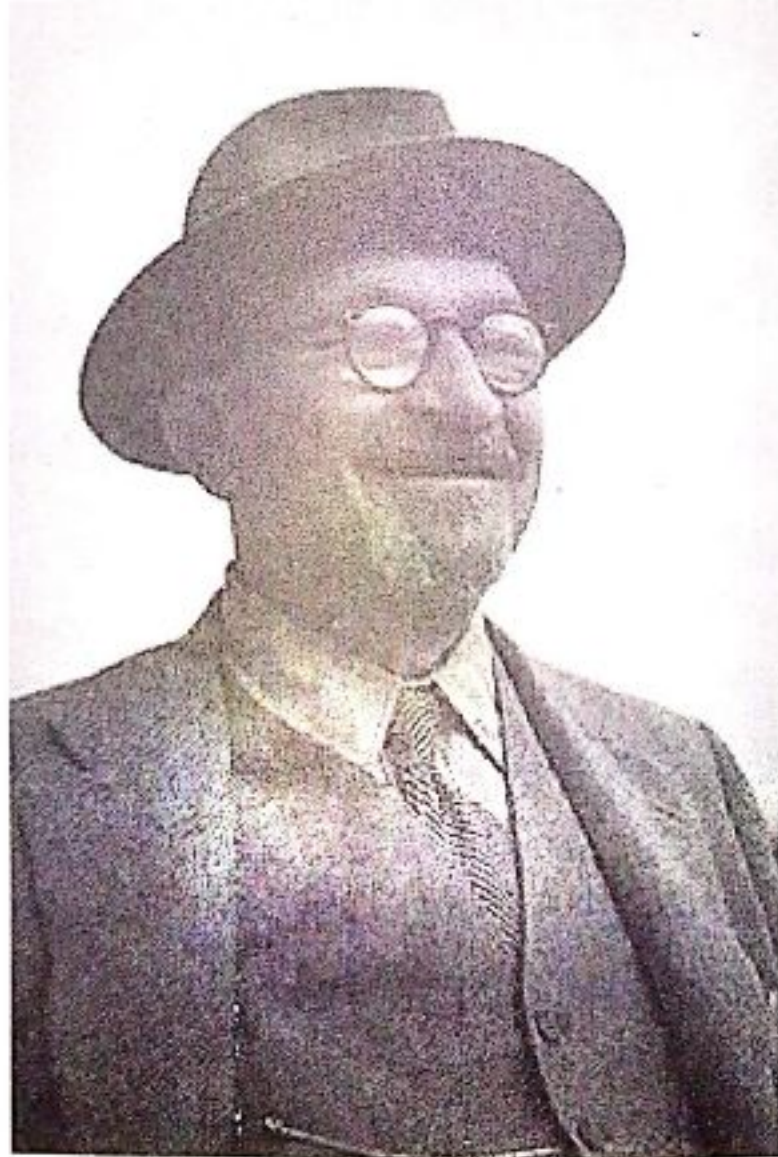
শরিফ হুসাইন বিন আলী, ছবিটি ১৯১৬ সালে তোলা

মক্কার নেতা শরিফ হুসাইন নির্দিষ্ট করে দিলেন যে তিনি কোন কোন আরব এলাকার স্বাধীনতা চান। তবে তিনি ফিলিস্তিনের কথা বলেছিলেন কি বলেননি, সেটা আজও বিতর্কের বিষয়। অন্যদিকে একই সময়ে সোভিয়েত আর ইতালির সাহায্য নিয়ে যুক্তরাজ্য আর ফ্রান্স নিজেদের মাঝে একটি গোপন চুক্তি সেরে নেয়। এই চুক্তিতে ব্রিটেনের অধীনে চলে যায় আজকের ইসরাইল, ফিলিস্তিন, জর্ডান,

ইরাকের দক্ষিণাংশ ইত্যাদি। এ তো গেল গোপনে হওয়া চুক্তি, কিছু সময় পরে সেটি জনসম্মুখেও চলে এলো। এবার আনুষ্ঠানিকতার পালা।

প্যারিস শান্তি সম্মেলনে এ নিয়ে আলোচনা হলো। ১৯২০ সালে লন্ডনের সম্মেলনেও সে আলোচনা চলতে থাকে। অবশেষে সে বছরের এপ্রিলে ইতালির উপকূলীয় শহর স্যানরেমোতে হওয়া সম্মেলনে আনুষ্ঠানিকভাবে ঘোষণা দেয়া হয়। মিত্রশক্তির সুপ্রিম কাউন্সিলের সিদ্ধান্ত অনুযায়ী, ফিলিস্তিন আর মেসোপটেমিয়ার ম্যান্ডেট গেল ব্রিটেনের কাছে, আর সিরিয়া ও লেবানন গেল ফ্রান্সের কাছে।

আরও বলা হলো, হেজাজের রাজা শরিফ হুসাইনের তিন ছেলে বা আমিরগণ বিভিন্ন বিজিত মুসলিম অঞ্চলের রাজা হবেন। ব্রিটিশদের আমন্ত্রণে প্যারিস সম্মেলনে আরবদের পক্ষ থেকে যোগ দেন হাশেমিদের প্রতিনিধি আমির ফয়সাল। বিশ্ব জায়েনিস্ট সংঘের পক্ষ থেকে যে দল এসেছিল, তাদের নেতা ছিলেন রুশ বায়োকেমিস্ট হাইম ওয়াইজম্যান, যিনি পরে গিয়ে ইসরাইলের প্রথম প্রেসিডেন্ট হন।



হাইম ওয়াইজম্যান, ইসরাইলের প্রথম প্রেসিডেন্ট

এর আগেই অবশ্য ইহুদী জায়োনিস্টরা ফয়সালের সাথে দেখা করেছিল, প্রায় দুসপ্তাহ আগে। তখন তারা ফিলিস্তিনের ব্যাপারে ইহুদী পরিকল্পনা নিয়ে ফয়সালের সায় নেয়। কিন্তু সম্মেলনে তারা ফয়সালের হাতে লেখা সে শর্ত উপস্থাপন না করে চেপে যায়, যেখানে আমির ফয়সাল লিখেছিলেন, তিনি এ শর্তে সায় দিচ্ছেন যে, ফিলিস্তিনকেও স্বাধীনতা দিতে হবে অন্যান্য আরব দেশের মতো। এই চেপে যাওয়ার মধ্য দিয়েই ১৯১৯ সালের ৩ জানুয়ারি ফয়সালের সাথে ওয়াইজম্যানের চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়ে যায়।

ফিলিস্তিন এখন পরিচিত হবে ব্রিটিশদের ম্যান্ডেট হিসেবে- ফিলিস্তিন ম্যান্ডেট।

অধ্যায় ২২

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ এবং ইহুদী গণহত্যা



‘আলিয়াহ আলফ’ আর ‘আলিয়াহ বেৎ’ ইহুদীদের মাঝে খুব গুরুত্ববহ দুটো বিষয়। প্রথম এবং দ্বিতীয় আলিয়াহ। প্রথম আলিয়াহ বা আলিয়াহ আলফ হলো, ব্রিটিশ ম্যান্ডেটে ব্রিটিশ সরকার যখন বৈধভাবে ইহুদীদেরকে অভিবাসী হতে অনুমতি দিয়েছিল। কিন্তু যখন থেকে সেটি সহজে দেয়া বন্ধ করে দেয় সরকার, তখন থেকে তারা অবৈধভাবে আসা শুরু করে। একেই বলা হয় দ্বিতীয় আলিয়াহ, বা আলিয়াহ বেৎ। আজকের ইসরাইলে একে ডাকা হয় ‘হাপালাহ’ (התפוצה), যার অর্থ ‘আরোহণ’। প্রশ্ন আসতে পারে, অবৈধভাবে কেন আসতে হবে? ব্রিটিশ সরকার কি খুশি মনেই ইহুদীদেরকে আসতে দেবার কথা না এখানে?

ব্যাপারটা যত সহজ মনে হচ্ছে, আসলে তা নয়। এই দ্বিতীয় আলিয়াহ ১৯২০ থেকে ১৯৪৮ সাল পর্যন্ত চলে। এর বেশিরভাগ অবৈধ ইহুদী অভিবাসী ছিল নাৎসি জার্মানি থেকে পালিয়ে আসা, কিংবা হলোকাস্ট থেকে বেঁচে আসা শরণার্থী ইহুদী। প্রথম দিকে ব্রিটেন ফিলিস্তিন আর ইউরোপীয় ইহুদীদের মধ্যে কোনো সম্পর্কই রাখতে চায়নি। সত্যি বলতে, খোদ ব্রিটেনেই আশি হাজার ইহুদীকে আশ্রয় দেয়া হয়েছিল। কিন্তু ধীরে ধীরে এ পরিস্থিতি বদলাতে থাকে, এবং সীমিত পরিসরে তারা অনুমতি দিতে থাকে ফিলিস্তিনের একটি অংশে ইহুদীদের অভিবাসনের। ব্রিটিশ সরকারের প্রতি ঘৃণা থেকে ধীরে ধীরে ইহুদী আন্ডারগ্রাউন্ড সন্ত্রাসী সংস্থাগুলো তৈরি হতে থাকে; যেমন, ইরগুন জাই লিউমি। তবে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় নির্যাতিত ইহুদীরা মিত্রপক্ষের সাথেই ছিল, অর্থাৎ

ব্রিটিশদের পক্ষে। তাই এ সময়টুকু ইরগুনও ব্রিটিশদের বিরুদ্ধে উৎপাত বন্ধ রাখে। ইহুদীরা এ সংঘগুলোকে 'প্যারামিলিটারি' সংস্থা ডাকত।



ইহুদীদের আলিয়াহ



১৫৯ ইরগুনের লোগো

ইরুনের পাশাপাশি 'লেহি' ছিল আরেকটি 'প্যারামিলিটারি' সংস্থা। লেহি ছিল হিব্রু 'লোহামেত হেরুত ইসরাইল' (לוחמי המחתרת - 'לה') এর আদ্যক্ষর দিয়ে বানানো সংক্ষিপ্তরূপ, এর মানে ছিল 'ইসরাইলের স্বাধীনতাযোদ্ধা'। এছাড়াও ছিল 'হাগানাহ' (הגנה) নামে আরেক সংস্থা, অর্থ 'প্রতিরক্ষা'। ১৯২০ থেকে ১৯৪৮ পর্যন্ত এটি ছিল ফিলিস্তিনের ইহুদীদের প্রধান 'প্যারামিলিটারি' সশস্ত্র দল। হাগানাহ ফ্রন্টে কাজ করা গ্রুপের নাম ছিল 'পালমাখ' (פלמ"ח) বা 'পালমাহ', যার অর্থ 'স্ট্রাইক ফোর্স'।

১৯২০ সালে ব্রিটিশ ম্যান্ডেটের ফিলিস্তিনে ইহুদীবাদী হার্বার্ট স্যামুয়েলকে হাই কমিশনার করে পাঠানো হয়। তখন জেরুজালেমের হিব্রু বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হয় এবং ফিলিস্তিনে ইহুদীদের আগমনের ঢেউ শুরু হয়। আরব বাসিন্দারা ফিলিস্তিনে এরকম ইহুদীদের আগমনকে ভালো চোখে দেখেনি। ১৯২০ সালে আরব দাঙ্গা ও ১৯২১ সালে ইয়াফা দাঙ্গার পর ইহুদী নেতারা বুঝতে পারলো, ব্রিটিশদের আসলে এখানে আরবদের ঠেকানোর কোনো ইচ্ছে বা পরিকল্পনা নেই। তাই তখন তারা তাদের প্যারামিলিশিয়া বাহিনীগুলো তৈরি করা শুরু করে, যাদের অনেকেই সন্ত্রাসী কর্মকাণ্ডে লিপ্ত হয়। তবে দাঙ্গার শেষ নয় সেখানেই। ১৯২৯ সাল এবং ১৯৩৬-৩৯ সালে আরও দুটো বড় দাঙ্গা হয়ে যায় ফিলিস্তিনে।

তবে স্ট্রাইক ফোর্স ঘরানার কোনো অবস্থা ইউরোপের ইহুদীদের ছিল না। তাই ন্যাসি বাহিনীর হাতে গণহত্যার শিকার হতে হয় তাদের। সেই ঘটনার সূত্রপাত কীভাবে হলো, তাই এবার আলোচনা করা যাক।

ইহুদীদের নিজস্ব হিসেব মতে, ১৮৮০ সালের মাঝেই মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে প্রায় আড়াই লাখ ইহুদীর বসবাস তখন। ১৮৮১-৮২ সালের দিকে জনসংখ্যা আরও বাড়তে শুরু করে। ১৮৮১ থেকে ১৯১৪ সালের মাঝে প্রায় সাড়ে সাতাশ লাখ পূর্ব ইউরোপীয় ইহুদী দেশত্যাগ করে। এর মাঝে ২ লক্ষ ইহুদী যায় ইংল্যান্ডে, সাড়ে ৩ লাখ যায় পশ্চিম ইউরোপে, ৪০ হাজার যায় দক্ষিণ আফ্রিকায়, ১ লাখ ১৫ হাজার যায় আর্জেন্টিনায়, ১ লাখ কানাডায় এবং প্রায় ২০ লাখ ইহুদী যায় মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে।

হঠাৎ করে এত ইহুদী আমেরিকায় চলে আসায় আগে থেকে সেখানে থাকা ইহুদীদের সমাজ ব্যবস্থায় প্রভাব পড়লো বেশ। আগে যেখানে সেফার্ডি ইহুদীরা প্রভাব বিস্তার করতো, এখন সেখানে জার্মানি থেকে আসা ইহুদীরা প্রভাব খাটাতে লাগলো। পুরো দেশ জুড়েই ছড়িয়ে পড়লো তারা, পুরো দস্তুর আমেরিকান বনে গেল। সাথে বাকি পূর্ব ইউরোপীয় আশকেনাজি ইহুদীরা তো আছেই।

১৯০২ সালে জার্মানি থেকে আসা ইহুদীদের মাঝে যারা উচ্চশিক্ষিত ছিল, তারা নতুন ধারার ইহুদী বিশ্বাস তৈরি করতে চেষ্টা করলো, অর্থাৎ তারা ধর্মটিকে সংস্কারের চেষ্টা করে। পূর্ব ইউরোপীয় ইহুদীরা এই নতুন সংস্কার বেশ আগ্রহ ভরেই গ্রহণ করে। ১৯০৬ সালে জার্মানি থেকে আসা ইহুদীরা দাতব্য সংস্থা গড়ে তোলে, প্রতিষ্ঠা করে আমেরিকান জ্যুয়িশ কমিটি যা ইউরোপের দুঃখ-কষ্টে থাকা ইহুদীদের কল্যাণে কাজ করতে দৃঢ় প্রতিজ্ঞ। জায়োনিস্ট নানা কর্মকাণ্ডে তারা ছিল সর্বাত্মে।

আমেরিকার ইহুদীদের জন্য সমস্যা বাঁধিয়ে দিল প্রথম বিশ্বযুদ্ধ। যুদ্ধে মিত্রপক্ষ ও কেন্দ্রীয় শক্তির পক্ষে লড়ে ইহুদীরা। রাশিয়াতে দুবছর যুদ্ধের পর ১৯১৭ সালের মার্চ মাসে জার শাসনের পতন হয়, এবং ইহুদীদের বিরুদ্ধে সমস্ত নিষেধাজ্ঞা উঠিয়ে নেয়া হয়। নভেম্বরেই রাশিয়ার অবস্থা খারাপের দিকে যেতে শুরু করে, শুরু হয় বলশেভিকদের বিপ্লব।

সংক্ষেপে যদি বলি, বলশেভিক হলো ভ্লাদিমির লেনিন প্রতিষ্ঠিত মার্কসবাদী রাশিয়ান সোস্যাল ডেমোক্র্যাটিক লেবার পার্টির একটি উপদল। তারা ১৯০৩ সালে দ্বিতীয় পার্টি কংগ্রেসে মেনশেভিক থেকে আলাদা হয়ে যায়। ‘বলশেভিক’ অর্থ ‘সংখ্যাগরিষ্ঠতা’, তারা ভোটে সংখ্যাগরিষ্ঠতা লাভ করেছিল। এরপর তারা সোভিয়েত কমিউনিস্ট পার্টিতে রূপান্তরিত হয়। বলশেভিকরা ১৯১৭ সালে রুশ বিপ্লবের সময় রাশিয়ার ক্ষমতায় আসে এবং প্রতিষ্ঠা করে রাশিয়ান সোভিয়েত ফেডারেটিভ সোস্যালিস্ট রিপাবলিক। পরবর্তীতে এটিই ছিল ১৯২২ সালে গঠিত সোভিয়েত ইউনিয়নের প্রধান প্রশাসনিক অঞ্চল।

আমরা যদি রাশিয়ার তৎকালীন ভোটগুলো দেখি, দেখা যায় সাধারণ ইহুদীরা বলশেভিকদের পক্ষে তেমন ভোটই দেয়নি! অথচ, বলশেভিকদের গুরুত্বপূর্ণ নেতারা ছিলেন ইহুদী। অবশ্য তারা ধর্মীয়ভাবে ছিলেন নাস্তিক, কিন্তু জাতিগত পরিচয়ে জন্মসূত্রে ছিলেন ইহুদী, তবে তারা নিজে থেকে ইহুদী পরিচয় দিতেন না। যেমন, লিওন ত্রোৎস্কিকে তার জাতিগত পরিচয় জিজ্ঞেস করা হলে তিনি উত্তর দেন, সমাজতান্ত্রিক।

১৯১৮ সালের মার্চ মাসে রাশিয়ার সাথে জার্মানির চুক্তি স্বাক্ষরিত হয় এবং এস্তোনিয়া, লাভভিয়া, লিথুয়ানিয়া, পোল্যান্ড ও ইউক্রেন জার্মানির অধিকারে চলে যায়। আমেরিকা যুদ্ধে প্রবেশের পর ১৯১৮ সালের ১১ নভেম্বর অস্ত্রবিরতি ঘোষণা করা হয়। কিন্তু পূর্ব ইউরোপে তখনও যুদ্ধ চলছে। জার্মানরা ইউক্রেন ছেড়ে চলে গেলে, ক্ষমতার জন্য অনেকগুলো দল মারামারি করতে থাকে। এরকম পরিস্থিতিতে রেড আর্মি চেষ্টা করে বাহিনীর ভেতর ইহুদী-বিরোধী মনোভাব দূর

করতে, কিন্তু অন্যান্য সেনারা ইহুদীদের হত্যা করে। ১৯২০ সালে এ যুদ্ধ শেষ হয়, কিন্তু ততদিনে অনেক ইহুদীই মারা পড়েছে। আসল সংখ্যাটা কতো সেটি নিরপেক্ষ উৎস থেকে নির্ধারণ করা দুষ্কর। তবে ইহুদী মতে, ১ থেকে দেড় লাখ ইহুদী মারা যায়। রুশ অঞ্চলের ইহুদী নিধনকে সাধারণত ‘পোগ্রোম’ বলা হয়, যদিও সাধারণ অর্থে এটি যেকোনো গণহত্যাকে বোঝানোর কথা।



বলশেভিক নেতা লিওন ত্রোৎস্কি

প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পর ইউরোপীয় বেশ কিছু দেশ ইহুদীদের অভিবাসন করার প্রচেষ্টায় বাধা দেয়। তখন থেকে ইহুদীরা মধ্যবিত্ত শ্রেণীতে পড়ে যেতে থাকে। আর যারা সফলতা লাভ করতে থাকলো, তারা স্থান পেলো সমাজের উঁচু মহলে। কেউ রাজনীতিতে নাম লেখালো, কেউ বা কলা, সঙ্গীত, বিজ্ঞান, বা সাহিত্যে। এ সময় পোল্যান্ডে বাস করত ৩০ লাখ ইহুদী, হাঙ্গেরিতে ৪ লাখ ৪৫ হাজার, রোমানিয়ায় সাড়ে ৮ লাখ, লাতভিয়াতে ৯৫ হাজার, লিথুয়ানিয়াতে ১ লাখ ১৫ হাজার, যুগোস্লাভিয়াতে ৬৮ হাজার, বুলগেরিয়াতে ৪৮ হাজার এবং গ্রিসে ৭৩ হাজার। এ দেশগুলো যুদ্ধে খুবই ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছিল।

প্রথম বিশ্বযুদ্ধ শেষে ফেডারেল প্রজাতন্ত্র হিসেবে জার্মানি ভালোই উন্নতি করে, কিন্তু ১৯৩০-৩২ সালের অর্থনৈতিক মন্দা তাদের পথে বসিয়ে দেয়, একটি বড় অংশ বেকার হয়ে পড়ে। ফলশ্রুতিতে, সরকারকে প্রেসিডেনশিয়াল ডিক্রিতে

চলার ব্যাপারে জোর করতে থাকা এক্সট্রিমিস্ট দলগুলো বেশ সমর্থন পেতে লাগলো। ন্যাশনাল সোশালিস্ট ওয়ার্কার্স পার্টির (নাৎসি পার্টির) নেতা অ্যাডলফ হিটলারকে তখন চ্যান্সেলর বানিয়ে দেয়া হয়। নাৎসি পার্টির মূল ভিত্তি ছিল জার্মান জাতীয়তাবাদ, পুঁজিবাদ-বিরোধিতা এবং অ্যান্টি-সেমিটিজম (এখানে কেবল 'ইহুদী'-বিরোধী অর্থে)। হিটলারের মতে, প্রথম বিশ্বযুদ্ধে জার্মানির হার এবং যুদ্ধের পর অর্থনৈতিক মন্দা- সবকিছুর পেছনেই দায়ী ছিল ইহুদীরা। রাশিয়ার বলশেভিক বিজয়কে ধরা হতো ইহুদীদের বিশ্বনিয়ন্ত্রণের মহাপরিকল্পনার অংশ। আর একে প্রতিহত করতে জার্মানির দরকার নিজের ক্ষমতা নিজের হাতে নিতে পারা।

হিটলারের ইহুদীদের প্রতি ঘৃণা তার জীবনীতে বেশ ভালোমতোই লিখিত রয়েছে। যেমন ধরুন, ভিয়েনাতে থাকার সময় তার লেখা, “এবার শহরের ভেতর দিকে ঘুরে বেড়াচ্ছি, হঠাৎ দেখি কালো কাফতান আর জুলফিওয়ালা এক লোক। আমার মনে প্রশ্ন জাগলো, এ কি ইহুদী? কারণ, লিনজে যাদের দেখেছিলাম, তারা তো দেখতে এমন ছিল না। কিন্তু কিছুক্ষণ আমি গভীরভাবে তাকে পর্যবেক্ষণ করলাম। এর চেহারা তো পুরোই বিদেশি! আমার প্রথম প্রশ্ন তখন নতুন এক প্রশ্নে রূপ নিল, এ কি আদৌ জার্মান?” [মেইন ক্যাম্প, পৃষ্ঠা ২৯]



নাৎসি বাহিনীর নেতা অ্যাডলফ হিটলার

নাৎসিরা ক্ষমতা হাতে পাবার পর ১৯৩৩ সালে অন্য সকল রাজনৈতিক দল নিষিদ্ধ করা হয়। ১৯৩৫ সালের সেপ্টেম্বরে নুরেমবার্গ আইনের মাধ্যমে ইহুদীদেরকে দ্বিতীয় শ্রেণীর নাগরিকে পরিণত করা হয়। ১৯৩৮ সালে তাদেরকে গেস্টাপো অর্থাৎ রাষ্ট্রীয় গোপন পুলিশের নজদারিতে রাখা হয়। সে বছর বেশ কিছু ইহুদীকে হত্যা করা হয়, যা হলোকাস্টের সূচনা করে।

১৯৩৯ সালের সেপ্টেম্বর মাসে নিয়ম জারি করা হলো, রাত ৮টার পর কোনো ইহুদী রাস্তায় থাকতে পারবে না। তাদের চলাফেরা সীমিত করা হলো, বিভিন্ন বাহন ও টেলিফোন ব্যবহারও নিষিদ্ধ করা হলো। ১৯৩৯ সালের ডিসেম্বর থেকে ইহুদীদের বাজার করার জন্য সময় বেঁধে দেয়া হলো।

প্রথমদিকে কয়েক হাজার ইহুদীকে শ্রম শিবিরে নিয়ে যাওয়া হলো, সেখানে অনেকের মৃত্যু হয়। শুরুতে পরিকল্পনা ছিল সব ইহুদীকে বের করে দেয়া, কিন্তু রাশিয়ার সাথে যুদ্ধ বেঁধে যাওয়ায় সেই পরিকল্পনা মাঠে মারা পড়ে। তাই তখন কেবল ইহুদীদের মেরে ফেলার রাস্তাই খোলা ছিল নাৎসিদের জন্য।

১৯৩৯ সালের সেপ্টেম্বরে হিটলার সিদ্ধান্ত নেন, তিনি পোল্যান্ডের একটা বড় অংশ জার্মানির অধিকারে নিয়ে নেবেন, এবং সব মিলিয়ে ৬ লাখের বেশি ইহুদীকে কেন্দ্রীয় একটি এলাকায় নিয়ে আসবেন। ততদিনে ইহুদীরা গেটোর অধীনে চলে এসেছে। তাদেরকে দিয়ে সারাদিন সারা সপ্তাহই কাজ করানো হতো, আর খাবার হিসেবে দেয়া হতো লাগলো রুটি, সুপ ও আলু। ১৯৪৪ সালের দিকে প্রায় ৪ লাখ ইহুদী এভাবে শ্রম দিত। এদেরকে নাম ধরে নয়, গায়ে ট্যাটু করে দেয়া সংখ্যা ধরে ডাকা হতো। কেউ মারা গেলে তার মৃত্যুর তদন্ত না করে তার জায়গায় আরেকজনকে কাজে লাগিয়ে দেয়া হতো। কিন্তু শুধু খাটিয়ে তো সবাইকে হত্যা করা সম্ভব না, তাই নতুন পরিকল্পনার সূচনা হয় ১৯৪১ সালে রাশিয়া অনুপ্রবেশের মাধ্যমে। হিটলারের লক্ষ্য ছিল, ইহুদী বলশেভিক ষড়যন্ত্রের মূলোৎপাটন করা সেখানে।

ইহুদী গণহত্যার বৃহৎ পরিসরে সূচনা মূলত তখন থেকেই। ১৯৪১ সালের অক্টোবর থেকে ১৯৪২ সালের শেষ পর্যন্ত প্রায় ১২ লাখ ইহুদীকে এভাবে পর্যায়ক্রমে হত্যা করা হয়।

১৯৪২ সালের মাঝামাঝি থেকে তাদেরকে গেটো থেকে ধরে নিয়ে মালবাহী ট্রেনে সিল করে পাঠিয়ে দেয়া হতো ডেথ ক্যাম্পে। ট্রেন থেকে নামানোর সময় জীবিত থাকলে সেখানে তাদেরকে হত্যা করা হতো গ্যাস দিয়ে, প্রহার করে, খাটিয়ে, মেডিক্যাল এক্সপেরিমেন্ট করে, কিংবা ডেথ মার্চ করিয়ে। তাদেরকে হত্যা করার এ পরিকল্পনাকে নাৎসি বাহিনী অভিহিত করতো ‘দ্য ফাইনাল সলুশন’ বা

‘চূড়ান্ত সমাধান’ নামে। ১৯৪৫ সালের মে মাস পর্যন্ত এই হত্যাকাণ্ড চলে, অর্থাৎ দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ শেষ হওয়া পর্যন্ত।



ইহুদীদেরকে ট্রেন থেকে নামানো হলো অসউইচে। ডোরাকাটা কাপড় পরা ইহুদী বন্দীদের দেখা যাচ্ছে। ছবিটি ১৯৪৪ সালের মে মাসে তোলা।

হলোকাস্টে মারা গিয়েছিল কত জন ইহুদী? এটিকে একটি বিতর্কের বিষয় হিসেবে ধরা হয়। একদিকে ষড়যন্ত্র তত্ত্ব প্রচারকারীদের দাবি, হলোকাস্ট বলে কিছু হয়নি আদৌ, এগুলো মিডিয়ার বানানো। আরেকটি পক্ষ বলে, হলোকাস্ট হয়েছিল, তবে যত ইহুদী মারা গিয়েছে বলা হয়, আসলে তত মরেনি, এটি অতিরঞ্জন। তবে, মূলধারার নানা ইতিহাসবিদের হিসেব মতে, দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের হলোকাস্টে নিহত ইহুদীর সংখ্যা ৪২ থেকে ৭০ লক্ষের মাঝামাঝি। আপনি হয়তো ৬০ লক্ষ নিহত ইহুদীর একটি হিসেব শুনে থাকবেন, এটি মূলত নাৎসিদের কাছ থেকে আসা হিসেব। ‘৬০ লাখ’ সংখ্যাটি ১৯৪৫ সালে হলোকাস্টের মূল পরিকল্পনাকারীদের একজন নাৎসি অ্যাডলফ আইখম্যান বলেছিলেন। তিনি ছিলেন নাৎসি বাহিনীর লেফটেন্যান্ট কর্নেল এবং তৃতীয় রাইখ সরকারের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তিত্ব।

‘হলোকাস্ট’ (Holocaust) মূলত একটি গ্রিক (ὁλόκαυστος) শব্দ, যার অর্থ ‘গণপোড়ানো’। তবে ইহুদীরা হলোকাস্টকে হিব্রুতে ‘শোয়াহ’ (שואה) বলে, যার অর্থ ‘ধ্বংস’। হলোকাস্টের মধ্য দিয়ে ইউরোপীয় ইহুদী জনসংখ্যার প্রায় দুই-

ইসরাইলের উত্থান-পতন ২১৯

তৃতীয়াংশ কমে যায়, আর পুরো বিশ্বের ইহুদী জনসংখ্যা কমে যায় এক-তৃতীয়াংশ। হলোকাস্টের সবচেয়ে কুখ্যাত কেন্দ্র ছিল অসউইচ বন্দী শিবিরে, যা মূলত ছোট খাট ৪০টি শিবিরের যোগফল। কেবল এই শিবিরের গ্যাস চেম্বারেই হত্যা করা হয় প্রায় ১০ লাখ ইহুদীকে।



অ্যাডলফ আইখম্যান

হিটলার খুব ছোট বয়সেই ইহুদী-বিরোধী মতবাদের সংস্পর্শে এসেছিলেন, বড় হয়ে নয়। ভিয়েনাতে তিনি যখন চিত্রশিল্পী হিসেবে কাজ করতেন তখন তার মনোভাব আরও পরিপক্ব হয়। কিন্তু অবাক ব্যাপার, তার সবচেয়ে বেশি পেইন্টিংয়ের ক্রেতা ছিলেন এক ইহুদী- স্যামুয়েল মর্গানস্টার্ন! তার ইহুদীদের প্রতি ঘৃণার কারণ খুঁজতে গিয়ে অনেকে অনেক রকম গল্প ফাঁদেন, যেমন তিনি নাকি এক ইহুদী পতিতার কাছে গিয়ে যৌনরোগ বাঁধিয়ে এসেছিলেন, সেই থেকে তার রাগ। কেউ বা বলেন, তার মাকে জড়িয়ে ছোট বেলায় কোনো ইহুদী সংক্রান্ত কাহিনী রয়েছে, কিংবা কেউ বলেন, হিটলারের কোনো ইহুদী প্রেমিকা হয়তো তাকে ছেড়ে চলে যায়, ইত্যাদি। এসব থেকে যে তার ইহুদী বিদ্বেষ গড়ে ওঠেনি, তা বলাই যায়। তার অতিরিক্ত জার্মান জাতীয়তাই একটি পর্যায়ে কড়া ইহুদী বিদ্বেষ পোষণ করতে সাহায্য করে। ২০১৫ সালে ইসরাইলের তৎকালীন

প্রধানমন্ত্রী বেনইয়ামিন নেতানিয়াহু বলেন, হলোকাস্ট আসলে হিটলার নিজে থেকে করতে চাননি, এটি নাকি তাকে জেরুজালেমের মুসলিম গ্র্যান্ড মুফতি হাজ আমিন আল-হুসাইনি শিখিয়ে দিয়েছিলেন। হিটলার কেবল চেয়েছিলেন, তাদেরকে বের করে দিতে। কিন্তু আল-হুসাইনি নাকি তাকে বলেন, বের না করে দিয়ে মেরে ফেলতে। নেতানিয়াহু এমন কথা বলার পর বেশ তোপের মুখে পড়েন, কারণ আল হুসাইনির সাথে হিটলারের যেদিন দেখা হয় (১৯৪১ সালের ২৮ নভেম্বর) সেদিন তাদের মাঝে কী কী আলাপ হয়েছিল, তার পুরো অনুলিপি সংরক্ষিত রয়েছে। এমন কোনো আলাপ সেদিন হয়নি।



গ্র্যান্ড মুফতি আল-হুসাইনির সাথে হিটলার

আর হ্যাঁ, একটি উদ্ধৃতি হিটলারের নামে চালানো হয়— “আমি ইচ্ছে করলে পৃথিবীর সব ইহুদীকে হত্যা করতে পারতাম। কিন্তু কিছু ইহুদী বাঁচিয়ে রাখলাম এ জন্য যে পৃথিবীর মানুষ দেখুক, আমি কেন তাদের হত্যা করেছিলাম।” এমন কোনো কিছু হিটলার কোনোদিন বলেছিলেন বলে অবশ্য প্রমাণ নেই, তার বইতেও কিছু নেই। এটি মূলত একটি ভুয়া উদ্ধৃতি, তবে বেশ পরিচিতি পেয়ে যায়।

অধ্যায় ২৩

ইসরাইল রাষ্ট্রের জন্ম



দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ শেষ হবার পর ১৯৪৭ সালে জাতিসংঘ ফিলিস্তিনের বিভাজীকরণ নিয়ে ভোটের আয়োজন করে। এ প্রস্তাবে বলা হয়, এ অঞ্চলে মুসলিম ও ইহুদীদের জন্য আলাদা রাষ্ট্রের প্রবর্তন করা হবে, আর জেরুজালেম থাকবে বিশেষ আন্তর্জাতিক নিয়ন্ত্রণের অধীনে। এ সময় পর্যন্ত ইরগুন আর লেহি ব্রিটিশ সেনা ও পুলিশদেরকে আক্রমণ করতে থাকে। প্রথমে হাগানাহ আর পালমাখ ব্রিটিশদের পক্ষেই ছিল, ইরগুন আর লেহির বিরুদ্ধে লড়ছিল; কিন্তু এরপর ইহুদী মুক্তিকামী হিসেবে ইরগুন আর লেহির পক্ষে যোগ দেয়। এর কিছুদিন পর তারা নিজেদেরকে আনুষ্ঠানিকভাবে নিরপেক্ষ দাবি করে। হাগানাহ নিজেও ফিলিস্তিনে ভয়াবহ আক্রমণ চালিয়ে যাচ্ছিল। যেমন ধরুন, দেশের রেললাইন উড়িয়ে দেয়া, রাস্তার ধ্বংস করে দেয়া, ব্রিটিশ ফিলিস্তিনি পুলিশ স্টেশনগুলো ধ্বংস করা। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময়টা জুড়ে হাগানাহ আলিয়াহ বেং আয়োজন করতে থাকে।

১৯৪৬ সালের ২২ জুলাই ভরদুপুরে ইরগুনের বোমা বিস্ফোরণে কিং ডেভিড হোটেলের একটি পাশ (দক্ষিণ পাশ) পুরো উড়ে যায় আক্ষরিক অর্থেই। ৯১ জন মারা যান সেদিন। তারা ছিলেন নানা দেশের মানুষ, কারণ সে হোটеле থাকতেন অনেক বিদেশী। এতজন মারা যাওয়ার পাশাপাশি গুরুতর আহত হন ৪৬ জন। যারা উড়িয়ে দিল, সেই ইরগুনের পুরো নাম ‘ইরগুন জাই লিউমি’ (এরেৎস ইসরাইল), হিব্রু থেকে বাংলা করলে যার মানে দাঁড়ায় ‘জাতীয় মিলিটারি সংঘ’ (ইসরাইল ভূমিতে)। ইরগুন সন্ত্রাসীরা আরবদেশী শ্রমিক আর ওয়েটার সেজে

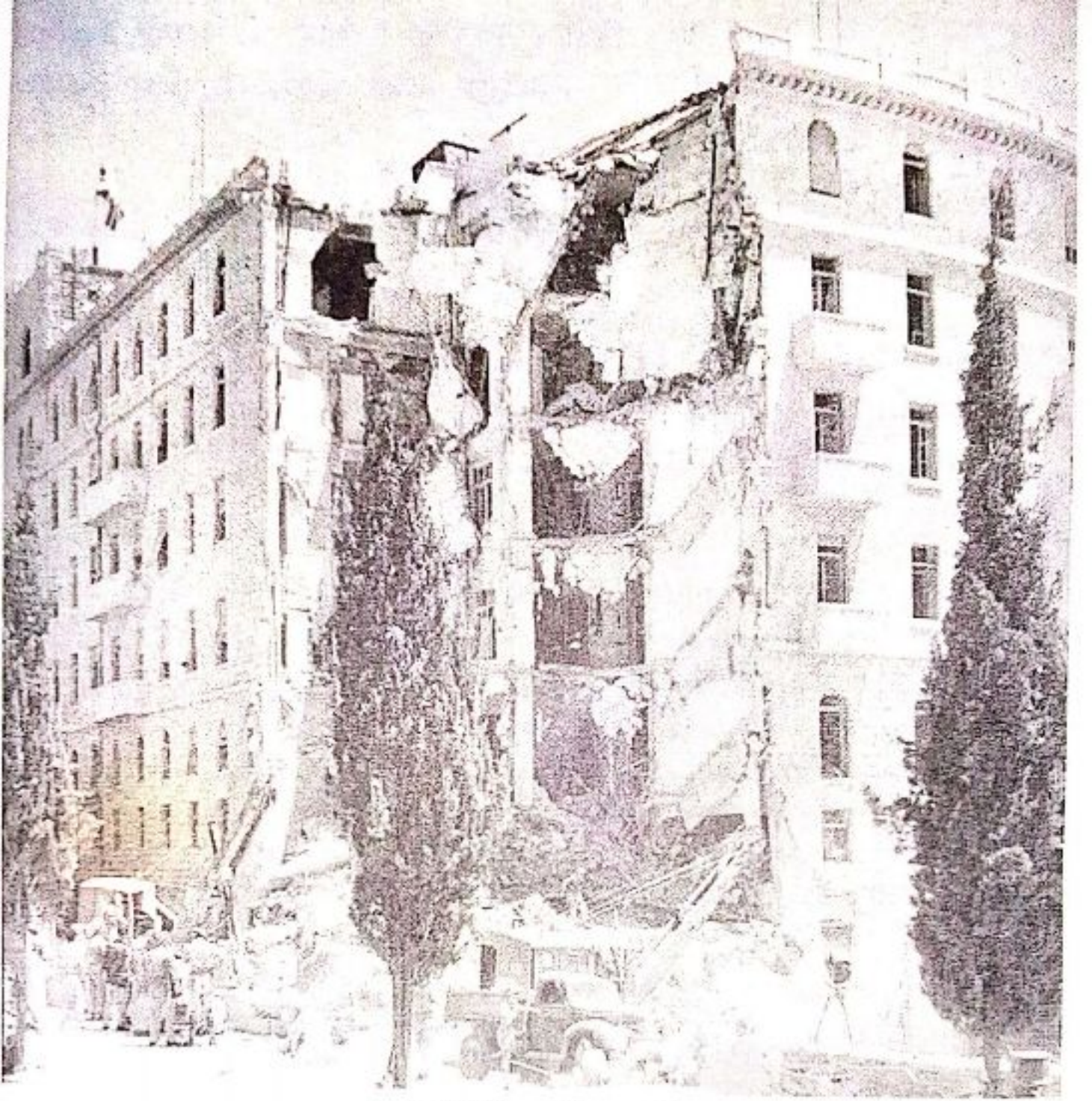
বোমা পেতে এসেছিল। তখন তেলআবিব (যেটা বর্তমানে ইসরাইলের রাজধানী) শহরে কারফিউ জারি করা হয়। ফিলিস্তিনের প্রায় ১ লাখ ২০ হাজার ইহুদীকে জেরা করা হয়। পরবর্তীতে অবশ্য ইরাকুনের নেতা মেনাখিম বেগিন দেশটির প্রধানমন্ত্রী পদ পেয়েছিলেন।



চলছে আলিয়াহ বেৎ

১৯৪৭ সালে আর না পেরে ব্রিটিশরা ঘোষণা করে তারা ফিলিস্তিন ম্যান্ডেট ছেড়ে দেবে, তারা ফিলিস্তিন ছেড়েই চলে যাচ্ছে। ১৯৪৭ সালে ব্রিটেনের লেবার সরকার এই ‘ঝামেলা’ সদ্য গঠিত জাতিসংঘকে হ্যান্ডেল করতে দেবার জন্য প্রস্তুত হয়।

১৯৪৭ সালের ১৫ মে গঠিত হয় United Nations Special Committee on Palestine (UNSCOP), যা পরে প্রস্তাব দেয় “স্বাধীন এক আরব রাষ্ট্র, স্বাধীন এক ইহুদী রাষ্ট্র এবং জেরুজালেম শহর” -এই তিন ভাগের। সামান্য কিছু এদিক-ওদিকের মাধ্যমে জাতিসংঘের জেনারেল অ্যাসেমবলিতে এই প্রস্তাব বিষয়ে ভোট হয়। ফলাফল স্বরূপ, ইহুদী সমাজে উচ্ছ্বাস আর আরব সমাজে অসন্তুষ্টি ছড়িয়ে পড়ে।



ধ্বংসপ্রাপ্ত কিং ডেভিড হোটেল

ওই অঞ্চলে তখন দাঙ্গা শুরু হয়ে যায়। ইহুদী আর আরবদের মাঝে তুমুল যুদ্ধ চলতে থাকে, ইহুদীরা আক্রমণ করছে, আরবরাও আক্রমণ করছে— সে এক এলাহী কাণ্ড। দুই মাসে মারা যায় ৮০০ মানুষ। ম্যাভেট বিলুপ্তির ছয় সপ্তাহ আগেই তর সইলো না হাগানাহ, ইরগুন, লেহিদের। তারা ভয়ংকর আক্রমণ চালালো সেই এলাকাগুলো দখলের জন্য, বিভাজীকরণ প্রস্তাব অনুযায়ী যেগুলো ইহুদীদের হবার কথা। তাইবেরিয়া, সাফেদ, হাইফা, জাফফা (ইয়াফা), আক্রা, বাইসানের মতো এলাকাগুলো থেকে পালিয়ে যায় আরবরা। ১৯৪৮ সালে অনুষ্ঠিত হয় জেরুজালেম যুদ্ধ— দুই পক্ষই লড়াই করে জেরুজালেমের জন্য। তেলআবিব থেকে জেরুজালেম জুড়ে প্রায় সকল আরব গ্রাম দখল করে নেয় ইহুদী সন্ত্রাসী সংঘগুলো, মাটিতে গুঁড়িয়ে দেয় সেসব।



ইরগনের মর্টার আক্রমণে গুঁড়িয়ে গিয়েছে জায়গাটা,
তেলআবিব আর জাফফার মাঝামাঝি এলাকা

দামেস্ক ফটকে গাড়ি বোমা ফাটিয়ে ইরগুন ২০ জনকে হত্যা করে। মুসলিমদের প্যারামিলিটারি সংস্থা নাজ্জাদার হেডকোয়ার্টার ধ্বংস করতে লেহি ট্রাকবোমা ব্যবহার করে, মারা যায় ১৫ আরব, আহত হয় ৮০। জেরুজালেমের সেমিরামিস হোটেল উড়িয়ে দেয় হাগানাহ, মারা যায় ২৪ জন। পরদিনও ইরগুন সন্ত্রাসীরা পুলিশের ভ্যান চুরি করে ব্যারেল বোমা বিস্ফোরণের মাধ্যমে জাফফা ফটকে বাসের জন্য অপেক্ষারত বেসামরিক লোকদের হত্যা করে; সেদিন মারা যায় ১৬ জন। রামলার বাজারে ইরগনের বোমা বিস্ফোরণে ৬ জন মারা যায়, আহত হয় ৪৫ জন। পালমাখ বাকি থাকবে কেন, তারাও হাইফাতে বোমা ফাটায় এক গ্যারেজে, মারা যায় ৩০ জন। ১৯৪৮ সালের ৯ এপ্রিল দেইর ইয়াসিন গণহত্যায় জেরুজালেমের নিকটস্থ দেইর ইয়াসিন গ্রামে ১০৭ জন ফিলিস্তিনি আরবকে হত্যা করে ইরগুন আর লেহি; এর মাঝে নারী ও শিশুও ছিল।

খুবই দ্বিমুখী ব্যাপার হলো, এরা একদম মোটা দাগেই সন্ত্রাসী সংঘ, এবং ব্যাপক সংখ্যক মানবহত্যার দায়ে দণ্ডিত। কিন্তু সন্ত্রাসী কর্মকাণ্ডের ইতিহাস বর্ণনা করতে গেলে মেইনস্ট্রিম মিডিয়া কখনও এ ইহুদী সন্ত্রাসী কর্মগুলো প্রচার করে না।

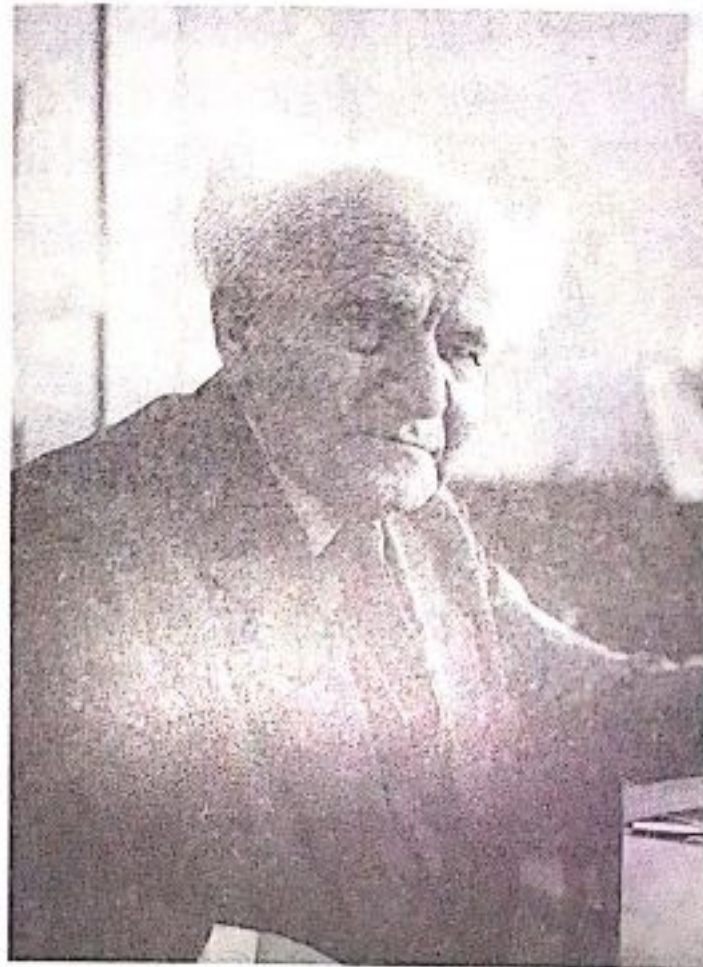
আর না পেরে জাতিসংঘ ইরগুনকে সন্ত্রাসী গোষ্ঠী বলে ঘোষণা করে। এর পাশাপাশি ব্রিটিশ সরকার, মার্কিন সরকার এবং নিউ ইয়র্ক টাইমস পত্রিকার মতো প্রভাবশালী পত্রিকাও তাদেরকে সন্ত্রাসী আখ্যা দেয়। এখানেই শেষ নয়, ইরগুনের নেতা মেনাখেম বেগিনকে খোদ আলবার্ট আইনস্টাইন এবং ২৭ জন ইহুদী বুদ্ধিজীবী 'সন্ত্রাসী' ডাকেন, এবং এ নিয়ে নিউ ইয়র্ক টাইমসে পত্র দেন; ১৯৪৮ সালের ৪ ডিসেম্বর পত্রটি প্রকাশিত হয়। অন্যদিকে লেহি-কে সন্ত্রাসী আখ্যা দেয় কেবল জাতিসংঘ আর ব্রিটিশ সরকার।

New Palestine Party Visit of Menachen Begin and Aims of Political Movement Discussed TO THE EDITOR OF THE NEW YORK TIMES: Among the most disturbing political phenomena of our time is the emergence in the newly created state of Israel of the "Freedom Party" (Tnuat HaHeruti), a political party closely akin in its organization, methods, political philosophy and social appeal to the Nazi and Fascist parties. It was formed out of the membership and following of the former Irgun Zvai Leumi, a terrorist, right-wing, chauvinist organization in Palestine. The current visit of Menachen Begin, leader of this party, to the United States is obviously calculated to give the impression of American support for his party in the coming Israeli elections, and to cement political ties with conservative Zionist elements in the United States. Several Americans of national repute have lent their names to welcome his visit. It is inconceivable that those who oppose fascism throughout the world, if correctly informed as to Mr. Begin's political record and perspectives, could add their names and support to the movement he represents. Before irreparable damage is done by way of financial contributions, public manifestations in Begin's behalf, and the creation in Palestine of the impression that a large segment of America supports Fascist elements in Israel, the American public must be informed as to the record and objectives of Mr. Begin and his movement. The public avowals of Begin's party are no guide whatever to its actual character. Today they speak of freedom, democracy and anti-imperialism, whereas until recently they openly preached the doctrine of the Fascist state. It is in its actions that the terrorist party betrays its real character; from its past actions we can judge what it may be expected to do in the future.	Attack on Arab Village A shocking example was their behavior in the Arab village of Deir Yassin. This village, off the main roads and surrounded by Jewish lands, had taken no part in the war, and had even fought off Arab bands who wanted to use the village as their base. On April 9 (THE NEW YORK TIMES), terrorist bands attacked this peaceful village, which was not a military objective in the fighting, killed most of its inhabitants—240 men, women and children—and kept a few of them alive to parade as captives through the streets of Jerusalem. Most of the Jewish community was horrified at the deed, and the Jewish Agency sent a telegram of apology to King Abdullah of Trans-Jordan. But the terrorists, far from being ashamed of their act, were proud of this massacre, publicized it widely, and invited all the foreign correspondents present in the country to view the heaped corpses and the general havoc at Deir Yassin. The Deir Yassin incident exemplifies the character and actions of the Freedom Party. Within the Jewish community they have preached an admixture of ultra-nationalism, religious mysticism, and racial superiority. Like other Fascist parties they have been used to break strikes, and have themselves pressed for the destruction of free trade unions. In their stead they have proposed corporate unions on the Italian Fascist model. During the last years of sporadic anti-British violence, the IZL and Stern groups inaugurated a reign of terror in the Palestine Jewish community. Teachers were beaten up for speaking against them, adults were shot for not letting their children join them. By gangster methods, beatings, window-smashing, and wide-spread robberies, the terrorists intimidated the population and exacted a heavy tribute. The people of the Freedom Party have had no part in the constructive achievements in Palestine. They have reclaimed no land, built no settlements, and only detracted from the Jewish defense activity. Their much-publicized immigration endeavors were minute, and devoted mainly to bringing in Fascist compatriots.	Discrepancies Seen The discrepancies between the bold claims now being made by Begin and his party, and their record of past performance in Palestine bear the imprint of no ordinary political party. This is the unmistakable stamp of a Fascist party for whom terrorism (against Jews, Arabs, and British alike), and misrepresentation are means, and a "Leader State" is the goal. In the light of the foregoing considerations, it is imperative that the truth about Mr. Begin and his movement be made known in this country. It is all the more tragic that the top leadership of American Zionism has refused to campaign against Begin's efforts, or even to expose to its own constituents the dangers to Israel from support of Begin. The undersigned therefore take this means of publicly presenting a few salient facts concerning Begin and his party; and of urging all concerned not to support this latest manifestation of fascism. ISIDORE ABRAMOWITZ, HANNAH ARENDT, ABRAHAM BRICK, RABBI JESSURUN CARDOZO, <u>ALBERT EINSTEIN</u>, HERMAN EISEN, M. D., HAYIM FINEMAN, M. GALLAN, M. D., H. H. HARRIS, ZELIO S. HARRIS, SIDNEY HOOK, FRED KARUSH, BRURIA KAUFMAN, IRMA L. LINDHEIM, NACHMAN MAJSEL, SEYMOUR MELMAN, MYER D. MENDELSON, M. D., HARRY M. ORLINSKY, SAMUEL PITLICK, FRITZ ROHRLICH, LOUIS P. ROCKE, RUTH SAGER, ITZHAK SANKOWSKY, I. J. SCHOMBERG, SAMUEL SHUMAN, M. ZNGER, IRMA WOLFE, STEFAN WOLFE. New York, Dec. 2, 1944.
--	--	---

নিউ ইয়র্ক টাইমসে দেয়া সেই পত্র

সে সময় জায়োনিস্ট নেতা ডেভিড বেনগুরিয়ন বাধ্যতামূলক করলেন যে, সকল ইহুদী নারীপুরুষকে মিলিটারি ট্রেনিং নিতে হবে। ১৯৪৮ সালের ১৪ মে, শেষ ব্রিটিশ সামন্ত এই এলাকা ছেড়ে চলে যায়। সেদিন ইসরাইলের সহপ্রতিষ্ঠাতা

ও প্রথম প্রধানমন্ত্রী ডেভিড বেনগুরিয়ন ইসরাইলের স্বাধীনতা ঘোষণা দেন, সেদিন ছিল ব্রিটিশ ম্যান্ডেটের শেষ দিন। তিনি ইসরাইলের অভ্যন্তরীণ গোপন ইন্টেলিজেন্সমূলক কাজের জন্য শিন-বেৎ সৃষ্টি করেন, আর আন্তর্জাতিক হুমকি সামাল দেবার জন্য তৈরি করেন দুর্ধর্ষ সিক্রেট সার্ভিস- ‘মোসাদ’। এই দুটো সংস্থার নাম ষাটের দশকের আগে মুখেই আনা নিষিদ্ধ ছিল। এতটাই গোপন ছিল এগুলোর কাজ কারবার!



ডেভিড বেনগুরিয়ন, ইসরাইলের সহপ্রতিষ্ঠাতা এবং প্রথম প্রধানমন্ত্রী

তবে মোসাদ নিয়ে বিস্তারিত জানতে হলে পড়তে হবে আমার আরেক বই “সিক্রেট মিশনস : মোসাদ স্টোরিজ”।

অধ্যায় ২৪

ছয়-দিনের সেই যুদ্ধ



তেলআবিব মিউজিয়ামে জুইশ পিপলস কাউন্সিল জড়ো হয়ে ইসরাইল রাষ্ট্রের অস্তিত্ব ঘোষণা করা মাত্রই মার্কিন প্রেসিডেন্ট ট্রুম্যান এবং সোভিয়েত ইউনিয়নের স্টালিন স্বীকৃতি দেন ইসরাইলকে। অবশ্য ১৯৪৭ সালের ১১ মে জাতিসংঘে সদস্যপদ পেয়ে যায় ইসরাইল। তবে আরব লিগের মিসর, জর্ডান, সিরিয়া, লেবানন, ইরাক এরা ইসরাইলের স্বাধীনতা প্রত্যাখ্যান করে।

ব্রিটিশরা যখন তাদের শেষ সেনাও সরিয়ে নেয় ফিলিস্তিন থেকে, তখন কিন্তু এ অঞ্চলে চলছিল বড় যুদ্ধ— ১৯৪৮ সালের আরব-ইসরাইল যুদ্ধ, একে গৃহযুদ্ধ বলে অভিহিত করা হয়।

১৯৪৮ সালের যুদ্ধটি ‘প্রথম’ আরব-ইসরাইলি যুদ্ধ নামে পরিচিত। যার মানে, এরপরেও এমন যুদ্ধ হয়েছে। অবশ্য ’৪৮ এর যুদ্ধটি ১৯৪৭-১৯৪৯ সাল পর্যন্ত চলা ফিলিস্তিন যুদ্ধের দ্বিতীয় ও শেষ অধ্যায়। ব্রিটিশ ম্যান্ডেট শেষ হলো ১৯৪৮ সালের ১৪ মে মধ্যরাতে। ঠিক পরদিন রাত পেরুতেই, অর্থাৎ ১৫ মে আরব সম্মিলিত বাহিনী সেই ব্রিটিশ প্যালেস্টাইন অঞ্চলে প্রবেশ করে।

মিসর, ট্রান্সজর্ডান, সিরিয়া, ইরাক ইত্যাদি আরব রাষ্ট্রগুলো আক্রমণ করে ইসরাইলকে, কিন্তু সদ্যজাত ইসরাইলের তখনও কোনো ভারী অস্ত্র ছিল না। ফলে আরব রাষ্ট্রগুলো সহজেই দখল নিয়ে নিতে পারে বেশ কয়েকটি অঞ্চল। তখন জাতিসংঘ অস্ত্র নিষেধাজ্ঞা জারি করে এ অঞ্চলে, ইসরাইলকে রক্ষা করতে। কিন্তু চেকোস্লোভাকিয়া সেই নিষেধাজ্ঞা ভঙ্গ করে ইসরাইলকে অস্ত্র যোগান দেয়।

২২৮ ইসরাইলের উত্থান-পতন

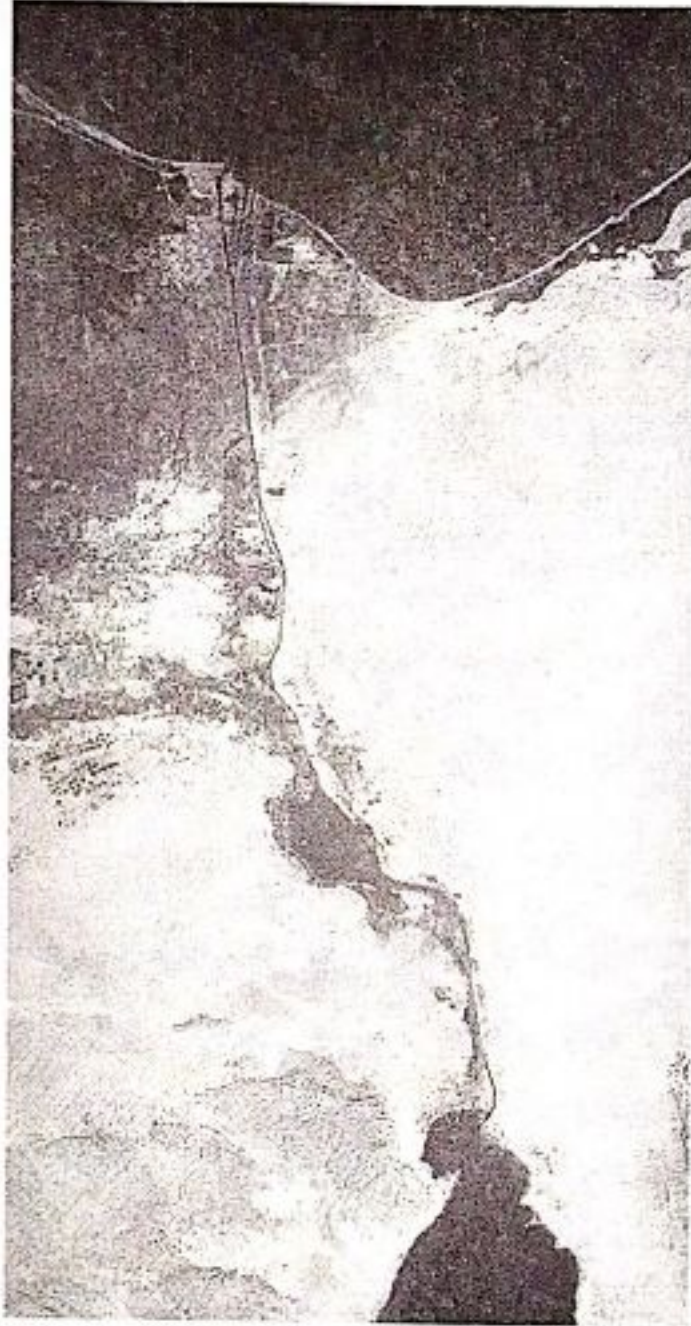
১৯৪৮ সালের ১১ জুন দুপক্ষকে এক মাসের শান্তিচুক্তিতে বাধ্য করে জাতিসংঘ। তবে তার মাঝে মারা যায় ইসরাইলের ৬,০০০ মানুষ, যেখানে মোট জনসংখ্যা ছিল সাড়ে ছয় লাখ। অন্যদিকে, দেশ হিসেবে আত্মপ্রকাশ করা ইসরাইল ৭ লাখ ২৬ হাজার ফিলিস্তিনিকে ভূমিত্যাগ করতে বাধ্য করে, ধ্বংস হয় প্রায় ৫০০ ফিলিস্তিনি গ্রাম। ১৯৪৮ সালের ১৫ মে শুরু হয়ে ১৯৪৯ সালের ১০ মার্চ পর্যন্ত এই যুদ্ধ চলেছিল, অর্থাৎ প্রায় ১০ মাস। এ দুবছরের ঘটনাকে ফিলিস্তিনিরা ‘নাকবা’ (النكبة) বলে থাকে, যার মানে ‘দুর্যোগ’। ব্রিটিশ ম্যান্ডেটের প্যালেস্টাইনের ৭৮% চলে যায় ইসরাইলের হাতে। এ যুদ্ধের পর পর ২ লাখ ৬০ হাজার ইহুদী চলে আসে ইসরাইলে।

যেহেতু হিব্রু পঞ্জিকার আইয়ার মাসের ৫ তারিখ ইসরাইল ব্রিটিশ ম্যান্ডেট থেকে ‘স্বাধীনতা’ অর্জন করে, তাই এ দিনটিকে তারা স্বাধীনতা দিবস হিসেবে পালন করে। তবে যেহেতু তা খ্রিস্টীয় পঞ্জিকা নয়, তাই প্রতি বছর তা ১৪ মে এটি পড়ে না। ১৯৯৮ সালে ইয়াসির আরাফাত ফিলিস্তিনিদের প্রস্তাব দিয়েছিলেন ১৫ মে-কে (অর্থাৎ ইসরাইলের স্বাধীনতা দিবসের পরের দিনকে) ‘নাকবা দিবস’ হিসেবে পালন করার।

ইসরাইলের সংসদ ‘কেনেসেত’ (Knesset) প্রথম মিলিত হয় তেলআবিবে, এরপর ১৯৪৯ সালের অক্টোবরতির পর কেনেসেত (বা ‘কানেসাত’) চলে যায় জেরুজালেমে। হিব্রু এ শব্দের অর্থ ‘সমাবেশ’। কেনেসেতের মোট ১২০ জন সদস্য। ঠিক যেমন ইহুদীদের প্রাচীন নবীযুগে ‘কেনেসেত হাগদোলা’ (נסיב נביא) অর্থাৎ ‘মহান সমাবেশে’ ১২০ জন সদস্য থাকতো, খ্রিস্টপূর্ব ২০০ অব্দে এটি শেষ হয়ে যায়। যাই হোক, ১৯৫০ সালের জানুয়ারিতে প্রথম নির্বাচনে নির্বাচিত হয়ে ইসরাইলের প্রথম প্রধানমন্ত্রী হন ডেভিড বেনগুরিওন। ১৯৫১ সালের মাঝেই অভিবাসনের কারণে ইসরাইলের জনসংখ্যা হয়ে যায় দ্বিগুণ। ১৯৫৮ সালে সংখ্যাটি দাঁড়ায় বিশ লাখে।

মিসরের একটি কৃত্রিম সামুদ্রিক খাল হলো সুয়েজ খাল (قناة السويس), যা মিশরের সিনাই উপদ্বীপের পশ্চিমে অবস্থিত। এটি ভূমধ্যসাগরকে যুক্ত করেছে লোহিত সাগরের সাথে। আন্তর্জাতিক ব্যবসায়িক দিক থেকে সুয়েজ খালের গুরুত্ব অকল্পনীয় রকমের বেশি। এই সুয়েজ খালের নিয়ন্ত্রণ নিয়ে নেয়া ও মিসরের প্রেসিডেন্ট জামাল আব্দুল নাসেরকে (আঞ্চলিক টানে ‘গামাল’-ও বলে) ক্ষমতা থেকে সরিয়ে দেয়ার উদ্দেশ্য নিয়ে ইসরাইল ১৯৫৬ সালের ২৯ অক্টোবর যুক্তরাজ্য এবং ফ্রান্সকে মিত্র হিসেবে নিয়ে মিসর আক্রমণ করে বসে। শুরু হলো দ্বিতীয় আরব-ইসরাইল যুদ্ধ, যা ‘সুয়েজ সংঘাত’ নামেও পরিচিত। তবে আক্রমণ শুরু

করতে না করতেই যুক্তরাষ্ট্র, সোভিয়েত ইউনিয়ন এবং জাতিসংঘের তিরস্কারের মুখে তিন আক্রমণকারী দেশই পিছপা হতে বাধ্য হয়; আক্রমণ থেমে যায় ৭ নভেম্বর। অর্থাৎ মাত্র ১ সপ্তাহ ২ দিন টেকে এ যুদ্ধ, তবে ডুবে যায় ৪০টি জাহাজ। নাক কাটা পড়ে যুক্তরাজ্য এবং ফ্রান্সের, বামেলায় পড়ে ইসরাইল, আর অবস্থান শক্তিশালী হয় মিসরের প্রেসিডেন্টের।



সুয়েজ খাল

ইসরাইল অবশ্য সুয়েজ সংকটের পেছনে যুক্তি দিয়েছিল- তারা চায় তিরান প্রণালী যেন খুলে দেয়া হয় তাদের জন্য। তিরান প্রণালী হলো সিনাই ও আরব উপদ্বীপের মধ্য দিয়ে চলে যাওয়া সরু সামুদ্রিক পথ। এটি লোহিত সাগর থেকে গালফ অফ আকাবা বা আকাবা উপসাগরকে (خليج العقبة) আলাদা করে। ১৯৫০ সাল থেকেই মিসর এটি বন্ধ করে দিয়েছে যেন ইসরাইল এটি ব্যবহার করতে না পারে। আন্তর্জাতিক চাপের মুখে তারা এ শর্তে যুদ্ধ থেকে সরে আসে

২৩০ ইসরাইলের উত্থান-পতন

যে তিরান প্রণালী তাদের জন্য খুলে দেয়া হবে। খুলে দেয়া হয়ও। কিন্তু দুই পক্ষের মধ্যে সীমান্ত থেকে সেনা সরাবার ব্যাপারে কোনো চুক্তি হলো না।

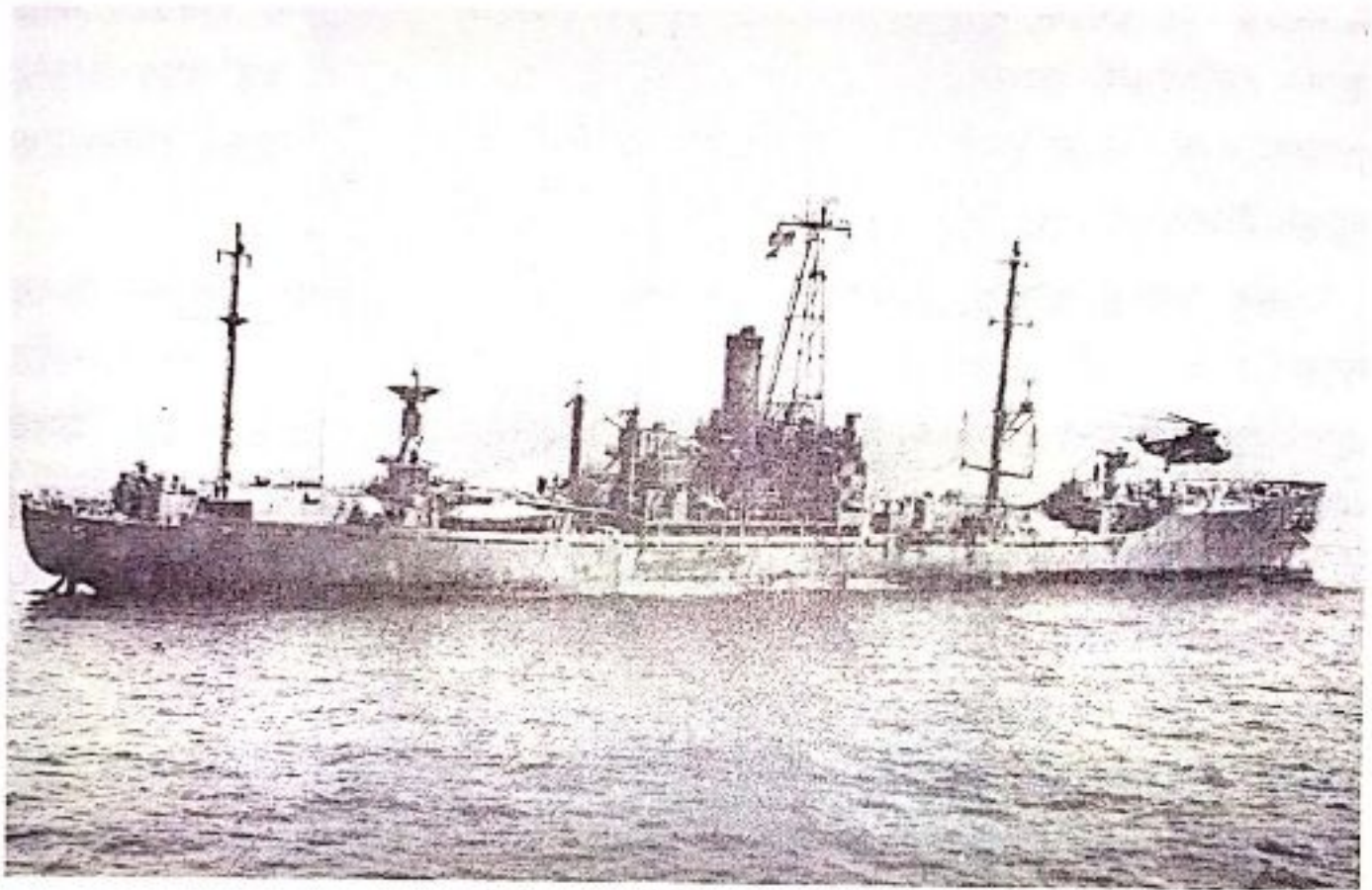
এরপরের কয়েক বছর দুই দেশের মাঝে স্নায়ুযুদ্ধ চলে। ১৯৬৭ সালের এপ্রিল মাসে সেনাবিহীন এলাকায় একটি ইসরাইলি কৃষি ট্রাক্টর ধ্বংস করে দেয় সিরিয়া। এর ফলশ্রুতিতে আকাশপথে যুদ্ধ যুদ্ধ অবস্থা হয়ে দাঁড়ায় দু দেশের মাঝে। ১৯৬৭ সালের মে মাসে সোভিয়েত ইউনিয়নের ভুল কিছু তথ্যের কারণে মিসর ইসরাইলের পরিকল্পনা সম্পর্কে ভুয়া কিছু আন্দাজ করে এবং সুয়েজ সংকটের পর থেকে সিনাই উপদ্বীপে জাতিসংঘের শান্তিরক্ষীদের বহিষ্কার করে বসে। প্রেসিডেন্ট জামাল আব্দুল নাসের আবার তিরান প্রণালী বন্ধ করে দেয়ার ঘোষণা দেন। ফলে ইসরাইল ক্ষেপে যায়। তারা তিরান প্রণালী বন্ধের ঘোষণাকে যুদ্ধের ইঙ্গিত ধরে নেয়।

এক মাসও যায়নি, ইসরাইল সবাইকে অবাক করে দিয়ে একদিন মিসর আক্রমণ করে বসে। তারিখটি ছিল ১৯৬৭ সালের ৫ জুন। ইসরাইল মিসরীয় এয়ারফিল্ড উদ্দেশ্য করে এয়ারস্ট্রাইক করে। শুরুতে তারা দাবি করে যে, মিসর তাদেরকে প্রথম আক্রমণ করেছে, কিন্তু পরে বলে যে তারা নিজেই ছুঁড়েছিল। আজও এ বিতর্কের অবসান হয়নি। অতর্কিত আক্রমণে মিসর পিছিয়ে পড়ে, ইসরাইল যায় এগিয়ে। ইসরাইলের তেমন ক্ষতি না হলেও, মিসরের প্রায় পুরো বিমান বাহিনী ধ্বংস হয়ে যায়। একই সাথে ইসরাইল মিসরীয় অধিকৃত গাজা অঞ্চল এবং সিনাই উপদ্বীপে আক্রমণ চালায়। সেখানেও অবাক হয়ে যায় মিসরীয়রা। প্রথম দিকে একটু ঠেকানোর চেষ্টা করলেও প্রেসিডেন্ট নাসের পরে সিনাই খালি করে ফেলতে আদেশ দেন। মাত্র ছয় দিনের মাঝে পুরো সিনাই উপদ্বীপ দখল করে নেয় ইসরাইল। ১১ জুন ইসরাইল অস্ত্রবিরতিতে রাজি হয়।

ছয়-দিনের এ যুদ্ধের মধ্য দিয়ে ইসরাইল মিসর এবং তার মিত্র জর্ডান ও সিরিয়ার সেনাবাহিনীকে তুলোধুনো করে ছাড়ে। ২০,০০০ আরব সেনা মারা যায়, যেখানে ইসরাইলের মারা যায় মাত্র ১,০০০। বিনিময়ে ইসরাইল সিরিয়ার কাছ থেকে গোলান মালভূমি, জর্ডানের কাছ থেকে পূর্ব জেরুজালেমসহ পশ্চিম তীর এবং মিসরের কাছ থেকে গাজা দখল করে নেয়। লজ্জায় প্রেসিডেন্ট নাসের পদত্যাগ করেন। যদিও প্রতিবাদের মুখে তিনি আবার প্রেসিডেন্ট হন। ছয় দিনের যুদ্ধ (বা তৃতীয় আরব-ইসরাইল যুদ্ধ) ৩ লাখ ২৫ হাজার ফিলিস্তিনিকে পশ্চিম তীর থেকে এবং ১ লাখ সিরীয়কে গোলান মালভূমি থেকে ঘরছাড়া করে।

তবে এ ছয় দিনের যুদ্ধে একটি ভিন্ন ঘটনাও ঘটেছিল। ৮ জুন তারিখে ইসরাইল এয়ার ফোর্স আর নেভি মোটর টর্পেডো বোট মার্কিন জাহাজ ইউএসএস

লিবার্টি আক্রমণ করে বসে। মারা যায় ৩৪ ক্রু, আহত হয় ১৭১ জন ক্রু। জাহাজটা ছিল মিসরীয় শহর আরিশ থেকে ২৫ নটিকাল মাইল দূরে। ইসরাইল দুঃখ প্রকাশ করে বলে, মিসরীয় জাহাজ ভেবে আক্রমণ করে ফেলেছিল। এখনকার হিসাব মতে ইসরাইল সরকার তিন দফায় ২২.৯, ২৩.৩ এবং ১৭.৪ মিলিয়ন মার্কিন ডলার ক্ষতিপূরণ দেয় সে ঘটনায় নিহতদের জন্য। তদন্ত রিপোর্ট বলে এটা ভুল ছিল, তবুও বেঁচে যাওয়া ভিক্তিমদের কারও কারও মত আবার ভিন্ন ছিল!



মার্কিন জাহাজ ইউএসএস লিবার্টি

উল্লেখ্য, ছয়দিনের যুদ্ধের মধ্য দিয়ে ইসরাইল তার মানচিত্র আজকের অবস্থার কাছাকাছি নিয়ে আসে এক লাফে, সে বিষয়ে আলাপ হবে পরের অধ্যায়ে।

অধ্যায় ২৫

ভৌগোলিক ইসরাইল-ফিলিস্তিন



বর্তমান ইসরাইলের সীমা পরিসীমা নিয়ে একটু আলোচনা করে নেয়া যাক। দেশটি আসলে কোথায়, কী কী এর অন্তর্গত, কী কী নয়, ইত্যাদি।

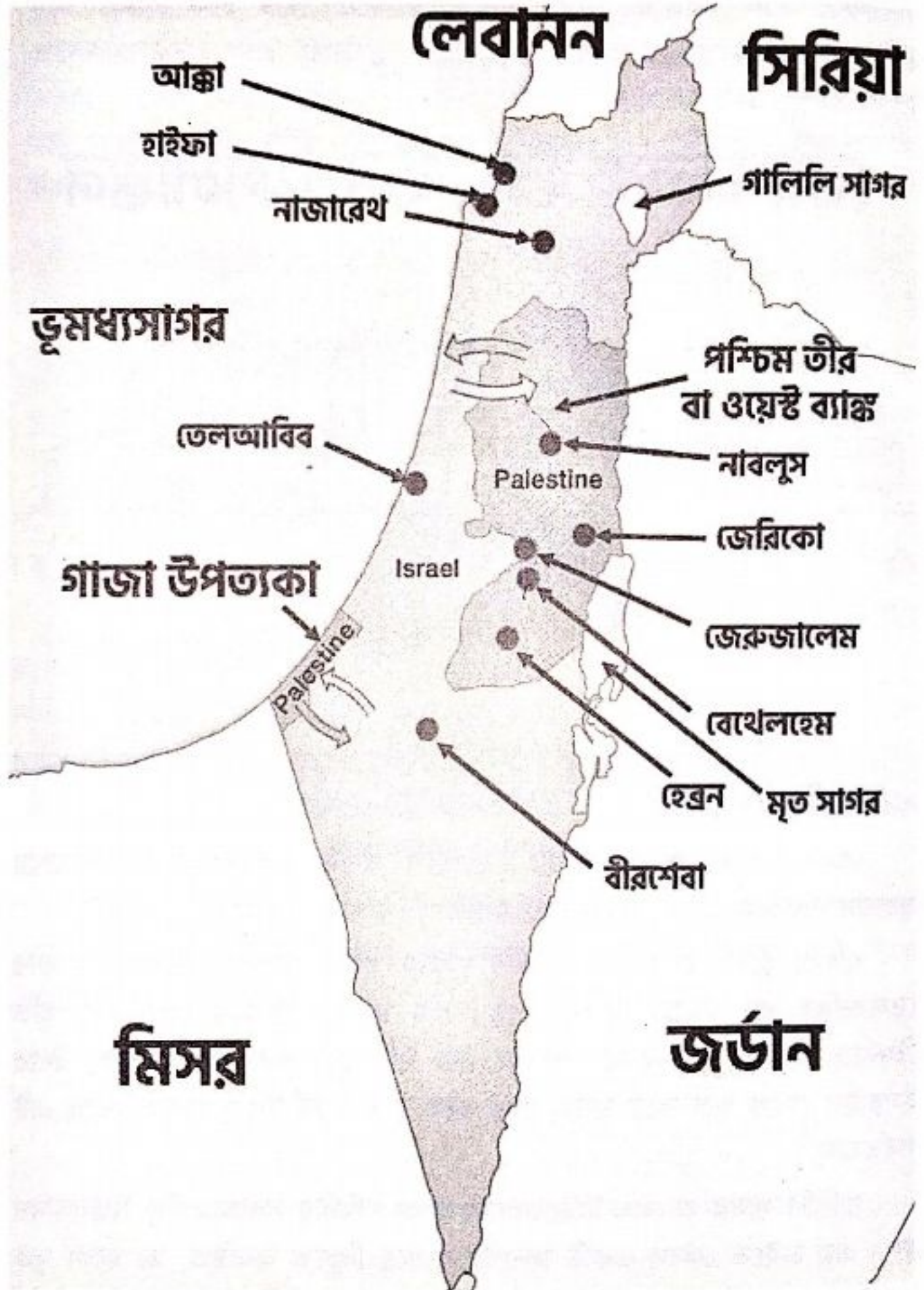
মিসর, জর্ডান, সিরিয়া ও লেবানন পরিবেষ্টিত এ দেশটির রয়েছে স্মৃতিবিজড়িত নানা শহর আর গ্রাম, যেখানে ইহুদী, খ্রিস্টান ও ইসলাম তিন সেমিটিক ধর্মেরই পবিত্র কিছু স্মৃতি আছে। আপনি নিচের মানচিত্রের দিকে খেয়াল করলে দেখতে পাবেন গুরুত্বপূর্ণ এলাকাগুলো চিহ্নিত করা রয়েছে।

যেমন, ‘আক্কা’ শহরটি উত্তর ইসরাইলে অবস্থিত, এটি পৃথিবীর সবচেয়ে পুরাতন মানব-অধ্যুষিত শহরগুলোর একটি।

হাইফা হলো ইসরাইলের তৃতীয় বৃহত্তম শহর, কেবল জেরুজালেম আর তেলআবিব এর চাইতে আকারে বড়। নবী হযরত ইলিয়াস (আ)-এর স্মৃতি বিজড়িত মাউন্ট কার্মেল বা ‘জাবাল মার ইলিয়াস’ এখানেই অবস্থিত, উত্তর ইসরাইল থেকে শুরু করে ভূমধ্যসাগর ধরে দক্ষিণ-পূর্ব দিকে চলে গিয়েছে এই পর্বতমালা।

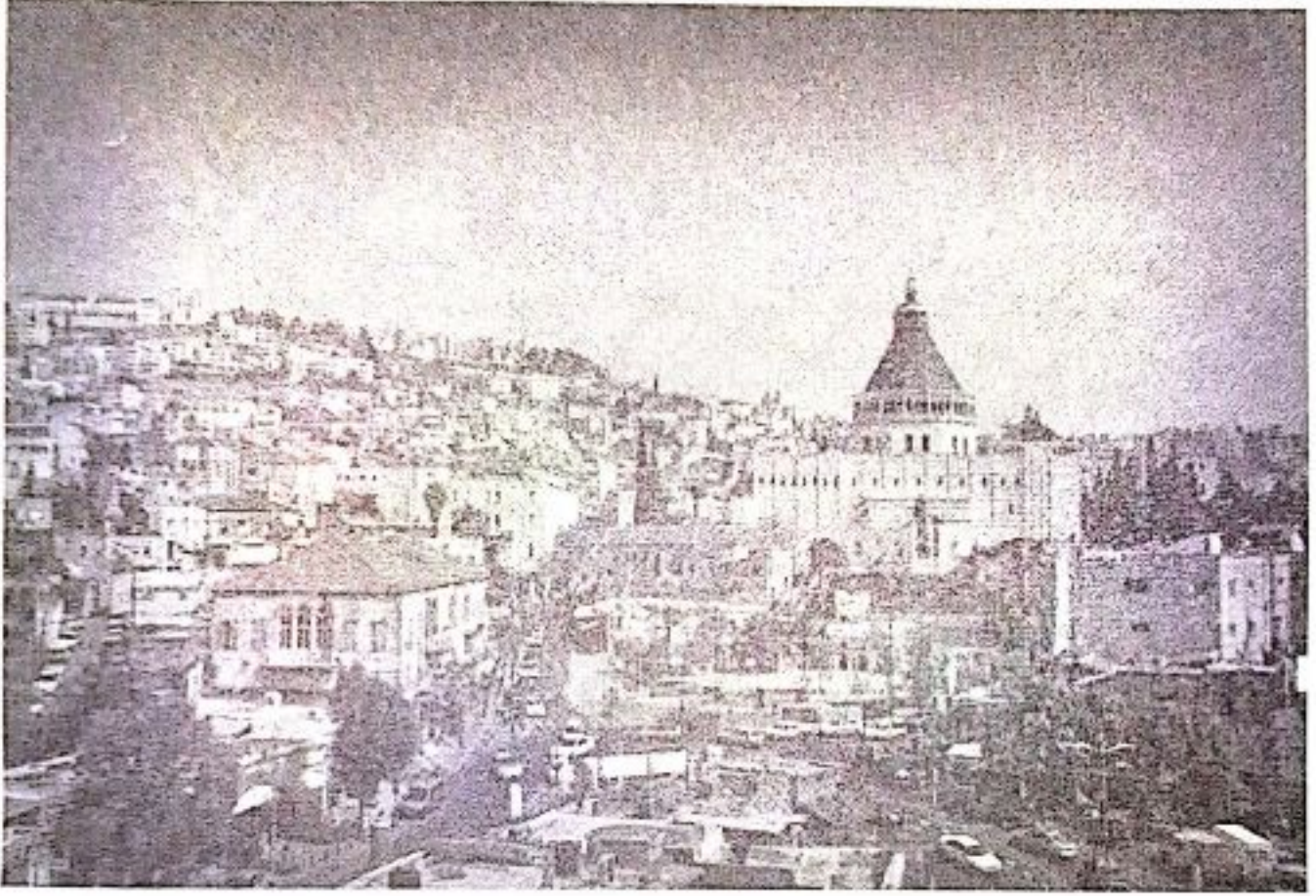
গালিলি সাগর বা লেক টাইবেরিয়াস হলো পৃথিবীর সবচেয়ে নিচু মিঠাপানির হ্রদ। এর চাইতে কেবল একটি জলাশয় রয়েছে নিচুতে অবস্থিত, তা হলো মৃত সাগর বা ডেড সি, তবে সেটা নোনা পানির। এই গালিলি সাগরের উৎস হলো জর্ডান নদী। বাইবেল মতে, এই পানির ওপর দিয়ে যীশু খ্রিস্ট হেঁটে যান, ঝড়

থামান, বিপুল পরিমাণ মাছ ধরেন, হাজার হাজার লোককে খাওয়ান, ইত্যাদি অলৌকিক সব ব্যাপার করে দেখান।



ইসরাইলের মতে অঞ্চলটির মানচিত্র

নাজারেথ, বা নাসরত গ্রাম, বা এখন মফস্বল বলতে পারেন। বাইবেলের নিউ টেস্টামেন্ট অনুযায়ী, এটি যীশুর শৈশবের গ্রাম। এখান থেকে তিনি এসেছিলেন, তাই তার অনুসারীদের গুরু দিকে ‘নাসারা’ ডাকা হতো, বা নাজারিন। এটাকে ইসরাইলের আরব রাজধানী ডাকা হয়। এখানে ৬৯% মুসলিম, আর ৩০.৯% খ্রিস্টান।



নাজারেথ

তেলআবিব-ইয়াফো নামের শহরে আসা যাক। যদি পূর্ব জেরুজালেমকে ইসরাইলের অংশ ধরা হয়, তাহলে তেলআবিব হলো জেরুজালেমের পর দ্বিতীয় জনবহুল শহর। আর যদি ইসরাইলের অংশ না ধরেন, তাহলে তেলআবিবই সবচেয়ে জনবহুল। ইসরাইলের এ শহরটি সম্পর্কে বলা হয়, এটি কখনও ঘুমায় না। এটি একটি প্রাচীন বন্দরনগরী। এর কোনো ধর্মীয় ইতিহাস নেই। শহরটির গোড়া পত্তন করাই হয় আধুনিক শহর হিসেবে গড়ে তোলার জন্য।

জেরিকোর অন্তত ১১,০০০ বছরের ইতিহাস আছে। এর সুজলা সুফলা ভূমি অনাদিকাল থেকেই জনপদ গড়ায় সাহায্য করে এসেছে, বাইবেলে ইউশা (আ) সংক্রান্ত ঘটনায় জেরিকোর বিবরণ আসে। হিব্রু বাইবেলে একে ‘পাম গাছের শহর’ বলে ডাকা হয়েছে।

বেথেলহেম, আরবিতে ডাকা হয় বাইত লাহম, মানে ‘মাংসের ঘর’। অবশ্য এ জায়গার আদি নাম কানানীয় উর্বরতার দেবতা লেহেমের নাম থেকে এসেছে।

ফিলিস্তিনের পশ্চিম তীরের মাঝেমাঝে জেরুজালেম থেকে ১০ কিলোমিটার দক্ষিণে এ শহর অবস্থিত। এ শহর থেকেই ডেভিড বা দাউদ (আ) এসেছিলেন বলে বিশ্বাস করা হয়, এখানেই তাকে রাজা করা হয় ইসরাইলের। বাইবেল অনুযায়ী, এখানে জন্ম হয় যীশু খ্রিস্টের। দ্বিতীয় শতকে ইহুদীদের বার-কহবা বিদ্রোহের সময় এ শহর একবার ধ্বংস করে দিয়েছিলেন রোমান সম্রাট হ্যাড্রিয়ান।



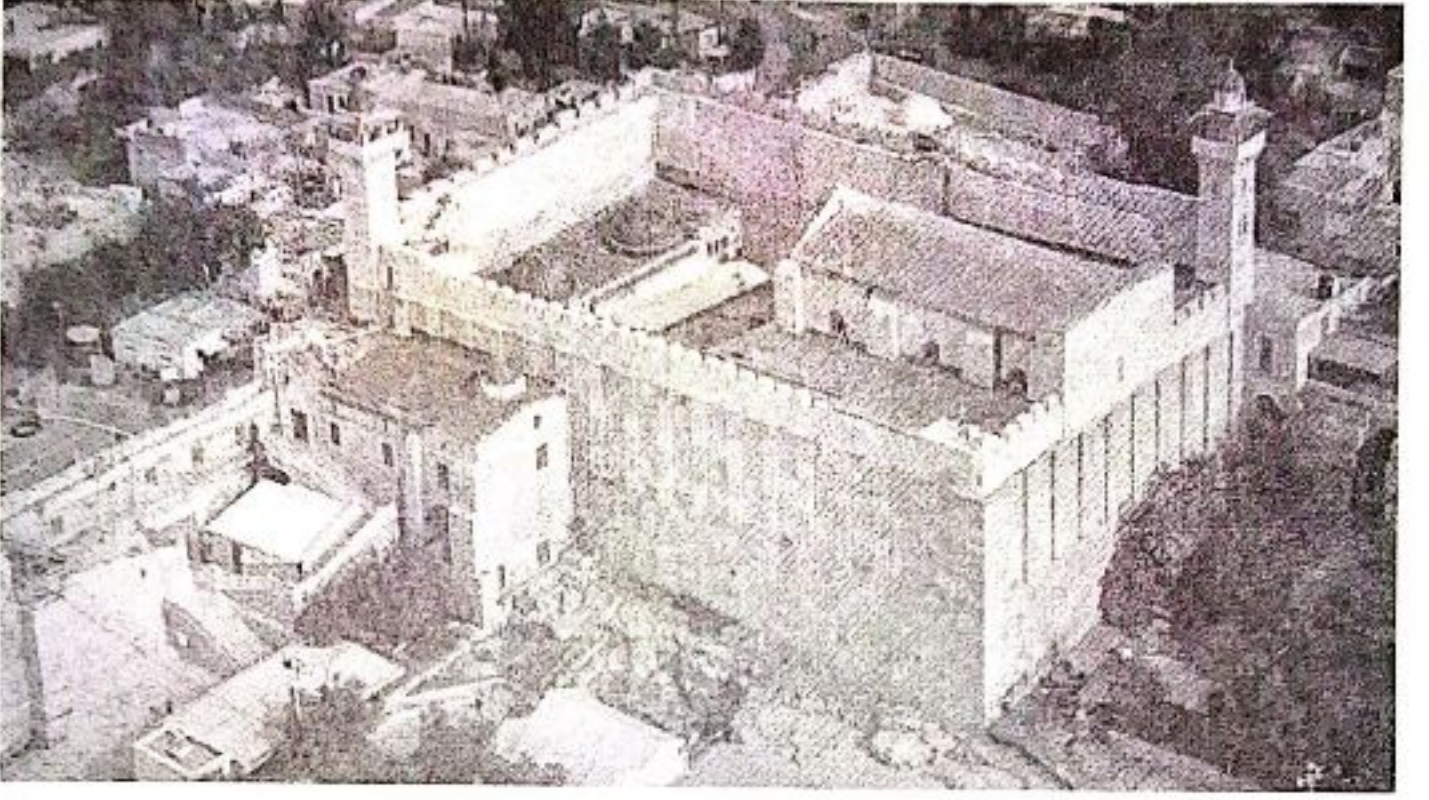
বেথেলেহেম

জেরুজালেমের পর ইহুদীদের কাছে দ্বিতীয় পবিত্রতম শহর হলো হেব্রন। মুসলিমদের কাছেও পবিত্রজ্ঞান করা হয়, কারণ এখানে ধারণা করা হয় কেইভ অফ দ্য প্যাট্রিয়ার্কে ইব্রাহিম (আ) এর কবর রয়েছে। একে আল-হারাম আল-ইব্রাহিমি ডাকা হয়। ইব্রাহিম (আ) ও তার স্ত্রী সারাহ, ইসহাক (আ) ও তার স্ত্রী রেবেকা, এবং ইয়াকুব (আ) ও তার স্ত্রী লেয়ার কবর নাকি এখানেই। ইহুদী কিংবদন্তি আছে, আদম হাওয়ার কবরও এখানে আছে।

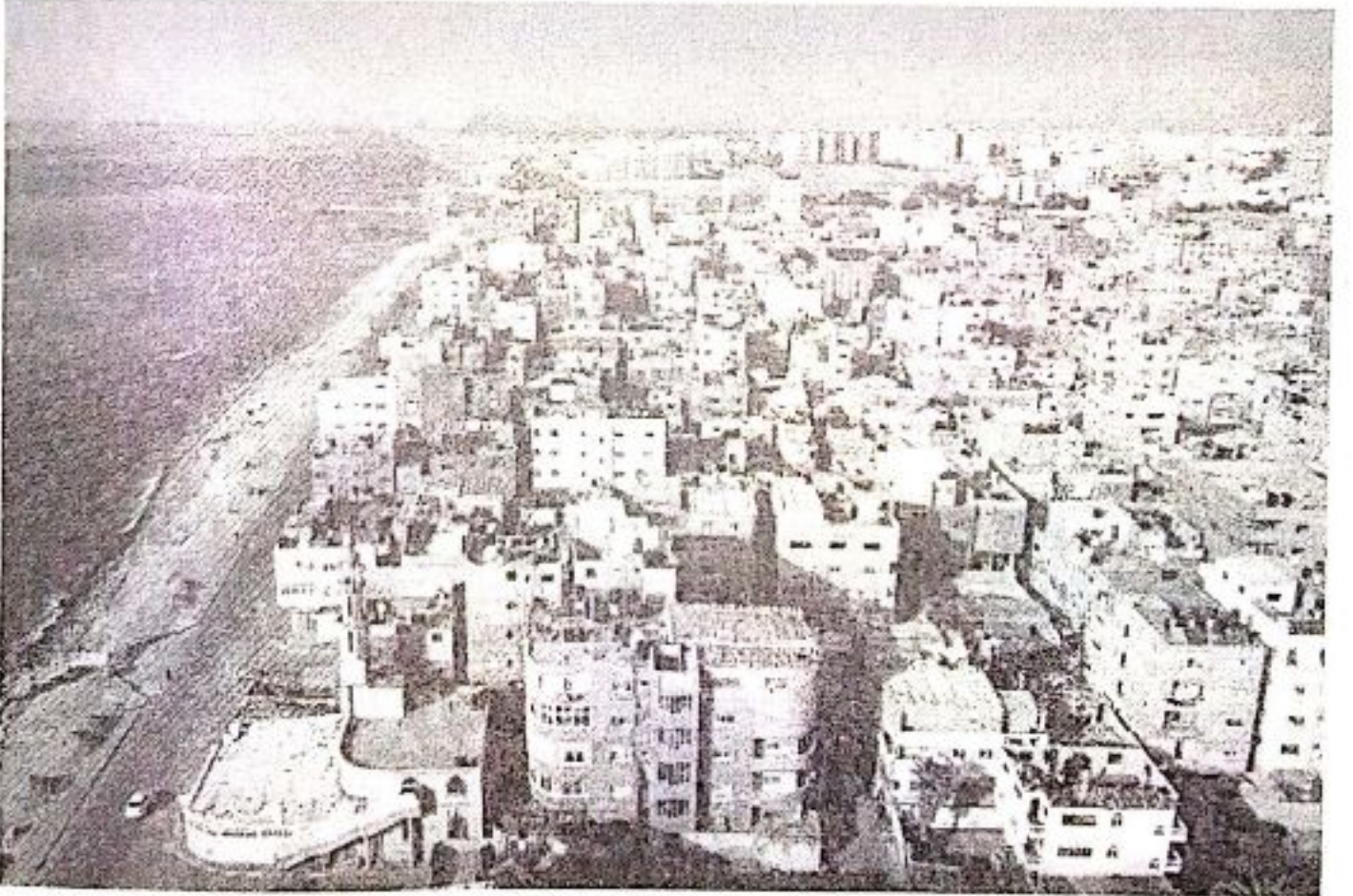
যাক গে, সবশেষে আসি জেরুজালেম আর গাজার ব্যাপারে। জেরুজালেম ইহুদীদের কাছে পবিত্রতম শহর, পবিত্র খ্রিস্টান ও মুসলিমদের কাছেও। ইয়ার-উস-সালাম বা ‘শান্তির শহর’ বা ‘দাউদের শহর’ নামে পরিচিত জেরুজালেম আজ পর্যন্ত দুবার পুরোপুরি ধ্বংস করা হয়েছে, ২৩ বার অবরোধ করা হয়েছে, দখল-বেদখল হয়েছে ৪৪ বার এবং আক্রমণ করা হয়েছে ৫২ বার।

গাজা হলো ভূমধ্যসাগরের পূর্ব তীরে স্বায়ত্তশাসিত ফিলিস্তিনি অঞ্চল। মিসরের সাথে এর সীমানা রয়েছে প্রায় ১১ কিলোমিটার জুড়ে। গাজা আর পশ্চিম

তীরই হলো বর্তমানে ফিলিস্তিনি এলাকা, অর্থাৎ এখনো ইসরাইলের হাতে চলে যায়নি।



হেব্রনের কেইভ অফ দ্য প্যাট্রিয়ার্কে



গাজা

পরের ছবিতে দেখতে পাচ্ছেন ১৯৪৭ সাল থেকে ক্রমান্বয়ে কীভাবে ফিলিস্তিনের অঞ্চলগুলো ইসরাইলের দখলে চলে যেতে থাকে।

1946

আরব
জিলাভিত্তিক

1947

1967

2005



অধ্যায় ২৬

অসলো অ্যাকর্ডস অবধি



১৯৬৮ সালের মার্চ মাসে ইসরাইলি ফোর্স আক্রমণ করে ফিলিস্তিনি বাহিনী ফাতাহকে। তবে ফাতাহ আর পিএলও (Palestine Liberation Organization) তখন আরব জুড়ে নাম করে ফেলে। ১৯৬৯-১৯৭০ সালে আবাবারো মিসরের সাথে ইসরাইলের যুদ্ধ লেগে যায়। ১৯৬৯ সালের ডিসেম্বরে ইসরাইলের নৌবাহিনী ৫ জন সোভিয়েত সেনাকে মেরে ফেলে, এরা সাহায্য করছিল মিসরকে। তখন পরিস্থিতি খারাপ হয়ে যায় ইসরাইলের জন্য। পরিস্থিতি ঠাণ্ডা করতে আমেরিকা কাজ করতে থাকে, ১৯৭০ সালের আগস্ট মাসে অস্ত্রবিরতিতে রাজি হয় দুপক্ষ। তখনও মিসরের প্রেসিডেন্ট ছিলেন জামাল আদেল নাসের।

পিএলও নিয়ে যেহেতু বললামই, ফাতাহ (فتح) আর হামাস (حماس) নিয়েও ছোট করে বলি। এ দুটো হলো ফিলিস্তিনের রাজনৈতিক অঙ্গনের শক্তিশালী দুই পার্টি। একটু পরের ইতিহাস হলেও বলি, ২০০৭ সালে প্রেসিডেন্ট মাহমুদ আব্বাসের ফাতাহ পার্টিকে নির্বাচনে হারিয়ে গাজা ভূখণ্ডের নিয়ন্ত্রণ নেয় হামাস। অল্প কথায় তাদের পার্থক্য হলো, হামাস যেখানে ইসলামিস্ট, ফাতাহ সেখানে সেকুলার। ইসরাইলের প্রতি দৃষ্টিভঙ্গির ক্ষেত্রে হামাস যেখানে সশস্ত্র প্রতিরোধ করে থাকে, ফাতাহ করে আপস-আলোচনা। হামাস ইসরাইলের বর্তমান সীমানা স্বীকার করে না, বরং মানে ১৯৬৭ সালের বর্ডার, যেখানে ফিলিস্তিনের অধীনে পশ্চিম তীর, পূর্ব জেরুজালেম ও গাজা; অন্যদিকে ফাতাহ ইসরাইলকে মেনে নিলেও তারাও ১৯৬৭ সালের বর্ডারে দেশ পুনর্গঠন করতে চায়। এ বই

ইসরাইলের উত্থান-পতন ২৩৯

লেখা পর্যন্ত হামাসের নিয়ন্ত্রণে এখন গাজা, আর ফাতাহ চালায় পশ্চিম তীর।
পিএলও মূলত অনেকগুলো সংগঠনের সমন্বয়, ১৯৬৭ সালের যুদ্ধের পর ইয়াসির
আরাফাতের নেতৃত্বে ফাতাহ হয়ে ওঠে পিএলও-র দলগুলোর মাঝে প্রধান।
পিএলও বানানোই হয়েছিলো ১৯৬৪ সালে ফিলিস্তিনকে স্বাধীন করার লক্ষ্য নিয়ে।



বাম থেকে যথাক্রমে ফাতাহ ও হামাসের লোগো

১৯৭০ সালে জর্ডানের রাজা হুসাইন বিন তালালের ওপর আততায়ী হামলার
জবাবে তিনি দেশজুড়ে সামরিক শাসন জারি করেন। তখন ১৬ থেকে ২৭
সেপ্টেম্বর পর্যন্ত ইয়াসির আরাফাতের নেতৃত্বাধীন পিএলও এবং রাজা হুসাইনের
নেতৃত্বাধীন জর্ডান সামরিক বাহিনীর মধ্যে যুদ্ধ সংঘটিত হয়। অসংখ্য ফিলিস্তিনি
যোদ্ধা নিহত হয় এবং জর্ডান থেকে ফিলিস্তিনিদেরকে বের করে দেয়া হয়
লেবাননে। সেপ্টেম্বর মাসে এটি সংঘটিত হয়, তাই একে ‘ব্ল্যাক সেপ্টেম্বর’ ডাকা
হয়, আবার জর্ডানের গৃহযুদ্ধও বলা হয়। তখন এর প্রতিশোধে গঠিত হয় ‘ব্ল্যাক
সেপ্টেম্বর’ সশস্ত্র সংঘ (আরবিতে মুনায্জামাত আয়লুল আল-আসওয়াদ) যারা
হত্যা করে জর্ডানের প্রধান মন্ত্রী ওয়াসফি তালকে। দুবছর বাদে ১৯৭২ সালে
ব্ল্যাক সেপ্টেম্বরের কমান্ডার লুতিফ আফিফের দাবি ছিল, ২৩৪ জন ফিলিস্তিনিকে
ইসরাইলি জেল থেকে মুক্তি দিতে হবে। এ দাবি আদায়ের জন্য ব্ল্যাক সেপ্টেম্বর
১৯৭২ সালের মিউনিখ অলিম্পিক খেলতে যাওয়া ইসরাইলি অলিম্পিক দলকে
জিম্মি করে। সেটিও ছিল সেপ্টেম্বর মাস, ৫ তারিখ। তারা প্রথমে হত্যা করে ২
জন খেলোয়াড়কে, আর ৯ জনকে জিম্মি করেছিল। তাদের দাবি অনুযায়ী
ইসরাইলি জেল থেকে ২৩০ জন ফিলিস্তিনি এবং ২ জন জার্মানকে মুক্ত করা হয়।
এরপর ব্ল্যাক সেপ্টেম্বর খেলোয়াড়দের নিয়ে যায় মুক্ত করতে; ওদিকে জার্মান
২৪০ ইসরাইলের উত্থান-পতন

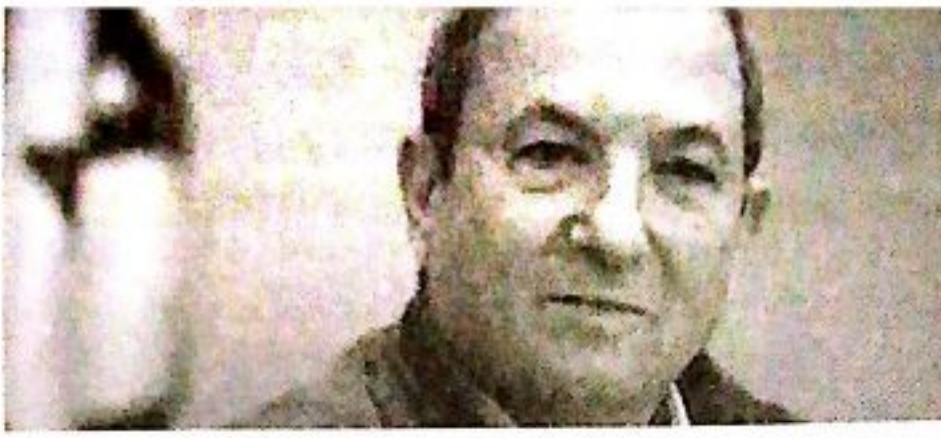
পুলিশ ছাদ থেকে তাদের ওপর গুলি করে এবং ব্ল্যাক সেপ্টেম্বরের তিনজনকে হত্যা করে। পুরো ঘটনা শেষে দেখা যায় মারা গিয়েছে ১৭ জন- ৬ জন ইসরাইলি কোচ, ৫ জন ইসরাইলি খেলোয়াড়, ১ জন জার্মান পুলিশ এবং ৫ জন ব্ল্যাক সেপ্টেম্বর সদস্য।



ব্ল্যাক সেপ্টেম্বরের সাথে জার্মান পুলিশের কথোপকথনে দোভাষী হিসেবে কাজ করছেন ওয়াকিটকি হাতে আরবিভাষী এই পুলিশ সদস্য।

এই ঘটনার প্রতিশোধ নিতে উঠে পড়ে লাগে ইসরাইল। ইসরাইলি প্রধানমন্ত্রী গোলদা মেইরের নির্দেশে ১৯৭২ সালে মোসাদের একটি দল নেমে পড়ে ব্ল্যাক সেপ্টেম্বরের সদস্যদের হত্যা করতে। ইসরাইলি টিমের ১১ সদস্যের নিহত হবার এ ঘটনা ‘মিউনিখ ম্যাসাকার’ নামে পরিচিত। আর এর প্রতিশোধের মিশনের নাম ছিল অপারেশন ‘র্যাথ অফ গড’ (মিভজা জাআম হায়েল)। প্রায় বিশ বছর চলে এ মিশন। মোসাদের করা ব্ল্যাক সেপ্টেম্বর সদস্যদের প্রত্যেকের হত্যাকাণ্ডের কয়েক ঘণ্টা আগে তাদের পরিবার ফুলসহ কার্ড পেতো, যেখানে লেখা থাকতো, “স্মরণ করিয়ে দিচ্ছি, আমরা ভুলি না, ক্ষমাও করি না।”

ব্ল্যাক সেপ্টেম্বরের বাকি ফিলিস্তিনিদের জার্মান সরকার ছেড়ে দেয় এক হাইজ্যাক হওয়া বিমানের জিম্মিদের মুক্ত করতে। অপারেশন র্যাথ অফ গডের পাশাপাশি ইসরাইল মিউনিখ ম্যাসাকারের সম্মুখ জবাব দেয় বোমা বিস্ফোরণ, গুলিহত্যা এবং লেবাননে পিএলও হেডকোয়ার্টারে হামলার মাধ্যমে। হামলার নেতৃত্ব দেন এহুদ বারাক, যিনি পরে ইসরাইলের প্রধানমন্ত্রী হয়েছিলেন।

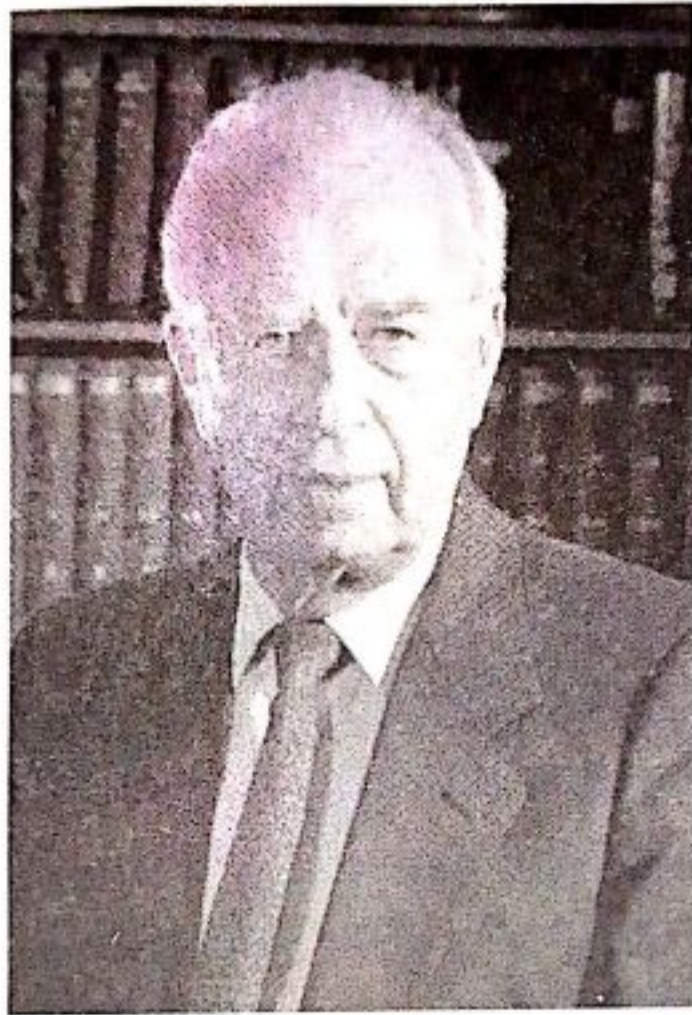


এহুদ বারাক

১৯৭২ সালে মিসরের প্রেসিডেন্ট হলেন আনোয়ার সাদাত। ইহুদীদের কাছে পবিত্রতম ঈদ হিসেবে পালিত হয় 'ইয়ম কিপুর'। সেই সময় মিসর আর সিরিয়া মিলে অতর্কিত আক্রমণ করে ইসরাইলকে সেই ১৯৬৭ সালের অতর্কিত আক্রমণের প্রতিশোধ হিসেবে। এ যুদ্ধ তাই 'ইয়ম কিপুর' যুদ্ধ নামে পরিচিত, আবার একে 'রামাদান যুদ্ধ' বা 'চতুর্থ আরব-ইসরাইল যুদ্ধ'-ও বলে। মূল যুদ্ধটা হয় গোলান মালভূমি ও সিনাই উপদ্বীপ এলাকায়। মিসরের উদ্দেশ্য ছিল সুয়েজ খালের অধিকার পাকাপোক্ত করা এবং সিনাই নিজ দখলে ফিরিয়ে আনা। কিন্তু মিত্রের সহায়তায় ইসরাইল ভালো মতই যুদ্ধে ফেরে, এবং বলা চলে তারাই যুদ্ধে জেতে, তবে রাজনৈতিক লাভ হয় মিসর ও ইসরাইল উভয়েরই। এ যুদ্ধের ফলে সৌদি সরকার ১৯৭৩-এর তেল সংকটের সূচনা করে। আর ১৯৭৪ সালে ফিলিস্তিনের পিএলও জাতিসংঘে অবজার্ভার স্ট্যাটাস পেয়ে যায়। ইয়াসির আরাফাত সাধারণ পরিষদে ভাষণ দেন। ১৯৭৪ সালের শেষ দিকে ইছহাক রাবিন ইসরাইলের প্রধানমন্ত্রী হন।

১৯৭৬ সালের জুলাইতে ফ্রান্সের ২৬০ জন যাত্রীসহ বিমান হাইজ্যাক করে দুজন ফিলিস্তিনি আর দুজন জার্মান, সেটি উগান্ডায় উড়িয়ে নেয় তারা, বিমানে ২৪৮ জন যাত্রী ছিল। তাদের দাবি ছিল ইসরাইলের জেল থেকে ৪০ জন ফিলিস্তিনিকে মুক্তি দিতে হবে, সেই সাথে আরও চারটি দেশের ১৩ জন বন্দীকেও। জার্মানরা এরপর অ-ইহুদী যাত্রীদের ছেড়ে দেয়, কিন্তু হত্যার হুমকি দেয় প্রায় ১০০ ইহুদী যাত্রীকে, অপারেশনে অবশ্য চারজন জিম্মি নিহত হয়। ইসরাইলি প্রধানমন্ত্রী রাবিন তখন একটা উদ্ধার অপারেশন অর্ডার করেন, যার নাম 'অপারেশন এনতেবে'। যেহেতু উগান্ডার সেই এয়ারপোর্টের নাম ছিল এনতেবে এয়ারপোর্ট, সেখান থেকেই এ নাম। মিশনটি 'অপারেশন থান্ডারবোল্ট' নামেও পরিচিত। সত্যি সত্যি ইহুদী যাত্রীদের উদ্ধার করে ফেলে ইসরাইল ফোর্স। কিন্তু উগান্ডার মতো জাতিসংঘের এক রাষ্ট্রে এরকম উদ্ধার অভিযান সার্বভৌমত্বের জন্য

ছমকি স্বরূপ বলে মন্তব্য করেন জাতিসংঘ সেক্রেটারি ওয়াল্ডহাইম, যিনি আগে আবার নিজে নাৎসি ছিলেন।



ইছহাক রাবিন

১৯৭৭ সালে রাবিন এক কেলেংকারিতে সরে দাঁড়ান, আর শিমন পেরেজ ইসরাইলের প্রধানমন্ত্রী হন। তবে নির্বাচনে জিতে মেনাখেম বেগিন প্রধানমন্ত্রী হয়ে যান। ৩০ বছরের শত্রুতা ঝেড়ে মিসরের প্রেসিডেন্ট আনোয়ার সাদাত জেরুজালেম ভ্রমণে যান।

১৯৭৮ সালের ১৭ সেপ্টেম্বর মার্কিন প্রেসিডেন্ট জিমি কার্টার আনোয়ার সাদাত আর মেনাখেম বেগিনের সাথে মিলিত হয়ে আমেরিকার ক্যাম্প ডেভিডে এক শান্তিচুক্তির রূপরেখা অংকন শুরু করেন যে, পশ্চিম তীর এবং গাজা এলাকা ফিলিস্তিনের অধিকারে থাকবে। ১২ দিন ধরে তারা সেখানে মিটিং করেন এবং দূরকম রূপরেখা আঁকা হয়, যার মাঝে গৃহীত হয় দ্বিতীয়টি। একে বলা হয় ক্যাম্প ডেভিড অ্যাকর্ডস (Camp David Accords)। ফলশ্রুতিতে ১৯৭৯ সালের ২৬ মার্চ মিসর-ইসরাইল শান্তিচুক্তি স্বাক্ষরিত হয় ওয়াশিংটন ডিসিতে। চুক্তিতে তারা তিনজনই স্বাক্ষর করেন, অর্থাৎ জিমি কার্টার, মেনাখেম বেগিন এবং আনোয়ার সাদাত। ১৯৭৮ সালের শান্তিতে নোবেল পুরস্কার যুগ্মভাবে জেতেন মেনাখেম বেগিন এবং আনোয়ার সাদাত।

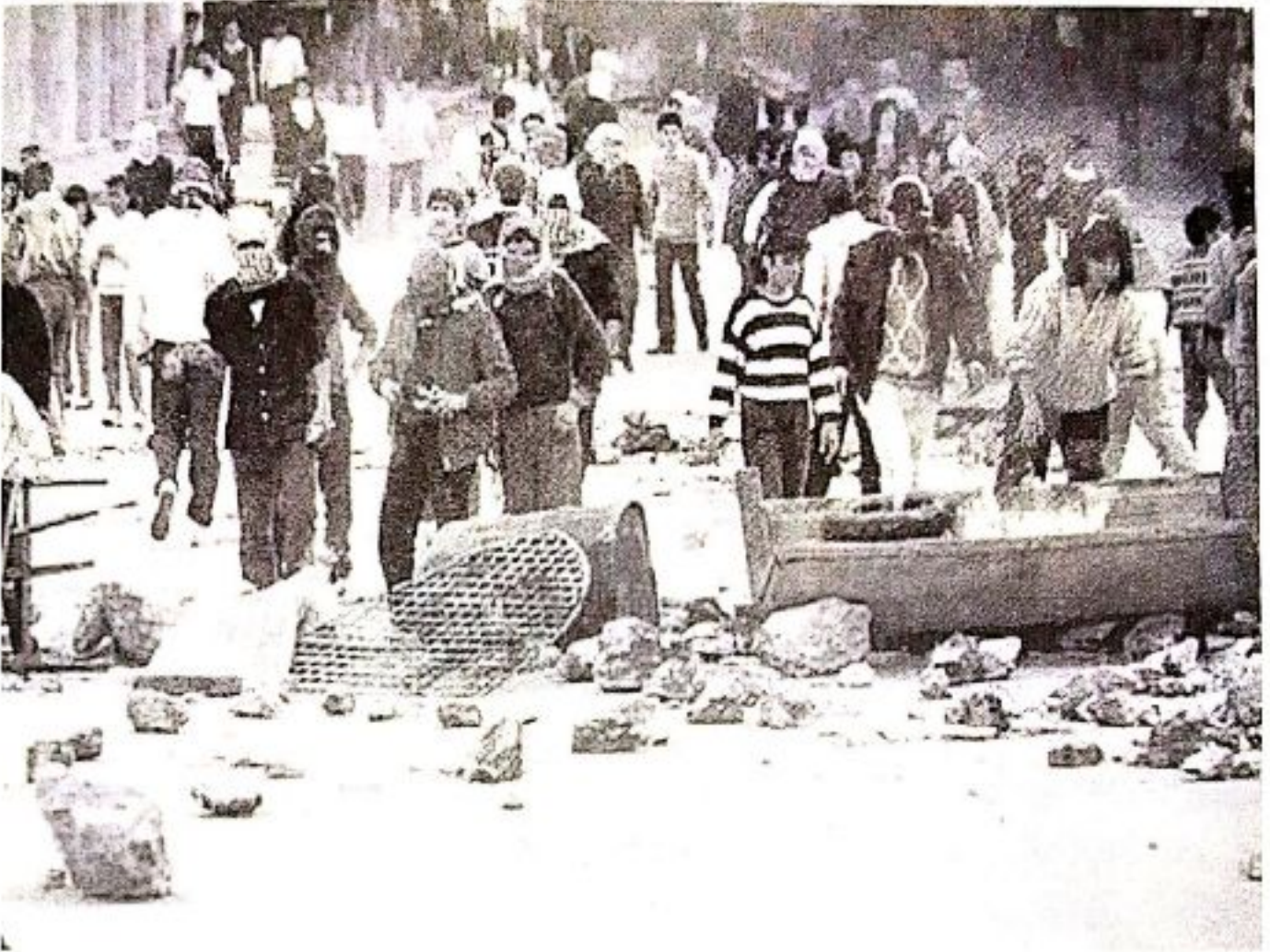


ক্যাম্প ডেভিড অ্যাকর্ডস উদযাপনে বাম থেকে বেগিন, কার্টার ও সাদাত

ওদিকে ১৯৭৯ সালে ইরানি ইসলামি বিপ্লব থেকে পালিয়ে আসে ৪০ হাজার ইহুদী। ১৯৮৪ সালে ইথিওপিয়াতে দুর্ভিক্ষ চলাকালে ৮০০০ ইথিওপিয়ান ইহুদীকে উড়িয়ে নিয়ে আসা হয় ইসরাইলে। ১৯৮৫ সালে লেবানন থেকে সব ইসরাইলি সামন্ত সরিয়ে নেয়া হয়। ১৯৯২ সালে আবারো জয়ী হন রাবিন। এর মাঝে জাবালিয়া ফিলিস্তিনি শরণার্থী শিবির থেকে ১৯৮৭ সাল থেকে ফিলিস্তিনি ‘ইত্তিফাদা’ (انتفاضة) শুরু হয়, যার শাব্দিক অর্থ ‘অভ্যুত্থান’। পশ্চিম তীর ও গাজায় ইসরাইলি আত্মসনের বিরুদ্ধে ছিল এ অভ্যুত্থান। বলা বাহুল্য, ইসরাইল সশস্ত্রভাবে দমনের চেষ্টা চালায় ইত্তিফাদাকে। একটি নয়, দুটো ইত্তিফাদা হয়েছিল। এর মাঝে প্রথমটি চলে ১৯৮৭ সাল থেকে ১৯৯৩ সাল পর্যন্ত। দ্বিতীয় ইত্তিফাদাকে ‘আল-আকসা ইত্তিফাদা’-ও বলা হয় (২০০০-২০০৫)। প্রথম ইত্তিফাদার ফলাফল হিসেবে ফিলিস্তিনি কর্তৃপক্ষ তৈরি হয়, আর পিএলও ইসরাইলকে স্বীকৃতি দেয়। ১,৯৬২ জন ফিলিস্তিনি এবং ১৭৯-২০০ জন ইসরাইলি মারা যায় প্রথম ইত্তিফাদায়। এছাড়া আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ ফলাফল হলো অসলো অ্যাকর্ডস।

১৯৯৩ সালের জুলাইতে, এক সপ্তাহ ধরে ইসরাইল লেবাননে আক্রমণ চালায় লেবাননের শিয়া হিজবুল্লাহ পার্টিকে দুর্বল করে দিতে। ১৯৯৪ সালের ফেব্রুয়ারিতে ইসরাইলের মৌলবাদী ইহুদী কাখ পার্টির সমর্থক বারুখ গোল্ডস্টাইন হেব্রনের পবিত্র প্যাট্রিয়াক গুহাতে ২৯ জন ফিলিস্তিনিকে হত্যা করে, আহত করে

১২৫ জনকে। কথিত আছে, এ গুহায় নবী হযরত ইব্রাহিম (আ) এবং তার পরিবারের কবর আছে।



প্রথম ইন্তিফাদার সময় রাস্তায় ব্যারিকেড দেয়া

১৯৯৩ সালে ওয়াশিংটন ডিক্লারেশনে স্বাক্ষর করে জর্ডান আর ইসরাইল, সাক্ষী ছিলেন মার্কিন প্রেসিডেন্ট বিল ক্লিনটন। ফলে, দুই দেশের মাঝে চলমান দীর্ঘদিনের এক যুদ্ধ পরিস্থিতি শেষ হয়। ওদিকে রাবিন আর পিএলও-চেয়ারম্যান ইয়াসির আরাফাতও শান্তিচুক্তি স্বাক্ষর করেন, এটি প্রথম অসলো অ্যাকর্ডস বা অসলো চুক্তি নামে পরিচিত। দ্বিতীয় অ্যাকর্ড স্বাক্ষরিত হয় ১৯৯৫ সালে মিসরে। মূলত নরওয়ের রাজধানী অসলো শহরে পিএলও ও ইসরাইলের মাঝে আলাপ শুরু হয়েছিল, যার ফলে ইসরাইলকে স্বীকৃতি দিয়েছিল পিএলও এবং ইসরাইল মেনে নিয়েছিল পিএলও-কে ফিলিস্তিনের কর্তৃপক্ষ হিসেবে। সেই থেকে শুরু। তাই এ চূড়ান্ত চুক্তিকে অসলো চুক্তি (অসলো অ্যাকর্ডস) বলা হয়। অবশ্য, ফিলিস্তিনি সূন্নি সংগঠন হামাস এর বিরোধিতা করে। অসলো চুক্তির মাধ্যমে ইসরাইল ফিলিস্তিনি অর্থনীতি, নিরাপত্তা ব্যবস্থা এবং পশ্চিম তীরের ৬০% দখল নিয়ে নেয়। পঞ্চাশ বছরে ওয়েস্ট ব্যাংকে ৬ লাখ ইসরাইলি সেটলার এসেছে। গড়েছে ২৫০ সেটেলমেন্ট।



১৯৯৩ সালের ১৩ সেপ্টেম্বর প্রথম অসলো অ্যাকর্ডসে স্বাক্ষরের সময় বাম থেকে যথাক্রমে
ইসরাইলি প্রধানমন্ত্রী ইছহাক রাবিন, মার্কিন প্রেসিডেন্ট বিল ক্লিনটন এবং পিএলও প্রধান
ইয়াসির আরাফাত

অধ্যায় ২৭

অতঃপর বর্তমান



১৯৯৬ সালের নির্বাচনে বেঞ্জামিন বা বেনইয়ামিন নেতানিয়াহু জিতে যান, প্রধানমন্ত্রী হন ইসরাইলের। সেপ্টেম্বরে ফিলিস্তিনি দাঙ্গায় ৮০ জন মারা যায়। ১৯৯৯ সালের জুলাইয়ের নির্বাচনে এহুদ বারাক জিতে যান। কিন্তু ২০০১ সালে নির্বাচনে জেতেন এরিয়েল শ্যারন। তিনি ২০০২ সালে পশ্চিম তীরে ব্যারিয়ার বানানো শুরু করলেন। এর প্রতিবাদে ফিলিস্তিনের গাজা থেকে সেখানে মর্টার হামলা হতে লাগল। আর লেবানন থেকে হিজবুল্লাহর আক্রমণ অব্যাহত ছিল। ২০০৪ সালে পুরোদমে গাজায় প্রতিশোধ নিতে নামে ইসরাইল। চলতে থাকে অপারেশন।

এর মাঝে চলতে থাকা দ্বিতীয় ইত্তিফাদার কথা ভুললে চলবে না। সেটির শুরু হয়েছিল কীভাবে, তা বলা যাক। ২০০০ সালের ১১-২৫ জুলাই বিল ক্লিনটনের নিমন্ত্রণে ক্যাম্প ডেভিডে একটি সামিট অনুষ্ঠিত হয়, উদ্দেশ্য ছিল বরাবরের মতোই ইসরাইল-ফিলিস্তিন সংঘাতের ইতি টানা। যোগ দেন ইসরাইলি প্রধানমন্ত্রী এহুদ বারাক এবং পিএলও প্রধান ইয়াসির আরাফাত। কিন্তু এই সামিটে কোনো একমতে পৌঁছানো যায়নি।

ঠিক তার পরপর সেপ্টেম্বর মাসে তৎকালীন লিকুদ পার্টির প্রধান অ্যারিয়েল শ্যারন জেরুজালেমের টেম্পল মাউন্ট বা আল-আকসা কম্পাউন্ডে যান, যা প্রবল বিতর্কের জন্য দেয়। এর প্রতিবাদে যে দাঙ্গা শুরু হয়, তা পুলিশ রাবার বুলেট ও টিয়ার গ্যাস দিয়ে প্রতিহত করার চেষ্টা করলেও তেমন লাভ হয়নি। ইসরাইলিরা

ইসরাইলের উত্থান-পতন ২৪৭

গুলি, ট্যাংক এবং এয়ার স্ট্রাইক ব্যবহার করতে শুরু করে; ওদিকে ফিলিস্তিনিরাও পাল্টা আক্রমণ চালায়, যদিও তাদের অস্ত্র ইসরাইলের সমান কিছু ছিল না। ৩,০০০ ফিলিস্তিনির বিপরীতে মারা যায় ১,০০০ ইসরাইলি। ২০০৫ সালের ৮ ফেব্রুয়ারি মিসরের শার্ম এল শেইখের সামিটের মধ্য দিয়ে দ্বিতীয় ইন্তিফাদার ইতিহাস বলে অনেকে মনে করে থাকেন। শ্যারন কথা দেন যে, তিনি ৭,৫০০ এর মাঝে ৯০০ জন ফিলিস্তিনি বন্দীকে ছেড়ে দেবেন, আর ইন্তিফাদার সময় পশ্চিম তীরের যেটুকু ভূমি ইসরাইল দখল করেছিল, সেগুলো ফিরিয়ে দেবেন।



ক্যাম্প ডেভিড সামিটে বাম থেকে এহুদ বারাক, বিল ক্লিনটন ও ইয়াসির আরাফাত



দ্বিতীয় ইন্তিফাদা দমনে নাবলুসে নামা কিছু ইসরাইলি সেনা

২০০৬ সালে ফিলিস্তিনে জিতে আসে হামাস, এসেই তারা আগের সকল সাইন করা চুক্তি বাতিল বলে গণ্য করে। তারা দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে ইহুদী গণহত্যাকে জায়োনিস্টদের বানানো মিথ বা নিছক কিংবদন্তী বলে প্রচার করে বসে এবং UNRWA এর প্রধানকে চিঠি দেয় এ ব্যাপারে, যেন এ বিষয়ে তাদের স্কুলে পড়ানো না হয়। এটা তাদের বড় একটি ভুল ছিল। ২০০৬ সালে শ্যারন স্ট্রোক করায় প্রধানমন্ত্রী হন এহুদ ওলমার্ট।

২০০৬ সালের ১৪ মার্চ এক ফিলিস্তিনি কারাগারে অপারেশন চালায় ইসরাইল। জুন মাসে ফিলিস্তিনের হামাস গাজা বর্ডার পেরিয়ে ট্যাঙ্ক অ্যাটাক করে ইসরাইলি সেনাকে ধরে নিয়ে আসে। লেবাননের হিজবুল্লাও প্রায় একই কাজ করে, দুজন ইসরাইলি সেনাকে ধরে নিয়ে আসে। ফলে ইসরাইল দ্বিতীয় লেবানন যুদ্ধ শুরু করে দেয়। ২০০৭ সালে গাজার নিয়ন্ত্রণ নিয়ে নেয় হামাস।

২০০৭ সালের সেপ্টেম্বরে ইসরাইলি এয়ারফোর্স সিরিয়ার নিউক্লিয়ার রিয়াক্টর ধ্বংস করে দেয়। ২০০৮ সালে হামাসকে শায়েস্তা করতে গাজায় অভিযান চালায় ইসরাইল। ২০০৯ সালে নেতানিয়াহু ক্ষমতায় আসেন আবার। ২০১১ সালে হামাস আর ইসরাইলের চুক্তি হয়, ফলে সেই অপহরণ করা ইসরাইলি সেনার বিনিময়ে ইসরাইল ১,০২৭ ফিলিস্তিনি বন্দীকে ছেড়ে দেয়।

২০১২ সালের নভেম্বরে হামাস নেতা আহমেদ জাবারিকে হত্যা করতে ইসরাইল গাজায় হামলা শুরু করে। যখন ২০১৪ সালে ফাতাহ আর হামাস একত্রে সরকার গঠন করতে রাজি হয়, তখন ইসরাইল শান্তিচুক্তি করতে বসার জন্য অস্বীকৃতি জানায়।

২০১৪ সালের ৮ জুলাই হামাসের রকেট হামলার উত্তরে ইসরাইল গাজা এলাকায় বড় আকারের আক্রমণ শুরু করে। সেই আক্রমণের পর বেশ কয়েক বছরে তেমন বড় কোনো ঘটনা ঘটেনি। ২০১৭ সালে রাজধানী তেলআবিব থেকে সরিয়ে জেরুজালেম নিয়ে যাওয়ার ঘটনা বাদ দিলে পরিস্থিতি আগের চেয়ে কিছুটা ম্রিয়মাণই ছিল। কিন্তু ২০২১ সালে করোনাকালে এসে পরিস্থিতি হঠাৎ তুঙ্গে ওঠে। কোভিড ভ্যাক্সিনেশন নিয়ে বৈষম্যের পাশাপাশি এবার শুরু হয় আবারও সশস্ত্র সংঘাত।

হঠাৎ কেন নারকীয় আক্রমণ শুরু করেছিল ইসরাইল? চলুন এবার জেনে নেয়া যাক ২০২১ এর এই আক্রমণের পেছনের ঘটনাগুলো, নির্যাতিত ফিলিস্তিনের আতর্নাদ আর কিংবদন্তিতুল্য ইসরাইলের আয়রন ডোমের বাস্তবতা।

ইসরাইল অনেক যুদ্ধেই জড়িয়েছে। যেমন, ১৯৪৮ সালে প্রথম আরব-ইসরাইল যুদ্ধ, ১৯৫৬ সালে সুয়েজ সংকট বা দ্বিতীয় আরব-ইসরাইল যুদ্ধ, ১৯৬৭

সালে ছয় দিনের যুদ্ধ বা তৃতীয় আরব-ইসরাইল যুদ্ধ, ইত্যাদি। আর ওদিকে গাজা ও পশ্চিম তীরে ধীরে ধীরে জায়গা দখল বাড়ছেই। এদেরকে আমরা বলি দখলদার ইসরাইলি, ইংরেজিতে বলে ইসরাইলি সেটলার, যারা ‘দখল’ করছে। গুরু দিকে স্বল্প সংখ্যক ইহুদী হাজির হলেও, ধীরে ধীরে পুরো পৃথিবী থেকে ইহুদীদেরকে ‘আলিয়া’র মাধ্যমে জড়ো করে ইহুদী জনসংখ্যা বাড়ানো হয়েছে, যেন একটি পর্যায়ে পবিত্র ভূমির দাবি আদায় করা যায় স্থানীয় ফিলিস্তিনিদের উৎখাত করে।

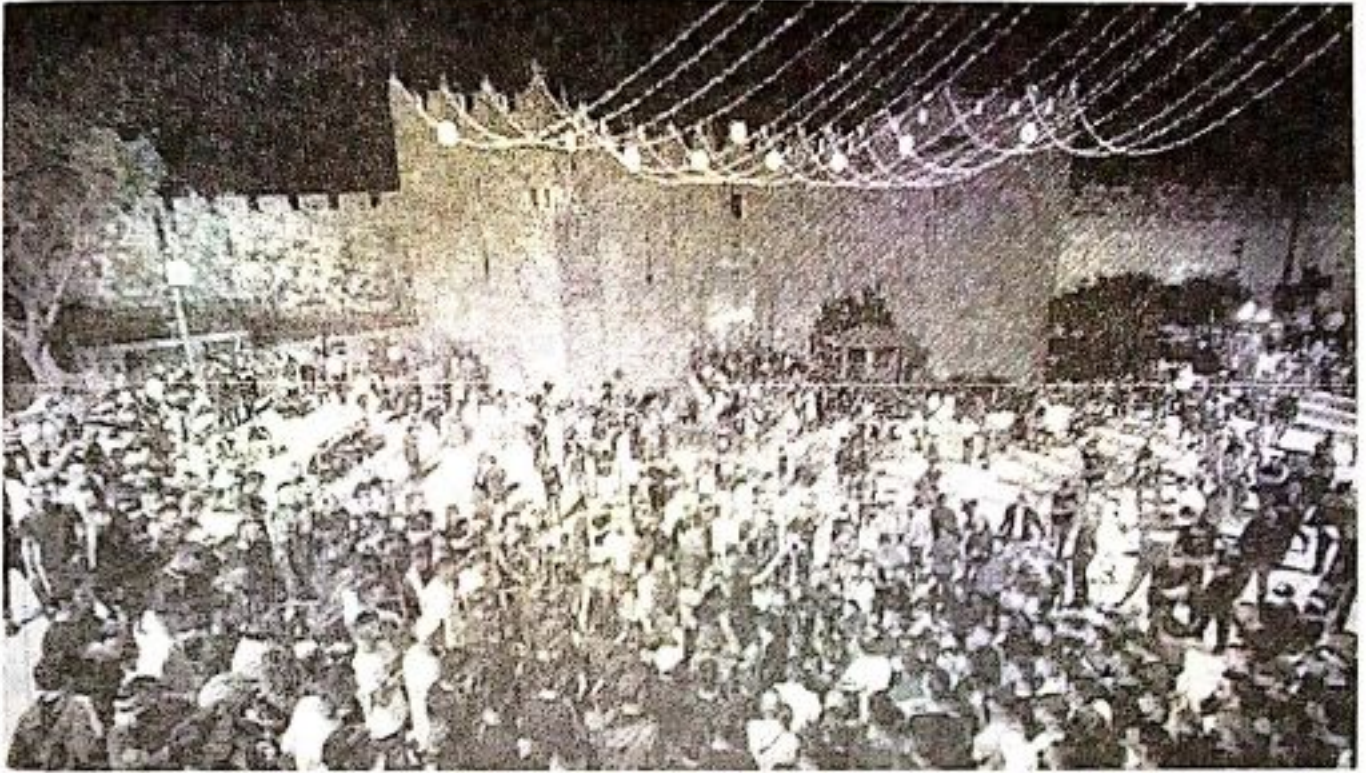
২০২১ সালের মে মাসে রমজানের শুরু থেকেই পরিস্থিতি ছিল থমথমে। ইসরাইলি পুলিশ জেরুজালেমের ইহুদী অধ্যুষিত ওল্ড সিটির বাইরে দামেস্ক গেটে ফিলিস্তিনি মুসলিমদের জমায়েত নিষিদ্ধ করে।

প্রশ্ন উঠতে পারে, দামেস্ক গেট কেন? ১৩০-১৩১ সালের দিকে রোমান সম্রাট হ্যাড্রিয়ান জেরুজালেম এলাকা পরিদর্শনে আসেন। এখানে একটি বিজয়স্তম্ভ ছিল, যার ওপরে সম্রাট হ্যাড্রিয়ানের ভাস্কর্য। কালের বিবর্তনে এ ভাস্কর্য আর স্তম্ভ ধ্বংস হয়ে গেলেও, লোকে এখানে থাকা ফটকের আরবি নামের মধ্য দিয়ে মনে রাখে সে ঘটনা। আরবি নামটি ‘বাব আল-আমুদ’ (باب العامود) বা স্তম্ভ ফটক। পরবর্তী সময়ে এ গেট দিয়ে বের হয়ে লোকে সিরিয়ার রাজধানী দামেস্কে যেত, তাই এর বিকল্প নাম হয়ে যায় দামেস্ক গেট। ইংরেজিতে এটিই প্রচলিত হয়, ডামেস্কাস গেট। এই দামেস্ক গেটটি ফিলিস্তিনি জাতিগত আন্দোলনের প্রতীক হয়ে দাঁড়িয়েছে। ফিলিস্তিনি আর ইসরাইলি সেনা ও পুলিশদের মাঝে সংঘর্ষগুলো এই দামেস্ক গেট এলাকা ঘিরেই হয়ে আসছে, কারণ এখানেই ফিলিস্তিনিরা আন্দোলন আর প্রতিবাদের জন্য জড়ো হয়ে থাকেন। এজন্য কোনো প্রতিবাদের আভাস পেলেই এ এলাকায় জমায়েত নিষিদ্ধ করা হয়।

তবে যাই হোক, ফিলিস্তিনিরা সেখানে জড়ো হয়ই, এবং প্রতিবাদও হয়। সংঘর্ষ হয়। একটা পর্যায়ে ইসরাইলি পুলিশ ব্যারিকেড সরিয়ে ফেলতে বাধ্য হয়। কিন্তু তখন পরিস্থিতি খারাপের দিকেই। ওদিকে, ইফতারের পর ফিলিস্তিনি জমায়েত এমনিতেই নিষিদ্ধ।

রমজানের শেষ সপ্তাহে এসে ইহুদী অধ্যুষিত পূর্ব জেরুজালেমের শেখ জাররাহ এলাকা থেকে বাদবাকি মুসলিম পরিবারকে উৎখাতের পরিকল্পনায় আন্দোলন তুঙ্গে ওঠে। এই এলাকায় ত্রয়োদশ শতকের সুলতান সালাহউদ্দিন বা সালাদিনের চিকিৎসক শেখ জাররাহর সমাধি রয়েছে। সেখান থেকেই এলাকার এ নাম। পূর্ব জেরুজালেমের এ অংশে মুসলিম বেশি, মানে ফিলিস্তিনি বেশি। একটা সময় জেরুজালেমের বনেদি মুসলিমদের কেন্দ্র ছিল শেখ জাররা। কিন্তু ১৯৬৭

সালে পূর্ব জেরুজালেম দখলে চলে যায় ইসরাইলের হাতে। এখন এই শেখ জাররাহ থেকেও তাদের বিতাড়ন প্রক্রিয়া শুরু হচ্ছে। ইহুদী জায়েনিস্টদের দাবি, ১৮৮৫ সালেই নাকি তারা এ এলাকা কিনে নিয়েছিল।



দামেস্ক গেট

৭ মে রাত্রে শত শত ফিলিস্তিনির প্রতিবাদে বাধা দেয় পুলিশ। শেখ জাররাহর চার ফিলিস্তিনি মুসলিম পরিবারকে উৎখাতের বিষয়ে পূর্ব জেরুজালেমে কেন্দ্রীয় কোর্ট ইসরাইলের পক্ষে রায় দেয়। শুনানির তারিখ তারা ফেলে ২০২১ সালের মে মাসের ১০ তারিখে। বিশেষ এক দিন।

১০ মে ইসরাইল পালন করে জেরুজালেম দিবস হিসেবে; ‘ইয়ম ইয়েরুশালায়িম’ (יום ירושלים)। ইসরাইলের জাতীয় ছুটির এ দিনটি মূলত সেই যে ১৯৬৭ সালের ছয় দিনের যুদ্ধে ইসরাইল আরবকে পরাজিত করেছিল, সেটির উদযাপন। এদিন জেরুজালেমের পুরনো শহর ইসরাইলিদের দখলে আসে। প্রতি বছর ইহুদীদের পতাকা মিছিল শুরু হয় সেই দামেস্ক গেট থেকে, আর শেষ হয় আল আকসা কম্পাউন্ড বা ইহুদীদের টেম্পল মাউন্ট তথা বাইতুল মুকাদ্দাস এলাকার পশ্চিম দেয়ালে এসে, মাঝে দিয়ে তারা মুসলিম এলাকা পার হয়। এ বিশেষ দিনে শুনানির কারণ এদিন মুসলিমরা বাধা দিতে পারবে না, রাস্তাঘাট ইহুদীদের দ্বারাই পূর্ণ থাকবে।

কিন্তু বড় আকারের আন্দোলনের ভয়ে শেষমেশ এ পরিকল্পনা থেকেও সরে আসে ইসরাইল সরকার; মিছিলের গতিপথ বদলে দেয়ার নির্দেশ আসে। সুপ্রিম কোর্ট পিছিয়ে দেয় শুনানির তারিখ। পবিত্র রমজানে আল-আকসা মসজিদে জড়ো

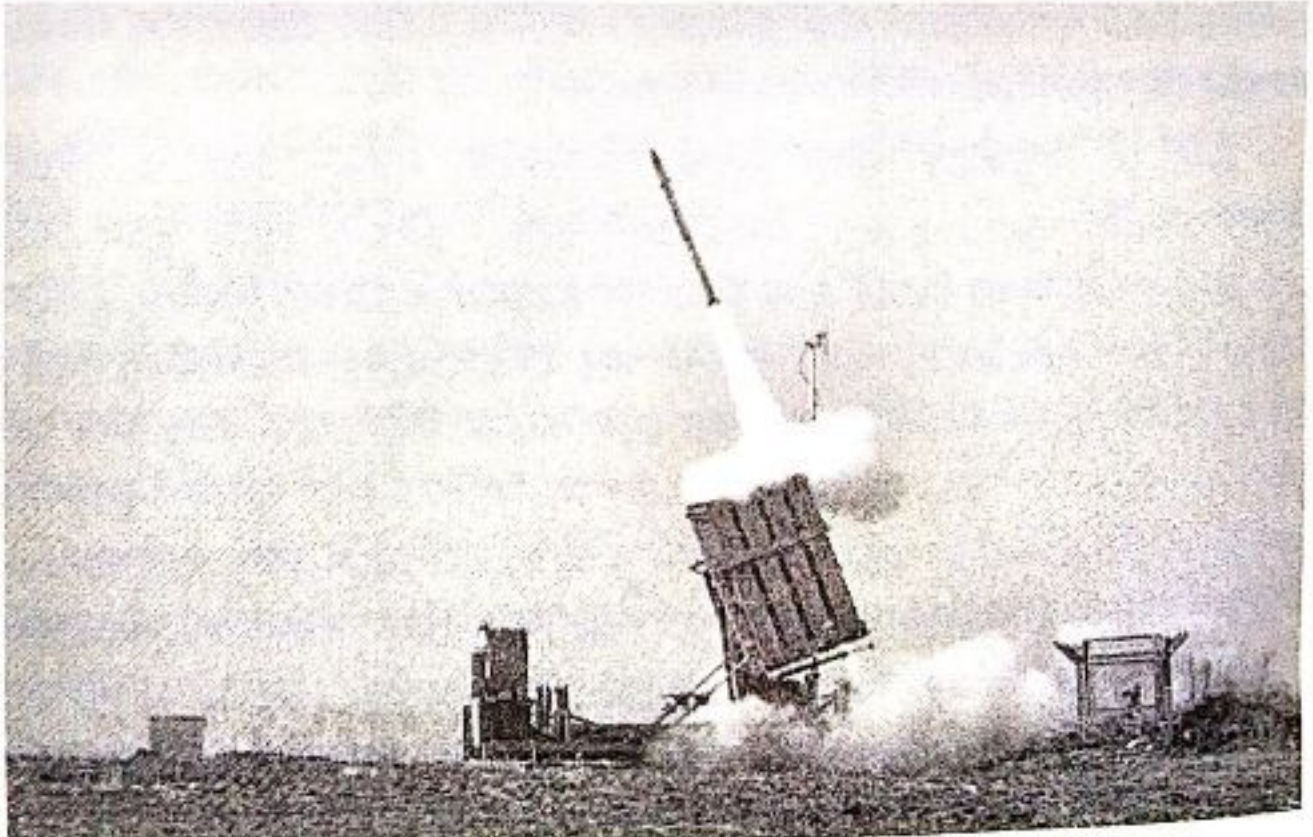
ইসরাইলের উত্থান-পতন ২৫১

হওয়া শত শত ফিলিস্তিনি প্রতিবাদকারীদের ওপর আক্রমণ করে ইসরাইলি ফোর্স। আহত হয় অসংখ্য ফিলিস্তিনি। এটি মে মাসের ১০ তারিখ, ২০২১।

গাজা উপত্যকার হামাস আন্টিমেটাম দিল, আল-আকসা আর শেখ জাররাহ থেকে ইসরাইলি ফোর্সকে চলে যেতে হবে, নাহলে আক্রমণ চালাবে তারা। সন্ধ্যার দিকে অনেক বছর পর ইহুদী অধ্যুষিত জেরুজালেম আর দক্ষিণ ইসরাইলের দিকে পাল্টা আক্রমণ চালায় হামাস মিসাইল ছুঁড়ে। হামাসের ভাষ্য জানা যায়নি, তবে ইসরাইলের মতে, প্রতি তিন মিনিটে নাকি একটি করে রকেট ছোঁড়া হয়েছে।

ইসরাইল তখন গাজায় এয়ারস্ট্রাইক চালাতে শুরু করে। হামাসের আক্রমণ ব্যাপক হলেও ইসরাইলের আক্রমণের মতো ভয়ংকর নয়। কারণ, মুসলিম অধ্যুষিত এ এলাকা অর্থাৎ ফিলিস্তিনের ডিফেন্স সিস্টেমের অভাব। এয়ারস্ট্রাইকগুলোর কারণে ১৩ তলার আবাসিক ভবন পর্যন্ত ধূলিসাৎ হয়ে যায়। সৌভাগ্যবশত, আগেই বেরিয়ে যেতে পেরেছিলেন অধিবাসীরা। কিন্তু তাই বলে সবাই এত ভাগ্যবান নয়। প্রতিনিয়তই আক্রমণ চলছে আর ইসরাইলের মতে, হামাস না থামলে তারা যুদ্ধে যেতেও প্রস্তুত। যদি এটাকে ইতোমধ্যে যুদ্ধ না ডাকা হয় আরকি।

কিন্তু এই কাউন্টার-অ্যাটাকে কেন কিছু হয় না ইসরাইলের? কারণ তাদের আছে অসম্ভব শক্তিশালী ‘আয়রন ডোম’ নামের এয়ার ডিফেন্স। এখন বলি সেটি কীভাবে কাজ করে।



আয়রন ডোম থেকে মিসাইল ইন্টারসেপ্টর ছোঁড়া হচ্ছে

ইসরাইলের নানা জায়গা জুড়ে বিরাজমান জালের মতো রাডার আর মিসাইল লক্ষ্যারের সমষ্টি এই আয়রন ডোম। কোনো জায়গা থেকে মিসাইল উৎক্ষেপিত হলে সাথে সাথে আয়রন ডোম সেটিকে চিহ্নিত করে এবং হিসেব গুরু করে এটি কোথায় গিয়ে আঘাত করবে, তা বের করতে। যদি সেটি কোনো জনবিরল এলাকায় পড়বে বলে নিশ্চিত হওয়া যায়, তাহলে আয়রন ডোম কিছুই করে না। আর যদি দেখা যায় এটি মানুষ অধ্যুষিত এলাকার দিকে আসছে, তাহলে সংশ্লিষ্ট এলাকা বা যেখান থেকে সুবিধা, সেখান থেকে কাউন্টার মিসাইল উৎক্ষেপিত হয়। সেগুলো আকাশে গিয়ে পিছু নেয় ছুটে আসা মিসাইলের এবং সেটিকে আকাশেই ধ্বংস করে দেয়। ২০১১ সালে যাত্রা শুরুর পর থেকে ৯০% মিসাইলকে ইন্টারসেপ্ট বা মাঝে আকাশে ধ্বংস করে দিয়েছে আয়রন ডোম। প্রতিটি রকেটের পেছনে ইসরাইলের খরচ ২০,০০০ ডলার। এই বড় প্রক্রিয়াটি মাত্র কয়েক সেকেন্ডের মাঝেই সমাপ্ত হয়। কিন্তু এই প্রথমবারের মতো হামাস এত রকেট একবারে ছুঁড়ছে যে, আয়রন ডোমকেও হিমশিম খেতে হয়েছে; এই অতিমাত্রায় মিসাইল ছোঁড়াই আয়রন ডোমের দুর্বলতা আপাতত। যার ফলে সেই ৭ জন ইসরাইলির মৃত্যু হয় এখন পর্যন্ত। অর্থাৎ আয়রন ডোমের ফাঁক ফাঁক দিয়ে ঢুকে পড়েছে হামাসের মিসাইল। যে ভিডিও ক্লিপগুলো ছড়িয়ে পড়ে, সেগুলো ভালো করে দেখলে বোঝা যায় আয়রন ডোমের মিসাইলগুলো কীভাবে উৎক্ষেপিত হয়ে ইনকামিং মিসাইলগুলো ধ্বংস করে দিচ্ছে।

আয়রন ডোমকে হিব্রুতে ডাকা হয় ‘কিফাত বারজেল’ (קִיפָּת בָּרַזֵּל)। রাফায়েল অ্যাডভান্সড ডিফেন্স সিস্টেমস আর ইসরাইল অ্যারোস্পেসের যৌথ উদ্যোগে এটি নির্মিত। ইব্রাহিম (আ) ও তার পুত্র ইসহাক (আ) এর স্মৃতিবিজড়িত বিরশেবা এলাকায় ইসরাইল এটি প্রথম লঞ্চ করেছিল ২০১১ সালে। ইহুদী ধর্মীয় নামের সাথে মিল রেখে নিজেদের সামরিক জিনিসগুলোর নাম দিতে দেখা যায় ইসরাইলকে। যেমন, গোলাঘাত বা জালুতের সাথে যুদ্ধে ডেভিড বা দাউদ (আ) গুলতির সাহায্যে পাথর ছুঁড়ে মেরে তৎকালীন ফিলিস্তিনিদের ওপর বনী ইসরাইলের বিজয় নিশ্চিত করেন। সেই ঘটনা থেকে আয়রন ডোমের চাইতেও শক্তিশালী ডিফেন্স আর অফেন্স সিস্টেম বানিয়ে চলেছে ইসরাইল, যার একটির নাম ‘কেলা ডেভিড’ (קלָה דָּבִיד) বা ‘দাউদের গুলতি’ (২০১৭), একে তারা আবার ‘জাদুদগ’-ও ডাকে। এরকম অনেকগুলো ডিফেন্স সিস্টেমের একটি হলো আয়রন ডোম। আপাতত ৭০ কিলোমিটার দূর থেকে আসা মিসাইল থেকে ইসরাইলকে নিরাপত্তা দিলেও, ভবিষ্যতে সেটি ২৫০ কিলোমিটার পর্যন্ত করার পরিকল্পনা আছে তাদের।

এখানে আরেকটা বিষয় বলা যায়, যুক্তরাষ্ট্র শুরুতে আয়রন ডোম কাজ করবে না বললেও, ২০২১ সালে তারাই ইসরাইল থেকে দুটো আয়রন ডোম সিস্টেম

ইসরাইলের উত্থান-পতন ২৫৩

নিয়েছে বসানোর জন্য। শুধু যুক্তরাষ্ট্র নয়, আয়রন ডোম নিতে চায় এক আরব দেশও! ২০২২ সালের ফেব্রুয়ারির খবর হলো, ইয়েমেনি হুসি বিদ্রোহীদের মিসাইল আক্রমণ সামাল দিতে ইসরাইলের কাছ থেকে আয়রন ডোম নিতে চায় সংযুক্ত আরব আমিরাত। বর্তমানে দক্ষিণ কোরিয়ার যে মিসাইল সিস্টেম তারা ব্যবহার করে আসছে, তা দিয়ে এখন তাদের আর চলছে না। তাই আপগ্রেড দরকার। এতে অবশ্য ইসরাইলের লাভ। কারণ আমিরাত যদি এ সিস্টেম নেয়, তবে ইরান থেকে কোনো আক্রমণ ইসরাইলের দিকে আসছে কি না, সেটি আরও আগে জেনে যাবে ইসরাইল। কেবল আমেরিকা ও আরব আমিরাতই নয়, ইউক্রেনও আয়রন ডোম চেয়েছে ইসরাইলের কাছে, যা জানা যায় ২০২২ সালের ফেব্রুয়ারিতে, কিন্তু রাশিয়া-ইউক্রেন দ্বৈরথে ইসরাইল কোনো ক্রমেই জড়িত হতে চায় না বিধায় তারা না করে দিয়েছে।

প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, আরব দেশগুলোর সাথে সম্পর্ক স্বাভাবিক করার চেষ্টা করে চলেছে ইসরাইল। ফেব্রুয়ারি ২০২২ পর্যন্ত যে আরব দেশগুলো ইসরাইলকে স্বীকৃতি দিয়েছে, সেগুলো হলো মিসর, জর্ডান, বাহরাইন, সুদান, মরক্কো এবং সংযুক্ত আরব আমিরাত।



দুবাই এক্সপোর ইসরাইল স্টলে র্যাবাই ইহুদীদের হানুকা উদযাপন উদ্বোধন করছেন; ছবি: ইউএই জ্যুয়িশ কমিউনিটি

যাই হোক, যা বলছিলাম— ২০২১ সালের ৬ থেকে ২১ মে পর্যন্ত চলা এ রক্তক্ষয়ী সংঘাতে ২৮২ জন ফিলিস্তিনি মারা যায়, চলে যেতে হয় ৭২,০০০ জনকে। আর এরপর চলে গণশ্রেফতার। ২৮২ জনের বিপরীতে ইসরাইলের মারা

যায় ১২ জন। তবে অবাক করা ব্যাপার, অন্যবার যেখানে বেশিরভাগ পশ্চিমা মিডিয়াই চুপ থাকে, সেখানে এবার গাজা আক্রমণ নিয়ে বেশ প্রতিবাদমুখর দেখা যায় তাদের।

The New York Times

© 2021 The New York Times Company

NEW YORK, FRIDAY, MAY 28, 2021

They Were Just Children

At least 67 people under age 18 in Gaza and two in Israel were killed during this month's conflict, according to initial reports. They had wanted to be doctors, artists and leaders. Read their stories. Pages A10-11.



PRESIDENT A \$6 TRILL AIMED AT

*Sweeping Budget Seen
Not Seen Since*

By JIM TAN

WASHINGTON — President Biden will propose a \$6 trillion budget on Friday that would take the United States to its highest sustained levels of federal spending since World War II as he looks to fund a sweeping economic agenda that includes large new investments in education, transportation and fighting climate change.

Documents obtained by The New York Times show that the budget request, the first of Mr. Biden's presidency, calls for total spending to rise to \$6.2 trillion by 2031, with deficits running above \$1.3 trillion throughout the next decade. The growth is driven by Mr. Biden's two-part agenda to upgrade the nation's infrastructure and substantially expand the social safety net, contained in his American Jobs Plan and American Families Plan, along with other planned increases in discretionary spending.

The proposal for the 2022 fiscal year and ensuing decade shows the sweep of Mr. Biden's ambitions to wield government power to help more Americans attain the comforts of a middle-class life and to lift U.S. industry to better compete globally.

The levels of taxation and spending in Mr. Biden's plans would expand the federal fiscal footprint to levels rarely seen in the postwar era to fund investments that his administration says are crucial to keeping America competitive. That includes money for roads, water pipes,

COUNTEROFFER Senate Republicans
worth a small fraction of President Biden's

নিউ ইয়র্ক টাইমস পত্রিকা ছাপায় এ ছবি; ২৮ মে, ২০২১

প্রশ্ন হলো, কেন অনেক দেশই তাদের এমন কাণ্ড কারখানা সমর্থন করে? প্রো-ইসরাইলি পলিটিক্যাল একটি প্রভাব কাজ করে অনেক দেশেই। উদাহরণ হিসেবে বলা যায় আইপ্যাকের কথা, American Israel Public Affairs Committee। ওয়াশিংটন ডিসিতে আইপ্যাক বার্ষিক কনফারেন্স করে, সেখানে যোগদান করেন উচ্চপদস্থ রাজনীতিবিদ এবং প্রেসিডেন্টরা। ইসরাইলি প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী বেনজামিন নেতানিয়াহু সেখানে নিয়মিত যেতেন। প্রো-ইসরাইল গ্রুপগুলো ভালো ফান্ডিং করে, দান করে, স্পন্সর করে। এর ফলে বিজয় লাভের পর আসলে তাদের বিরুদ্ধে যেতে পারেন না বা চান না নির্বাচিতরা। আমেরিকার ক্ষেত্রে দুই পক্ষকেই কিন্তু তারা দান করে। যেমন, ২০২০ সালের ক্যাম্পেইনে ৬৩% গিয়েছিলো ডেমোক্র্যাটদের কাছে, ৩৬% রিপাবলিকান।



আইপ্যাকের সম্মেলনে তৎকালীন ইসরাইলি প্রধানমন্ত্রী নেতানিয়াহু

জাতিসংঘের ১৯২টি দেশের মাঝে ১৬৪টি দেশের সাথেই কূটনৈতিক সম্পর্ক আছে ইসরাইলের। আরব দেশগুলো এখন ইসরাইলের সাথে যে সম্পর্ক স্বাভাবিক করছে, তা তো আগেই বললাম। আর আগে থেকেই প্রতিবেশী দেশ মিসর ও জর্ডান তো ছিলই। ইসরাইলের নেতৃত্বে বদল এসেছে বেশিদিন হয়নি; বেনইয়ামিন নেতানিয়াহু ১৯৯৬-৯৯ এবং ২০০৯-২০২১ সাল পর্যন্ত মোট ১৫ বছর ইসরাইলের প্রধানমন্ত্রী ছিলেন, এবং শেষমেশ দুর্নীতি মামলায় অপসারিত হন বলা যায়। এ বই লেখার সময় ইসরাইলের প্রধানমন্ত্রী নাফতালি বেনেট।

সুদূর অতীত থেকে শুরু করে বর্তমান (এ বই লেখা শেষ করার সময়কাল অর্থাৎ ফেব্রুয়ারি ২০২২) পর্যন্ত এই হলো ইসরাইলের উত্থান-পতনের সংক্ষিপ্ত গল্প। হয়তো এটা ‘উত্থান-পতন’ নয়, বরং পতন-উত্থানের ইতিহাস।

বি. দ্র. এ ইতিহাস পড়তে গিয়ে আরও প্রশ্ন মাথায় জাগতে পারে, বা কিছু জিজ্ঞাসার উত্তর না পেয়ে থাকতে পারেন। এ বইয়ের শেষ দিকে পাঠকের প্রশ্নোত্তর অংশে গিয়ে সবগুলো পড়ার অনুরোধ থাকলো। হয়তো আপনার না-করা প্রশ্নটি অন্য কেউ করে ফেলেছেন!

অধ্যায় ২৮

ইহুদী এসকাটোলজি



কটমটে একটি নাম দিয়ে দিলাম অধ্যায়ের। ইতিহাস তো শেষ, বর্তমানও বলে ফেললাম। এবার তাই ভবিষ্যতের পালা। কিন্তু ভবিষ্যৎ তো বলা যায় না!

কিন্তু তারপরও যুগে যুগে নানা ধর্মে ভবিষ্যদ্বাণী হয়ে এসেছে, আসছে দিনগুলোতে কী হবে না হবে, তা নিয়ে। কিন্তু সবচেয়ে বেশি আলাপ হয়েছে দুনিয়া ধ্বংসের সময় এগিয়ে এলে কী হবে, সেই বিষয়ে। বিশ্বাস করুন আর নাই করুন, এ নিয়ে এক আলাদা ধর্মবিদ্যাই আছে! গ্রিক থেকে ইংরেজিতে এসে সেই বিদ্যার নাম হয়েছে এসকাটোলজি (Eschatology), যার মানে ‘অন্তিম সময়ের বিদ্যা’। গ্রিক শব্দ ‘এসকাটোস’ (ἔσχατος) মানে ‘অন্তিম’। ১৮৪৪ সালে এ শব্দটি প্রথম ব্যবহৃত হয়। এ অধ্যায়ে আমরা মূলত জানার চেষ্টা করব সেমিটিক এসকাটোলজি নিয়ে, অর্থাৎ শেষ সময় নিয়ে এ ধর্মগুলো কী বলে থাকে, বিশেষ করে ইহুদী ধর্ম, যেহেতু তারাই আমাদের বইয়ের বিষয়বস্তু।

ইহুদী ধর্মে শেষ সময়কে বলা হয় ‘আহারিত হা-ইয়ামিম’ (אֲחֵרֵית הַיָּמִים), তাদের পবিত্র তানাখ গ্রন্থে বারবার এসেছে এ শব্দটি। অন্তিম সময় বা এন্ড অফ টাইমস নিয়ে ইহুদীদের যত ভবিষ্যদ্বাণী, তার মূল উৎস হলো তানাখ বা হিব্রু বাইবেল। নির্বাসনের আগের নবীদের কিতাবে তারা এগুলোর খোঁজ করে, বিশেষ করে ইশাইয়া (আ), ইয়ারমিয়া (আ), হিজকীল (আ) এবং মূসা (আ)।

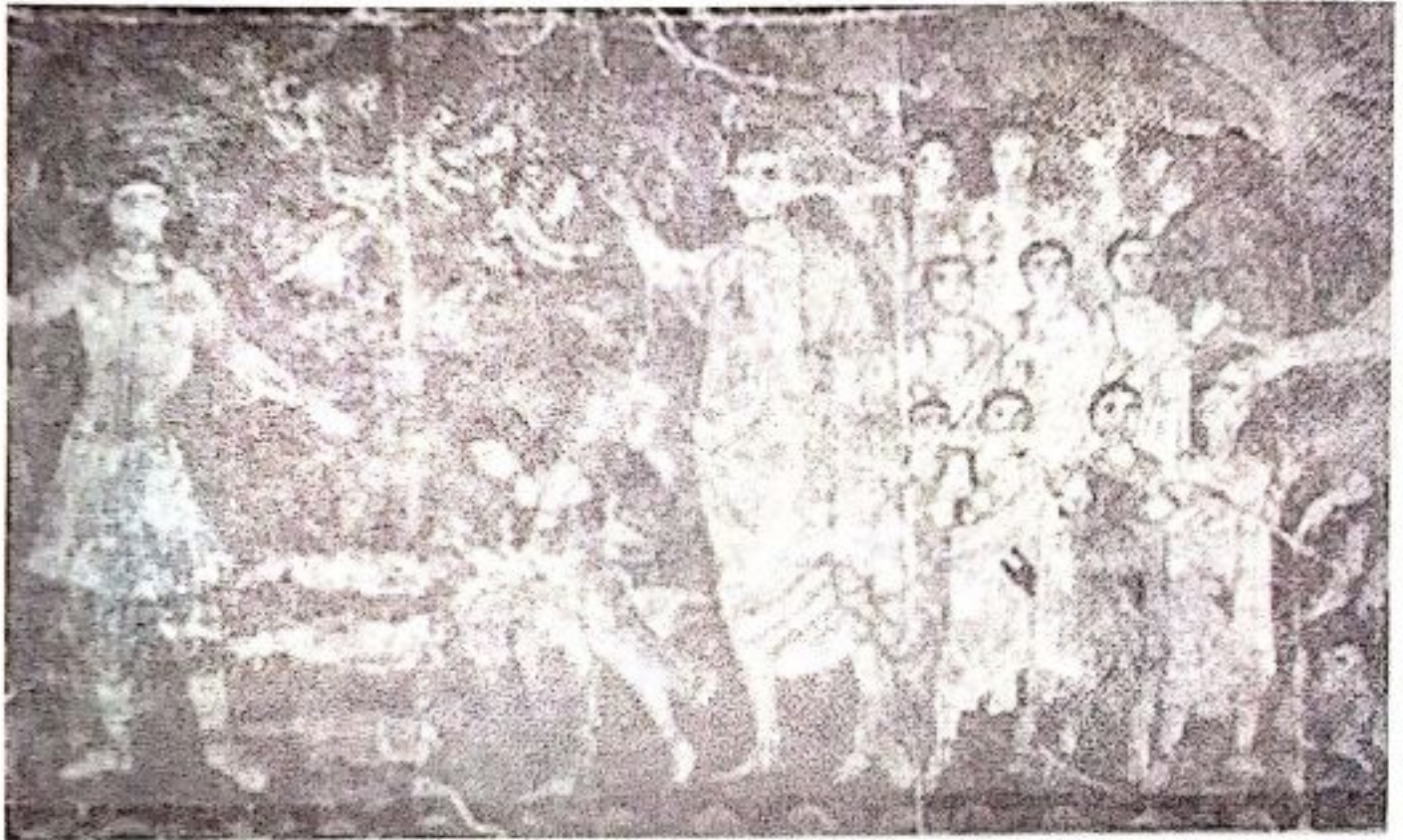
ইহুদীদের হিজকীলের কিতাব থেকে ভবিষ্যদ্বাণী হলো, ইহুদীদের নির্বাসন শেষে তারা যখন ঘরের ছেলে ঘরে ফিরে আসবে, তখন অনুষ্ঠিত হবে ইয়াজুজ

মাজুজের যুদ্ধ। ইয়াজুজ মাজুজ ইসলাম ছাড়াও অন্যান্য ধর্মে কীভাবে উল্লেখিত, তা বিস্তারিত জানতে পড়ুন আমার 'অতিপ্রাকৃতের সন্ধানে' বইটি। মধ্যযুগীয় র‍্যাবাই এবং তাওরাত বিশারদ দাউদ কিমহির মতে, এই যুদ্ধ অনুষ্ঠিত হবে জেরুজালেমে, বা জেরুজালেমকে ঘিরে। তবে হাসিদী ইহুদীরা মনে করতো, ইহুদীদের দুঃখ মোচন হবার আগ পর্যন্ত এ যুদ্ধ হবে না।



হিব্রু বাইবেলের পাতা, দাউদ কিমহির সংগ্রহ থেকে

ইহুদী ভবিষ্যৎবাণী অনুযায়ী, আল্লাহ দাউদ (আ)-এর বংশধারাকে আবার সিংহাসনে বসাবেন, রাজত্ব দেবেন। আবার দাঁড়াবে বাইতুল মুকাদ্দাস বা থার্ড টেম্পল অফ সলোমন। দাউদের বংশধারা থেকে আগত মাসীহ বা মেসায়ী (খ্রিস্ট) ইহুদীদেরকে নেতৃত্ব দেবেন এবং এক মসীহ যুগের (মেসায়ানিক এজ) সূচনা করবেন। সেই যুগ হবে শান্তি ও সমৃদ্ধির। সারা পৃথিবীর সকল মানুষ ইহুদীদের ঈশ্বরকে এক ঈশ্বর বলে মেনে নেবে। অতঃপর কিয়ামত হবে এবং আল্লাহ সকল মৃতকে জীবিত করবেন, শুরু হবে নতুন জীবন।



ইহুদী সিনাগগে পুনরুত্থানের ছবি

মুসলিমদের মাঝে সবচেয়ে বেশি জিজ্ঞাসিত একটি প্রশ্ন হলো, ইহুদীদের মাসিহ কি দাজ্জাল? ইসলামি বিশ্বাস অনুযায়ী, মাসিহ আদ-দাজ্জাল বা ভণ্ড মাসিহের আগমন ঘটবে শেষ যুগে, যাকে হত্যা করবেন ঈসা (আ), যিনি খ্রিস্ট ও ইসলাম ধর্ম অনুযায়ী প্রকৃত মাসিহ বা খ্রিস্ট। হিব্রু মাসিয়াহ (מָשִׁיחַ) শব্দের আক্ষরিক অর্থ ‘যার গায়ে মেখে দেয়া হয়েছে’, অর্থাৎ রাজ-অভিষেকের সময় অভিষিক্তের শরীরে তেল মাখিয়ে দেয়া হতো, তাই এর ভাবার্থ হলো ‘ত্রাণকর্তার পদে যিনি অভিষিক্ত’, আরবিতে আল-মাসিহ (المسيح)। ইহুদী ধর্মে আসলে চারজন মাসিহের উল্লেখ আছে। এরা হলেন- ‘দাউদের বংশের মাসিহ’, ‘ইউসুফের বংশের মাসিহ’, ইলিয়াস (আ)- যাকে ইহুদী মতে জীবিত আকাশে উঠিয়ে নেয়া হয়েছিল, এবং সর্বশেষ আসবেন একজন ইমাম, যাকে কেবল ‘সৎ ইমাম’ বলে উল্লেখ করা হয়েছে। আর একজন আসবে ভণ্ড মাসিহ, যাকে হত্যা করবেন দাউদের বংশের মাসিহ। কে কোন সময় আসবেন, তা নিয়ে আছে

বিতর্ক। সাধারণ বিশ্বাস হলো, প্রথমে ইউসুফের বংশের মাসিহ আসবেন, তিনি ইসরাইলের সন্তানদের একত্রিত করবেন, তাদের নিয়ে যাবেন জেরুজালেমে। জেরুজালেম বিজয়ের পর তিনি বাইতুল মুকাদ্দাস বানাবেন, এবং নিজের রাজত্ব শুরু করবেন। তখন ইয়াজুজ মাজুজ কিংবা দাজ্জালের আগমন হবে। কোনটা আগে হবে, তা বলা যায় না।

ইহুদী ধর্মে এই দাজ্জাল বা খ্রিস্টবিরোধী চরিত্রের নাম আরমিলাস (ܐܪܡܝܠܐܣ)। আরমিলাস এসে পুরো পৃথিবী জয় করে নেবে খুব কম সময়ে, এরপর জেরুজালেমে তার রাজধানী করবে এবং সেখান থেকে রাজত্ব করবে এবং নিজেকে খোদা দাবিও করবে। এবং এটি সম্পন্ন করতে গিয়ে আরমিলাস হত্যা করবে ইউসুফের বংশের মাসিহকেই, তার দেহ কবর না দেয়া অবস্থায় পড়ে থাকবে জেরুজালেমে। তখন ফেরেশতারা তার মৃতদেহ আড়াল করে রাখবেন, যতক্ষণ না দাউদের বংশের মাসিহের আগমন না ঘটে। তিনি আসার পর ইউসুফের বংশধারার মাসিহকে পুনরুজ্জীবিত করা হবে। ইলিয়াসও (আ) আসবেন দাউদের বংশের মাসিহের সাথে। এই মাসিহ নামার সময় ফেরেশতা পরিবেষ্টিত হয়ে নামবেন এবং তিনি আরমিলাসকে হত্যা করবেন কেবল তার শ্যেন দৃষ্টি বা নিঃশ্বাসের আঘাতেই। এই দাউদের বংশের মাসিহ হলেন আসল মাসিহ, যাকে ইহুদীরা আরামায়িকে ‘মালকা মেশিহা’ বা হিব্রুতে ‘মেলেখ মাশিয়াহ’ (রাজা মাসিহ) বলে থাকে।

ইসলামের নানা ভবিষ্যদ্বাণীর সাথেই ইহুদীদের কিছু ভবিষ্যদ্বাণী মিলে যায়, চরিত্রগুলোর গড়মিল আছে যদিও। যেমন, ইয়াজুজ মাজুজের আগমনের কথা রয়েছে ইসলামেও। “আর যে জনপদকে আমি ধ্বংস করে দিয়েছি, তার অধিবাসীদের ফিরে না আসা অবধারিত। যে পর্যন্ত না ইয়াজুজ ও মাজুজকে বন্ধন মুক্ত করে দেয়া হবে এবং তারা প্রত্যেক উচ্চভূমি থেকে দ্রুত ছুটে আসবে।” (কুরআন, সূরা আশ্বিয়া, আয়াত ৯৫-৯৬)

আবু দাউদ শরিফের একটি হাদিসে এসেছে, মুয়ায ইবনে জাবাল (রা)-কে রাসুল (সা) বলছেন, “জেরুজালেমের রাজ্য বিকাশমান হবে যখন ইয়াসরিবের অবস্থা করুণ, ইয়াসরিবের অবস্থা করুণ হবে যখন মালহামা (শেষ যুদ্ধ) আসবে, আর মালহামার সাথে আসবে কনস্ট্যান্টিনোপল জয়, আর তার সাথে আসবে দাজ্জালের আগমন। রাসুল (সা) নিজের উরু বা কাঁধে চাপড় দিয়ে বললেন, তুমি (মুয়ায) আমার সামনে বসে আছ তা যেমন সত্য, আমার এ কথাগুলোও তেমন সত্য।” (আবু দাউদ ৪২৯৪, ৩৯/৪ বা ৩৮/৪২৮১)

আরেকটি হাদিসে এসেছে, “আমার উম্মাতের একটি দল হকের ওপর বিজয়ী থেকে কিয়ামত পর্যন্ত লড়াই করতে থাকবে। অতঃপর ঈসা ইবনে মারইয়াম (আ)

অবতরণ করবেন। তাকে দেখে মুসলমানদের আমির বলবেন, ‘আসুন! আমাদেরকে নিয়ে নামাযের ইমামতি করুন।’ ঈসা (আ) বলবেন, ‘না; বরং তোমাদের আমির তোমাদের মধ্যে হতেই (হবে)।’ এই উম্মাতের সম্মানের কারণেই তিনি এ মন্তব্য করবেন।” (সহিহ মুসলিম)

এরকম হাদিসগুলো বর্ণনা করে শেষ করা যাবে না সংক্ষেপে, তবে যে যুদ্ধের কথা বলা হচ্ছে অর্থাৎ মালহামা (الملاحمة الكبرى), তা অন্যান্য ধর্মে আর্মাগেডন (Armageddon) নামে পরিচিত। এটি আসলে কোনো মূল ইংরেজি শব্দ নয়, বরং হিব্রু থেকে এসেছে। মূল শব্দটি ছিল ‘হার মেগিদো’ (הר מגידו) অর্থাৎ মেগিদো পাহাড়। ইহুদী ভবিষ্যদ্বাণী অনুযায়ী, মেগিদো টিলার কাছেই সর্বশেষ মহাযুদ্ধের বাহিনীগুলো জড়ো হবে। এজন্যই এর নাম আর্মাগেডন।



আজকের ইসরাইলের মেগিদো টিলা

অনেক গোঁড়া ইহুদীর মাঝেই ভবিষ্যদ্বাণী ত্বরান্বিত করার একটি প্রবণতা থাকে, আর সেই সূত্রে বলতে হয় ‘পবিত্র গাভীর ইহুদী বৃত্তান্ত’। এ অদ্ভুত বিষয়ে অনেকের নানা জিজ্ঞাসা থাকে আমার কাছে। মসীহবাদী ইহুদীদের সবচেয়ে বড় স্বপ্ন অপেক্ষা প্রতীক্ষা যা নিয়ে, তার পেছনে আছে এক পবিত্র লাল গরু। কেন?

ব্যাপারটা খুলে বলা যাক। ইহুদীদের তাওরাত কিতাব বা অন্যান্য নবীদের কিতাব বলে বিশেষ এক নবী আসবেন। আর অন্তত একজন মাসিহ (Messiah) আসবেন। সেই নবী কে, সেটি এই বইয়ের আলোচ্য বিষয় নয়— এ নিয়ে লিখতে হলে অনেক বড় পরিসরে আলোচনা করতে হবে। কিন্তু সেই মেসায়্যা (ক্রাইস্ট) কে, সেটা বড়ই গুরুত্বপূর্ণ। নবী নিয়ে ইহুদীদের মাথাব্যথা নেই।

হযরত ঈসা (আ) যে সেই মেসায়া বা খ্রিস্ট, সেই বিষয়ে অন্য দুই সেমিটিক ধর্ম ইসলাম আর খ্রিস্ট ধর্মবিশ্বাসে কোনোই দ্বিমত নেই। বাগড়াটা ইহুদী ধর্মবিশ্বাসে। কারণ, ইহুদী বিশ্বাসে যীশু হলেন ভগ্ন মেসায়া, অনেক ভগ্নের একজন। তাদের যুক্তি যে নেই, তা নয়, সেই যুক্তি হলো, কিং ডেভিড অর্থাৎ দাউদ (আ) এর বংশধর সেই মেসায়া এসে জেরুজালেম থেকে দুনিয়া শাসন করবেন, বাইতুল মুকাদ্দাস তথা টেম্পল অফ সলোমন হবে তার শাসনকেন্দ্র। তার কিছুই করে দেখাতে পারেননি যীশু খ্রিস্ট। তার ওপর, তিন ধর্মমতেই, স্বয়ং ইহুদীরাই যীশুকে রোমানদের দ্বারা ক্রুশে চড়িয়ে মৃত্যুদণ্ডের বিধানের ব্যবস্থা করে। ইহুদীরা একজন মৃত ও ব্যর্থ কাউকে খ্রিস্ট মানতে নারাজ। সুতরাং, খ্রিস্টের আগমন এখনও বাকি। যিনি আসবেন, এসে ইসরাইলকে সেরা বানাবেন, টেম্পল অফ সলোমন নির্মাণ করবেন আবার, সেখান থেকে দুনিয়াজুড়ে কর্তৃত্ব করবেন, যা বললাম এতক্ষণ আরকি। যে সব ইহুদী তখন যীশুর বাণীতে সাড়া দেয়, তারা পরিচিত হয় যীশুর গ্রামের বাড়ি নাসরতের (নাজারেথ) নামে-নাসারা, নাজারিন (অন্য এক সূত্রে, সাহায্যকারী অর্থে নাসারা)। এই ইহুদী আর নাসারাদের খ্রিস্ট দ্বন্দ্বের মাঝেই হাজির হয় ইসলাম। ইসলামেও যীশুই খ্রিস্ট। কিন্তু ইহুদীদের নিজস্ব হিসাবানুসারে যীশু তো আসলেই অনেক কিছু পূরণ করেননি, অন্তত নবী হিজকীল (আ) আর ইশাইয়া (আ) মেসায়া সম্পর্কে যা যা ভবিষ্যৎবাণী করে রেখে গিয়েছিলেন, সেগুলোর মাঝে এক দাউদের বংশ ছাড়া বাকিগুলোর পূরণ হওয়াটা জরুরি তাদের মতে।

এখানেই ঘটনার শুরু।

ইহুদী ধর্ম যীশুর ব্যাপারে অবশ্যই আর কিছুই কখনও বলেনি, এক অবিবাহিতা নারীর অবৈধ সন্তান ও ভগ্ন মেসায়া দাবিদার- এটুকুই ইহুদী ধর্মে তার পরিচয়। অন্যদিকে, ইসলাম ও খ্রিস্টধর্ম আরেকটি ব্যাপারে বেশ একমত, সেটি হলো, যীশুর দ্বিতীয় আগমন। তিনি আসবেন এবং শেষ যুদ্ধ করবেন ভগ্ন মেসায়ার বিরুদ্ধে, যাকে খ্রিস্টানরা বলে অ্যান্টিক্রাইস্ট, আর মুসলিমরা বলে মাসিহে দাজ্জাল (“ভগ্ন মসীহ”)। তিনি তারপর জেরুজালেম থেকে শান্তির রাজত্ব কায়েম করবেন, ইত্যাদি। এদিক থেকে তার খ্রিস্টত্বের শর্ত পূরণ হয়ে যায়। ইসলামে অবশ্য কোনো গ্রন্থে বা কোথাও এই শর্ত পূরণ নিয়ে কথা হয়নি, তবে ইহুদী খ্রিস্টান ধর্ম আবার এ ব্যাপারে বেশ সতর্ক। প্রশ্ন হলো, সেই আগমনটা কবে? ইহুদীরা যদি যীশুকে ভগ্ন বলে, তাহলে অপরজন যাকে বাকি দুই ধর্ম ভগ্ন বলবে, তাকেই ইহুদীদের সত্য বলে মেনে নেবার কথা। এবং এটাই ইসলামি এসকাটোলজি বলে, ইহুদীরা সেই ভগ্ন মেসায়ার অনুসারী হবে দলে দলে। কথা হলো, এই সত্য মিথ্যা মেসায়ার আগমন বিষয়ে ইহুদী এসকাটোলজি কী বলে?

ইসরাইলের উত্থান-পতন ২৬৩

খ্রিস্টপূর্ব প্রায় অর্ধসহস্র বছর আগে প্রথমবারের মতো বাইতুল মুকাদ্দাস বা টেম্পল অফ সলোমন ধ্বংস করে দেন ব্যাবিলনের সম্রাট নেবুকাদনেজার, ইহুদী কিতাব তাই বলে। ইহুদীরা দাসবন্দী অবস্থা থেকে আবার ইসরাইলে ফিরে, বানায় সেকেন্ড টেম্পল। এই বাইতুল মুকাদ্দাস এবার ৭০ সালের দিকে আবার ভেঙে দিয়ে যায়, এবার ভাঙে রোমানরা। সুতরাং, মেসায়ার আগমন সত্য হতে হলে, তাকে টেম্পল অফ সলোমন থেকে রাজত্ব করতে হলে, ওই স্থানে থার্ড টেম্পল প্রয়োজন, যা অরিজিনাল বাইতুল মুকাদ্দাসের আর্কিটেকচারাল ডিজাইনে নির্মিত হবে। ডিজাইন সংরক্ষিত আছে ভালোভাবেই। সেটা সমস্যা না। কিন্তু থার্ড টেম্পল কিন্তু যেন তেন সময় বানানো যাবে না! থার্ড টেম্পল নির্মাণের সংকেত কী হবে জানেন?

ইহুদী ধর্মগ্রন্থ বলে থাকে, টেম্পলের পবিত্রতার জন্য প্রয়োজন এক লাল গরুর দেহভস্ম। এক নিখুঁত লাল গরুর। শত শত বছর আগে এই একই রকম গরুর খোঁজে হন্যে হয়ে গিয়েছিলো ইহুদীরা। থার্ড টেম্পলকে পবিত্র করে ব্যবহার উপযোগী করতে যা যা প্রয়োজন, তার জন্য নিরলস কাজ করে যাচ্ছে দ্য টেম্পল ইনস্টিটিউট। সবই প্রস্তুত, কাজ শুরু হলে শেষও হয়ে যাবে। কিন্তু গরুর খোঁজ কই?

এ গরু হতে হবে— “লালের নিখুঁত উদাহরণ। যদি দুটো লোমও পাওয়া যায়, যেটা একটু হালকা লাল, তাহলেও সেই গরু বাদ, অন্য রঙ তো পরের কথা। খুরের রংও হতে হবে লাল। বয়স তিন থেকে চার বছর, এর কম হবে না। সূচ পরিমাণ কোনো ক্ষতও থাকতে পারবে না। কোনোদিন তাকে দিয়ে কোনো কাজ করানো হয়নি, এমনটি হতে হবে। উৎসর্গ বাইতুল মুকাদ্দাসে নয়, জেরুজালেমের জলপাই পাহাড়ে হবে।” (তাওরাতের গণনাপুস্তক)

১৯৯৭ সালে টেম্পল ইনস্টিটিউট এক লাল গাভীর সন্ধান পায়, কিন্তু সেই গাভীর ইতিহাস ঘাঁটতে গিয়ে খুঁত পাওয়া যায়। একই ঘটনা ঘটে ২০০২ সালেও, সেবারের লাল গরুরও পরে খুঁত ধরা পড়ে। গরুকে আবার ইসরাইলি হতে হবে, এমন শর্তের কথাও শোনা যায়। ১৯৮৭ সালে টেম্পল ইনস্টিটিউট প্রতিষ্ঠিত হয় থার্ড টেম্পল নির্মাণের উদ্দেশ্যে। গত দুহাজার বছরেও কোনো নিখুঁত লাল গরুর জন্ম হয়নি বলে তারা জানায়। ২০১৮ সালে এক লাল গরুর জন্মের সন্ধান তারা পায়, যা আগামী কয়েক বছর চোখে চোখে রাখা হবে বলে জানানো হয়, কোনো খুঁত ধরা পড়ে কি না, দেখার জন্য। হিব্রুতে এ গরুকে বলা হয় “পারাহ আদুমাহ” বা লাল গরু (Red Heifer)। তবে বিকল্প হিসেবে জেনেটিক ইঞ্জিনিয়ারিংয়ের মাধ্যমে নিখুঁত লাল গরু উৎপাদনের চেষ্টাও যে করা হচ্ছে না, তা নয়। এ সবই কেবল থার্ড টেম্পল নির্মাণের পথ খুলে দেবার প্রচেষ্টা, যেন আগমন ২৬৪ ইসরাইলের উত্থান-পতন

করতে পারেন মেসায়ী। সাদিয়া গাওনের মতো ইহুদী ব্যাখ্যাবিশারদ হিব্রু ‘আদুমাহ’ শব্দটিকে লাল নয় বরং হলদে অনুবাদ করেছেন। ইহুদী পণ্ডিতগণ অনেকেই ভেবেছেন, কেন এই গরু এত জরুরি। কিন্তু কোনো উত্তর না পেয়ে শেষমেশ এটিকে ঐশী আদেশ হিসেবেই মেনে নিয়েছেন তারা, যার উত্তর স্রষ্টা ছাড়া কেউ জানে না।

বর্তমানে যে স্থানে সোনালি গম্বুজের ডোম অফ দ্য রকের অবস্থান, সেখানেই ফার্স্ট এবং সেকেন্ড টেম্পল অফ সলোমন তথা বাইতুল মুকাদাসের অবস্থা ছিল অন্তত ৭০ সাল পর্যন্ত। এটি গুঁড়িয়ে থার্ড টেম্পল বানাতেই মেসায়ার আগমনের ভবিষ্যৎবাণী পূর্ণ হবে, এমনটাই প্রত্যাশা সেই ইহুদীদের।

বহুকাল আগে যখন নিখুঁত গরুর খোঁজ করছিল মরুচারী ইহুদী জাতি এবং প্রশ্নবাণে জর্জরিত করেছিল হযরত মূসা (আ)-কে, সে ঘটনাকে পবিত্র কুরআনেও (২:৬৭-৭১) উল্লেখ করা হয়েছে, সেখানে গরুর রঙ লাল নয়, হলুদ। এই ঘটনার কারণে পবিত্র কুরআনের দ্বিতীয় সুরার নামকরণ করা হয় “বাকারা” বা “গরু”।

২০২২ সালের ৮ ফেব্রুয়ারি বিবিসির খবরে আসে, যেহেতু জেরুজালেমের টেম্পল মাউন্ট এলাকায় ইহুদীদের প্রার্থনা করতে ঢোকা বলতে গেলে নিষিদ্ধই, সেহেতু অনেকেই মুসলিম সেজে সেখানে ঢুকে পড়ে; এজন্য তারা মুসলিমদের নামাজ পড়ার রীতিনীতিও শিখে নেয়। এদের সাথে কথা বলে জানা যায়, তাদের প্রত্যাশা এখানকার মসজিদ দ্রুত ভাঙা হবে, গড়ে তোলা হবে থার্ড টেম্পল, যেন ভবিষ্যৎবাণী ত্বরান্বিত হয়।

ভবিষ্যতের ব্যাপার ভবিষ্যতেই দেখা যাবে। এখন কেবল দেখার পালা, বর্তমানের স্রোত গড়ায় কোনদিকে।

পরিশিষ্ট ১

পাঠকের যত প্রশ্নের উত্তর



আমি প্রথম খণ্ড ‘ইহুদী জাতির ইতিহাস’ লেখার পর, বইয়ের শেষে পাঠকদেরকে প্রশ্ন করার জন্য ঠিকানা দিয়েছিলাম। এরপর আমার নিজস্ব ফেসবুক প্রোফাইল থেকেও গুগল ডক লিংক শেয়ার করি, যেখানে সবাইকে প্রশ্ন করার সুযোগ দিই।

যে সাড়া পেয়েছিলাম, তা অভাবনীয়। শত শত প্রশ্নের ভীড়ে কোনটা ছেড়ে কোনটার উত্তর দেব, সেটাই ভেবে পাচ্ছিলাম না। একই প্রশ্ন অনেকবার এসেছে অবশ্য। এতসব প্রশ্নের মধ্য থেকে আমি কিছু প্রশ্ন এখানে তুলে দিলাম, এবং আমার মতো করে উত্তর দেবার চেষ্টা করলাম। বইয়ের মূল লেখায় উঠে না আসা অনেক কিছু এখানে উঠে আসবে পাঠকদের জিজ্ঞাসা মেটাতে গিয়ে, তাই প্রতিটি উত্তরই ধৈর্য ধরে পড়ার অনুরোধ থাকলো।

প্রশ্ন : গোলান মালভূমির আন্তঃ ভূ-রাজনৈতিক গুরুত্ব নিয়ে লিখবেন! এবং কেন সিরিয়া এটি পুনরুদ্ধারে এখনো সচেষ্ট হতে পারছে না, এই অপারগতাও তুলে ধরবেন!

উত্তর : গোলান মালভূমি আগে পুরোটাই সিরিয়ার অধিকারে ছিল, এখন এর অধিকাংশটা ইসরাইলের অধিকারে। এই জায়গার আরবি নাম জাওলান (الجَوْلَان) হলেও হিব্রু নাম রামাৎ হা-গোলান (רמת הגולן), তবে এগুলো থেকে গোলান হাইটস (Golan Heights) নামটাই বেশি পরিচিত, বাংলাতেও তাই। প্রায় ১,৮০০ বর্গকিলোমিটার এ জায়গাটির প্রায় ১,২০০ বর্গকিলোমিটার এখন ইসরাইলের অধীনে, বাকিটুকু সিরিয়ার। ১৯৬৭ সালের ছয়-দিনের যুদ্ধে ইসরাইল

২৬৬ ইসরাইলের উত্থান-পতন

সিরিয়ার কাছ থেকে জায়গাটি দখল করে নেয়। ১৯৮১ সালের ১৪ ডিসেম্বর ইসরাইলি সংসদ কেনেসেতে পাশ হয় গোলান মালভূমি আইন। এর মাধ্যমে ইসরাইল সরকারিভাবে এই দখলের বৈধতা দেয়। ২০১৮ সালে তৎকালীন ইসরাইলি প্রধানমন্ত্রী বলেন, “গোলান মালভূমি চিরদিন ইসরাইলের থাকবে।”



মানচিত্রে গোলান হাইটস বা গোলান মালভূমি

এই অঞ্চলের ভূরাজনৈতিক গুরুত্বটা কী? বাইবেল বলে, গোলান মালভূমি এলাকা আজীবন ইসরাইলের রাজাদের সাথে দামেস্কের আরামিয়ান রাজাদের দ্বৈরথের বিষয় ছিল। আসিরীয় ও ব্যাবিলনীয়দের রাজত্বের পর এ অঞ্চলটি পারস্যের অধীনে আসে, এরপর পারস্য থেকে নির্বাসন শেষে ফিলিস্তিনি ভূমিতে ফিরে আসে ইহুদীরা। ষোড়শ শতকে অটোমান সাম্রাজ্য জিতে নেয় গোলান। আর যখন ম্যাভেটের সময় এলো (এ বইতে ম্যাভেট নিয়ে আলাপ করা হয়েছে) তখন

গোলান পড়লো সিরিয়ার ফ্রেঞ্চ ম্যান্ডেটের অধীনে। ১৯৪৬ সালে ম্যান্ডেট বিলুপ্ত হবার পর সিরিয়ার অধিকারে চলে আসে গোলান মালভূমি। আর ১৯৬৭ সালে ইসরাইল অতর্কিত আক্রমণের করার পর গোলানের ৬৬% হাতছাড়া হয়ে যায় সিরিয়ার। ১৯৮১ সালে আইন পাশের পর সেখানে ইসরাইলি সেটেলমেন্ট বানানো শুরু হয়, তবে সেই আইন জাতিসংঘ কর্তৃক নিন্দিত হয়। ২০১৯ সালে তৎকালীন মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প গোলান মালভূমিকে ইসরাইলের অংশ বলে স্বীকৃতি দেয়। তবে ইউরোপীয় ইউনিয়নের ২৮ সদস্য স্বীকৃতি দেয়নি।

ইউনাইটেড ন্যাশনস ডিজএনগেজমেন্ট অবজারভার ফোর্স (UNDOF) নিরাপত্তার জন্য ২৬৬ বর্গকিলোমিটারের একটি বাফার জোন রাখার ব্যবস্থা করে গোলানের ইসরাইলি ও সিরীয় অঞ্চলের মাঝে।

কেন সিরিয়া সরকার পারছে না গোলান মালভূমি ফেরত নিতে? এটার সঠিক উত্তর দেয়া সম্ভব নয়। তবে আমার মতে দুটো কারণ। এক, ইসরাইলের সেনাবাহিনী সিরিয়ার বাহিনীর চেয়ে ঢের শক্তিশালী। আর দুই, সিরিয়ার অভ্যন্তরীণ কোন্দল। যেমন ধরুন, ২০১১ সালে সিরিয়ার গৃহযুদ্ধের সময় গোলান মালভূমির যে ৬০০ বর্গকিলোমিটারের ক্ষমতা সিরিয়ার হাতে রয়েছে, তা নিয়েই কোন্দল শুরু হয়ে যায়, ক্ষমতা ভাগ হয়ে যায় সিরিয়া সরকার এবং তার বিরোধী দলগুলোর মাঝে। বিদ্রোহী দলগুলোকে দমন করতে গিয়েই সিরিয়া সরকার কুলিয়ে উঠতে পারছে না, আর আল-নুসরা ফ্রন্ট এবং আইএস (ইসলামিক স্টেটের)-এর উপস্থিতি তো আছেই। এসবের পরে কি আর শক্তিশালী ইসরাইলের কাছ থেকে জমি উদ্ধারের চেষ্টা চালাতে পারবে সিরিয়া? পূর্ব গোলান মালভূমির পুরো ক্ষমতা অবশ্য সিরিয়া সরকার নিজ হাতে নিতে পেরেছে ২০১৮ সালে, অর্থাৎ প্রায় ৬ বছর বামেলার পর। [ইরান অবশ্য ইসরাইলি গোলান মালভূমিতে আক্রমণ চালিয়েছে অতীতে (২০১৮), তবে কোনো লাভ হয়নি।]

কেন গোলান মালভূমি চায় ইসরাইল? ইসরাইলের প্রত্যক্ষ উদ্দেশ্য আসলে দুটো- দেশের আয়তন বাড়ানো, আর সিরিয়ার মূলভূমির সাথে বাফার জোনের মাধ্যমে দূরত্ব বাড়ানো এবং নিজের দেশের নিরাপত্তা নিশ্চিত করা সিরিয়ার হাত থেকে।

প্রশ্ন : আমেরিকা অন্ধভাবে কেন ইসরাইলকে সমর্থন দিয়ে যাচ্ছে, এর সম্পর্কে জানতে চাই।

উত্তর : এ বইতেই আলোচনা করেছি লবিং নিয়ে; প্রো-ইসরাইল গ্রুপগুলো এর জন্য ভালো ফান্ডিং করে, ডোনেশন করে, স্পন্সর করে। এর ফলে বিজয় লাভের পর আসলে তাদের বিরুদ্ধে যেতে পারেন না বা চান না নির্বাচিত হয়ে

ক্ষমতায় আসা ব্যক্তিরা। কেবল ২০১৮ সালের মার্কিন নির্বাচনেই ইসরাইল-পন্থী ইহুদী লবিস্ট গ্রুপ ৫ মিলিয়ন মার্কিন ডলার খরচ করে, স্বতন্ত্র ব্যক্তিদের কথা হিসেবে আনলে সেই অংকটা ছাড়িয়ে ১৫ মিলিয়ন মার্কিন ডলার। এত টাকা দিয়ে ক্যাম্পেইন করে জেতার পর লবিস্টদের বিরুদ্ধে চলার ইচ্ছা রাখা যায় কি?

প্রশ্ন : আরব রাজারা ফিলিস্তিন নিয়ে নিরুৎসাহিত কেন?

উত্তর : ফিলিস্তিনিদের প্রতি আরব দেশগুলোর সমর্থন একদম হারিয়ে গেছে, তা নয়। কিন্তু অনেকাংশেই ম্রিয়মাণ হয়ে পড়েছে, সত্য। ২০১৮ সালে ওয়াশিংটনে নিযুক্ত ইসরাইলের রাষ্ট্রদূত রন ডার্মার বলেছিলেন, “আরব দেশগুলো এখন আর ফিলিস্তিনের সুরে নাচছে না।”

মিসরের সিসি থেকে শুরু করে জর্ডানের আব্দুল্লাহই বলুন কিংবা সৌদি আরবের সালমান— তারা সবসময়ই টু স্টেট সমাধানের কথা বলে এসেছেন, যার ভিত্তি ২০০২ সালের অ্যারাব পিস ইনিশিয়েটিভ। তারা চান পূর্ব জেরুজালেম হোক ফিলিস্তিনের রাজধানী। এমন না যে তারা একদম হাত ধুয়ে ফেলেছেন ফিলিস্তিন ইস্যুতে। মিসর এখনও চেষ্টা করে ফিলিস্তিন কর্তৃপক্ষের সাথে ইসরাইলের পিস টক করাবার, চেষ্টা করে ফাতাহ-হামাসের মাঝে মিল মহব্বত তৈরি করার; গাজা উপত্যকায় সবচেয়ে বেশি ডোনেশন করে থাকে যে দেশটি, সেটি হলো কাতার; আমেরিকায় যে দেশটি ফিলিস্তিনিদের পক্ষে ওকালতি করে, সেটি হলো জর্ডান, দেশটি প্রত্যক্ষভাবে জেরুজালেমের নানা বিষয়ে জড়িত, আল-আকসা কম্পাউন্ড তো রীতিমত জর্ডানই চালায়! যদিও সৌদি আরবের ব্যাপারে ইসরাইলের সাথে দহরমের গুঞ্জন শোনা যাচ্ছে, তারপরও এটা স্বীকার করতে হয় যে, ফিলিস্তিনি কর্তৃপক্ষকে বড় অংকের সাহায্যই সৌদি করেছে, এবং করছে। ডোনাল্ড ট্রাম্প যেবার সৌদি আরবের রিয়াদ সামিট গেলেন, সেখানেও তাকে চেপে ধরেন ১২ আরব নেতা ফিলিস্তিনের ইস্যুতে, অবশ্য ট্রাম্পের তাতে কিছু যায় আসেনি।

তবে টাকা পয়সা দান খয়রাত করে দেয়াই শেষ কথা নয়। রাজনৈতিক সমর্থন আছে কি না, সেটিও বিবেচ্য বিষয়। এখানেই এসে বাঁধে গণ্ডগোল। অনেকে মনে করেন, আরবরা ফিলিস্তিন ইস্যুতে ক্লান্ত। অনেকে আবার ফিলিস্তিনের ওপর রেগেও আছে। যেমন, তারা কেন সাদাম হোসেনের সাথে যোগ দিয়েছিল কুয়েত ও সৌদি আরবের বিরুদ্ধে? হামাসের মুসলিম ব্রাদারহুড কেন মিসরকে ছোট করে, কেন জর্ডানে সরকার পতন ঘটানোর চেষ্টা করেছিল ফিলিস্তিনিরা, লেবাননের গৃহযুদ্ধের জন্যও অনেকে দায়ী করে ফিলিস্তিনকে—এরকম নানা অভিযোগ রয়েছে অনেকের।

এ বই লেখার সময় ফিলিস্তিনের প্রেসিডেন্ট মাহমুদ আব্বাস। তিনি পিএলও-র চেয়ারম্যান, ফাতাহর সদস্য। ২০১৯ সালে এক কেবিনেট মিটিংয়ে তিনি জানান, বিভিন্ন আরব দেশ তাদেরকে সাহায্য ও ঋণ দেবার প্রতিশ্রুতি দিলেও একটি টাকাও আসেনি। “অনেক বেশি চাইনি, ইনশাআল্লাহ, কিছু না কিছু হয়ে যাবে। আমরা মাসে মাত্র একশো মিলিয়ন ডলার করে চেয়েছি। বলেছি যে, ঋণ হিসেবে দিন, আমরা পরে পরিশোধ করে দেব। কিন্তু ঋণের প্রশ্নে আজও কোনো উত্তরই পেলাম না আমরা।”



ফিলিস্তিনি প্রেসিডেন্ট মাহমুদ আব্বাস (১৯৩৫ - বর্তমান)

ইতিহাসে এর আগেও আরবরা জোটবদ্ধ হয়ে ইসরাইলকে আক্রমণ করেছে বটে, তাতে অবশ্য ইতিহাসের মোড় ঘুরে যায়নি। আরব আমিরাতের মতো দেশগুলো তাই ঘুরছে অন্য দিকে, ফিলিস্তিন ইস্যু মাথা থেকে ঝেড়ে ফেলে যদিকে তাদের নিজেদের উন্নতি, সে পথেই হাঁটছে তারা।

প্রশ্ন : সাধারণ ফিলিস্তিনদের জীবন যাপনে আয়ের উৎস কী? তাদের কি বহির্বিশ্বের সাথে চাকরি-ব্যবসার সম্পর্ক আছে?

উত্তর : আমি ধরে নিচ্ছি ফিলিস্তিন বলতে আপনি ইসরাইল বলতে যে সীমানা বোঝায় এখন, সেখানকার মুসলিমদের বোঝাচ্ছেন না, বরং ফিলিস্তিন রাষ্ট্র বলে অনেক দেশ যে সীমানাকে স্বীকৃতি দেয়, তার নাগরিকদের ব্যাপারে জানতে চাইছেন।



ফিলিস্তিনি শিশুরাও এখন বড় হয় স্বাধীন ফিলিস্তিনের স্বপ্ন দেখে

ফিলিস্তিন রাষ্ট্র (دولة فلسطين) বর্তমানে পিএলও শাসিত; তারা পশ্চিম তীর ও গাজার অধিকার রাখে, যদিও গাজায় এখন হামাস শাসন চলছে। পশ্চিম তীর এখন ১৬৫টি ছোট ছোট ফিলিস্তিনি অংশে বিভক্ত, আর সেই সাথে আছে ২৩০টি ইসরাইলি সেটলার বা দখলি অঞ্চল, যেখানে ইসরাইলের আইন চলে। অন্যদিকে ২০০৭ সাল থেকে গাজা বন্ধ করে রেখেছে ইসরাইল।

আলজেরিয়ায় প্যালেস্টাইনিয়ান ন্যাশনাল কাউন্সিলের নির্বাসিত সেশনে ১৯৮৮ সালের ১৫ নভেম্বর স্বাধীনতা ঘোষণা করা হয় ফিলিস্তিনের। পিএলও-র উদ্দেশ্যই হলো ফিলিস্তিনের আন্তর্জাতিক স্বীকৃতি আদায় করা বিভিন্ন দেশের কাছ থেকে। করোনা মহামারি শুরু হবার আগে জাতিসংঘের ১৯৩টি সদস্য দেশের মাঝে ৭১.৫% অর্থাৎ ১৩৮টি দেশ ফিলিস্তিন রাষ্ট্রকে স্বীকৃতি দিয়েছে। যে দেশগুলো এখনও স্বীকৃতি দেয়নি, তাদের মাঝে উল্লেখযোগ্য হলো অস্ট্রেলিয়া, কানাডা, ফ্রান্স, জার্মানি, ইতালি, জাপান, দক্ষিণ কোরিয়া, মেক্সিকো, যুক্তরাজ্য, যুক্তরাষ্ট্র, ইত্যাদি।

ইউএনডিপি-র হিসেব মতে, ফিলিস্তিনের সাক্ষরতার হার ৯৬%-এরও বেশি। পূর্ব জেরুজালেমের টুরিজম থেকে ফিলিস্তিনের একটা বড় আয় হয়। প্রায় ২০-৫০ লাখ মানুষ ফিলিস্তিনি অঞ্চলগুলোতে ঘুরতে আসে বছরে, যার মাঝে ৪০% ইউরোপীয় এবং ৯% উত্তর আমেরিকান। করোনা মহামারির ঠিক আগের

ইসরাইলের উত্থান-পতন ২৭১

মূলনীতি- “কোনো যুদ্ধে কোনোদিন হারা যাবে না।” নারী-পুরুষ নির্বিশেষে ব্যতিক্রম ব্যতীত সকল ইসরাইলি নাগরিককে একটি নির্দিষ্ট সময় বাহিনীতে কাজ করতে হয়। তবে ধর্মীয় কারণ দেখিয়ে অব্যাহতি পাওয়া যাবে, এবং প্রায় ৩৩% ইসরাইলি মেয়ে এ কারণ দেখায়। আর, আরব মুসলিমরা চাইলে যোগদান না করতে পারে।

বাহিনীর পেছনে খরচের ব্যাপারে উন্নত দেশগুলোর মাঝে একদম ওপরের দিকের তালিকায় থাকবে ইসরাইল।

২০২২ সালের হিসেবে, বিশ্বের ১৪০টি দেশের বাহিনীর শক্তিমাত্রার হিসেবে ইসরাইলের অবস্থান ১৮।



আইডিএফ

উল্লেখযোগ্য দেশগুলোর শক্তিমাত্রার ক্রমিক দেয়া হলো-

- ১ - মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র
- ২ - রাশিয়া
- ৩ - চীন
- ৪ - ভারত
- ৫ - জাপান
- ৬ - দক্ষিণ কোরিয়া
- ৭ - ফ্রান্স

ইসরাইলের উত্থান-পতন ২৭৩

- ৮ - যুক্তরাজ্য
- ৯ - পাকিস্তান
- ১০ - ব্রাজিল
- ১১ - ইতালি
- ১২ - মিসর
- ১৩ - তুরস্ক
- ১৪ - ইরান
- ১৫ - ইন্দোনেশিয়া
- ১৬ - জার্মানি
- ১৭ - অস্ট্রেলিয়া
- ১৮ - ইসরাইল
- ১৯ - স্পেন
- ২০ - সৌদি আরব
- ২১ - তাইওয়ান
- ২২ - ইউক্রেন
- ২৩ - কানাডা
- ৩৪ - ইরাক
- ৩৬ - সংযুক্ত আরব আমিরাত
- ৪২ - সিঙ্গাপুর
- ৪৩ - মেক্সিকো
- ৪৬ - বাংলাদেশ
- ৪৭ - সিরিয়া
- ৪৯ - পর্তুগাল
- ৫৫ - মরক্কো
- ৬১ - সার্বিয়া
- ৭১ - কুয়েত
- ৭২ - লিবিয়া
- ৭৩ - সুদান
- ৭৫ - জর্ডান
- ৭৭ - কাতার
- ৭৮ - ওমান
- ৭৯ - শ্রীলংকা
- ৮০ - ইয়েমেন
- ৮১ - কেনিয়া

- ৯২ - উগান্ডা
- ৯৮ - বাহরাইন
- ১০৩ - দক্ষিণ সুদান
- ১১৪ - লেবানন
- ১১৮ - আফগানিস্তান

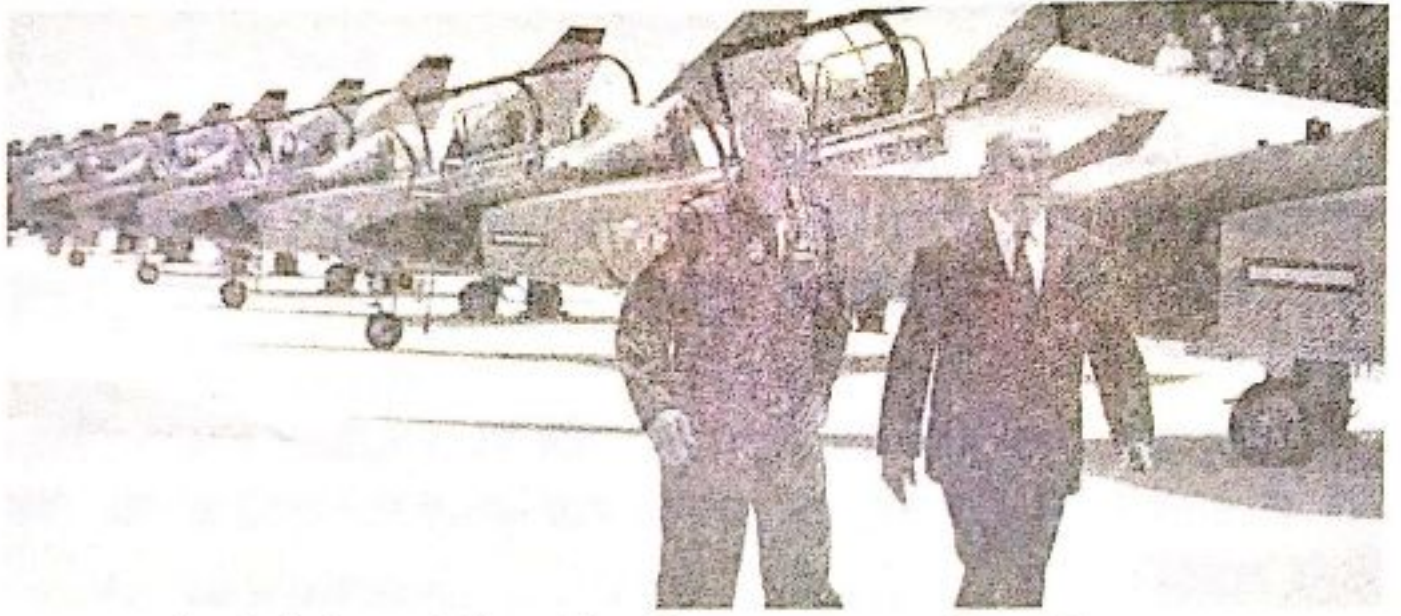
অর্থাৎ মিসর আর ইরান ছাড়া অন্য কোনো আরব দেশের সশস্ত্র বাহিনীর শক্তিমত্তা ইসরাইলের ওপরে নয়। তুরস্ক ওপরে আছে, তবে সেটি আরব দেশ নয়। মিসরের সাথে ইসরাইলের কূটনৈতিক সম্পর্ক রয়েছে। ইরান অবশ্য ইসরাইলের শত্রুই।

আশা করি, কেন আরব দেশগুলো কিছু করে না, তার উত্তর পাওয়া যাচ্ছে। এর আগে যে আরব দেশ কয়েকটি জোটবদ্ধ হয়ে কিছু চেষ্টা করেনি তা নয়, কিন্তু ব্যর্থই হয়েছে।

প্রশ্ন : আপাতদৃষ্টিতে আমরা দেখি যে, ইসরাইল-ফিলিস্তিনের শক্তির বিশাল তারতম্য, আর মুসলিম (!) রাষ্ট্রগুলো ফিলিস্তিন থেকে তাদের হাত ধুয়ে ফেলেছে, পুরা পৃথিবী ইনিয়িং বিনিয়িং ইসরাইলকেই সাপোর্ট দেয় (জায়োনিস্টদের প্রভাব হোক আর যাই হোক), তাহলে তো ইসরাইল একটা ফুল স্কেল যুদ্ধ করে সবটা একবারেই দখল করতে পারে, তাদের হাতে সব থাকা সত্ত্বেও ফুল স্কেল যুদ্ধ করে না কেন? তারা কি কিছুর অপেক্ষায় আছে?

উত্তর : ইসরাইল একটি দেশকে আক্রমণ করলে যুদ্ধে হয়তো জিততেও পারে, কিন্তু আশপাশের সব দেশ অধিকার করে নেয়া কোনো বাস্তবিক পরিকল্পনা নয়। এত বড় সেনাবাহিনীও নেই দেশটির। আর সত্যি বলতে ইসরাইলের এমন পরিকল্পনার প্রয়োজন নেই, যেখানে তার সব দখল করতে হবে। তাদের আদি এবং আসল উদ্দেশ্য সবসময়ই পবিত্র ভূমির অধিকার নেয়া, যেমনটা তারা প্রাচীন ফিলিস্তিনিদেরকে পরাজিত করে জয় করে নিয়েছিল। সেই সীমানা কেমন? ইহুদীদের বর্তমান তাওরাত অনুযায়ী পবিত্র প্রতিশ্রুত ভূমির সীমানা অনেকটা এমন, “আর লোহিত সাগর হতে ফিলিস্তিনিদের সমুদ্র পর্যন্ত এবং মরুভূমি হতে ফোরাহ নদী পর্যন্ত তোমার সীমা নিরূপণ করবো; কেননা আমি সেই দেশবাসীদেরকে তোমার হাতে তুলে দেব এবং তুমি তোমার সম্মুখ থেকে তাদেরকে তাড়িয়ে দেবে। তাদের সঙ্গে কিংবা তাদের দেবতাদের সঙ্গে কোনো চুক্তি স্থাপন করবে না। তারা তোমার দেশে বাস করবে না, অন্যথায় তারা আমার বিরুদ্ধে তোমাকে গুনাহ করাবে।” [হিজরত, ২৩:৩১-৩২]

এই সীমা যদি দখল করতে হয়, তাহলে বর্তমান ইসরাইলি সীমানার বাইরেও মিসর, জর্ডান, লেবানন ও সিরিয়ার কিছু অংশ দখল করে নিতে হবে। তাহলে উদ্দেশ্য পূরণ হয়েছে বলতে পারবে। সারা বিশ্ব জয় করে নেয়া ইহুদীদের ধর্মগ্রন্থের কোনো ধার্য করা লক্ষ্য বা উদ্দেশ্য নয়।

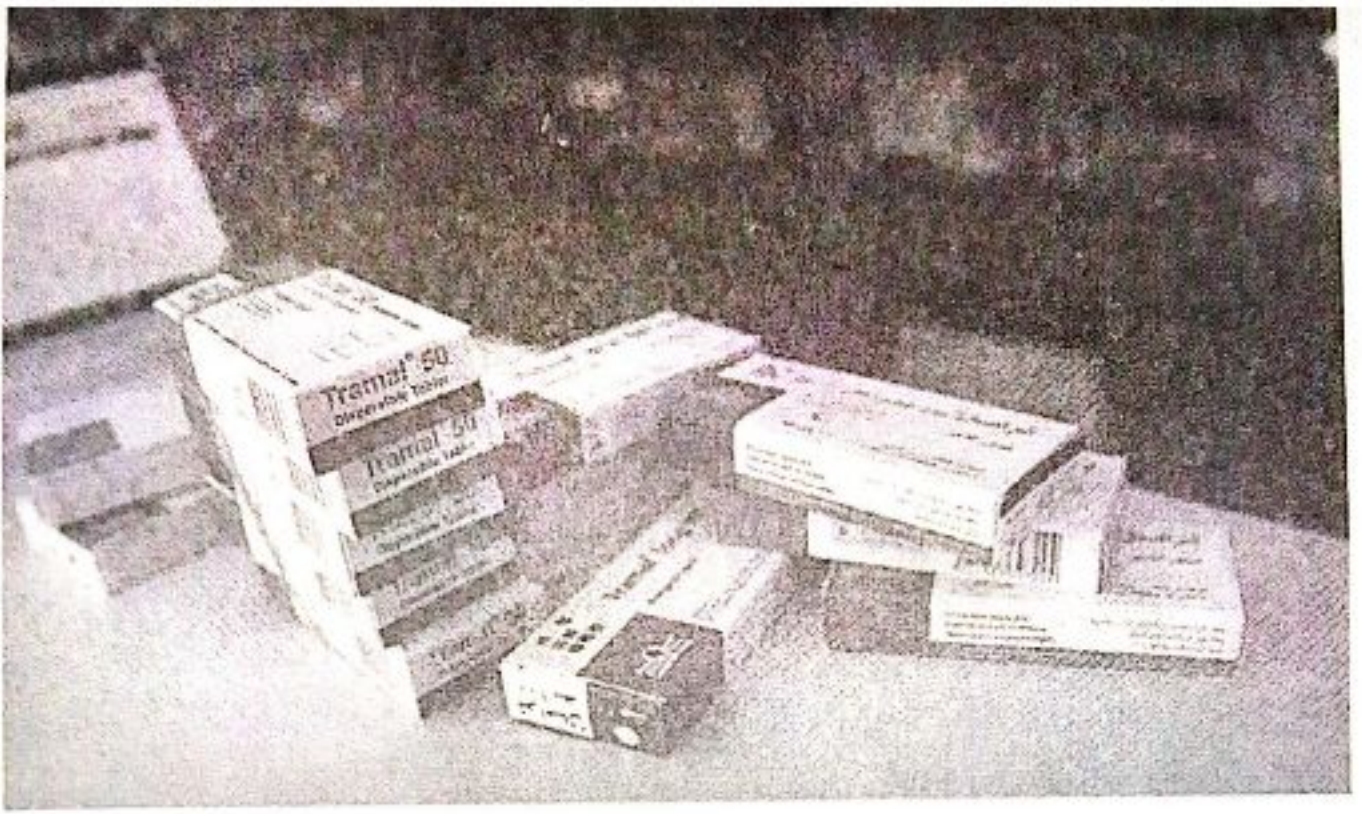


ইসরাইলি বিমানবাহিনীর সারিবদ্ধ বিমানগুলোর সামনে দিয়ে হেঁটে যাচ্ছেন
তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী নেতানিয়াহু

প্রশ্ন : ফিলিস্তিনিদের মধ্যে আগে ভাবতাম তারা ইসলাম সম্পর্কে তেমন সচেতন না, এখন (২০২১) মনে হচ্ছে ভালোই সচেতন। হামাসের নেতৃত্বে যারা আছে, তারা কি ইসলামি ভাবধারার নাকি সেকুলার?

উত্তর : আশপাশের সিরিয়া, লেবানন, জর্ডানের তুলনায় ফিলিস্তিনি মুসলিমেরা অপেক্ষাকৃত বেশি ধার্মিক; মিসরের চাইতে তো অতি অবশ্যই ধার্মিক। তবে শহুরে এলাকার চাইতে গ্রামাঞ্চলে ধার্মিকতা বেশি, এবং কম বয়সীদের তুলনায় বয়স্কদের মাঝে ধর্মপালনের প্রবণতা বেশি গাজা এবং পশ্চিম তীরে। তবে বেশ অনেক বছর ধরে গাজায় ড্রাগ সমস্যাকে অনৈসলামিক বলে চিহ্নিত করেছেন অনেকে। হাজার হাজার তরুণ ট্র্যামাডল নামের এক ধরনের ব্যথানাশক ড্রাগ নেয় আনন্দদায়ক অনুভূতির জন্য। কারণ জিজ্ঞেস করলে তারা গাজার ক্রমবর্ধমান মানসিক চাপ, বেকারত্ব, রাজনৈতিক অস্থিরতা এবং যুদ্ধাবস্থার কথা বলে। কালো-বাজারে এই ট্র্যামাডলের চাইতেও বেশি নেশাদায়ক ট্র্যামাল পাওয়া যায় এখন সেখানে। বছর দশক আগেও গাজার নিচের সুড়ঙ্গ দিয়ে ট্র্যামাডল পাচারের কথা জানা যেত। সমাজের উচ্চ পদস্থ থেকে শুরু করে বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র ছাত্রীদের মাঝেও এ ড্রাগ ছড়িয়ে পড়ে বাজেভাবে।

হামাস সুড়ঙ্গগুলো বন্ধ করে দেয় এবং ড্রাগ বিরোধী কার্যক্রম শুরু করে, এর ফলে ড্রাগটির দামও বেড়ে যায়। আর যারা ড্রাগ ব্যবহারকারী ছিলেন, তাদের জন্য স্বল্প খরচের রিহ্যাব নেই গাজায়।



ট্রামাল ড্রাগ

হামাস ইসলামিক কি না তার উত্তরে বলতে হয়, হ্যাঁ।

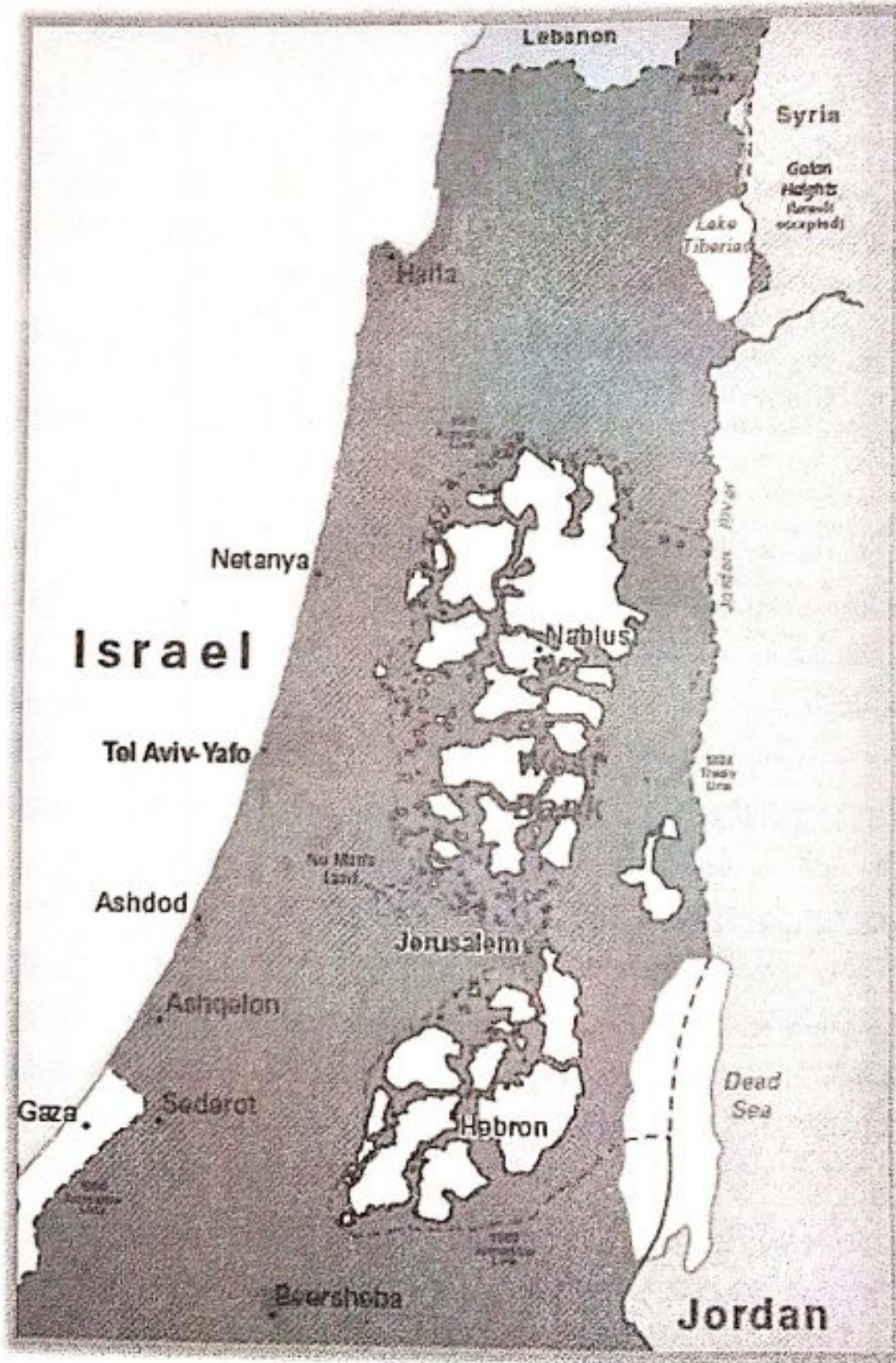
“ফিলিস্তিনের সংগ্রাম কেবল ভূমি আদায়ের সংগ্রাম নয়, এর সাথে জড়িত ঈমান।” এটিই ছিল হামাসের বিবৃতি। উল্লেখ্য, ইসলামিক রেজিস্ট্যান্স মুভমেন্ট, যা আরবিতে হারাকাত আল-মুকাওয়ামা আল-ইসলামিয়া (المقاومة الإسلامية) নামে পরিচিত, এরই আদ্যোক্ষর দিয়ে গঠিত সংক্ষিপ্ত রূপ হলো ‘হামাস’।

গাজার হামাসের তুলনায় পশ্চিম তীরের ফাতাহ অপেক্ষাকৃত মডারেট এবং সেকুলার বটে। ফিলিস্তিনি লিবারেশন মুভমেন্ট (الوطني الفلسطيني) আরবি নামের আদ্যোক্ষরগুলো উল্টো করে সাজালে পাওয়া যায় ‘ফাতহ’ যার অর্থ ‘বিজয়’, সেই থেকেই নাম ‘ফাতাহ’। উদ্দেশ্য ছিল ইসরাইল রাষ্ট্রের পতন ঘটানো। ইয়াসির আরাফাত বলেছিলেন, “আমাদের কোনো আদর্শ নেই সেরকম, আমাদের লক্ষ্য কেবল একটিই— আমাদের মাতৃভূমিকে যেকোনোভাবেই হোক স্বাধীন করতে হবে। আমাদের সেনারাই আমাদের ভবিষ্যৎ।”

বইয়ের অধ্যায়েও অল্প করে হামাস ও ফাতাহ নিয়ে আলাপ হয়েছে, সুতরাং তাদের নিয়ে প্রাথমিক ধারণা ইতোমধ্যেই দেয়া হয়েছে।

প্রশ্ন : ইসরাইলের এত ক্ষমতা থাকার পরেও তারা পুরো ফিলিস্তিন দখল করে কেন নিচ্ছে না যেখানে পুরো বিশ্বই এক কথায় তাদের সমর্থন দিচ্ছে? আরব বিশ্বের/মধ্যপ্রাচ্যের অন্য সব দেশ ফিলিস্তিন ইস্যুতে চুপ এবং অনেক দেশ

ইতিমধ্যে সম্পর্ক স্থাপন করছে ইসরাইলের সাথে। এতে তারা ঠিক কীভাবে লাভবান হবে? যদি সুসম্পর্ক না থাকত তাহলে কি তাদের আক্রমণ করতে পারবে ইসরাইল? পুরো বিশ্বের এত আন্দোলন কি আসলেই কোনো সুফল বয়ে আনবে ফিলিস্তিনের জন্য? জায়েনিজমকে পশ্চিমা বিশ্ব এতটা সমর্থন কেন করছে?



পশ্চিম তীরের ছোপ ছোপ সাদা অংশগুলো ফিলিস্তিনি এলাকা,
এদের ঘিরে রয়েছে ইসরাইলি সেটেলমেন্ট

উত্তর : আমার ব্যক্তিগত মত হলো, ইসরাইল চাইলে অবশ্যই পুরো ফিলিস্তিন নিয়ে নিতে পারে, কিন্তু হয়তো কিছুটা চক্ষুলাজ্জার জন্য করেনি, তবে ধীরে ধীরে পশ্চিম তীরে সেটলাররা অবস্থান নিয়ে নিচ্ছে, অর্থাৎ ইসরাইলি জমি বাড়ছে; ব্যাপারটা অনেকটাই ছিটমহলের মতো। হয়তো ভবিষ্যতে আরও দখল নেবে। আপনি মানচিত্র খেয়াল করলে দেখতে পাবেন কীভাবে ইসরাইলি ছোপ ছোপ জমিগুলোকে ঘিরে রেখেছে ইসরাইলি সেটেলমেন্ট, এক জমি থেকে আরেক জমিতে যাবার জন্য সরাসরি রাস্তা পাওয়াও দুষ্কর। বারাক ওবামা এ মানচিত্র দেখে অবাক হয়েছেন বলে রিপোর্ট এসেছিল।

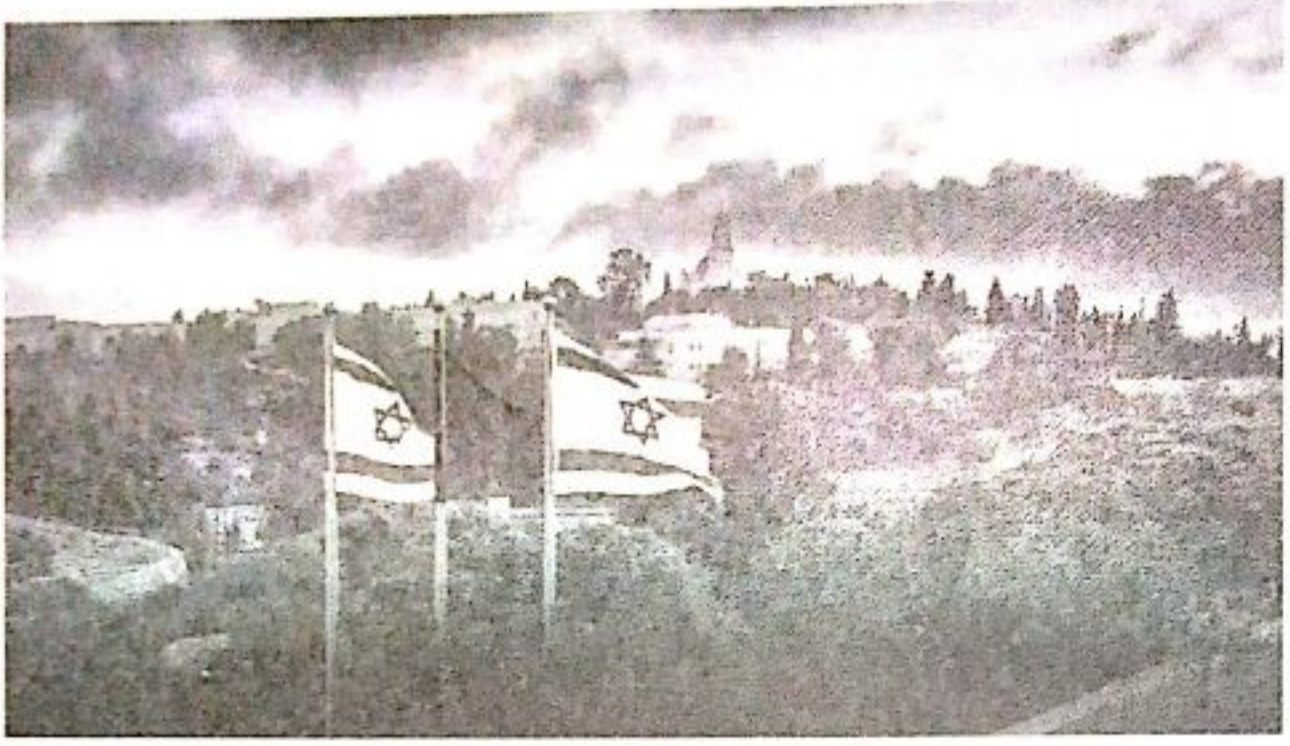
আরব বিশ্ব বর্তমানে ফিলিস্তিন ইস্যুতে কিছুটা চুপ তা সত্য, কারণ ইসরাইলকে এখান থেকে সরাবার কোনো উপায় এ মুহূর্তে নেই তাদের কাছে, করতে গেলে সেটা তৃতীয় বিশ্বযুদ্ধের জন্ম দেবে, কারণ ইসরাইলের মিত্র সবাই শক্তিশালী। ইসরাইল নিজেও শক্তিশালী দেশ বর্তমানে, এর ফলে তাদের সাথে সুসম্পর্ক স্থাপন করা কোনো দেশের জন্য ব্যবহারিক দৃষ্টিকোণে লাভজনক, যদিও ফিলিস্তিন-দখল এবং ধর্মীয় আবেগের জায়গা থেকে নীতিগতভাবে সেটি সমর্থনযোগ্য নয়। কিন্তু এগুলো গোণায় না ধরলে যেকোনো দেশই ইসরাইলের সাথে সম্পর্ক স্থাপনে আগ্রহী হবে, ঠিক যেমনটি আরব আমিরাত করেছে। আমার মনে হয় না, পুরো বিশ্বের বিবৃতি বা সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমের হ্যাশট্যাগ যুদ্ধ ফিলিস্তিনের জন্য কোনো সুফল বয়ে আনবে। হয়তো কিছু সাহায্য পৌঁছাবে, কিন্তু এর বেশি কিছু হবার সম্ভাবনা আমি দেখি না।

প্রশ্ন : What's the best interest of the USA to support Zionism? How do the Israelis defend and justify their actions? (জায়েনিজমকে সমর্থন করার পেছনে যুক্তরাষ্ট্রের মূল উদ্দেশ্য কী? ইসরাইলিরা কীভাবে তাদের কাজকে ন্যায্য বলে দাবি করে?)

উত্তর : এর উত্তর আগেও দিয়েছি, আসলে জায়েনিজম সমর্থন করে কোনো দেশেরই লাভ নেই, তবে যারা ইসরাইলের মিত্র রাষ্ট্র, তারা মিত্রের উদ্দেশ্য ও লক্ষ্যকে সমর্থন করবে এটাই স্বাভাবিক। সারা বিশ্বে আপনি খেয়াল করে দেখবেন, মাইনরিটিকে সমর্থন দেয়াকে একটি মহৎ কর্ম হিসেবে দেখা হয়; ধর্ম হিসেবে ইহুদী ধর্ম এবং এর অনুসরণকারীরা নিঃসন্দেহে অন্যান্য বড় ধর্মের তুলনায় মাইনরিটি, সংখ্যালঘু। তাদেরকে এই দৃষ্টি থেকে সমর্থন দেয়াকে অনেকটা 'নৈতিক দায়িত্ব' মনে করে নেয় নানা দেশ। তাদেরকে জায়গা করে দেয়া, দেশ করে দেয়া— এগুলো তাদের অধিকার মনে করে। কোন দেশে জায়গা দেয়া হবে, সেই প্রশ্নের উত্তরে একদা তারা যে দেশে বসবাস করতো, সেই জায়োন পাহাড়ের কোলের জমিকেই বেছে নেয়া হয়। আর মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের

ইসরাইলের উত্থান-পতন ২৭৯

নির্বাচিতদের জন্য লবিস্টদের প্রতি বাধ্যবাধকতার ব্যাপার তো আগেই ব্যাখ্যা করেছি, তাই আবার বললাম না।



জায়েন পাহাড়

ইসরাইল নিজেদের কার্যক্রমকে ডিফেন্ড করে পুরো প্রতিশ্রুত ভূমির সীমানা ও বাপদাদার জমি ফেরত নেয়ার অজুহাতে। এজন্য সেখানকার ফিলিস্তিনিদের থেকে ভূমির অধিকার নিয়ে নিতে চায় তারা।

প্রশ্ন : ইয়াসির আরাফাত এই দেশটির কতটুকু উপকার করতে পেরেছেন? নাকি পুরোটাই লোক দেখানো? হামাসের ভূমিকা প্রশ্নবিদ্ধ। হামাস কি আসলেই ইসরাইলের তৈরি ছিল ফাতাহকে দমন করার জন্য?



ইয়াসির আরাফাত

উত্তর : ইয়াসির আরাফাতের প্রসঙ্গ যখন এলোই, তার ব্যাপারে সংক্ষেপে একটু বলে নেয়া যাক।

তার পুরো নাম মুহাম্মাদ ইয়াসির আদেল রাহমান আদেল রাউফ আরাফাত আল-কুদওয়া আল-হুসাইনি (الرحمن عبد الرؤوف عرفات القدوة الحسيني) কিন্তু সংক্ষেপে তিনি হয় ‘ইয়াসির আরাফাত’ কিংবা ‘আবু আম্মার’ নামে পরিচিত ছিলেন। ফিলিস্তিনি বাবা-মার ঘরে তার জন্ম মিসরের কায়রোতে ১৯২৯ সালে। ছাত্র অবস্থাতেই তিনি আরব জাতীয়বাদকে বরণ করে নেন এবং ইসরাইল-প্রতিষ্ঠা বিরোধী ছিলেন। ১৯৪৮ সালের আরব-ইসরাইল যুদ্ধে তিনি মুসলিম ব্রাদারহুডের হয়ে লড়াই করেন। ১৯৫০ এর দশকে তিনি ফাতাহ সহ-প্রতিষ্ঠা করেন, যার উদ্দেশ্য ছিল ইসরাইল রাষ্ট্রের অপসারণ। কয়েকটি আরব দেশ থেকে ফাতাহ কার্যক্রম পরিচালনা করত এবং ইসরাইলি টার্গেটে আক্রমণ করত। ১৯৬৭ সালে তিনি পিএলও-তে (প্যালেস্টাইন লিবারেশন অরগানাইজেশনে) যোগদান করেন এবং ১৯৬৯ থেকে ২০০৪ সাল পর্যন্ত প্রতিষ্ঠানটির চেয়ারম্যান পদে ছিলেন। তিনি পিএলও-র হয়ে ১৯৯১ সালের মাদ্রিদ কনফারেন্স, ১৯৯৩ সালের অসলো অ্যাকর্ডস এবং ২০০০ সালের ক্যাম ডেভিড সামিটে অংশ নেন। ১৯৯৪ সালে তিনি ইসরাইলের প্রধানমন্ত্রী ইছহাক রাবিন এবং শিমোন পেরেজের সাথে যুগ্মভাবে নোবেল শান্তি পুরস্কার পেয়েছেন। কিন্তু সে সময় থেকে হামাসের উত্থানের কারণে ফাতাহর সমর্থন কমেতে শুরু করে। দুই বছর রামাল্লায় গৃহবন্দী থাকার পর ২০০৪ সালের শেষ দিকে তিনি কোমায় চলে যান এবং ৭৫ বছর বয়সে ১১ নভেম্বর ফ্রান্সে মারা যান। তার মৃত্যুর কারণ বিষয়ে পরে আসছি।

আরাফাত শুরুতে অবশ্যই স্বাধীন ফিলিস্তিনের পক্ষে ছিলেন, কাজ করেছেন ইসরাইলের অপসারণের জন্য, কিন্তু এরপর তিনি অন্যান্য আরব রাষ্ট্রের নেতাদের মতোই আচরণ করেন বলে মনে হয় আপাতদৃষ্টিতে। যেমন, ১৯৮৮ সালে তিনি মেনে নেন যে ইসরাইলের দেশ হিসেবে থাকার অধিকার রয়েছে। তিনি তখন থেকে দ্বিরাষ্ট্র সমাধানের দিকে এগিয়ে যান, অর্থাৎ ফিলিস্তিন ও ইসরাইলের পাশাপাশি অবস্থান। মৃত্যুর পরও আরাফাত ছিলেন বিতর্কিত। সাধারণ ফিলিস্তিনিরা তাকে ফিলিস্তিনের অধিকার আদায়ের পথে শহীদ মনে করে, কিন্তু তার ফিলিস্তিনি প্রতিপক্ষরা বিশেষ করে যারা কড়া ইসলামিক এবং কতিপয় বামপন্থী পিএলও সদস্য তাকে দুর্নীতিবাজ এবং ইসরাইলের প্রতি মাথা নতকারী হিসেবে প্রতীয়মান করে। ইসরাইল অবশ্য তাকে সন্ত্রাসী মনে করত বেশ অনেকটা সময়।



নোবেল পুরস্কার হাতে নিয়ে সর্ববামে ইয়াসির আরাফাত

আপনি যদি ওয়াল স্ট্রিট জার্নালকে ২০০৯ সালে দেয়া ইসরাইলি এক কর্মকর্তার সাক্ষাৎকার পড়েন, তাহলে বুঝতে পারবেন যে যদিও ইসরাইল প্রত্যক্ষভাবে হামাসকে তৈরি করেনি, তবুও হামাস ও তৎকালীন অন্যান্য সশস্ত্র সংঘের জন্ম ইসরাইলের জন্য সুখকর ছিল বলেই তারা মনে করে। কারণ আশির দশকে যেখানে ইসরাইল বারবার সেকুলার ফাতাহর গেরিলা আক্রমণে জর্জরিত হচ্ছে, তখন আসলেই ফাতাহর বিপরীতে দাঁড়ানো কোনো সশস্ত্র সংঘের খুব দরকার ছিল তাদের। এক্ষেত্রে ইসরাইল চাক বা না চাক, হামাস বেশ সাহায্য করে। ফাতাহর দৃষ্টি তখন হামাসের দিকেও দিতে হয়। আমি অবশ্যই এমন কোনো ষড়যন্ত্র তত্ত্বে সমর্থন দেব না যে ইসরাইল সজ্ঞানে হামাসকে বানায় (যারা কিনা মিসরের মুসলিম ব্রাদারহুডের সাথে অ্যালাইন্ড ছিল), কিন্তু এটা অস্বীকার করব না যে ইয়াসির আরাফাতের পিএলও-র বিরুদ্ধে কড়া ইসলামি চিন্তাধারার হামাস ইসরাইলের জন্য অনাকাঙ্ক্ষিত আশীর্বাদের মতো ছিল, অন্তত যতদিন ফাতাহর ক্ষমতা বেশি ছিল। এরপর অবশ্য হামাসই তাদের মাথা ব্যথার কারণ হয়ে দাঁড়ায়। প্রথম ইত্তিফাদার সময় তুঙ্গে ওঠা হামাসকে পরবর্তীতে ইসরাইল সন্ত্রাসী সংঘ বলে ঘোষণা করে।

যাক গে, ফিরে আসি ইয়াসির আরাফাতের বিষয়ে। ২০০২ সালের মার্চে ইসরাইলিদের পাসওভার বা ঈদুল ফিসাখের সময় হামাস আক্রমণ চালিয়ে ২৯ জনকে হত্যা করে। এর উত্তরে ইসরাইল পশ্চিম তীরে অপারেশন শুরু করে। গাজায় হামাসের এক নেতার ২০১০ সালের বিবৃতির বরাতে জানা যায়, সেই ২৮২ ইসরাইলের উত্থান-পতন

আক্রমণের আদেশ নাকি এসেছিল ইয়াসির আরাফাতের কাছে থেকে, যখন আরাফাত বুঝতে পেরেছিলেন যে ইসরাইলের সাথে নেগোশিয়েশন করে আর লাভ নেই। ২০০২ সালে ইসরাইলি সরকার কর্তৃক জব্দ করা কিছু রিপোর্ট অনুযায়ী, ফাতাহর উপদল আল-আকসা ব্রিগেডের ফাভিংয়ের ব্যবস্থা ইয়াসির আরাফাতই করতেন। এগুলোর সত্য মিথ্যা আমরা জানি না।

তিনি বিয়ে করেছিলেন জেরুজালেমে জন্ম নেয়া রোমান ক্যাথোলিক মেয়ে সুহা-কে, যিনি তাদের বিয়ের সময় সুন্নি ইসলামে ধর্ম পরিবর্তন করেন। তবে অনেক ফিলিস্তিনি বিশ্বাস করে না যে সুহা ধর্মান্তরিত হয়েছিলেন। ইয়াসির আরাফাতের মৃত্যুর সময় 'ক্লোজ কন্টাক্ট' ছিলেন তার স্ত্রী সুহা-ই। ১৯৯০ সালে তাদের বিয়ের সময় আরাফাতের বয়স ছিল ৬১ বছর এবং সুহা-র বয়স ২৭ বছর।

২০০৪ সালের অক্টোবরে ইয়াসির আরাফাত যখন অসুস্থ হয়ে পড়লেন, তখন তাকে ফ্রান্সে নিয়ে যাওয়া হয়, এবং প্যারিসের এক হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। তার ডায়রিয়া, বমি, তলপেটে ব্যথা, ইত্যাদি সমস্যা ছিল। ৩ নভেম্বর তিনি কোমায় চলে যান।

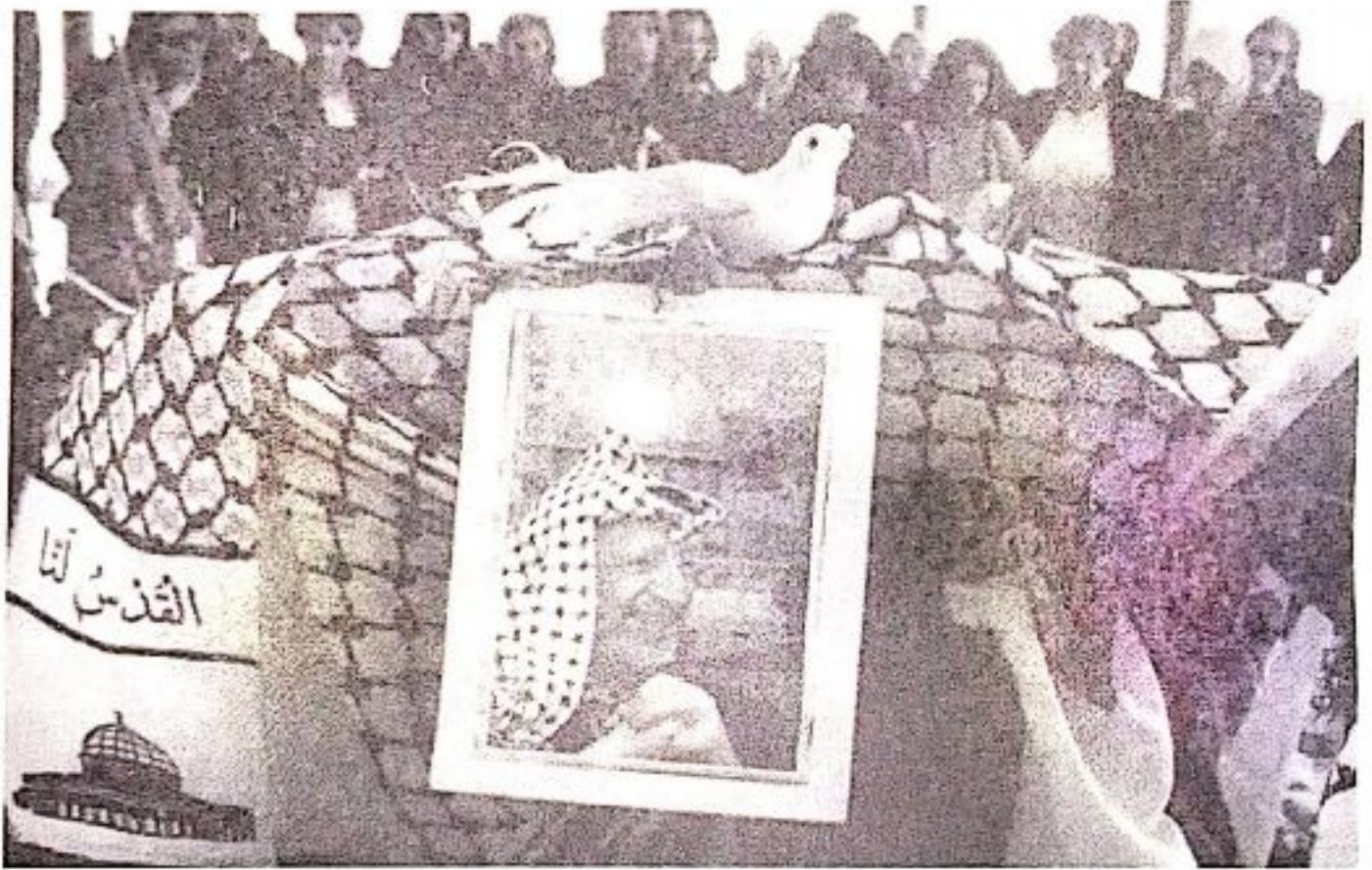
ফরাসি আইন অনুযায়ী, ডাক্তার কেবল রোগীর ক্লোজ কন্টাক্টকে তথ্য জানাতে পারেন। সুহা আরাফাত সেই তথ্য পেয়ে সবাইকে সব কিছু জানাচ্ছিলেন না বলে ফিলিস্তিনি কর্মকর্তারা অভিযোগ করেন।

১১ নভেম্বর তাকে মৃত ঘোষণা করা হয়। কিন্তু মৃত্যুর সঠিক কারণ পরিষ্কারভাবে উল্লেখ করা হয়নি। আরাফাতের ১৮ বছরের পারিবারিক ডাক্তার আল-কুর্দিকে সুহা আরাফাত ধারে কাছেও আসতে দেননি বলে অভিযোগ রয়েছে। এমনকি লাশের কাছেও নয়। সুহা আরাফাত ময়নাতদন্ত করতেও দেননি। গুজব ছিল, তারা নাকি আলাদা থাকছিলেন, যদিও সুহা সেটা অস্বীকার করেন। অবশ্য, প্যারিসে থাকা সত্ত্বেও 'নাকি' তিনি আরাফাতের কাছে আসেননি।

কেউ বললেন, আরাফাতের এইডস হয়েছিল, কোনো রিপোর্ট জানায় তিনি গ্যাস্ট্রোএন্টারাইটিসে মারা গিয়েছেন। কেউ বলেছেন প্লাটিলেট (আসল উচ্চারণ 'প্লেটলেট') কাউন্ট এলোমেলো হওয়ার কারণে তার মৃত্যু হয়। কেউ বা ধারণা করেন, তার মৃত্যু হয়েছে খাবারে রাইসিন বিষ প্রয়োগের মাধ্যমে। আরাফাতের প্রাক্তন উপদেষ্টা বাসাম আবু শরিফ বললেন, মোসাদ এই হত্যাকাণ্ড ঘটিয়েছে থ্যালিয়াম ডোজ দিয়ে।

তবে সবচেয়ে তোলপাড় করা অভিযোগ নিয়ে আসেন ফিলিস্তিনি প্রাক্তন ইন্টেলিজেন্স অফিসার অ্যাটর্নি ফাহমি শাবানা; তিনি জানালেন, ইয়াসির

আরাফাতের রাজনৈতিক প্রতিপক্ষরা নাকি তাকে তেজস্ক্রিয় পোলোনিয়াম দিয়ে হত্যা করেছে। আল-জাজিরা লুফে নিলো এই রিপোর্ট। ২০১২ সালে নয় মাসের তদন্ত শেষে আল-জাজিরা রিপোর্ট প্রকাশ করে, যেখানে তাদের দাবি আরাফাতের দেহে উচ্চ পরিমাণে পোলোনিয়াম পাওয়া গিয়েছে, এবং যেনতেন প্রাকৃতিক পোলোনিয়াম নয়, একদম নিউক্লিয়ার রিয়াক্টর থেকে আসার মতো পোলোনিয়াম। এর পক্ষে যেসব তথ্য প্রমাণ হাজির করা হয়, তা উড়িয়ে দেয়া যায়নি। সুহা আরাফাত নতুন করে তদন্ত করার জন্য আরাফাতের লাশ ওঠানোর কথা বললেন। ফিলিস্তিনের প্রেসিডেন্ট মাহমুদ আব্বাস একমত হলেন।



ইয়াসির আরাফাতকে শেষ সম্মান জানানো

২০১২ সালের ৮ আগস্ট, মৃত্যুর আট বছর পর ইয়াসির আরাফাতের লাশ উঠিয়ে পরীক্ষা করা হলো। পরীক্ষার ফলাফল দেয়া পেছানো হলো ফিলিস্তিনি কর্তৃপক্ষের অনুরোধে, এতে নাকি শান্তি আলোচনায় বিঘ্ন ঘটতে পারে।

২০১৩ সালের ৬ নভেম্বর আল জাজিরা জানায়, সুইস ফরেনসিক টিম আরাফাতের পাজর ও শ্রোণীতে স্বাভাবিকের চাইতে ১৮ গুণ বেশি পোলোনিয়াম পেয়েছে। এক থেকে ছয়ের মাঝে যদি নাম্বারিং করতে হয়, তাহলে তার বিষক্রিয়ায় মারা যাবার সম্ভাবনা ছয়ে ৫। সুহা দাবি করলেন, এটি রাজনৈতিক হত্যা।

রুশ একটি দল স্যাম্পল পাওয়ার পর মতামত দিলো, না, পোলোনিয়ামের কারণে আরাফাত মারা যাননি।



মাহমুদ আব্বাসের সাথে ইয়াসির আরাফাত

২০১৩ সালের ডিসেম্বরে ফরাসি দলও রিপোর্ট প্রকাশ করে- আরাফাতকে বিষ প্রয়োগে হত্যা করা হয়নি, করা হলেও সেটি তাদের ল্যাবের জানা তালিকার কোনো বিষ নয়।

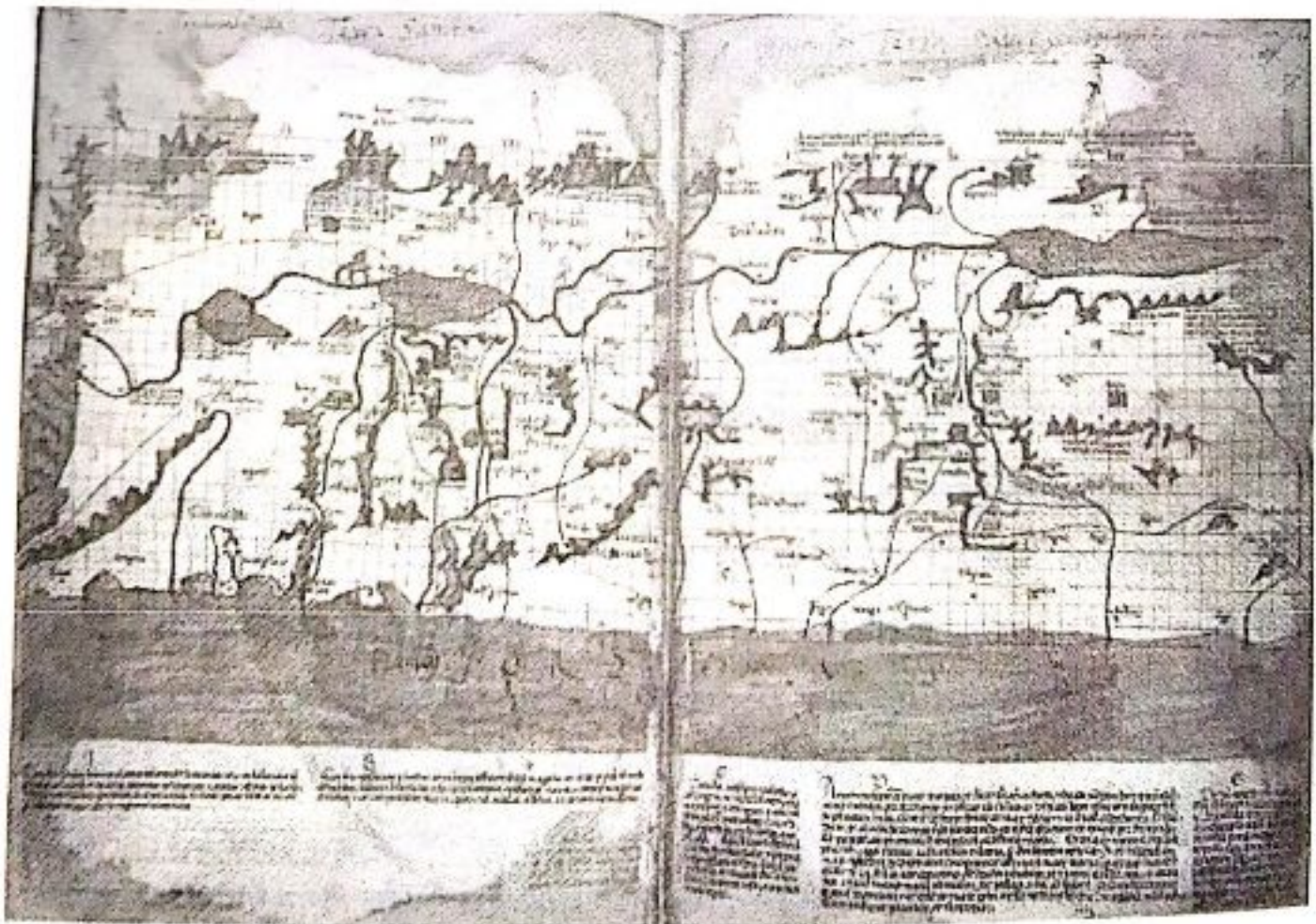
সুহা আরাফাত এবং তার মেয়ে জাওরা আরাফাত প্যারিসে খুনের তদন্তের দাবি করেন। ২০১৫ সালের মার্চে ফ্রান্স জানায়, আরাফাতের মৃত্যু স্বাভাবিক কারণেই হয়েছে। পোলোনিয়াম এবং সীসা নাকি কবরে ভুলক্রমে পাওয়া গিয়েছে।

ইসরাইল বরাবরের মতোই আরাফাতের মৃত্যুতে তাদের কোনো হাত নেই বলে দাবি করে। অ্যারিয়েল শ্যারন যদিও আরাফাতের প্রস্থান চাইতেন, তারপরও ইসরাইলি সাংবাদিক ইয়োসি মেলম্যান রিপোর্ট করেন যে, ইসরাইলি ডিফেন্স ফোর্স আরাফাতকে সরিয়ে দিতে চাইলেও শ্যারন নাকি তাতে ভেটো দেন। আরাফাত নাকি তাদের কাছে এখন অপ্রয়োজনীয় এক চরিত্র।

২০১৭ সালে সুহা ও জাওরা তাদের দাবি দাওয়া নিয়ে ইউরোপিয়ান কোর্ট অফ হিউম্যান রাইটসে যান, তাদের অভিযোগ- ফরাসি কর্তৃপক্ষ তাদের সাথে ন্যায়বিচার করেনি। ২০২১ সালে এই কোর্ট তাদের দাবিকে অগ্রহণযোগ্য বলে প্রত্যাখ্যান করে।

প্রশ্ন : ইহুদীরা বলে যে এটা ‘প্রমিসিং ল্যান্ড’, বিষয়টি আসলে কী?

উত্তর : ‘প্রমিসিং’ নয়, ‘প্রমিজড’। হিব্রুতে বলা হয় ‘হারেৎস হা-মুভতাখাত’ আর আরবিতে ‘আরদ আল-মি’আদ’। ইহুদীদের তাওরাত অনুযায়ী, আল্লাহ ইব্রাহিম (আ) এর সন্তানদের জন্য পবিত্র ভূমির প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন, “সেদিন মাবুদ ইব্রা(হি)মের সঙ্গে নিয়ম স্থির করে বললেন, আমি মিসরের নদী থেকে মহানদী ফোরাতে পর্যন্ত এই দেশ তোমার বংশকে দিলাম; কেনীয়, কনিষীয়, কদমোনীয়, হিট্টীয়, পরিসীয়, রফায়ীয়, আমোরীয়, কেনানীয়, গির্গাশীয় ও যিবূষীয় লোকদের দেশ দিলাম।” (পয়দায়েশ, ১৫:১৮-২১) সে সময় ইব্রাহিম (আ)-এর নাম ইব্রাম ছিল। তিনি পরবর্তীতে ইব্রাহিম (আ)-এর ছেলে ইসহাক (আ) এবং পরবর্তীতে ইসহাক (আ)-এর ছেলে ইয়াকুব (আ)-কেও একই প্রতিশ্রুতির পুনরাবৃত্তি করেন (পয়দায়েশ ২৬:৩ এবং পয়দায়েশ ২৮:১৩)। ইহুদী ও খ্রিস্টান ব্যাখ্যাকারীগণ এ প্রতিশ্রুতির অংশ হিসেবে ইসমাইল (আ) ও তার বংশধরদের মনে করেন না।



১৭২১ সালে আঁকা প্রমিজড ল্যান্ডের মানচিত্র

ইসলামেও অর্থাৎ কুরআনেও মূসা (আ)-এর বরাতে আল্লাহ এ কথা উল্লেখ করেছেন, যেখানে মূসা (আ) বনী ইসরাইলকে বলছিলেন, “হে আমার সম্প্রদায়! আল্লাহ তোমাদের জন্য যে পবিত্র ভূমি লিখে দিয়েছেন তাতে তোমরা প্রবেশ কর এবং পশ্চাদপসরণ করো না, করলে তোমরা ক্ষতিগ্রস্ত হয়ে প্রত্যাবর্তন করবে।” (কুরআন সূরা মায়িদা ৫:২১)

এই হলো ইহুদীদের সেই ‘প্রতিশ্রুত পবিত্র ভূমি’ বা প্রমিজড হোলি ল্যান্ড।

প্রশ্ন : বাংলাদেশে মাদখালি গোষ্ঠীর ষড়যন্ত্র মানুষের সামনে তুলে আনতে কী কী পদক্ষেপ নেয়া যেতে পারে?

উত্তর : মদিনা ইসলামি ইউনিভার্সিটির সুন্যাহ স্টাডিজ বিভাগের প্রাক্তন প্রধান সালাফি ধর্মতত্ত্ববিদ রাবী বিন হাদী ‘উমাইর আল-মাদখালী (১৯৩১-) হলেন মাদখালি আন্দোলনের প্রবক্তা, যা মূলত মুসলিম ব্রাদারহুডের বিরুদ্ধে। অবশ্য সৌদি আরবে এর সমর্থন এখন ক্ষীয়মাণ। মাদখালিরা সেকুলার রাষ্ট্রব্যবস্থা সমর্থন করে থাকে। তাদের মাঝে সৌদি আরবের প্রতি ভক্তি লক্ষণীয়।

তাদের ‘ষড়যন্ত্র’ আছে কি না, থাকলেও তা নিয়ে আলাপ করা এ বইয়ের বিষয়ের সাথে যায় না।

প্রশ্ন : ইয়াসির আরাফাতের পিএলও জনপ্রিয়তা হারানোর কারণ কী?

উত্তর : আমার ধারণা হামাসের সমসাময়িক উত্থান এবং ইয়াসির আরাফাতের ইসরাইলের দাবিদাওয়া অনেকটাই মেনে নিয়ে চুপসে যাওয়া হলো প্রধান কারণ। হয়তো ফিলিস্তিনিরা আশা করেনি, ইয়াসির আরাফাত ইসরাইলের অস্তিত্ব মেনে নেবেন।

প্রশ্ন : হামাস এবং ফাতাহ-এর সংঘাত এর ভবিষ্যৎ কী? বা, আরও স্পষ্ট করে বললে এ দুদলের মাঝে সত্যিকারের সমঝোতা কি সম্ভব নয়?

উত্তর : আমি সমঝোতার লক্ষণ দেখছি না, হয়তো কথাটা খুব নৈরাশ্যবাদী শোনাচ্ছে। একদিকে হামাস পুরোপুরিই অস্বীকার করে ইসরাইলের অস্তিত্ব, সেকুলারিজমের ধারেকাছেও নেই। অন্যদিকে সেকুলার ফাতাহ তো মেনেই নিয়েছে ইসরাইলকে, এখন ফিলিস্তিন শাসন করছে কাগজে কলমে। দুপ্রান্তে থাকা দল দুটো একে অন্যকে মেনে নেয়ার কোনো নিশানাই নেই। ২০১৭ সালে অবশ্য তারা ১০ বছরের সশস্ত্র সংঘর্ষের ইতি টানে নিজেদের মধ্যে।



হামাস ও ফাতাহের নেতাগণ

প্রশ্ন : এ সংঘাত-পরবর্তী গাল্ফ কান্ট্রিগুলোর পিঠ বাঁচানোমূলক পদক্ষেপগুলো কী হতে পারে?

উত্তর : আপনি হয়তো ২০২১ সালের সংঘাতের কথা বলছেন। গাল্ফ দেশগুলোর পিঠ বাঁচাবার জন্য কোনো পদক্ষেপ নিতে হবেই বা কেন? তাদেরকে কেউ আদৌ কোনো জবাবদিহিতার মুখোমুখি করবে বলে মনে হয় না। ফিলিস্তিন ইসরাইল অঞ্চলের যাবতীয় ঘটনা ইন্টারনেট দুনিয়া আর মিডিয়ায় ঝড় তুললেও আসল ব্যাপার কেবল ওই অঞ্চলেই টের পাওয়া যাবে, এর বাইরে কারও টনক নড়বে না।

প্রশ্ন : এবারের (২০২১ সালের) সংঘাতে হিজবুল্লাহর সরাসরি কোনো পদক্ষেপ না দেখার কারণ কী?

উত্তর : হিজবুল্লাহ (حزب الله) অর্থ ‘আল্লাহর দল’, এটি লেবাননের শিয়া সশস্ত্র একটি দল। ১৯৮৫ সালে সায়েদ আব্বাস আল-মুসাওয়াই কর্তৃক এটি প্রতিষ্ঠিত হয়। ইউরোপীয় ইউনিয়নসহ অনেক দেশই হিজবুল্লাহকে সন্ত্রাসী দল হিসেবে আখ্যা দিয়েছে, তবে রাশিয়া দলটিকে বৈধজ্ঞান করে। হিজবুল্লাহর বিখ্যাত স্লোগান- “আমরা জেরুজালেমে নামাজ পড়বো।”

২০২১ সালের গাজা সংঘাতের সময় কেন হামাসকে হিজবুল্লাহ সহযোগিতা করেনি, সেজন্য অনেকেই হিজবুল্লাহকে ভণ্ড ডেকেছেন, তাদের উদ্দেশ্য ইরানের ইচ্ছেপূরণ ছাড়া কিছুই নয়-এমনটাই তাদের মন্তব্য। হিজবুল্লাহর ফোর্স লেবানন,

সিরিয়া, ইরাক ও ইয়েমেনে ছড়িয়ে ছিটিয়ে ছিল, তাই তারা হামাসের সাথে যোগ দেয়নি, এমনটাই অনেকের দাবি।



উল্লেখ্য, সৌদি আরব এই হিজবুল্লাহকে হুমকি মনে করে, আবার হিজবুল্লাহ সৌদি বাদশাহকে সম্রাসী ডেকেছে

প্রশ্ন : ইসরাইল কি পরবর্তীতে এমন কোনো যুদ্ধের সৃষ্টি করতে পারে যা ইসরাইলকে গ্রেটার ইসরাইলে রূপান্তর করবে?

উত্তর : আপনি যদি গ্রেটার ইসরাইল বলতে বুঝিয়ে থাকেন প্রতিশ্রুত ভূমির পূর্ণ মানচিত্রের সমান সীমানা করা, তাহলে সেটি হতেই পারে। যদি এর বাইরে কোনো দেশকে এমনই অধিকৃত করতে চাওয়া বুঝিয়ে থাকেন, তাহলে আমার ধারণা এমনটা ইসরাইলের করার কথা না, কারণ সেটিকে জাস্টিফাই করার মতো তাওরাতীয় আদেশ বা পূর্বপুরুষের অধিকার- কোনোটিই ইসরাইল দেখাতে পারবে না। ‘জায়োন’-এর সাথে অন্য ভূমি যায় না।

প্রশ্ন : রাশিয়ার কোনো হস্তক্ষেপ এ সংঘাতে এখনো না দেখার কারণ কী, যেখানে তুরস্কের সাথে সম্পর্কের জের ধরে তারা চাইলেই আসতে পারত ময়দানে?

উত্তর : রাশিয়ার সাথে ইসরাইলের সম্পর্ক ভালো, ইসরাইল চায় না এ সম্পর্ক বিঘ্নিত হোক। প্রায় ১ লাখ ইসরাইলি বসবাস করে রাশিয়াতে, যার মধ্যে ৮০,০০০ থাকে মস্কোতে। ইসরাইলে প্রায় ১৫ লাখ রুশ ভাষায় কথা বলা ইসরাইলি নাগরিক থাকে। রাশিয়ার প্রথম কোভিড-১৯ ভ্যাক্সিন তৈরিতে সাহায্য করে ইসরাইলি প্রতিষ্ঠান হাদাসসা। পুতিনের সরকারের সাথে ইসরাইলের

সুসম্পর্ক, এমনকি ২০২২ সালে ইউক্রেন আয়রন ডোম কিনতে চাইলেও ইসরাইল বিক্রি করেনি, কারণ তারা রাশিয়ার সাথে সম্পর্ক খারাপ করতে চায় না। তাই আমার মনে হয় না এরকম ক্ষেত্রে রাশিয়া আদৌ ইসরাইলের কোনো সংঘাতে হস্তক্ষেপ করবে, যদিও স্নায়ুযুদ্ধের সময় রাশিয়ার বিরোধী ছিল একসময় ইসরাইল।



ভ্লাদিমির পুতিন এবং নাফতালি বেনেট; ২২ অক্টোবর, ২০২১

প্রশ্ন : মার্কিন সিনেটে ফিলিস্তিনের পক্ষে ডাক ওঠাকে কীভাবে দেখছেন?

উত্তর : চমৎকার ব্যাপার। মনে হচ্ছে পরিবর্তন আসছে, কেবল ইসরাইলের পক্ষেই ক্রমাগত বলে যাওয়ার বদলে অন্যায়ের বিরুদ্ধে বলা স্বরও উঠে আসছে। নিউইয়র্ক টাইমস পত্রিকাও যে ফিলিস্তিনের পক্ষে লিখেছে, সেটিকে স্বাগত জানাই।

প্রশ্ন : আরবদের কি আসলেই সেই সক্ষমতা নেই যে এরা গোলামি থেকে বের হয়ে একটু ইনসাফের এহলান করুক?

উত্তর : সক্ষমতা হয়তো আছে, ইচ্ছেটা নেই সেভাবে। তারা ব্যবহারিক লাভ দেখতে চায়, যেটা হয়তো ইসরাইলের সাথে শত্রুতার মাঝে তাদের জন্য নিহিত নেই।

প্রশ্ন : ইসরাইল কেন ফিলিস্তিনিদের সাথে এক রাষ্ট্র গঠন করেনি?

উত্তর : টেকনিকালি ইসরাইল এক রাষ্ট্রই চেয়েছে। যে রাষ্ট্রে ফিলিস্তিনিরা নাগরিক থাকবে- ইসরাইলি নাগরিক, আর ক্ষমতায় থাকবে ইহুদীরা। এ মুহূর্তে কিন্তু ইসরাইলের রাষ্ট্র ভাষা হিব্রু পাশাপাশি আরবিও। কেবল রাষ্ট্রধর্ম একটিই- ইহুদী ধর্ম।

প্রশ্ন : ইসরাইল কি শুধু রাষ্ট্রের জন্যই এত সব করেছে নাকি তাদের ধর্মের জন্য? তাদের মূল কনফ্লিক্ট কি শুধু মুসলিমদের সাথে নাকি অন্য ধর্মের সাথে?

উত্তর : ইসরাইলের ক্ষমতায় থাকা কর্তৃপক্ষ মূলত জায়োনিস্ট। অর্থাৎ তারা পবিত্র ভূমিতে ইহুদীদের ফিরে আসা চায়। ‘পবিত্র ভূমি’ ব্যাপারটি কেবলই ধর্মীয় আবেগ। অর্থাৎ তারা এমনটি ধর্মের জন্যই করেছে, তাদের রাষ্ট্রধর্মও যেহেতু ইহুদী। কিন্তু আমার মতে, ধর্মটাকে তারা কাজে লাগালেও আসলে অনেকেই আছে যারা ধর্মীয় কারণে কাজগুলো করেছে না, তারা কেবল এই ভূমিটা চায়। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, অনেক ধর্মপ্রাণ সাধারণ ইসরাইলি ইহুদীও জায়োনিজমের বিরুদ্ধে! ফিলিস্তিনি খ্রিস্টানরা ইসরাইলিদের কাছে একই রকম ব্যবহার পায়, অর্থাৎ ফিলিস্তিনি মুসলিমদের থেকে বিশেষ আলাদা নয়। ফিলিস্তিনি খ্রিস্টানরা একে ইহুদী বনাম মুসলিম সংঘর্ষ মানতে নারাজ, বরং এটা তাদের কাছে জাতীয়বাদের সংঘর্ষ।

এ ব্যাপারে একটা জিনিস বলতে ইচ্ছে হচ্ছে, আমেরিকান অনেক খ্রিস্টান এই যুক্তিতে জায়োনিজমকে সমর্থন দেন যে, ইহুদীরা ফিলিস্তিনে ফিরে গেলে এবং সেখানে থার্ড টেম্পল প্রতিষ্ঠা করলে যীশু খ্রিস্ট ফেরত আসবেন। এর পর যা হবার দেখা যাবে।

প্রশ্ন : আইখম্যান সম্পর্কে জানা যায়, তিনি নাকি ফাঁসির আগে ইহুদী ধর্ম গ্রহণ করতে চেয়েছিলেন এজন্য যে, মৃত্যুর আগে আরেকজন ইহুদীর মৃত্যু দেখে যেতে চেয়েছেন। এটি কি সত্যি?

উত্তর : আমি এমন কিছু জানি না। ১৯৬১ সালে অ্যাডলফ আইখম্যানের গুনানি হয়। তিনি ইসরাইলি প্রেসিডেন্টের কাছে ক্ষমা চান, বলেন, “আমি যোগ্য নেতা ছিলাম না, তাই আমি দোষী নই।” অর্থাৎ তিনি নাকি কেবল আদেশ পালন করছিলেন, ইহুদী গণহত্যা তার সিদ্ধান্ত ছিল না। ক্ষমা চাওয়ার সাথে তার ইহুদী হতে চাওয়ার ইচ্ছার কোনো মিল পাচ্ছি না, তাই অসত্যই মনে হচ্ছে আমার কাছে। এমন বক্তব্য প্রদানের দুদিন পর রামলার জেলখানায় তাকে ফাঁসিতে ঝোলানো হয়।



আইখম্যানের ট্রায়াল

প্রশ্ন : জাতিসংঘ তো স্বীকার করে যে ইসরাইল দখলদারি করছে। তবে কেন এর বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নিচ্ছে না? ডিটেইলস বলবেন। ভেটো দেয়ার পিছনে প্রতিবার রিজন কী দাঁড় করায় আমেরিকা? কেন ভেটো সিস্টেম বাদ দেয়া যায় না?

উত্তর : ২০২১ সালের মে মাস পর্যন্ত জাতিসংঘের নিরাপত্তা পরিষদে ইসরাইল প্রশ্নে ৫৩ বার ভেটো দিয়েছে যুক্তরাষ্ট্র। তাদের প্রতিবারের যুক্তি থাকে “ইসরাইলের অধিকার রয়েছে নিজেকে প্রতিরক্ষার” এবং ফিলিস্তিনের পক্ষে কথা বললে বলা হয় “এটি একপক্ষীয় বিবৃতি”। এসবের কারণে জাতিসংঘ চাইলেও অনেক সময় কিছু করতে পারে না।

ভেটো সিস্টেম ওঠানো যাবে না কারণ এতে করে কয়েকটি দেশ সংখ্যাগরিষ্ঠতা নিয়ে কোনো হঠকারী সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেলতে পারে।

প্রশ্ন : তুরস্ক কেন ১ম বিশ্বযুদ্ধে অংশগ্রহণ করেছিল?

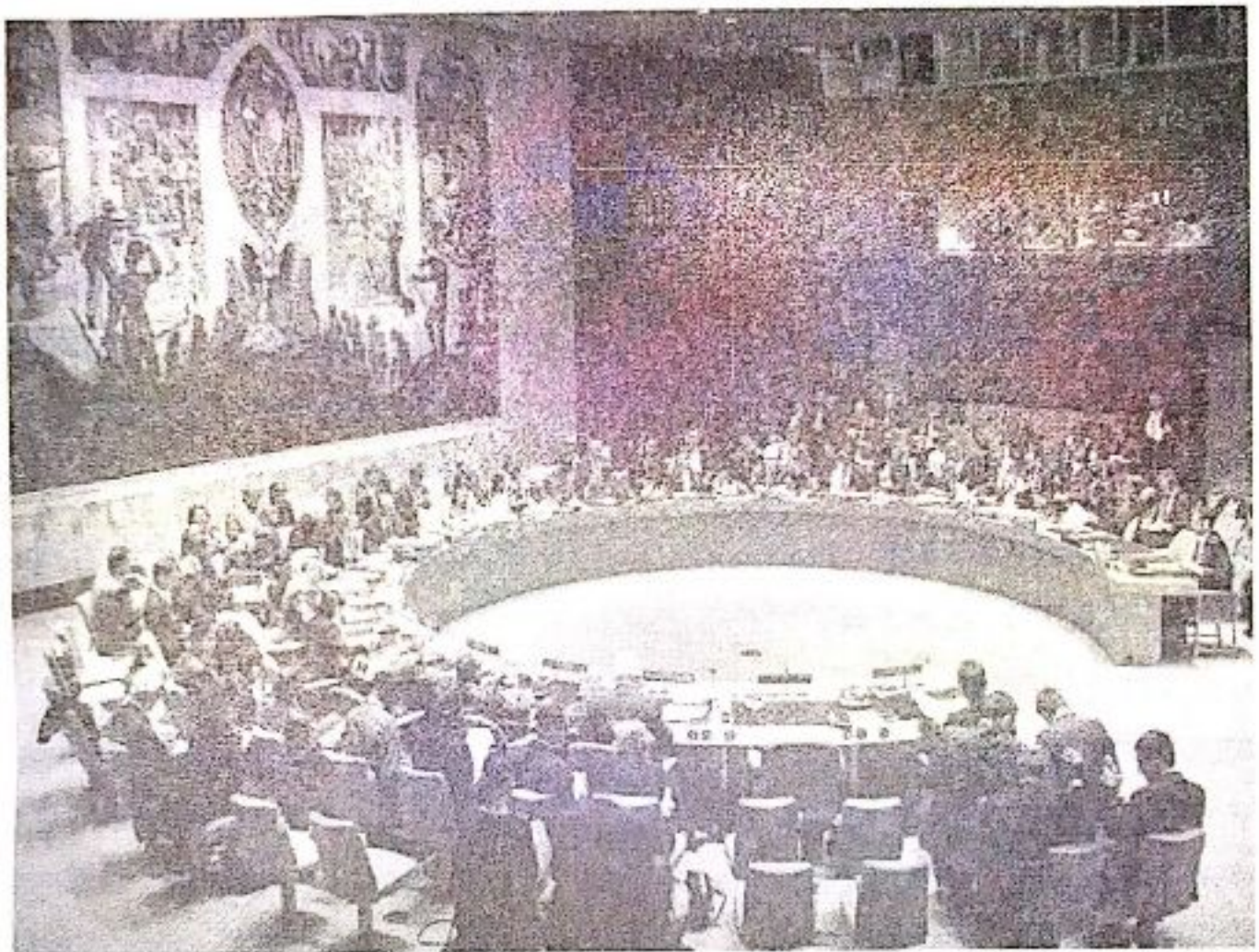
উত্তর : এর উত্তর অন্য কোনো বই বা মাধ্যমে দেব ইনশাআল্লাহ।

প্রশ্ন : ইহুদীরা এত ধনী কীভাবে হলো?

উত্তর : এখানে একটা ভুল ধারণা রয়েছে। অনেক ধনী ইহুদী আছে মানে এই না যে সকল ইহুদীই ধনী এবং সফল। অনেক দরিদ্র অসচ্ছল ইহুদী আছে

২৯২ ইসরাইলের উত্থান-পতন

পৃথিবীতে। কিন্তু তাদের ধনাঢ্যতা বেশি চোখে পড়ে, কারণ শতাংশ হিসেব করলে অ-ইহুদীদের তুলনায় ইহুদীদের মাঝে সফলতা ও ধনী বনে যাওয়ার অংশটা বেশি। ইহুদীদেরকে যদি আমরা একটি এথনিক গ্রুপ ধরি, মুসলিমদের যদি ধরি (আসলে ধরা যায় না), খ্রিস্টানদেরকে ধরি (এটিও ধরা যায় না) এবং হিন্দুদেরকে ধরি, তাহলে পার ক্যাপিটা (জনপ্রতি) আয় দেখা যাবে ইহুদীদের এথনিক গ্রুপে বেশি।



জাতিসংঘের নিরাপত্তা কাউন্সিল

এর পেছনে কিছু কারণ আছে। ঠিক কেন তা বলা না গেলেও, ইহুদীদের মাঝে আইকিউ টেস্ট করলে গড়ে তা অন্যান্য এথনিক গ্রুপের চাইতে বেশি আসে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের জরিপেই তা পাওয়া যাবে। ইহুদীদেরকে খুব ছোটবেলা থেকে কঠোরভাবে পড়ালেখা করানো হয়, যেমনটা অন্যান্য এথনিক গ্রুপে পরিলক্ষিত হয় না। তাদেরকে সফল হতে হবেই— এমন একটি ধারণা গেঁথে দেয়া হয় ধর্মপ্রাণ ইহুদী পরিবারগুলোতে, এর সাথে উচ্চ আইকিউ যোগ হয়ে সফলতার হার বেশিই থাকে। এখন আপনি যদি বিশ্বজুড়ে সকল ব্যাংক ইহুদীরাই নিয়ন্ত্রণ করে কি করে না— এরকম তত্ত্বের ব্যাপারে জানতে চান, সেক্ষেত্রে অবশ্য এ উত্তর খাটে কি না, বলতে পারছি না।

প্রশ্ন : ইহুদীরা কীভাবে আমেরিকার পলিটিস্ক নিয়ন্ত্রণ করে?

উত্তর : মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে ‘ইসরাইল লবি’ বা ‘জায়োনিস্ট লবি’ নামে যে লবি রয়েছে জায়োনিস্টদের, তার মধ্য দিয়েই আসলে রাজনীতি নিয়ন্ত্রণ হয়। এটি আসলে গোপন কিছুও নয় যে লুকিয়ে লুকিয়ে হয়। আমি তোমার নির্বাচনী ক্যাম্পেইনে টাকা দেব, তুমি জিতলে আমাকে এই এই ফেভার করবে— এটিই এই লবির কার্যপ্রণালী। এখন লবি যদি লাল বনাম নীল দুই দলেই টাকা দেয়, তাহলে কোনো না কোনো দল তো জিতবেই, আর রিটার্ন আসবেই। টাকা দেয়া দল জেতা মানে পরের বছরগুলো লবির ইন্টারেস্ট অনুযায়ী কিছু কাজ হবে। এই হলো নিয়ন্ত্রণের মূলনীতি।

সবচেয়ে বড় প্রো-ইসরাইল মার্কিং লবিং গ্রুপ হলো ক্রিস্টিয়ানস ইউনাইটেড ফর ইসরাইল। আর দ্বিতীয়টি হলো আইপ্যাক (আমেরিকান ইসরাইল পাবলিক অ্যাফেয়ারস কমিটি)। উল্লেখ্য, সদস্যরা সবাই ইহুদী তা কিন্তু নয়, খ্রিস্টান জায়োনিস্ট হতেই পারে। উনিশ শতক থেকেই এই লবিং চলে আসছে। আইপ্যাক সরাসরি প্রার্থীকে ডোনেট করে না, বরং ডোনেশন ম্যানেজ করে দেয়।

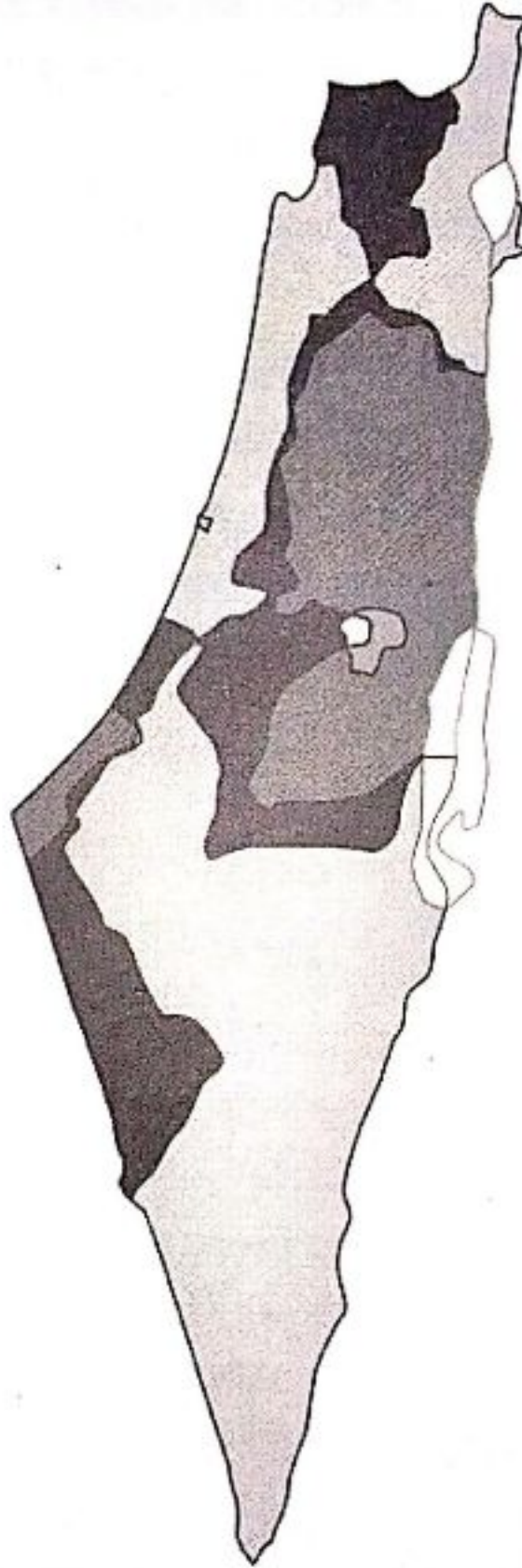
প্রশ্ন : আন্তর্জাতিক সংস্থা জেরুজালেমকে ফিলিস্তিনিদের বলে স্বীকার করে কেন? যেহেতু যুদ্ধে ইসরাইলের জয় হয়েছে। কোন আইন বলে এটা আসলে?

উত্তর : জেরুজালেম শহরের পূর্ব জেরুজালেম নিয়েই যত কোন্দল, যার মাঝে ওল্ড জেরুজালেম অন্তর্গত, সেখানেই তিন সেমিটিক ধর্মের যাবতীয় পবিত্র স্থাপনা। ১৯৬৭ সালের যুদ্ধের মধ্য দিয়ে ইসরাইল এই পূর্ব জেরুজালেম দখল করে নেয়, এবং ফিলিস্তিন এখনও ভবিষ্যৎ ফিলিস্তিন রাষ্ট্রের রাজধানী হিসেবে বিবেচনা করে জেরুজালেমকে। ইসরাইল বর্তমানে ‘অবিভক্ত’ জেরুজালেম শহরকে তাদের রাজধানী হিসেবে শনাক্ত করে, মিত্র মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রও এতে সমর্থন দিয়েছে। তবে এর বাইরে খুব বেশি দেশ এর সমর্থনে নেই। জাতিসংঘের মতে ইসরাইলের পূর্ব জেরুজালেম দখল আন্তর্জাতিক আইন ভঙ্গ করে, কারণ আসলে এই জায়গায় ইসরাইলিরা ছিল না আগে থেকে। আইনটি হলো UN Security Council Resolution 478।

প্রশ্ন : জাতিসংঘ কীভাবে ৫৫:৪৫ এর ভিত্তিতে প্যালেস্টাইন ইসরাইল ভাগ করলো? ইহুদী তখন বেশি ছিল না।

উত্তর : ৫৫%-৪৫% কি না, নিশ্চিত করে বলতে পারছি না, তবে জাতিসংঘ তিনভাগে ভাগ করতে চেয়েছিল দেশটিকে— আরব রাষ্ট্র, ইহুদী রাষ্ট্র এবং জেরুজালেম শহর। ইহুদীদের জন্য রাখা হয়েছিলো উর্বর পূর্ব গালিলি, তীরবর্তী

সমভূমি এবং নেগেভ মরুর বেশিরভাগ। অবশ্য এতে ইহুদীরা সম্ভ্রষ্ট ছিল না, আরবরাও না। ইহুদীদের অংশে সেসব এলাকা রাখার চেষ্টা করা হয়েছিল, যেখানে ইহুদী কমিউনিটি একটু বেশি, যদিওবা ওই একই এলাকায় প্রচুর মুসলিম আছে। তার মানে ইসরাইল রাষ্ট্রে বেশিরভাগ ইহুদী কমিউনিটিকে রাখার মাধ্যমে একটি বড় মুসলিম জনগোষ্ঠী ঢুকে যাবে।



কালো ও ধূসর এলাকা রাখা হয় মুসলিমদের জন্য, আর বাকিটা ইহুদীদের জন্য (জাতিসংঘ পার্টিশন প্ল্যান)

প্রশ্ন : ডোম অফ রকের নিচে কি টেম্পল আছে? ৩৯০০ বছর আগের ইতিহাস পুরোটা জানতে চাই।

উত্তর : না, সেখানে টেম্পল নেই। ওয়েল অফ সোলস আছে। পুরো ইতিহাস জানতে 'ইহুদী জাতির ইতিহাস' ও 'ইসরাইলের উত্থান-পতন' পড়তে হবে।

প্রশ্ন : ইসরাইল বর্তমান প্যালেস্টাইনিদের নিয়ে কী ভাবে? এত এত রিফিউজি বাইরে আছে তাদের নিয়ে তাদের মতবাদ কী? এতগুলো মানুষ কী করবে?

উত্তর : কিছু ভাবে বলে তো মনে হয় না। ভ্যাক্সিনের ক্ষেত্রে আমরা দেখেছি যে ফিলিস্তিনিরা পরবর্তীতে ভ্যাক্সিন পেয়েছে, আগে বা একই সময়ে নয়।

প্রশ্ন : যুক্তরাষ্ট্র কীভাবে ইসরাইলকে এত পরিমাণ সাহায্য করার বিল পাশ করে? কেন করে?

উত্তর : এ প্রশ্নের উত্তর আমার মনে হয় বিভিন্ন রূপে দিয়ে ফেলেছি ইতোমধ্যে।

প্রশ্ন : হামাসের ইতিহাস, ইয়াসির আরাফাতের রাজনৈতিক দর্শন জানতে চাই।

উত্তর : হামাস এবং ইয়াসির আরাফাত নিয়ে আলোচনা হয়ে গিয়েছে আগেই।

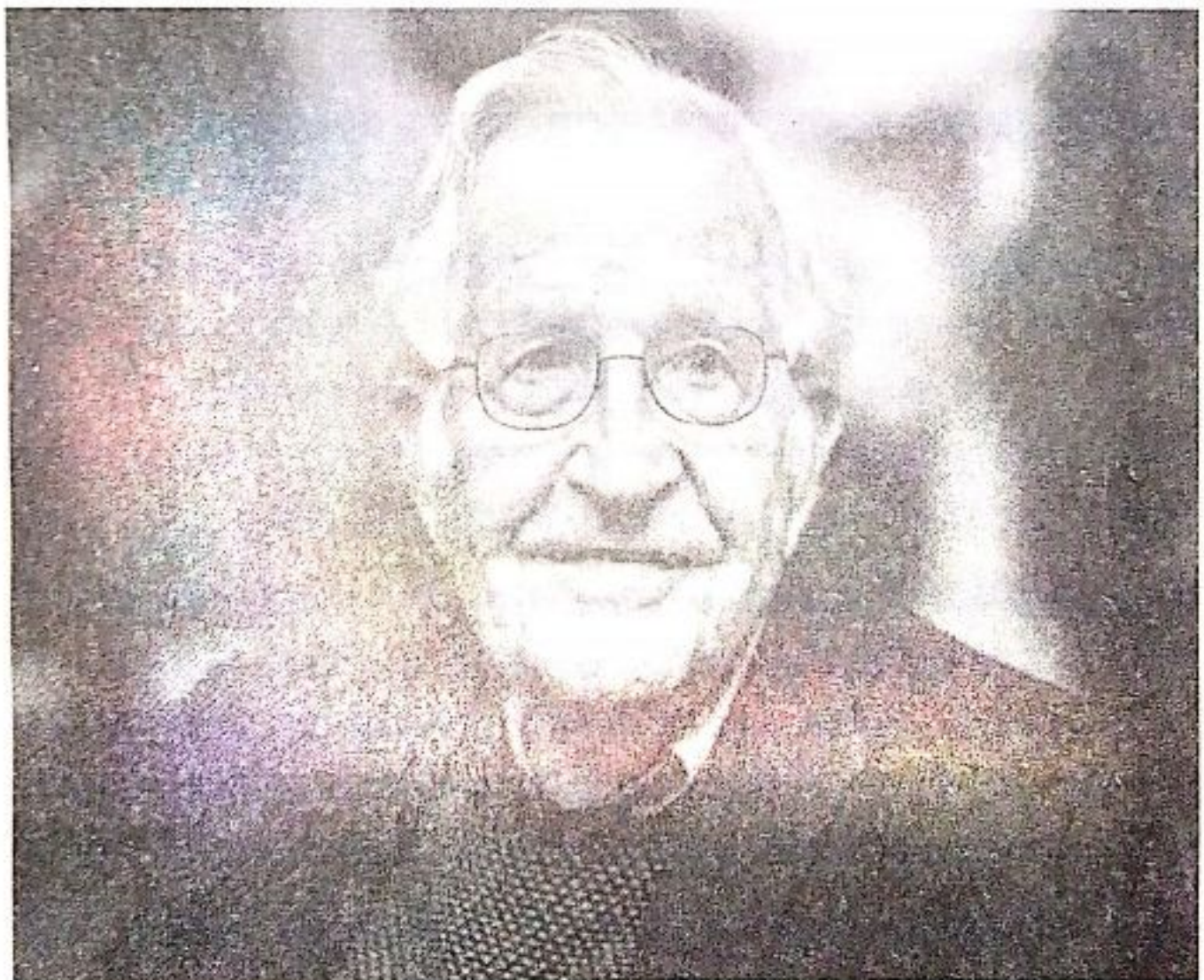
প্রশ্ন : যারা টু স্টেট সল্যুশনের পক্ষপাতী, আমি তাদেরকে ফিলিস্তিনিদের জায়গায় নিজেদের কল্পনা করতে বলবো না। ইমাজিন করতে বলবো- ধরুন উড়ে এসে জুড়ে বসা কোনো দেশ না, পাশের দেশ মায়ানমারই এসে আপনার ভূমি কেড়ে নিল, ৫০ বছর আপনার ওপর তাগুব চালালো, আপনাকে ভালো খাবার খেতে দেয় না, চাকরি/ব্যবসা/বাণিজ্য কিছু করতে দেয় না, হাসপিটাল চালাতে দেয় না, মসজিদে যেতে দেয় না, আপনি প্র্যাগ্টিসিং মুসলিম না বাট দে ডোন্ট কেয়ার, আপনার মুসলমান নামের কারণে মানবেতর জীবনযাপন করছেন। এখনো কি আপনি নিজে টু স্টেট সল্যুশন চান বা আরেকজনের টু স্টেট সল্যুশন মেনে নেবেন? কেন নেবেন? যুক্তি কী? যারা বিশ্বাস করেন হামাসের রকেট মারার কাজ ঠিক না- কারণ এটা অন্যায়, তাহলে কী করবে তারা বলেন। পশ্চিম তীর তো অস্ত্র ছেড়ে দিয়ে স্বেভ লাইফ যাপন করছে। কারণ এই করে আরো ইসরাইল গাজায় বেশি আক্রমণ করবে, বেশি মানুষ মারবে। একই কথা। আপনার পরামর্শ কী? সল্যুশন কী?

উত্তর : আমার তো মনে হয় না এটা এখন উভয় পক্ষ মেনে নেবে, এমন মধ্যমপন্থী কোনো সমাধান আছে। দিতে পারলে আমিই নোবেল শান্তি পুরস্কারটা পেয়ে যেতাম। এখন হলো, হয় এম্পার নয় ওম্পার পরিস্থিতি।

প্রশ্ন : i) If American Israelis aren't mostly Zionist then how come Israel relentlessly get assistance from American tech giant like Facebook, Twitter, Google & so on? (যুক্তরাষ্ট্রের ইসরাইলিদের বেশিরভাগ জায়োনিষ্ট না হলে ইসরাইল কীভাবে প্রতিনিয়ত মার্কিন টেক কোম্পানি ফেসবুক, টুইটার, গুগল ইত্যাদি থেকে নিয়মিত সাহায্য পাচ্ছে?)

ii) Being a Jew, Noam Chomsky & Norman Finkelstein show support & often pave the way for Palestinian with information and opinion. But why are they not targeted and silenced yet by Israeli Secret Service? (ইহুদী হয়েও নোম চমস্কি ও নরম্যান ফিন্কেলস্টাইন অনেক সময়ই ফিলিস্তিনের সমর্থনে কথা বলেন, তাদের পথ বাতলে দেন। মোসাদ কেন তাদের টার্গেট করে খুন করছে না?)

উত্তর : ফেসবুক, টুইটার, গুগল কী সাহায্য করে জানি না, তবে তারা ইসরাইলের প্রতি আগ্রহী কারণ বিশ্বের সবচেয়ে বড় টেক হাবগুলোর একটি হবার জন্য এগিয়ে যাচ্ছে দেশটি।



নোম চমস্কি

নোম চমস্কি কিংবা ফিল্ডেলস্টাইনের মতো হাজার হাজার মহারথী রয়েছেন যারা ইসরাইলের বিরুদ্ধে কথা বলে, খোদ ইসরাইলেই এরকম অ্যান্টি-জায়োনিজম ইহুদী আছেন, যা বাইও আছেন। কিন্তু ইসরাইলি সিক্রেট সার্ভিস তাদের কাউকে চুপ করিয়ে দেয় না। যতক্ষণ না দেশটির বাস্তবিক ক্ষতি করছে কেউ, তাদের কোনো মাথা ব্যথা আছে বলে মনে হয় না। বাস্তবিক বলতে, দেশটির বিরুদ্ধে পারমাণবিক অস্ত্র বানিয়ে ফেলা, কিংবা ওই দেশের ক্রীড়াবীদদের হত্যা করা, কিংবা হলোকস্ট করা, বা দেশের জন্য হুমকি হয়ে দাঁড়ানো, ইত্যাদি সমমানের কাজ বুঝালাম।

প্রশ্ন : অনেক সময় শুনি যে ইহুদী বা ইসরাইলি বা জায়োনিষ্টরা পুরো পৃথিবীর অর্থনীতি, রাজনীতি নিয়ন্ত্রণ করে; এটার ভিত্তি কী?

উত্তর : অর্থনীতি নিয়ন্ত্রণ করে, এটার কারণ হিসেবে হয়তো বিশ্বের শীর্ষস্থানীয় ব্যাংকগুলোতে ইহুদী মালিকানা থাকাকে দেখানো হয়। আমি কোনো ষড়যন্ত্র তত্ত্ব প্রমাণ ছাড়া বলতে চাই না, তাই এটি নিয়ে বেশি দূর এখানে লিখলাম না।

আর রাজনীতি নিয়ন্ত্রণ পুরোই লবিংয়ের 'মাধ্যমে', এটি গোপন নয়। যুক্তরাষ্ট্রের রাজনীতি নিয়ন্ত্রণ করতে পারলে, অন্যান্য দেশকেও প্রভাবিত করাই যায়।

প্রশ্ন : ইহুদী আর খ্রিস্টানরা তো জাতিগতভাবে এক না, আগেও উভয় পক্ষ বিরোধী ছিল একে অপরের, তাহলে এখন খ্রিস্টানরা কেন ওদের সমর্থন দিচ্ছে?

উত্তর : রাজনৈতিক সমর্থন কেন দিচ্ছে, তা তো বললামই আগে। কিন্তু আগে তারা একে অপরের শত্রু থাকলেও, এখন অনেক খ্রিস্টান যীশুর দ্বিতীয় আগমনকে ত্বরান্বিত করতে ইহুদীদের জেরুজালেম অধিকারকে সমর্থন করে।

প্রশ্ন : এই সংঘাত কি শুধুমাত্র রাজনৈতিক নাকি ধর্মীয়ও? ইহুদীরা কি আসলেই দাজ্জালের জন্য অপেক্ষা করছে? তাহলে খ্রিস্টানদের লাভ কী?

উত্তর : ধার্মিক ইহুদীরা তাদের মাসিহের জন্য অবশ্যই অপেক্ষমান, এ বিষয়ে কোনো লুকোছাপা নেই। সেটি দাজ্জাল কি না, তা ইসলামি ধর্মবিশ্বাস অনুযায়ী। ইহুদী বিশ্বাস নয়। খ্রিস্টানদের লাভ তো সেই যীশুর দ্বিতীয় আগমন!

প্রশ্ন : ফিলিস্তিনিদের আন্দোলন কি শুধুমাত্র জাতীয়তাবাদী আন্দোলন নাকি ইসলামি আন্দোলনও? ইরান, তুরস্ক, কাতার কেন ওদের সাহায্য করছে? রাজনৈতিক নাকি ধর্মীয় কারণে?

উত্তর : অনেক ফিলিস্তিনি লড়ে ধর্মের জন্য, অনেকে লড়ে আরব জাতীয়তাবাদের জন্য, অনেকে লড়ে আমার জায়গা জমি ছাড়া আমি যাব না, এটা আমার অধিকার- এজন্য। সারা বিশ্বের মুসলিমদের মাঝে বেশিরভাগই ধর্মীয় ও মানবিক কারণে একে সমর্থন দেয়, আর অনেকে দেয় কেবলই নৈতিক কারণে। আমি একটা বইতে পড়েছিলাম, একজন ফিলিস্তিনিদের সংগ্রামে যোগদান করেছিলেন ধর্মপ্রাণ হিসেবে, কিন্তু সেখানকার ফিলিস্তিনি যোদ্ধাদের একটি ছোট দলের কেবল জাতীয়বাদী উচ্ছ্বাস দেখে তিনি হতাশ হয়ে পড়েন, কারণ তার ধারণা ছিল এখানে সবাই বুঝি ইসলামের কারণেই যুদ্ধটা চালিয়ে যাচ্ছে, অথচ কেউ যে নিজের মাতৃভূমির জন্যও লড়তে পারেন, এমনটি তার মাথাতে আসেনি। এটা বুঝতে হবে যে ফিলিস্তিনি মিলেনিয়ালদের মাঝে ধর্মের আবেগ আর আট দশটি দেশের তরুণদের মতোই।

কোনো কোনো দেশ ধর্মীয় কারণে সাহায্য করে, কেউ বা করে শুধুই রাজনৈতিক কারণে; যারা সাহায্য খামিয়ে দেয়, তারা রাজনৈতিক কারণেই করত সাহায্য।

প্রশ্ন : ইসরাইলকে শায়েস্তা করার জন্য সব আরব দেশ ৭০ বছরেও এক হতে পারলো না কেন?

উত্তর : আরবদের মাঝে এ বিষয়ে ঐক্য লাভ হয়নি আর কি। হয়তো রাজনৈতিক ফায়দা নেই।

প্রশ্ন : ফিলিস্তিন বিভিন্ন সময়ে কার অধীন ছিল? মহানবী হযরত মুহাম্মাদ (সা)-এর পর থেকে।

উত্তর : এ ইতিহাস আপনি এ বইতেই পেয়ে গিয়েছেন।

প্রশ্ন : শক্তিদর মুসলিম রাষ্ট্রগুলো ফিলিস্তিন ইস্যুতে কেন বলিষ্ঠ ভূমিকা রাখে না?

উত্তর : ইতোমধ্যে আলোচিত হয়েছে।

প্রশ্ন : ইহুদীদের মেসিয়াহর (Messiah) ধারণাটা কী রকম? মুসলিমরা দাজ্জালের যেসব বৈশিষ্ট্য বলে হাদিস থেকে, সে বৈশিষ্ট্যগুলো কি ইহুদীদের মেসিয়াহর সাথে মিলে যায়? তারা কীভাবে বুঝবে যে তাদের মেসিয়াহ আসার সময় হয়ে গিয়েছে?

উত্তর : বাইতুল মুকাদ্দাসের পুনর্নির্মাণকে তারা লক্ষণ হিসেবে ধরে নেয়। মাসিহ নিয়ে আলোচনা আমি মূল বইতেই করেছি। আশা করি উত্তর পাওয়া যাবে।

প্রশ্ন : জেরুজালেম কি কেবল ধর্মীয় কারণেই গুরুত্বপূর্ণ? নাকি এর কোনো অর্থনৈতিক বা ভূতাত্ত্বিক গুরুত্ব আছে?

উত্তর : এর বিশেষ কোনো আলাদা অর্থনৈতিক বা ভূ-তাত্ত্বিক গুরুত্ব নেই।
এর যদি কোনো ধর্মীয় গুরুত্ব না থাকত, তাহলে কোনো যুদ্ধই হতো না।

প্রশ্ন : আরব দেশগুলো কি আদৌ ইসরাইলকে স্বীকৃতি দিত? কবে এবং কেন তাদের মতের পরিবর্তন হয়? ইসরাইল কবে পর্যন্ত আরবদের স্বীকৃতির জন্য লালায়িত ছিল? কবের কোন ঘটনার পর থেকে তারা বেরোয়া হয়ে ওঠে এবং এখন মত ড্যাম কেয়ার আচরণ করতে শুরু করে? ইসরাইল ফিলিস্তিন ইস্যুর সুষ্ঠু সমাধান কী বলে জনাব আব্দুল্লাহ ইবনে মাহমুদ মনে করেন? ব্যক্তি আব্দুল্লাহ ইবনে মাহমুদ কি নিজস্ব মতাদর্শের দ্বারা কিঞ্চিৎ হলেও প্রভাবিত এই সমাধানে? আব্দুল্লাহ ইবনে মাহমুদের লেখকসত্তা কী বলে? টু স্টেট সল্যুশন কি এখন আর সম্ভব? বর্তমান পরিস্থিতিতে সাধারণ জনগণের কী করণীয়? ইসরাইলের জুতোয় দাঁড়িয়ে দেখলে বিষয়টা কেমন দেখায়?



১৯৬৭ সালেরও আগে ১৯৪৮ সালে এভাবে আরবদের চলে যেতে বাধ্য করে ইসরাইল

উত্তর : আরব দেশগুলো একটি পর্যায়ে বেশিরভাগই স্বীকৃতি দিয়ে দেবে ইসরাইলকে, অবস্থাদৃষ্টে এমনটিই মনে হচ্ছে। আরবদের স্বীকৃতি অর্জন মানে ইসরাইলকে কম ঝামেলা পোহাতে হবে, এদিক থেকে এর চাহিদা আছে ইসরাইলের। আমার মতে, ১৯৬৭ সালের যুদ্ধটি ছিল ইসরাইলের জন্য বড় টার্নিং পয়েন্ট, তখন থেকেই পরোয়া না করা আচরণ তাদের।

ইসলামি দৃষ্টিকোণ থেকে চাওয়া হলো ফিলিস্তিনি রাষ্ট্র পূর্ণ প্রতিষ্ঠা, কিন্তু আমাকে যদি ব্যবহারিক বাস্তবসম্মত সমাধানের কথা বলতে বলা হয়, তাহলে আমি বলব ওয়ান স্টেট সমাধানের কথা। যে যত কিছুই বলুক, এই ভূমিতে ফিলিস্তিনি খ্রিস্টান, ফিলিস্তিনি মুসলমানের পাশাপাশি খাঁটি ফিলিস্তিনি ইহুদীদের সত্যিকার অর্থেই বসবাস ছিল, এদের সবারই এখানে থাকার অধিকার রয়েছে—তাদের কথা বলছি, যারা যুগ যুগ ধরে এখানে বসবাস করে এসেছে, যারা হাজার হাজার বছর আগে পালিয়ে গিয়েছে অন্য কোথাও তাদের কথা নয়, হয়তো লতায় পাতায় তারা একে অন্যের সাথে রক্তের বন্ধনে আবদ্ধ, কিন্তু অন্তত কয়েকশ বছর ধরে অবিরতভাবে বসবাস করা সাধারণ ইহুদীদেরও এখানে থাকবার অধিকার অস্বীকার করা যায় না। পবিত্র ভূমি তিন ধর্মের জন্যই গুরুত্বপূর্ণ। কিন্তু এখানে টু স্টেট সমাধান খাটবে না। যে ওয়ান স্টেটের কথা বলছি, সেখানে অখণ্ড রাষ্ট্রে তিন ধর্মের লোকেরই (বা যেকোনো ধর্ম) বসবাস থাকবে, এবং সরকার পর্যায়েও যেকোনো ধর্মের লোকের নিয়োগ থাকবে। রাষ্ট্রধর্ম কেবল ইহুদী ধর্ম নয়, তিনটি ধর্মই থাকতে পারে, যেহেতু এখানে তিন ধর্মের লোকেরই বাস। পালাক্রমে দুবছর পর পর ইহুদী ও মুসলিম দলের হাতে ক্ষমতা দেয়া যেতে পারে এবং সেভাবেই সংবিধান তৈরি করতে হবে। এতে করে টানা এক ধর্মের লোক বিশেষ সুবিধা পেতে থাকবে না। জেরুজালেম অখণ্ড রাষ্ট্রটির রাজধানী হতে পারবে। এমনটি করলে এই রক্তপাতের ইতি হতে পারে বলে আমার বিশ্বাস।

প্রশ্ন : এই পরিস্থিতিতে ফিলিস্তিনের মানুষদের জন্য সবচেয়ে যৌক্তিক ও বাস্তবমুখী সমাধান কী হতে পারে? ঠিক কী করলে তারা নিজেদের ভূখণ্ডে মানুষের মত বাঁচতে পারবে?

উত্তর : আগের উত্তরে যা বললাম, হয়তো সেটিই এখন একটি বাস্তবিক সমাধান হতে পারে, যদিও সেটি ধর্মীয়ভাবে বিশ্বব্যাপী মুসলিমের কাছে সাদরে গৃহীত হবার সম্ভাবনা কম।

প্রশ্ন : অনেকেই দাবি করে থাকেন এই সংঘাত ‘দাজ্জাল’ আসার আলামত, এই সবকিছু হাদিসে বর্ণিত আছে, এই দাবির কতটুকু সত্য? সব কিছু কি হাদিসে বর্ণিত ভবিষ্যৎবাণী অনুসারেই হচ্ছে?

উত্তর : মূল ধারার ইসলাম অনুযায়ী, হাদিসে সরাসরি উল্লেখ নেই যে ইহুদীরা ফিলিস্তিনে রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা করবে। অবশ্য বিভিন্ন ভবিষ্যৎবাণী রয়েছে ‘শেষ সময়’ নিয়ে, তবে সেগুলো নিয়ে ভিন্ন কোথাও আলোচনা করতে হবে।

প্রশ্ন : হলোকাস্টে ইহুদীদের যে অত্যাচার সহ্য করতে হয়েছে, এখন তারা নিজেদের জন্য লড়াই করছে। স্যাপিয়েসরা যেমন নিয়াভারথাল, হোমো ইরেস্টাস-

সহ আরও এমন অনেক প্রজাতির সাথে লড়াই করে এখন কেবল টিকেই আছে না বরং পৃথিবী রাজত্ব করছে। ন্যায়বিচার তো শুরু থেকেই নেই, ইসরাইলিদের বাঁচতে হলে ফিলিস্তিনিদেরকে তো মারতেই হবে... আমরা ইহুদীদের দিক থেকে এ যুদ্ধ/লড়াইকে কীভাবে দেখবো? কেন জানি মনে হয় পবিত্র ধর্মগ্রন্থে ইহুদীদের রাজত্ব দাজ্জাল বা ইমাম মাহদীকে নিয়ে যা লেখা আছে, তা দিয়ে আমাদের ব্রেইনওয়াশ করানো হয়েছে, যেমন হিটলার নাকি কিছু ইহুদীদের মুক্ত করে বলেছিল পৃথিবীর মানুষ জানবে কেন আমি এত ইহুদীদের হত্যায় নেমেছিলাম। হিটলার এটা জানতোই বা কীভাবে, পবিত্র ধর্মগ্রন্থে ছিল বলে না! আমার তো এটাও মনে হয়, মানুষ দাজ্জাল ও ইমাম মাহদীর আগমন নিয়ে যেসব জানে তা অনুকরণ করে কোনো একসময় নিজেরাই ঘটনা ঘটিয়ে ফেলবে। (মনের কথা কেন জানি গুছিয়ে লিখতে পারি না) তারা যে বলে আল্লাহ কথা দিয়েছিল পবিত্র ভূমিতে তাদের আবাসস্থল ফিরিয়ে দেয়ার, সেটা কি তাওরাতে আছে বা কোথায় আছে? আমরা কি সেটা জানতে বা দেখতে পারি? ওপরে প্রশ্ন, এটা প্রশ্ন না। আপনার তথ্যবহুল লেখা খুব ভালো লাগে, আমাকে আপনার একজন ভক্ত বলতে পারেন। তাওরাতের কি কোনো বাংলা কপি পাওয়া কোনোভাবে সম্ভব?

উত্তর : আপনার হিটলার সংক্রান্ত ধারণাটি ভুল, তার এমন কোনো বক্তব্য নেই। দাজ্জাল বা মাহদি নিয়ে হাদিসগুলোও বিশুদ্ধ, যদি আপনি মুসলিম দৃষ্টিভঙ্গি থেকে জিজ্ঞেস করে থাকেন।

এটা সত্য যে অনেকে ভবিষ্যদ্বাণীকে বাস্তবায়িত করার জন্য নিজেরাই অনেক কিছু করে ফেলে। যেমন, অনেক খ্রিস্টান জায়োনিজম সমর্থন করেন যীশুর আগমন ত্বরান্বিত করতে; ১৯৭৯ সালে ইমাম মাহদির আগমন করানোর চেষ্টা করা হয়েছিল, ইত্যাদি।

এবার বলি পবিত্র ভূমিতে আল্লাহ ইহুদীদের ফিরিয়ে দেয়ার কথা বলেছেন কি না। এমন কথা বর্তমান বাইবেলে আছে, “তোমার আল্লাহ মাবুদ তোমার তোমার দুর্দশা ফিরাবেন তোমার প্রতি করুণা করবেন ও যেসব জাতির মধ্যে তোমার আল্লাহ মাবুদ তোমাকে ছিন্নভিন্ন করেছিলেন সেখান থেকে আবার তোমাকে সংগ্রহ করবেন। যদিও তোমরা কেউ দূরীকৃত হয়ে আসমানের প্রান্তে থাক, তবুও তোমার আল্লাহ মাবুদ সেখান থেকে তোমাকে সংগ্রহ করবেন, ঐ স্থান থেকে নিয়ে আসবেন। আর তোমার পূর্বপুরুষেরা যে দেশ অধিকার করেছিল, তোমার আল্লাহ মাবুদ সেই দেশে তোমাকে আনবেন ও তুমি তা অধিকার করবে এবং তিনি তোমার মঙ্গল করবেন ও তোমার পূর্বপুরুষদের চেয়েও তোমার সংখ্যা বৃদ্ধি করবেন।” (ডিউটেরনমি ৩০:৩-৫)

উল্লেখ্য, এটি ওল্ড টেস্টামেন্টে আব্বাহ মূসা (আ)-কে বলছেন, অর্থাৎ এটি ব্যাবিলনেরও নির্বাসনের আগের কথা। যখন তারা নির্বাসিত হয় আবার, তখন এই আয়াতের ওপর তারা বিশ্বাস রাখত, এবং আবার জেরুজালেমে পারস্য থেকে ফিরে আসার আশা করত।

এরপরের বার যে প্রতিশ্রুতির কথা ওল্ড টেস্টামেন্টে আছে সেটি হলো, "আর সেদিন যখন আসবে তখন প্রভু তাঁর নিজস্ব লোকদের অবশিষ্টাংশকে মুক্ত করে আনবার জন্য দ্বিতীয়বার হস্তক্ষেপ করবেন, অর্থাৎ আসেরিয়া, মিসর, পথোষ, ইথিওপিয়া, ইলাম, শিনিয়র, হমাৎ ও সমুদ্রের উপকূলগুলো থেকে অবশিষ্ট লোকদেরকে আনবেন। আর তিনি জাতিদের জন্য নিশান তুলবেন, ইসরাইলের বিতাড়িত লোকদের একত্র করবেন ও দুনিয়ার চার কোণ থেকে এহুদার ছিন্নভিন্ন লোকদেরকে সংগ্রহ করবেন।" (ইশাইয়া ১১:১১-১২)

"আর আমি তোমাদেরকে আমার উদ্দেশ্য পেতে দেব, মাবুদ এই কথা বলেন; এবং আমি তোমাদের বন্দীদশা ফিরাব এবং যেসব জাতির মধ্যে ও যেসব স্থানে তোমাদেরকে তাড়িয়ে দিয়েছি, সেসব স্থান থেকে তোমাদেরকে সংগ্রহ করবো, মাবুদ এই কথা বলেন; এবং যে স্থান থেকে তোমাদেরকে বন্দী করে এনেছি, সেই স্থানে তোমাদেরকে পুনর্বীর নিয়ে যাব।" (ইয়ারমিয়া ২৯:১৪)

"যখন জাতিদের মধ্য থেকে তোমাদের আনবো এবং যেসব দেশে তোমরা ছিন্নভিন্ন হয়ে রয়েছ, সেসব দেশ থেকে তোমাদের একত্র করবো, তখন আমি খোশরু ধূপের মতো তোমাদেরকে গ্রাহ্য করবো; আর তোমাদের দ্বারা জাতিদের সাক্ষাতে পবিত্র বলে মান্য হবো। আর আমি তোমাদের পূর্বপুরুষদের যে দেশ দেব বলে শপথ করেছিলাম, সেই ইসরাইল দেশে যখন তোমাদেরকে আনবো, তখন তোমরা জানবে যে, আমিই মাবুদ।" (হিজকীল ২০:৪১-৪২)

ফিলিস্তিনিদের আবার জড়ো হওয়াকে হিব্রুতে 'কিব্বুৎস গালুয়োট' (קִבּוּצִים גָּלוּיִּוֹת) বলা হয়।

অনেকে না বুঝেই কুরআন থেকে ইসরাইলের ফিলিস্তিনে প্রত্যাবর্তনের ভবিষ্যদ্বাণী দেখিয়ে থাকে, "এরপর আমি বনী ইসরাইলকে বললাম, তোমরা এই দেশে বসবাস কর। অতঃপর যখন শেষ প্রতিশ্রুতি বাস্তবায়িত হবে, তখন তোমাদের সকলকেই আমি একত্রিত করে উপস্থিত করব।" (সূরা বনী ইসরাইল ১৭:১০৪) এই প্রতিশ্রুতি আসলে ছিল মূসা (আ)-এর কওমকে দেয়া, যারা প্রতিশ্রুত ভূমিতে বসবাস করতে যাচ্ছিলো, তাদের শর্ত ছিল সৎ কাজ করতে

থাকা। কিন্তু তারা সেটি করতে পারেনি। তাদেরকে আল্লাহ ফারয়ে এনোছিলেন বটে পারস্য থেকে, কিন্তু আবারও তারা কিতাবের বিরুদ্ধে যায়। কুরআন সেই শেষ বা পরবর্তী প্রতিশ্রুতি পূরণের কথাও বলে—

“তোমরা সৎ কাজ করলে তা নিজেদেরই জন্য করবে এবং মন্দ কাজ করলে তাও করবে নিজেদের জন্য। অতঃপর পরবর্তী প্রতিশ্রুতি পূরণের সময় উপস্থিত হলে আমি আমার দাসদেরকে প্রেরণ করলাম তোমাদের মুখমণ্ডল কালিমাচ্ছন্ন করার জন্য, প্রথমবার তারা যেভাবে বাইতুল মুকাদ্দাসে প্রবেশ করেছিল পুনরায় সেভাবেই তাতে প্রবেশ করার জন্য এবং তারা যা অধিকার করেছিল, তা সম্পূর্ণ রূপে ধ্বংস করার জন্য।” (সূরা বনী ইসরাইল ১৭:৭) এখানে প্রথমবার হলো বাদশাহ নেবুকাদনেজার এবং দ্বিতীয়বার হলো রোমান সম্রাট টাইটাসের জেরুজালেম আক্রমণ।

আপনার শেষ প্রশ্নে আসি, তাওরাতের বাংলা কপি আপনি বাইবেল সোসাইটির ‘কিতাবুল মোকাদ্দাস’ নামে পেতে পারেন, লালচে বা সবুজাভ রঙের কভারে বিক্রি করে থাকে। তবে এটি মূলত ওল্ড টেস্টামেন্টের ইসলামি পারিভাষিক অনুবাদ, বর্তমান বাইবেল আরকি। ইসলামের দৃষ্টিতে সেটি অবিকৃত তাওরাত নয়, এটি আমি ডিসক্লেইমার দিয়ে দিলাম। যদি আপনি ধর্মপ্রাণ হয়ে থাকুন, তবে যথেষ্ট ইসলামি জ্ঞান অর্জনপূর্বক সেটি পড়তে পারেন যদি তুলনামূলক ধর্মতত্ত্ব নিয়ে আপনার আগ্রহ থাকে, অন্যথা ইসলামি ফতোয়া অনুযায়ী একে নিরুৎসাহিত করা হয়।

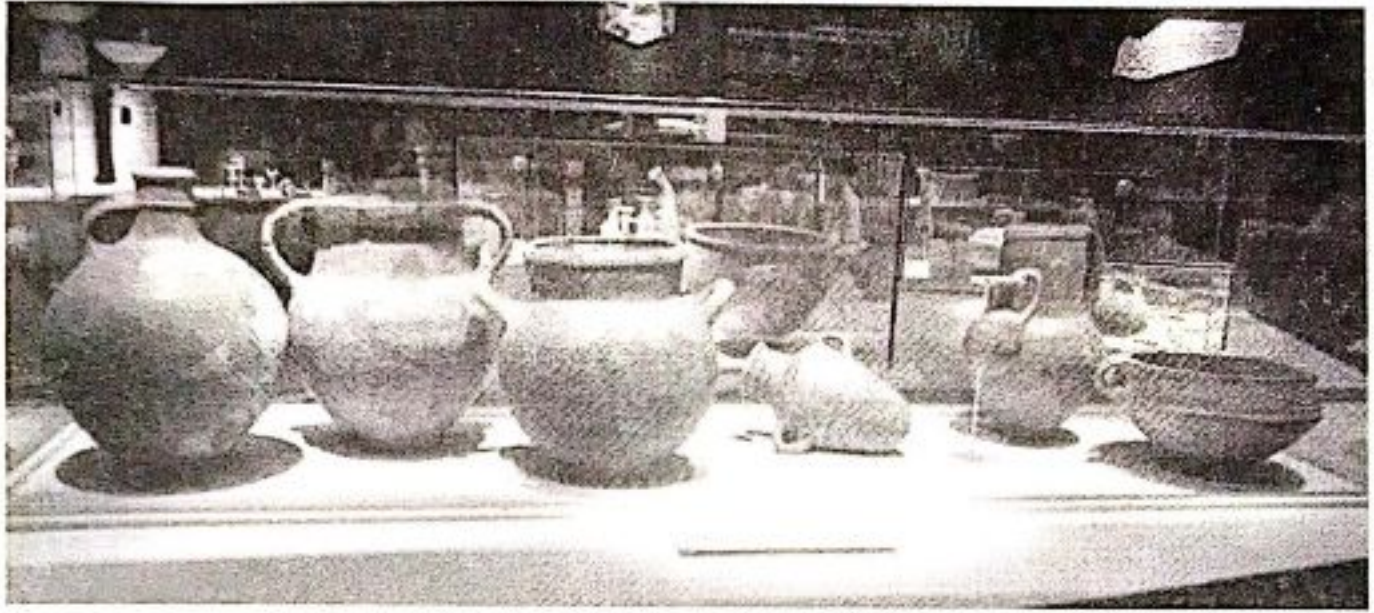
প্রশ্ন : ধর্মীয় প্রেক্ষাপট ছাড়া একজন সাধারণ মানুষের কাছে কীভাবে প্রমাণ করা যায় যে জেরুজালেমের প্রকৃত মালিক ফিলিস্তিনের অধিবাসীরা?

উত্তর : এই পবিত্র ভূমির আদি নাম ছিল কানানদের (כנען, ܟܢܥܢ) ভূমি। প্রত্নতাত্ত্বিক নিদর্শন বলে, ব্রোঞ্জ যুগের শেষ দিকেই (খ্রিস্টপূর্ব চতুর্দশ শতক) এখানে লোকালয় ছিল নানা জাতির। কানানের দক্ষিণ দিকে খ্রিস্টপূর্ব দ্বাদশ শতক থেকে খ্রিস্টপূর্ব ৬০৪ সাল পর্যন্ত ফিলিস্তিনিরা এখানে বসবাস করেছে। এরপর তারা নব্য-আসিরীয় সাম্রাজ্যের অধীন থেকে নব্য-ব্যবিলনীয় সাম্রাজ্যের দ্বিতীয় নেবুকাদনেজারের হাতে ধ্বংস হয় বড় আকারে। এরপর তারা পারস্যের অধীনে চলে আসে।

অবশ্য এর দ্বারা জেরুজালেমের ওপর ফিলিস্তিনের মালিকানা প্রতিষ্ঠিত হয় কি না, তা নিয়ে প্রশ্ন তুলতেই পারে কেউ, সেটি ভিন্ন আলোচনা।

প্রশ্ন : হামাসের কার্যক্রম, তাদের আয়ের উৎস, আয় ব্যয় ইত্যাদি সম্পর্কিত তথ্য জানতে চাই।

উত্তর : হামাস নিয়ে আগেও আলোচনা করেছি, তবে ফান্ডিং আর রকেট নিয়ে আলাপ করা যায় এখানে।



জাদুঘরে সংরক্ষিত আদি ফিলিস্তিনিদের মাটির পাত্র

হামাসের সবচেয়ে বড় ফান্ডিং আসে মিত্র কাতার থেকে, অন্তত তা-ই শোনা যায়। ২০১২ সালে কাতারের আমির শেইখ হামাদ বিন খালিফা আল-সানি প্রথম বিশ্বনেতা হিসেবে হামাস সরকারের সাথে দেখা করতে গিয়েছিলেন। এ পর্যন্ত প্রায় ১.৮ বিলিয়ন মার্কিন ডলার সাহায্য দিয়েছে তারা হামাসকে। অবশ্য ইসরাইল চায় কাতার যোগ দিক আব্রাহাম অ্যাকর্ডসে, যা ২০২০ সালের ১৩ আগস্ট ইসরাইল, আমেরিকা ও আরব আমিরাতে উত্থাপন করে। বাহরাইনও আছে সাথে। এ অ্যাকর্ডস মূলত আরব দেশগুলোর সাথে ইসরাইলের সম্পর্ক সহজায়নের চেষ্টা করতে চায়। কিন্তু কাতার কি যোগ দেবে? (কাতারের ফান্ড গাজার ফিলিস্তিনিদের উদ্দেশ্যে আসে।)

হামাসের আরেক বড় সমর্থক দেশ হলো তুরস্ক। তুর্কি প্রেসিডেন্ট এরদোয়ান হামাসকে রাজনৈতিক সমর্থন দিয়েছেন। জার্মানি থেকেও কিছু দল হামাসকে ফান্ডিং করে।

প্রশ্ন : গাজা আর পশ্চিম তীরের মধ্যকার পলিটিক্স ও পার্থক্যটা কেমন? পৃথিবীর বিভিন্ন অঞ্চল থেকে বিভিন্ন ডোনেশন এই দুই জায়গায় কীভাবে যায় আর কার মাধ্যমে কতটুকু বাধা পেরিয়ে আদৌ কতটুকু পৌঁছাতে পারে? মুসলিমদের পাশাপাশি ইহুদী, আরব, অনারবদের মধ্যে কারা প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে ফিলিস্তিনকে সাপোর্ট দিচ্ছে? কেন ও কীভাবে দিচ্ছে? ইসরাইলের অল্প সময়ে শক্তিশালী হয়ে ওঠার কারণ কী? এর পেছনে কাদের কী স্বার্থ? এর ভবিষ্যৎ কী?

উত্তর : গাজা চালায় হামাস আর পশ্চিম তীর চালায় ফাতাহ, এদের রাজনীতি নিয়ে ইতোমধ্যে আলাপ হয়েছে। বিভিন্ন দেশের অবস্থান নিয়েও আলাপ করেছে।

ইসরাইলের স্বল্প সময়ে উন্নত হওয়ার পেছনে বড় কারণ হলো তাদের ‘টিকে থাকা লাগবেই’ এই বোধটুকু। তারা প্রচণ্ড রকমের লেগে থাকা জাতি, ছোট থেকেই পড়ালেখা তাদের জন্য খুব বেশি বাধ্যতামূলক যেটি অন্য কোনো ধর্মভিত্তিক জাতি করতে পারেনি। আর সবচেয়ে বড় কথা তাদের ধনী মিত্র রয়েছে।

এ মুহূর্তে ফিলিস্তিনি সরকারকে সরাসরি দান না করে জাতিসংঘের মাধ্যমে দান করে নানা দেশ। ফিলিস্তিনিদের কাছে ডোনেশন পৌঁছানোর কাজ সঞ্চালন করে থাকে মূলত এএইচএলসি (অ্যাড হক লিয়াজোঁ কমিটি), যা ১৯৯৩ সালে প্রতিষ্ঠিত।

প্রশ্ন : আপনার মতে ফিলিস্তিনিদের এখন প্রধান লক্ষ্য কী হওয়া উচিত?

উত্তর : এ জায়গায় এসে কবি নীরব। সাধারণ ফিলিস্তিনিদের এ মুহূর্তে এমন কিছুই করার নেই, যেটি তাদেরকে নিরীহ প্রাণ বিসর্জন থেকে রক্ষা করতে পারে, তাই মনে হচ্ছে।

প্রশ্ন : জাতিসংঘ কি ফিলিস্তিনের জন্য কোনো ভূমিকা রেখেছে নাকি ইসরাইলের স্বার্থে পেছন থেকে কাজ করে গিয়েছে?

উত্তর : জাতিসংঘ চেষ্টা করেছে কাজ করতে, কিন্তু সবসময় পারেনি ভেটোর কারণে। বিভিন্ন ডোনেশনের ব্যাপারে অবশ্য জাতিসংঘ সাহায্য করে থাকে।

প্রশ্ন : কয়েকদিন আগে শুনেছিলাম, বেনইয়ামিন নেতানিয়াহুর দুর্নীতির বিরুদ্ধে বিক্ষোভ হয়েছে ইসরাইলে, সম্প্রতি নির্বাচনে অর্ধেক অর্ধেক ভোট পাওয়ায় আড়াই বছর চুক্তি করেছে তারা উভয় দল। বর্তমানে এই সংঘাত চাঙ্গা করার পেছনে কি ইসরাইলের কোনো রাজনৈতিক স্বার্থ আছে?

উত্তর : কোনো স্বার্থ নেই, এটি অনেকদিন ধরে চলে আসছিলো, এবং এ বই লেখার সময় নেতানিয়াহু ইতোমধ্যে অপসারিত, এবং নাফতালি বেনেট ইসরাইলের প্রধানমন্ত্রী।

প্রশ্ন : এই ভূমি কি আসলে ইহুদীদের প্রমিজড ল্যান্ড? সেই ১৯২০ সাল থেকেই ইসরাইল ফিলিস্তিনের ভূখণ্ডে আর্কিওলজিক্যাল গবেষণা করে তেমন কিছুই নাকি পায়নি, এটা কতটা সত্য?

উত্তর : ধর্মীয়ভাবে এ ভূমি আসলেই ইহুদীদের প্রতিশ্রুত ভূমি। এ ব্যাপারে কুরআন ও বাইবেল একমত। প্রত্নতাত্ত্বিক গবেষণা সেরকম ধর্মীয় কিছু খুঁজে পাবার কথা না।



নেতানিয়াহু

প্রশ্ন : Kamal Salibi I Bernard Leman-এর মতে ইহুদীদের আদি নিবাস হচ্ছে ইয়েমেনের দিকে, এ সম্পর্কে কিছু লিখবেন কি?

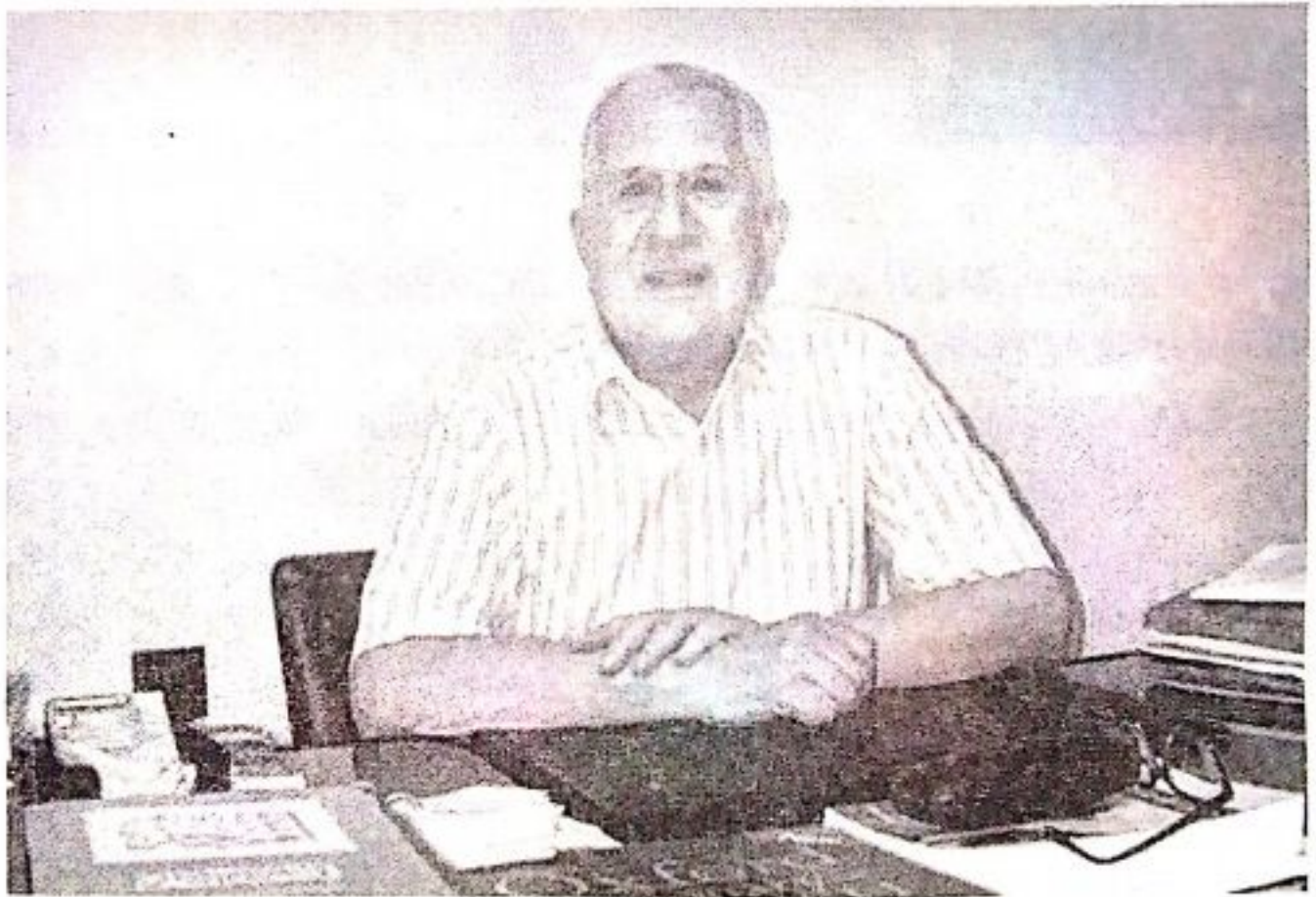
উত্তর : লেবাননের বৈরুতে এক প্রোটেষ্ট্যান্ট খ্রিস্টান পরিবারে জন্ম নেয়া কামাল সুলাইমান সালিবি (১৯২৯-২০১১) যে তত্ত্বগুলো দিয়েছেন, তা আমার কাছে বিশ্বাসযোগ্য মনে হয়নি। তার মতে ইহুদীরা আসলে আগে আরব ছিল, তারা আরবে বসবাস করতো, দাউদ (আ)-এর রাজত্বও আরবেই ছিল। পরবর্তীতে তারা এই জায়গাগুলোর নাম মনে রেখে ফিলিস্তিনে মাইগ্রেট করে এবং একই নামগুলো দেয় সেখানকার বিভিন্ন স্থানের। এই তত্ত্বে অনেক বেশি ভুল রয়েছে, তালিকা করে শেষ করা যাবে না। এটি একই সাথে কুরআন ও বাইবেল বিরোধীও বটে।

প্রশ্ন : আমেরিকা কেন ইসরাইলকে সমর্থন করে? আমেরিকার রাজনীতিতে ইহুদীদের ভূমিকা কী?

উত্তর : ইতোমধ্যে আলোচিত হয়েছে।

প্রশ্ন : মিডিয়াতে ইহুদীদের প্রভাব কী?

উত্তর : এটি সত্য যে মুভি ইন্ডাস্ট্রি এবং নিউজ মিডিয়ায় অনেক ইহুদী রয়েছে, তবে তারচেয়ে বেশি খ্রিস্টানও রয়েছে। সংখ্যাগরিষ্ঠতার দিক থেকে আমরা একে খ্রিস্টান-নিয়ন্ত্রিত মিডিয়াও বলতে পারি। ইহুদীরা মিডিয়া ‘নিয়ন্ত্রণ’ করে এ বক্তব্য প্রথম ‘দ্য প্রোটোকলস অফ দ্য এন্ডারস অফ জায়োন’ বইতে পাওয়া যায়। হ্যাঁ, নিউইয়র্ক টাইমসের মতো প্রভাবশালী পত্রিকার মালিকপক্ষ ইহুদী; ওয়ার্নার ব্রাদার্স, প্যারামাউন্ট, এনবিসি, সিবিএস ইত্যাদির মালিকপক্ষও ইহুদী (মালিকপক্ষ ইহুদী বলতে সবাই ইহুদী নয়, ইহুদী সদস্য রয়েছে আরকি)। ডিজনি, সিএনএন-এর মতো প্রতিষ্ঠানগুলো ইহুদীদেরকে সুযোগ সুবিধা ভালো দিয়ে এসেছে। নোরা এফ্রন, স্টিভেন স্পিলবার্গের মতো ইহুদী ব্যক্তিবর্গের ছবি সাদরে গৃহীত হয়েছে। টাইমস, ওয়াশিংটন পোস্ট পত্রিকা চলেছে বিখ্যাত ইহুদী সাংবাদিকদের দ্বারা। এসমস্ত কারণে মূলত মিডিয়া ইহুদীরা নিয়ন্ত্রণ করে, এমন কথা ওঠে। এসব মিডিয়াতে ইহুদীদের খারাপভাবে পোর্ট্রে করা হয় না, এবং ইহুদীদের প্রতি সহানুভূতি জাগ্রত করা হয়-এমন অভিযোগ দেখা যায়।



কামাল সুলাইমান সালিবি (১৯২৯-২০১১)

প্রশ্ন : বিশ্ব রাজনীতিতে ইহুদীদের ভূমিকা কী?

উত্তর : আলোচনা করেছি ইতোমধ্যে।

৩০৮ ইসরাইলের উত্থান-পতন

প্রশ্ন: ইসরাইলের অর্থনৈতিক অবস্থা ভালো হলো কীভাবে? বিশ্বের অর্থনীতিতে ইহুদীদের কী প্রভাব রয়েছে? ইহুদীরা এত ক্ষমতা ও সম্পদের মালিক হলো কীভাবে?

উত্তর : আলোচিত হয়েছে ইতোমধ্যে ।

প্রশ্ন : ইহুদীদের শিক্ষা ব্যবস্থা কেমন?

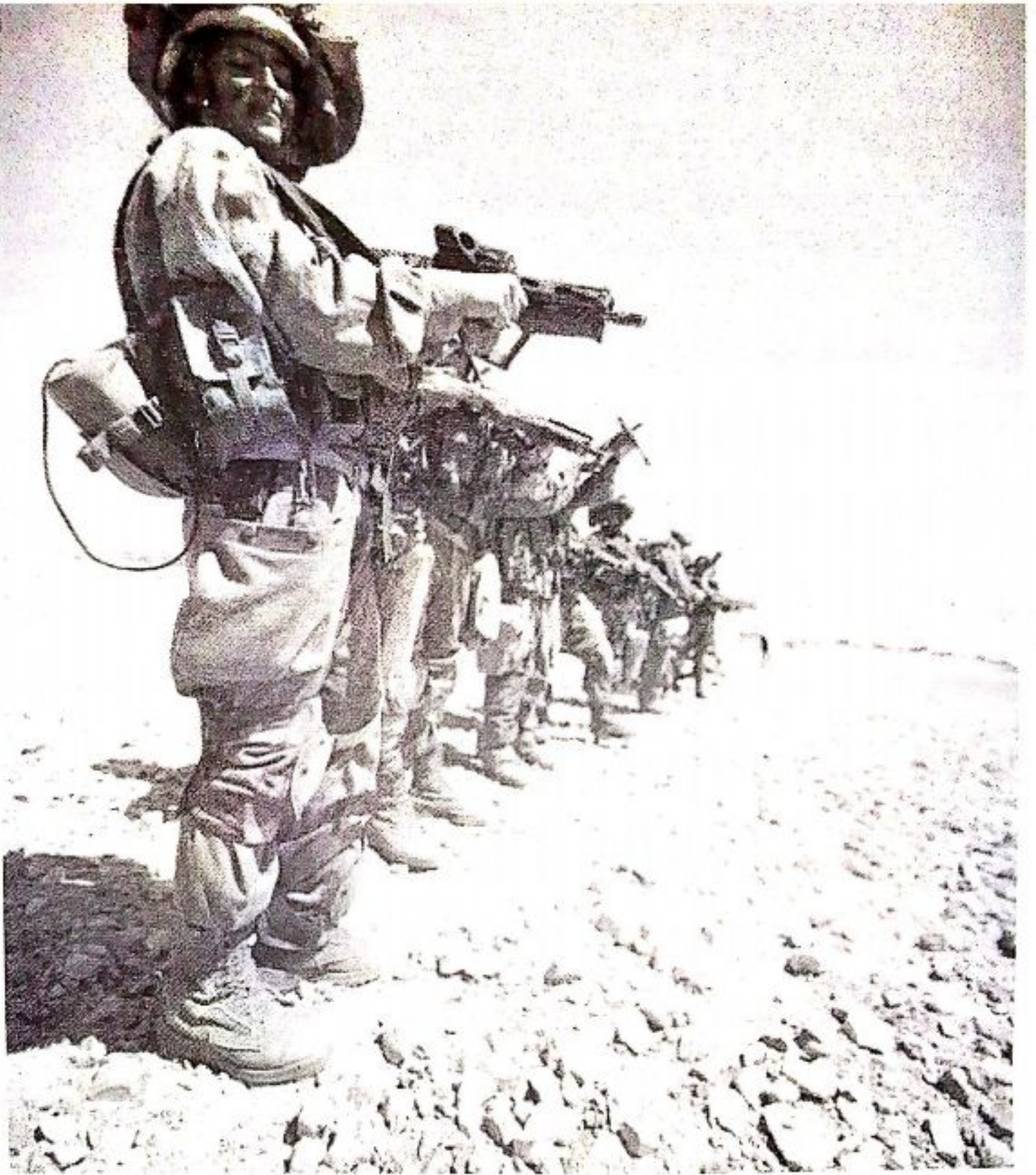
উত্তর : গড়ে একজন ইহুদী ১৩.৪ বছর পড়াশোনা করে, এবং অন্যান্য যেকোনো ধর্মীয় জাতির তুলনায় তাদের উচ্চশিক্ষার হার ঢের বেশি। সনাতন ধর্মী ও মুসলিমদের ক্ষেত্রে গড় পড়াশোনার সময় ৫.৬ বছর। খ্রিস্টানদের জন্য সেটি ৯.৩ বছর এবং বৌদ্ধদের জন্য ৭.৯ বছর। অবাক করা বিষয় হলেও সত্য, ইহুদীদের মাঝে মেয়েদের ৬৯% উচ্চশিক্ষায় যায়, আর ছেলেদের মাঝে সেটি ৫৭%। জরিপটি করে ওয়াশিংটনভিত্তিক একটি রিসার্চ সেন্টার।



ইহুদীদের, বিশেষ করে ছেলেদের ছোট থেকেই তাওরাত পাঠ বাধ্যতামূলক ছিল

প্রশ্ন: সমস্যাটার সমাধান কীভাবে করা যাবে বা সমাধান কি আদৌ সম্ভব?

উত্তর : আলোচিত হয়েছে ইতোমধ্যে ।



ইসরাইলের নারী সেনারা

প্রশ্ন : যেসব আরব দেশ এখনও নিউক্লিয়ার পজিশনে আছে, তারা কেন ফিলিস্তিনের ব্যাপারে কিছু বলছে না বা ইসরাইলের সাথে তাদের দহরম মহরম সম্পর্কের ভবিষ্যৎ কী? (সেটা কি খেটার ইসরাইলের মতো কোনো কিছুতে রূপ নিয়ে নিতে পারে?)

৩১০ ইসরাইলের উত্থান-পতন

উত্তর : খেটার ইসরাইল বলতে মূলত প্রতিশ্রুত ভূমির সীমানা বোঝায়, ফিলিস্তিনিদের জায়গা নিয়ে নিতে পারলেই প্রায় বেশিরভাগ পূরণ হয়ে যাবে সেই সীমানার। যেসব আরব দেশ নিউট্রাল পজিশনে আছে, আমার ধারণা তারা সামনেই আব্রাহাম অ্যাকর্ডসে যোগ দিয়ে ইসরাইলের সাথে সম্পর্ক স্বাভাবিক করে ফেলবে।

প্রশ্ন : প্রশ্নটা করা ঠিক হবে কি না জানি না, তবে করেই ফেলছি। ইসরাইলে উল্লেখযোগ্য পরিমাণ নারী সৈনিক (চোখে পড়ল আরকি) থাকার কি বিশেষ কোনো কারণ আছে?

উত্তর : ইসরাইল মেয়েদের জন্যও বাধ্যতামূলক করেছে আর্মিতে যোগ দেয়া, যা অনেক দেশই করেনি। এজন্যই আমরা বেশি মেয়ে দেখতে পাই তাদের আর্মিতে। ১৯৪৮ সাল থেকেই তারা এমনটি করে আসছে।

প্রশ্ন : এতোগুলো আরব দেশের সাথে যুদ্ধে ইসরাইল জিতলো কীভাবে?

উত্তর : ইসরাইলের মিত্রশক্তি ভালো, সমর্থন ভালো, তাদের আর্মির ক্ষমতাও বেশি, আগেই আলোচিত হয়েছে।

প্রশ্ন : নব্য-নাৎসিবাদীরা ইসরাইল-ফিলিস্তিনিদের চলমান সংকটকে কীভাবে দেখছে? কাদের পক্ষে কথা বলছে তারা? তারা কি জায়েনবাদকে সমর্থন দিচ্ছে? তাদের আদর্শিক মতবাদ এক্ষেত্রে কী বলে?

উত্তর : নব্য নাৎসিরা সাদা বর্ণবাদে বিশ্বাসী, তারা ফ্যাসিবাদী একটি রাষ্ট্র কায়েম করতে চায়। তারা এমন এক ফোর্থ রাইখ গড়ে তুলতে চায়, যেখানে অ্যাডলফ হিটলারের আদর্শ লালিত হবে। তারা হলোকাস্ট অস্বীকার করে। কিছু ইউরোপীয় দেশে নব্য-নাৎসি কিছু প্রদর্শন করাই নিষিদ্ধ। তারা স্বস্তিকা চিহ্নটি ব্যবহার করে। তাদের মতে, সম্ভ্রান্ত নিখুঁততা আর সৌন্দর্যের বিপরীত যদি কিছু থেকে থাকে, তবে তা হলো ইহুদী জাতি।

প্রশ্ন : ভাইয়া, ফিলিস্তিনি সরকার ফিলিস্তিন নিয়ন্ত্রণ করতে পারলেও গাজা নাকি শুধু হামাস নিয়ন্ত্রণ করে! ফিলিস্তিনি জনগণের কাছে কে বেশি জনপ্রিয়, হামাস নাকি ফিলিস্তিনি গভমেন্ট? গাজায় বলে হামাসের অনুমতি ব্যতীত ফিলিস্তিন সরকারের কর্তৃত্ব চলে না, বিষয়টা কি ঠিক?

উত্তর : নিয়ন্ত্রণের ব্যাপারে যা গুনেছেন তা সত্য।

আর জনপ্রিয়তার ব্যাপারে যদি বলি, ২০২১ সালের রক্তপাতের পর জরিপ বলছে, ৫৩% ফিলিস্তিনি এখন হামাসের পক্ষে, আর ১৪% মাহমুদ আব্বাসের

ফাতাহর পক্ষে। আরও জানা যায়, ৭৭% ফিলিস্তিনি মনে করে ২০২১ সালের যুদ্ধে হামাস জয়ী হয়েছে।



ইউএস ক্যাপিটলে নিও-নাৎসিদের দল

প্রশ্ন : দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে হিটলার কর্তৃক ইহুদী নিধনের কারণটা কী?

উত্তর : আলোচিত হয়েছে।

প্রশ্ন : ধর্মীয় এবং ঐতিহাসিক দৃষ্টিকোণ থেকে (রাজনৈতিক দৃষ্টিভঙ্গি নয়) ইসরাইল/প্যালেস্টাইনের প্রতি এবং জেরুজালেমের প্রতি কাদের অধিকার তুলনামূলকভাবে বেশি? মুসলিমদের নাকি ইহুদীদের?

উত্তর : ইসলামে মুসলিমদের প্রথম কিবলা ছিল বাইতুল মুকাদ্দাস, এবং যে তিনটি তীর্থস্থানে সোয়াবের উদ্দেশ্যে ভ্রমণের অনুমতি দেয়া হয়েছে ইসলামে, তার মাঝে একটি হলো বাইতুল মুকাদ্দাস অর্থাৎ জেরুজালেম। সুতরাং এর ওপর মুসলিমদের ধর্মীয় অধিকার রয়েছে। তবে পবিত্র ভূমির তুলনায় মুসলিমদের জন্য অনেক বেশি স্মৃতি ও ধর্মীয় গুরুত্ব ছড়িয়ে আছে মক্কা ও মদিনায়। কিন্তু ইহুদীদের পবিত্র সমস্ত স্থাপনা ও তীর্থস্থান কেবলই পবিত্র ভূমিতে। ঐতিহাসিক দৃষ্টিকোণ থেকে অনেক বছর ধরে যে পরিবারগুলো (ইহুদী, খ্রিস্টান ও মুসলিম) পবিত্র ভূমিতে বসবাস করে আসছে, তাদের সবারই অধিকার রয়েছে জেরুজালেমের ওপর, যারা পরে এসে জুড়ে বসেছে তাদের থেকে বেশি অধিকার।

প্রশ্ন : ফিলিস্তিনের সামরিক অবস্থা সম্পর্কে জানতে চাই।

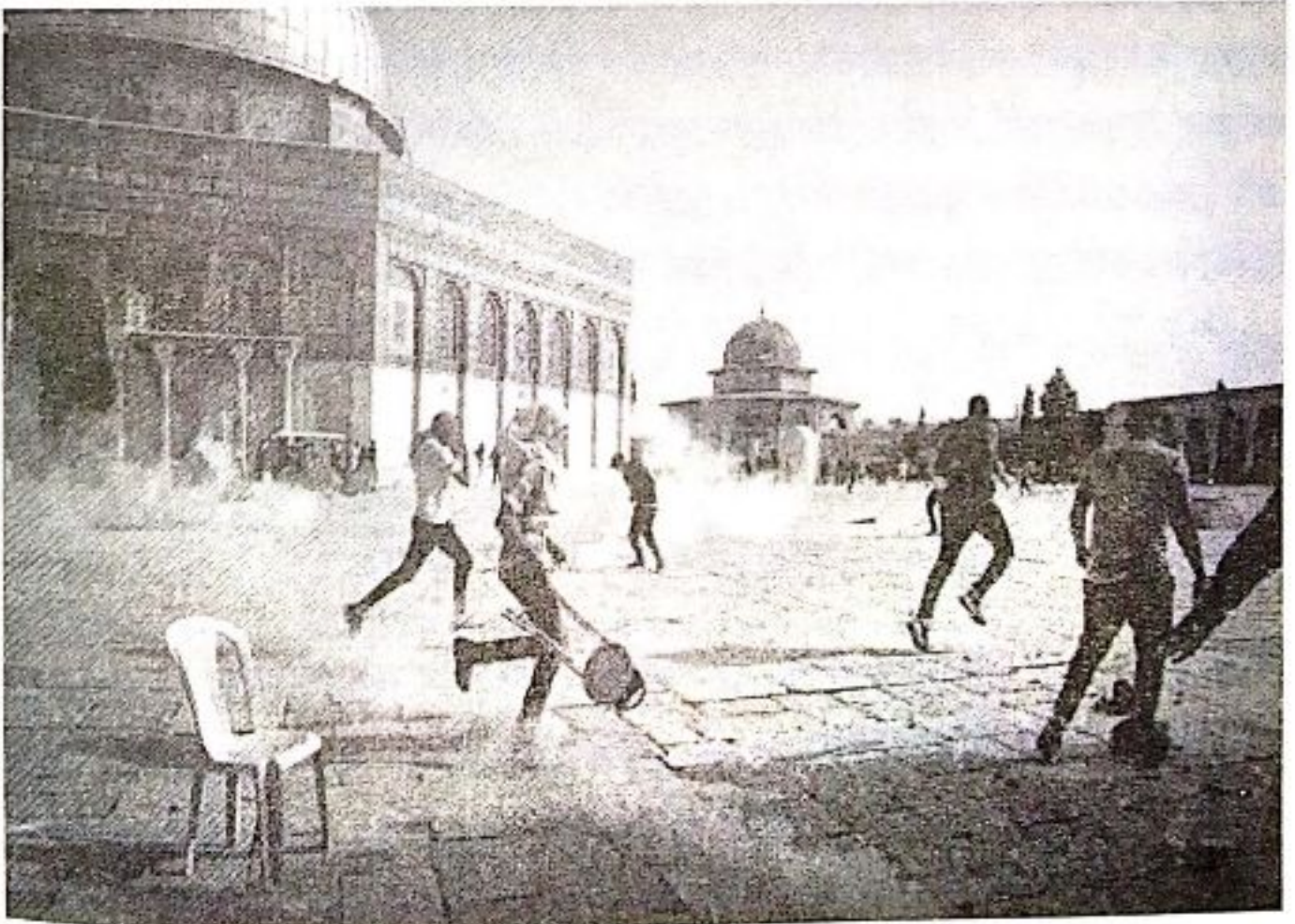
উত্তর : এ মুহূর্তে ফিলিস্তিনি সরকার হলো পিএলও-র সরকার। তাদের মিলিটারি হলো প্যালেস্টাইন লিবারেশন আর্মি (جيش التحرير الفلسطيني)। তবে সেটি কেবল নামেই আছে, মূলত সেটি বিভিন্ন জায়গা থেকে নিয়ন্ত্রিত, বিশেষ করে সিরিয়া। বর্তমানে এটি ফিলিস্তিনে নয়, বরং সিরিয়ায় চালু আছে, তারা ফিলিস্তিনি শরণার্থীদের রিক্রুট করে। ফিলিস্তিন থেকে প্রতিরোধ এ মুহূর্তে যারা করে, সেটি হামাস, তবে তাদের সামরিক সক্ষমতা সম্পর্কে সম্যক ধারণা পাওয়া যায় না। তাদের মিসাইল ২০২১ সালের যুদ্ধে আয়রন ডোম ঠেকিয়ে দিয়েছে বেশিরভাগ।

প্রশ্ন : বাংলাদেশ থেকে সহযোগিতা স্বরূপ যে ওষুধ এবং অর্থ পাঠানো হয়, তার যথাযথ ব্যবহারের নিশ্চয়তা কতটা?

উত্তর : এটির উত্তর আমি দিতে পারছি না। তবে আমি যতদূর জানি, যে সাহায্যগুলো এএইচএলসি কর্তৃক পাঠানো হয়, সেগুলো ঠিকঠাক পৌঁছে।

প্রশ্ন : ফিলিস্তিনকে যদি সত্যিই সাহায্য করতে চায় তবে বাংলাদেশ কি সামরিক সুবিধা দিতে পারবে?

উত্তর : এটি বাংলাদেশ সরকারের সিদ্ধান্ত।



ফিলিস্তিনি মিলিটারি থাকলে এমন দৃশ্য হয়তো দেখা যেত না

প্রশ্ন : যেহেতু লম্বা সময় ধরে এই সংঘর্ষ চলছে, তাহলে ফিলিস্তিন নেতাদের এখানে কীরূপ ভূমিকা ছিল বা এখন আছে? ধন্যবাদ। আল্লাহ সহায়।

উত্তর : ইয়াসির আরাফাত আর মাহমুদ আক্বাসকে নিয়ে এ বইতে আলোচনা হয়েছে।

প্রশ্ন: ইসরাইলকে সহায়তা করার পেছনে যুক্তরাষ্ট্র-যুক্তরাজ্য এসব দেশের কী কী স্বার্থ আছে?

উত্তর : আলোচিত হয়েছে ইতোমধ্যে।

প্রশ্ন : ইসরাইলের বিপক্ষে লড়াই করতে হলে বর্তমান প্রেক্ষাপটে মুসলিম বিশ্বকে কী কী পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হবে?

উত্তর : মুসলিম বিশ্ব ইসরাইলের বিরুদ্ধে এ মুহূর্তে লড়াই করবে বলে মনে হয় না।

প্রশ্ন : ইসরাইল-ফিলিস্তিন ইস্যুতে ধর্মীয় নাকি রাজনৈতিক, কোন বিষয়টি মূল প্রভাবক হিসেবে কাজ করছে?

উত্তর : মূল প্রভাবক ধর্মীয়, কারণ জায়েনিস্ট প্ল্যান বাস্তবায়ন করা হচ্ছে, যা এসেছে ওল্ড টেস্টামেন্ট থেকে। ফিলিস্তিনীদের দিক থেকে সেটি নিজের ভূমি রক্ষা কিংবা ফিলিস্তিনি জাতীয়তাবাদ এবং একই সাথে একটি বড় অংশের জন্য সেটি ধর্মযুদ্ধ, ইসলামের বিরুদ্ধে অন্যায়ের যুদ্ধ। কেউ যদি বলে থাকে সমস্ত ফিলিস্তিনি এটি কেবল ধর্মীয় অবস্থান থেকে করছে, তবে সেটি ভুল। কারণ অনেক ফিলিস্তিনি খ্রিস্টানও রয়েছে, যারা স্বাধীন ফিলিস্তিন চায়।

প্রশ্ন: ইসরাইল-ফিলিস্তিন সমস্যাটা এত দিন ধরে কেন চলমান? ইসরাইল এক সময় মিসরের জায়গা দখল করেছে, কিন্তু গাজা এত দিনেও কেন পারে না?

উত্তর : আলোচিত হয়েছে। তবুও বলি, গাজা ও পশ্চিম তীর ইসরাইল চায় বটে। হয়তো একদিন অধিকার করেও নেবে।

প্রশ্ন: যেসব রাষ্ট্র ইসরাইলকে সাপোর্ট করছে, তারা তা কেন করছে?

উত্তর : আলোচিত হয়েছে।

প্রশ্ন : ‘আর্ক অভ দ্যা কোভ্যানেন্ট’ কিয়ামতের আগে আবারও দেখা যাবে বলে ‘ইহুদী জাতির ইতিহাস’ বইতে লিখিত রয়েছে। কিন্তু এটা কখন/কীভাবে/কার দ্বারাই বা উন্মোচিত হবে? আর এটা প্রকাশিত হওয়ার উদ্দেশ্যই বা কী হবে?



ইহুদীরা যেখানেই যেত সাথে করে নিয়ে যেত আর্ক অফ দ্য কোভেন্যান্ট

উত্তর : খ্রিস্টপূর্ব ৫৮৭ সালের পর থেকে আর্ক অফ দ্য কোভেন্যান্টের হদিস কারও জানা নেই। ইসলামি কিংবদন্তিতে বলা হয়ে থাকে, ইমাম মাহদি এসে সেটিকে শেষ সময়ে উদ্ধার করবেন। কারও কারও ধারণা, রোমানরা এটি রোমে নিয়ে গিয়েছিল জেরুজালেম ধ্বংসের সময়। ইহুদীদের বিশ্বাস মাসিহের আগমনের পর আর্ক পুনরুদ্ধার হবে। ইহুদীদের থেকে অবশ্য খ্রিস্টানরাই বেশি খুঁজেছে আর্ক বা ‘তাবুতে সাকিনা’, যার কথা কুরআনেও উল্লেখ আছে (সূরা বাকারা ২:২৪৮)। বলা হয়ে থাকে, গালিলি সাগর বা টাইবেরিয়াস হ্রদের কাছ থেকে মাহদি আর্ক উদ্ধার করবেন। কেউ বলেন জর্ডানের কোনো গুহা থেকে। কেউ বলেছেন মক্কা, কেউ বা জেরুজালেম, কেউ বা অ্যান্টিয়ক, আবার বাদ যায়নি ইস্তাম্বুলও! শিয়া উৎসে আর্ক উদ্ধার নিয়ে বেশি লেখনি রয়েছে।

প্রশ্ন : এই প্রশ্নটি এখানে করা ঠিক কী না জানিনা। তবুও যেহেতু সুযোগ পেয়েছি, তাই করছি। মিশর, গ্রিস নিয়ে যেমন ১,৩০০ টাকার ‘মিথোলজি’ এর বই আছে, তেমনি কী ‘ব্যবিলনীয় সভ্যতা’ নিয়ে কোনো আলাদা বই আছে? আমি কোথাও এমন কিছু খুঁজে পাচ্ছি না। অথচ জানার জন্যে কাতর হয়ে আছি। আপনি যদি এমন কোনো বই এর সন্ধান দেন, তাহলে কৃতজ্ঞ হবো। আর যদি এমন বই না থাকে, তাহলে শীঘ্রই আপনি লিখবেন বলে আশা করছি।

উত্তর : আমি লিখবার আশা রাখি মিথোলজি সিরিজ। ইনশাআল্লাহ।

ইসরাইলের উত্থান-পতন ৩১৫

প্রশ্ন: ইসরাইলের পতাকায় যে চিহ্নটি, যেটি আপনার বইয়ের কাভারেও দেখা যায়, এই চিহ্নের আসল রহস্য কী? বা আদৌ কোনো আলাদা রহস্য আছে কী না? বিভিন্ন মুন্ডি/টিভি শো তে দেখেছি এই চিহ্ন ঐকে কালো জাদু করার দৃশ্য রয়েছে।

উত্তর :



সীল অফ সলোমন, পরবর্তীতে স্টার অফ ডেভিড

এ চিহ্নকে বলা হয় ‘স্টার অফ ডেভিড’। হিব্রুতে একে বলা হয় ‘মেগেন ডেভিড’ (מגן דוד) অর্থাৎ দাউদের বর্ম। এটি একটি হেব্রাথ্রাম, দুটো সমবাহু ত্রিভুজের সমন্বয়ে গঠিত। তবে আগে এর নাম ছিল ‘সলোমনের সীল’। মুসলিম ও ইহুদী উভয়েই এ চিহ্ন ব্যবহার করত তাবিজের উদ্দেশ্যে। তবে ১৭শ শতকে এসে ইহুদীদের আশার প্রতীক হিসেবে ব্যবহার শুরু হয় এ চিহ্নটির। ১৮৯৭ সালের প্রথম জায়োনিস্ট কংগ্রেসে এ চিহ্নকে পতাকায় বসানোর প্রতীক হিসেবে ধার্য করা হয়। প্রথম বিশ্বযুদ্ধে নিহত ইহুদীদের কবরের ফলকে এ চিহ্ন ঐকে দেয়া হতো। বর্তমানে ইসরাইলের পতাকায় এর অবস্থান।

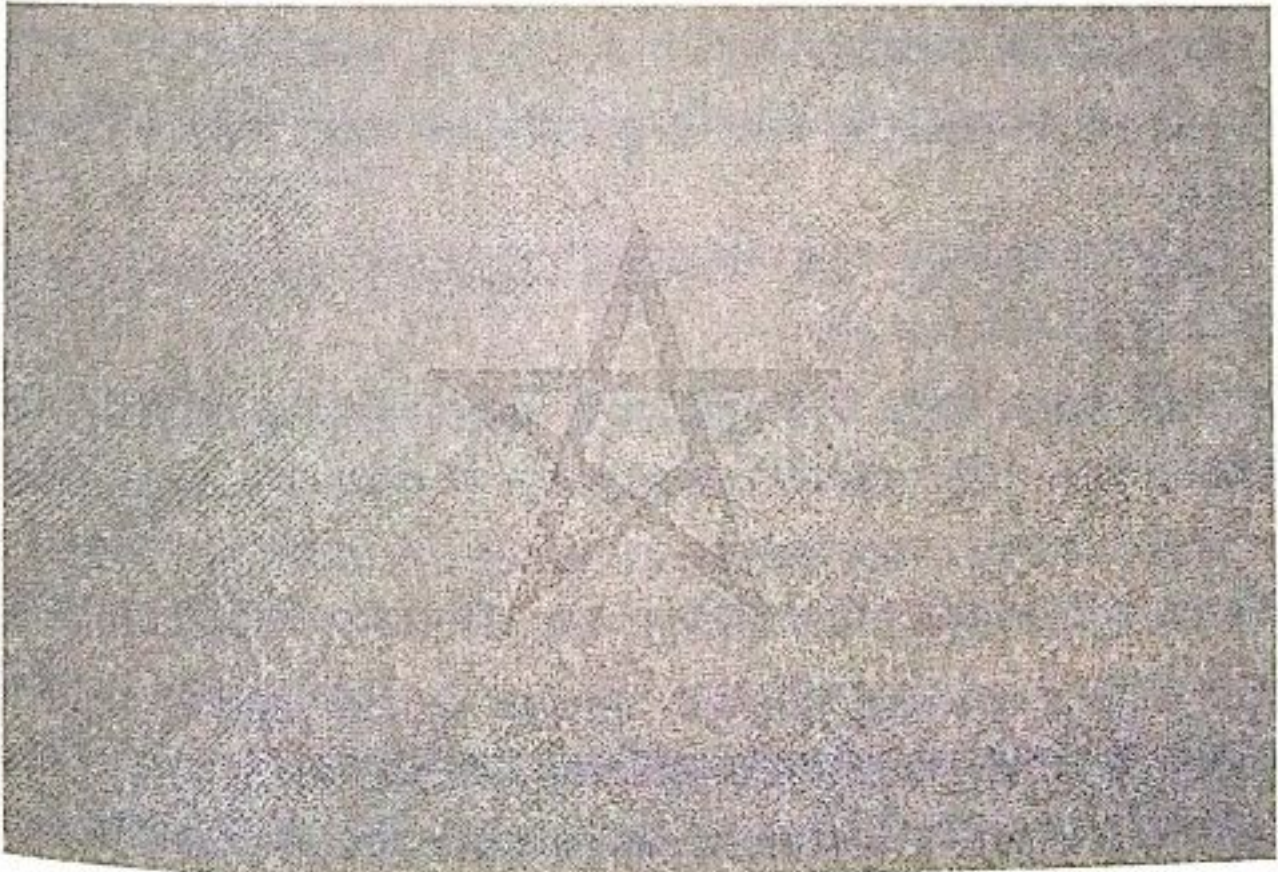
৩১৬ ইসরাইলের উত্থান-পতন

স্যাটানিজমের ক্ষেত্রে আপনি যেটি দেখেছেন, সেটি হেক্সাগ্রাম নয়, পেন্টাগ্রাম। ভালো করে খেয়াল করে দেখুন—



পেন্টাগ্রাম

ইহুদীরা ৩০০ খ্রিস্টপূর্বাব্দ থেকে পেন্টাগ্রাম ব্যবহার করত জেরুজালেমের স্ট্যাম্প হিসেবে। এর অর্থ তাদের কাছে ছিল ন্যায়বিচার, ক্ষমা ও মহাজ্ঞান। মরক্কো ও ইথিওপিয়ার পতাকায় পেন্টাগ্রাম দেখতে পাওয়া যায়।



মরক্কোর পতাকা



ইথিওপিয়ার পতাকা

প্রশ্ন : (এটা এই প্রসঙ্গ ব্যতীত এবং প্রশ্নের বদলে বরং একটা অনুরোধ) দয়া করে একেবারে সৃষ্টির শুরু থেকে সকল ইবাদাতকারী জীবের ইতিহাস নিয়ে লিখুন। একদম সবকিছু। ‘কোরআনের শ্রেষ্ঠ কাহিনী’ নামে এক বই আছে। ওটার মধ্যে এতো বেশি বানান ভুল, আর বানানের ভুলগুলোও রুচিহীন এবং বারবার একই ভুল দেখা যায়। যেমন : ‘মাথা’ কে লিখেছে ‘মাতা’, সমাধানকে লিখেছে ‘সমাদান’ ইত্যাদি। এগুলো দেখলেই বইয়ের তথ্যের ওপর বিশ্বাস রাখা কঠিন হয়ে যায়। তাই আপনার অপেক্ষায় থাকলাম। আশা করি শীঘ্রই আপনি সবকিছুর ইতিহাস লিখে আমাদেরকে উপকৃত করবেন। পরিশেষে, অসংখ্য ধন্যবাদ।

উত্তর : মাথায় থাকলো।

প্রশ্ন : আপনি এই সংঘাতকে ধর্মীয় না ভূ-রাজনৈতিক কারণে সংঘটিত বলে মনে করেন?

উত্তর : ধর্মীয়ভাবে শুরু, পরবর্তীতে ইসরাইলের রাজনৈতিক আগ্রাসনে পরিণত হয়েছে বলে মনে করি।

প্রশ্ন : ভাই, অনেক আশ্রয় নিয়ে ১৭টা লেখা পড়লাম, পরে অসমাপ্ত রয়ে গেলো, ইহুদীদের উত্থান পর্বটার পরে কী হয়েছিল জানার খুব ইচ্ছে।

উত্তর : আপনি তার মানে অনলাইনে ফ্রি অংশগুলো পড়েছিলেন। বই বেরিয়েছে দুটো। ‘ইহুদী জাতির ইতিহাস’ এবং এটি- ‘ইসরাইলের উত্থান পতন’।

প্রশ্ন : Can I support Hamas? Bangla answer please. (আমি কি হামাসকে সমর্থন করতে পারি? বাংলায় উত্তর দেবেন দয়া করে।)

উত্তর : এ তো সম্পূর্ণ আপনার বিষয়। হামাস ফাতাহ সবার সম্পর্কেই এ বইতে বলা হয়েছে।

প্রশ্ন : I have questions related to the Jewish nation. 1) Many nations have their own land, these Jews came first to this land- Israel led by Prophet Musa and later they were banished and they returned again, While I'm a Muslim by practice and while I don't support the killing nature of Israel towards innocent Palestinian citizens but this is also true that these Jews were oppressed since long (well, we know they got punishment for their own sins in the past) but at the same time these Jews got nowhere to go and comparatively they may seek a land of their own (may be not Israel land though) but as per their own religious belief they too are attached to Israel itself. Palestine and Israel could live side by side as humans but instead they fight with each other and here the most miserable deaths happened in Palestine by the cruel Israel itself. My question is who is playing from behind for the clash between these two nations? Why is Israel so cruel to Palestine? While Israel has friend like America and Europe but it's also true that Israel has all enemies (as per their religious conflicts) in its surroundings and they are always in a tension all through. Where should they go if they don't have a place to live for their own religious stake? I'm asking this from humanitarian ground and nothing else. Why are all the Muslim countries not protesting the cruelty of Israel? Why don't they fight together?

উত্তর : আমার মনে হয় আপনার প্রশ্নের উত্তরগুলো ইতোমধ্যে দিয়ে দেয়া হয়েছে।

প্রশ্ন : ব্যালফোর চুক্তির আগে কেমন ছিল এই এলাকা? আমি জানি এটা অটোমানদের অধীনে ছিল, কিন্তু সেটা কি ফিলিস্তিন নামেই ছিল? নাকি অন্য কোনো নামে? চুক্তির ফলশ্রুতিতে ১৯২০-১৯৪৮ সময়ে ডেমোগ্রাফিক চেঞ্জ কেমন হয়েছিল? ইহুদী মিলিশিয়াদের সাথে কেন ব্রিটিশদের সংঘাত ছিল? অভিবাসীদের প্রতি তখনকার বাসিন্দাদের মনোভাব কেমন ছিল? চুক্তির আগের, চুক্তির পর থেকে ১৯৪৮, আর ৪৮-৬৭ পর্যন্ত টাইমলাইনের গাজা, পশ্চিম তীর, রামাধ্বা, তেল আবিব, ইসরাইলের অন্য বড় শহর, জেরুজালেম, আল আকসা কম্পাউন্ডের ছবি চাই। ফিলিস্তিনিরা কেন নিজেদের ফিলিস্তিনি বলে পরিচয় দেয়? এটা কি

বাইবেল/রোমান আমলের সূত্র ধরে? ৬০-৭০ দশকের আরব জাতীয়তাবাদ ভিত্তিক সেকুলার সংস্থামের রূপটি কীভাবে বিশ্বে ইসলামাইজড লেবেলে প্রচারিত হল? কবে থেকে? কেন?

উত্তর : ফিলিস্তিনিরা নিজেদেরকে সেই আদি ফিলিস্তিনি আমল থেকেই ফিলিস্তিনি নামে পরিচয় দেয়। আর সেটিকে পাকাপোক্ত করেছে রোমান নামকরণ।

ইহুদী মিলিশিয়াগুলো ব্রিটিশ ট্রুপদের আক্রমণ করত, কারণ ব্রিটেন ইহুদী অভিবাসনের বিরুদ্ধে আইন করেছিল। ইহুদীদেরকে এখানে জনসংখ্যা বাড়াতে দিচ্ছিলো না।

আপনার বাকি প্রশ্নগুলোর উত্তর বোধ করি ইতোমধ্যে দিয়ে ফেলেছি।

প্রশ্ন : ইসরাইল এবং ফিলিস্তিনের পারমাণবিক অস্ত্র সক্ষমতা সম্পর্কে স্পষ্ট ধারণা দিবেন?

উত্তর : ইসরাইলের পারমাণবিক অস্ত্র আছে বলে ধারণা করা হয়। ৮০-৮০০টি নিউক্লিয়ার ওয়ারহেড ইসরাইল জমা করে রেখেছে বলে ধারণা। অবশ্য ইসরাইল কখনও প্রকাশ্যে এমন কিছু স্বীকার করেনি। তাদের বক্তব্য, "মধ্যপ্রাচ্যে পারমাণবিক অস্ত্র ব্যবহার করা প্রথম দেশ ইসরাইল হবে না।" দেশটি "পারমাণবিক অস্ত্রের বিস্তার নিয়ন্ত্রণ চুক্তি" স্বাক্ষরেও অস্বীকৃতি জানিয়েছে জাতীয় নিরাপত্তার অজুহাতে। এই চুক্তিতে স্বাক্ষরকারী রাষ্ট্রপক্ষের সংখ্যা ১৮৯। তার মধ্যে পাঁচটি রাষ্ট্র পরমাণু শক্তিদর এবং জাতিসংঘ নিরাপত্তা কাউন্সিলের সদস্য : যুক্তরাষ্ট্র, যুক্তরাজ্য, ফ্রান্স, রাশিয়া ও চীন।

ফিলিস্তিনের কোনো পারমাণবিক অস্ত্র নেই।

প্রশ্ন : বিশ্বব্যাপী এই দুই পক্ষের মধ্যে কাদের সমর্থন বেশি?

উত্তর : বিশ্বের ৮৩% দেশ ইসরাইলকে স্বীকৃতি দেয়। প্রায় প্রতিটি আরব দেশই দেয়। তবে গাজা আক্রমণের প্রশ্নে এবং ফিলিস্তিনে রক্তপাতের বিষয়ে বিশ্বের সাধারণ জনগণের রায় ফিলিস্তিনের দিকেই। উল্লেখ্য, আমি রাজনৈতিক সমর্থন বলিনি।

প্রশ্ন : ফিলিস্তিনের ওপর অযাচিত এই হত্যাকাণ্ডের পর ভবিষ্যতে ফিলিস্তিনিরা নিজেদের অস্তিত্ব রক্ষার স্বার্থে কী ধরনের পদক্ষেপ নিবে বলে আপনি মনে করেন?

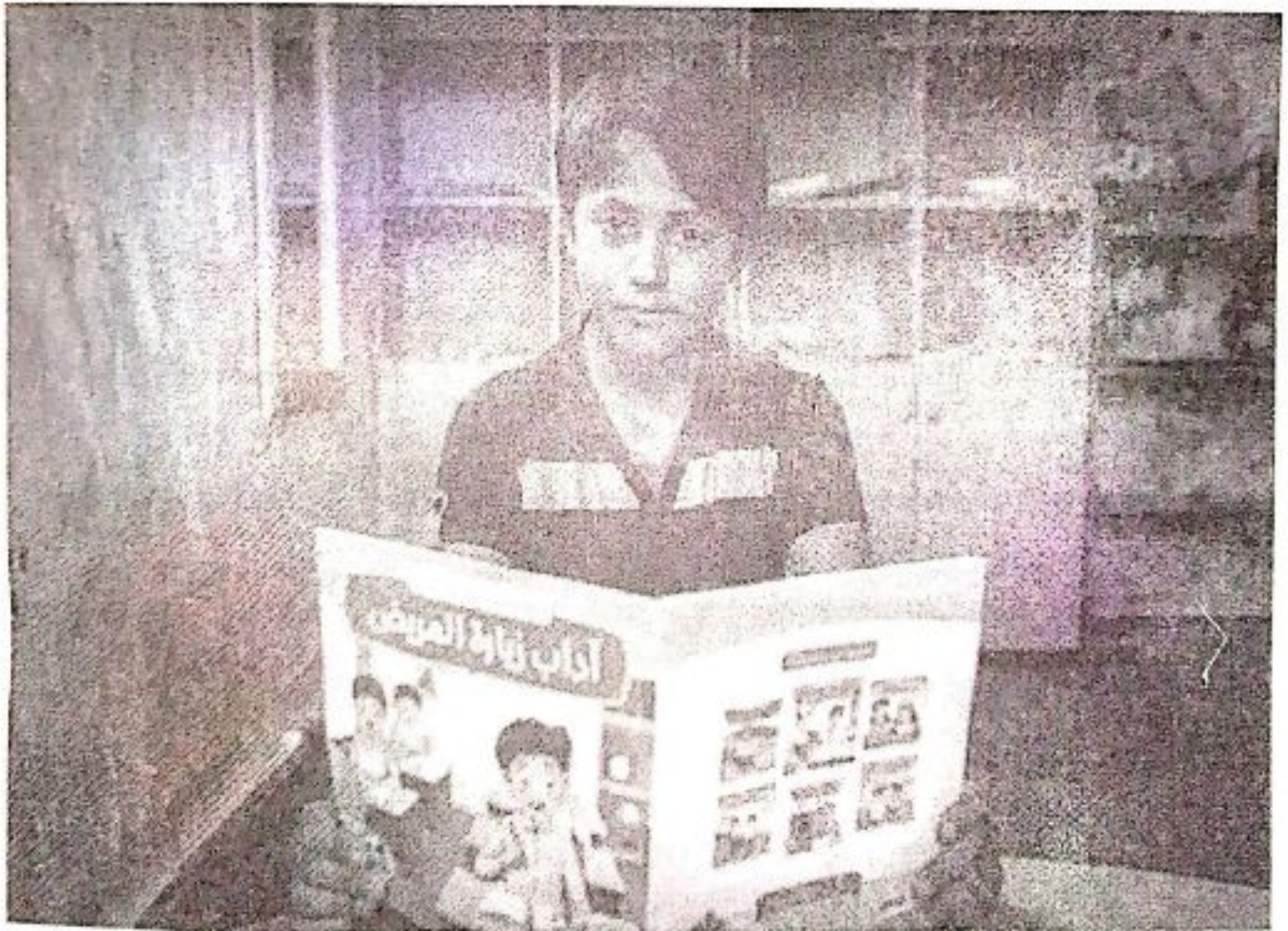
উত্তর : এই হত্যাকাণ্ড আগেও হয়েছে, এরপর কোনো পদক্ষেপ নেয়া হয়নি। ২০২১ সালের যুদ্ধের পরেও হবে না।

৩২০ ইসরাইলের উত্থান-পতন

প্রশ্ন : ফিলিস্তিনিদের শিক্ষার অবস্থা ও ব্যবস্থা কেমন? আর যদি শিক্ষার অবস্থা খারাপ হয়ে থাকে, তাহলে শিক্ষার মাধ্যমে বর্তমান পরিস্থিতির কতটুকু উন্নতি হবে?

উত্তর : ফিলিস্তিনে পড়ালেখার কদর ভালোই। ৯৫.৪% শিশু মৌলিক শিক্ষা পায়, তবে ঝরে পড়ে অনেক। ১৫ বছরের আগে ২৫% ছেলে ও ৭% মেয়ে স্কুল থেকে ঝরে পড়ে। পশ্চিম তীরে ৪০% তরুণ বেকার, আর গাজার বেকার ৬২% তরুণ। জাতীয় সাক্ষরতার হার ৯১.১%। পড়াশোনার নিয়ম কানুন বাংলাদেশ থেকে তেমন ভিন্ন কিছু না। পশ্চিম তীর এবং গাজায় ২০০৫ সালের হিসেব অনুযায়ী, ১০টি বিশ্ববিদ্যালয়, ১৩টি ইউনিভার্সিটি কলেজ এবং ১৯টি সাধারণ কলেজ রয়েছে। এরপর পরিস্থিতির বিশেষ উন্নতি হয়নি। সমাজবিজ্ঞান এবং কলায় বেশি শিক্ষার্থী ভর্তি হয়, বিজ্ঞান ও প্রকৌশলে যায় কম শিক্ষার্থী।

কেবল শিক্ষা আসলে ইসরাইলি দখলদারিত্ব দমনে সাহায্য করতে পারে বলে মনে হয় না।



ফিলিস্তিনি এক শিশু

প্রশ্ন : আমেরিকা অন্ধভাবে কেন ইসরাইলকে সমর্থন দিয়ে যাচ্ছে? এর সম্পর্কে জানতে চাই।

উত্তর : আলোচিত হয়েছে।

প্রশ্ন : আরব দেশগুলো কেন আগের মতো এক হচ্ছে না ইসরাইল ফিলিস্তিন ইস্যু নিয়ে?

উত্তর : আলোচিত হয়েছে।

প্রশ্ন : ফিলিস্তিনের মুক্তি আসলেই কি সম্ভব? যেখানে সবারই দায়-ছাড়া ভাব।

উত্তর : সম্ভবপর মনে হচ্ছে না। আশা করা ছাড়া কোনো উপায় নেই।

প্রশ্ন : হিটলার আর ইসরায়েল নিয়ে প্রচলিত যত মিথ বা কথাবার্তা হয় তা কতটা যুক্তিযুক্ত। আসলেই কি হিটলার ‘অর্ধেক’ ইহুদী মেরেছিলেন?

উত্তর : আলোচিত হয়েছে এ বইতেই।

প্রশ্ন : সূরা মায়িদা ২১, বনী ইসরাইল ১০৪ আয়াত অনুসারে ফিলিস্তিনের ভূমি কার? সংঘাতটি জাতিগত নাকি ধর্মীয়?

উত্তর : আয়াত দুটি নিয়ে একাধিকবার আলোচনা হয়েছে।

ধর্মীয় দৃষ্টিকোণ থেকে আরেকটি আয়াত বলি, “... প্রতিশ্রুতি পালন করা আমার কর্তব্য, আমি (আল্লাহ) এটি পালন করবই।” [সূরা আশ্বিয়া ২১:১০৪]

ইসরাইল তাদের প্রতিশ্রুত ভূমিতে দুবার ফেরত গিয়েছিল। এক, মিসর থেকে, আরেকবার ব্যাবিলন থেকে। প্রতিশ্রুতি পূরণ হয়েছিল। আর এখন তারা এসেছে তৃতীয়বার।

সংঘাতটি কীরূপ, তা আমি ইতোমধ্যে আলোচনা করেছি।

প্রশ্ন : আমার প্রশ্নটা একটু ভিন্ন। উদাহরণের জন্য বাংলাদেশের বিষয় টানবো। যখন ফিলিস্তিনে ৮০/৯০ ভাগ মুসলিম ছিল এবং ইংল্যান্ড শাসনামল ছাড়ল ইহুদী এবং মুসলিমদের কোনো দেশ স্বীকৃতি না দিয়ে, তখন ইহুদীরা বা তাদের নেতারা ঠিকই নিজেদের দখল নেয়া জায়গায় রাষ্ট্র গঠনের ঘোষণা দিল। অন্যদিকে অনেক বড় সংখ্যায় মুসলিমরা সেই জায়গায় থাকার পরেও কেন তারা রাষ্ট্র গঠন করলো না? তারাও কি আমাদের নেতাদের মতো পূর্ব এবং পশ্চিম মিলিয়ে অন্য মুসলিম দেশের সাথে থাকতে চেয়েছিল?

উত্তর : ব্রিটিশ ম্যান্ডেট ছাড়ামাত্রই ইসরাইল রাষ্ট্রের ঘোষণা হয়, সেখানে মুসলিম রাষ্ট্র ঘোষণার কোনো প্ল্যান প্রোগ্রামই হয়নি। এমনটা তারা আদৌ ভাবেননি।

প্রশ্ন : ইসরাইল বিশ্বরাজনীতিকে নিয়ন্ত্রণের ঠিক কোন পর্যায়ে আছে? আর কী কী কাজ বাকি আছে সেটি সম্পন্ন করতে?

উত্তর : প্রশ্নটি অনেকটা ষড়যন্ত্র তত্ত্বের মতো। তবে লবিংয়ের মাধ্যমে যতটুকু করা যায়, তারা করছে। বাকি বিষয়গুলো নিয়ে আলোচনা করলে সেটা যৌক্তিক বা তথ্যনির্ভর হবে না।

প্রশ্ন : বিশ্ব-রাজনীতিতে ইসরাইলের প্রভাব সম্পর্কে বিস্তারিত জানতে চাই।
ফেসবুক, অ্যাপল, গুগলের মত বড় বড় প্রতিষ্ঠানের ইসরাইলের সাথে কী সম্পর্ক?

উত্তর : আলোচিত হয়েছে।

প্রশ্ন : ইসমাইল (আ) আর ইসহাক (আ)-কে নিয়ে করা চুক্তির বিষয়টি উল্লেখ করেন। এই দুই জন থেকে দুটি জাতি।

উত্তর : যে চুক্তি নিয়ে এ বইতে বেশি আলোচিত হয়েছে সেটি ইহুদীরা ইসহাক (আ)-এর সাথে চুক্তি বলে অভিহিত করে। আর ইসমাইল (আ)-এর ব্যাপারে চুক্তি ছিল, “আর ইসমাইলের বিষয়েও তোমার (ইব্রাহিম) মুনাজাত শুনলাম; দেখ, আমি তাকে দোয়া করলাম এবং তাকে ফলবান করে তার অতিশয় বংশবৃদ্ধি করবো; তা থেকে বারো জন বাদশাহ উৎপন্ন হবে ও আমি তাকে (তার বংশধরদের) বড় জাতি করবো।” (পয়দায়েশ ১৭:২০)

প্রশ্ন : ইসরাইলের ইহুদীরা কী চায়?

উত্তর : পবিত্র ভূমির পূর্ণ অধিকার।

প্রশ্ন : ইহুদীদেরকে পরাশক্তি রাষ্ট্রগুলো সাহায্য করার কারণ কী?

উত্তর : আলোচিত হয়েছে ইতোমধ্যে।

প্রশ্ন : The Jews believe that God had made covenant with Abraham about the blessings on his descendants as well as giving the right over the promised land now known as Israel. But we know that the Muslims are also descendants of Abraham. Then according to the covenant don't the Muslims also have the right over the promised land? Or the Jews do not accept the fact that Muslims are also the descendants of Abraham? (ইহুদীরা বিশ্বাস করে, স্রষ্টা কোভেন্যান্ট বানিয়ে ইব্রাহিম (আ) এর পুত্রদের আশীর্বাদ করেছেন ও তাদের বংশধরদের পবিত্র ভূমির অঙ্গীকার করেছেন। কিন্তু আমরা জানি, মুসলিমরাও ইব্রাহিম (আ) এর বংশধর। তাহলে, কোভেন্যান্ট (অর্থাৎ অঙ্গীকার) অনুযায়ী মুসলিমদেরও তো পবিত্র ভূমির ওপরে অধিকার আছে, তাই না? নাকি ইহুদীরা মুসলিমদের ইব্রাহিম (আ) এর বংশধর বলে স্বীকার করে না?)

উত্তর : এটা সত্য যে তাওরাতে করা আল্লাহর সেই অঙ্গীকার ইব্রাহিম (আ)-এর পুত্রদের জন্য ছিল। কিন্তু পরবর্তীতে ইসহাক (আ)-কে আলাদা করে বলাতে

ইহুদীরা এমন ধারণা প্রত্যাখ্যান করে যে, এতে ইসমাইল (আ)-এরও অধিকার ছিল। তাই তারা ইসমাইল (আ) এর বংশধরদের এই পবিত্র ভূমিতে অধিকার আছে বলে মনে করে না।

অবশ্য ইংরেজিতে একে চিরস্থায়ী অঙ্গীকার বলা হলেও, হিব্রু শব্দ ‘ওলাম’ বলতে চিরস্থায়ী নয় বরং দীর্ঘকাল বোঝায়। অর্থাৎ তা ছিল দীর্ঘকালের অঙ্গীকার। এ প্রসঙ্গে কুরআনের কেবল একটি আয়াত উল্লেখ করা যেতে পারে- "এবং যখন তোমার প্রতিপালক ইব্রাহিমকে কতিপয় বাক্য দ্বারা পরীক্ষা করেছিলেন পরে সে তা পূর্ণ করেছিল; তিনি (আল্লাহ) বলেছিলেন- নিশ্চয়ই আমি তোমাকে মানবমণ্ডলীর নেতা করব। সে (ইব্রাহিম) বলেছিল, আমার বংশধরগণ হতেও। তিনি (আল্লাহ) বলেছিলেন- আমার অঙ্গীকার অত্যাচারীদের প্রতি প্রযোজ্য হবে না।" (সূরা বাকারা ২:১২৪)

প্রশ্ন : ফিলিস্তিনের ভবিষ্যৎ কী হতে পারে?

উত্তর : কঠোর সত্য কথা হলো, বাস্তবিকভাবে পশ্চিম তীর তো বটেই, গাজাও ইসরাইল নিয়ে নিতে পারে, অন্তত তাই তো তাদের ইচ্ছে। হয়তো স্বল্প একটি অংশ বাকি থাকবে। যদি না অলৌকিক কোনো সমাধানের দেখা মেলে।

প্রশ্ন : বর্তমান ইসরাইল যারা শাসন করছে তারা কারা?

উত্তর : জায়োনবাদী ইহুদী।

প্রশ্ন : ফিলিস্তিনি জাতীয়তাবাদ আর বামপন্থী আন্দোলন কি আলাদা?

উত্তর : ফিলিস্তিনি বামপন্থী আন্দোলন আর ফিলিস্তিনি জাতীয়তাবাদ আলাদা। বামপন্থী আন্দোলন এখন ম্রিয়মাণ।

প্রশ্ন : হামাস ফাতাহ দ্বন্দ্ব কতটা চরমে?

উত্তর : তাদের মাঝে মারামারি কাটাকাটি এ মুহূর্তে ততটা না থাকলেও তারা একে অন্যের বন্ধু পর্যায়ে যেতে পারেনি এখনও।

প্রশ্ন : ইয়াসির আরাফাতকে কি আসলেই ইহুদীরা বশে এনে ফেলেছিলো?

উত্তর : এটা তো আমাদের বলতে পারার মতো অবস্থা নেই। কথাটা খানিকটা ষড়যন্ত্র তত্ত্বের মতো শোনায় যদিও। তবে তিনি ইসরাইলের অস্তিত্বকে শেষমেশ মেনে নিয়েছিলেন আরকি। ফাতাহ যেমন মানে।

প্রশ্ন : হামাসের সাথে ফাতাহর সম্পর্ক নিয়ে বিস্তারিত জানতে চাই। ফাতাহর বিরুদ্ধে করাপশন, হামাসকে অসহযোগিতা, ক্ষমতা দখল, ইসরাইলের সাথে নমনীয় আচরণ— এই অভিযোগগুলোর সত্যতা কতটুকু? ব্যাখ্যা চাই।

উত্তর : ফাতাহ এবং হামাস তো একে অন্যের সাথে অসহযোগিতাই করে। দুর্নীতির অভিযোগ আছে বটে। ক্ষমতা দখল বলতে কী বোঝাচ্ছেন, তা জানা দরকার। তবে ইসরাইলের সাথে তারা এখন নমনীয় বটে, হামাস অনমনীয়।

প্রশ্ন : ইরান চোরাই পথে কীভাবে হামাসকে অস্ত্রের যোগান দেয়? যেখানে মিশরের সাথে অল্প বর্ডার ছাড়া পুরোটাই ইসরাইলের নিয়ন্ত্রণে!

উত্তর : বহু বছর ইরানের যোগান দেয়া রকেটের ওপর ভরসা করে থেকেছে হামাস। ধারণা করা হয় প্রায় ৮ হাজার রকেট তাদের মজুদে রয়েছে। প্রথাগতভাবে সুদানে শিপিং করার পর মিসরের বিশাল মরু পেরিয়ে ভূগর্ভস্থ গোপন সুড়ঙ্গের মধ্য দিয়ে রকেটগুলো আনা হয় গাজায়।

প্রশ্ন : ফিলিস্তিন সরকারকে হামাসের মতো পদক্ষেপ নিতে দেখা যাচ্ছে না কেন?

উত্তর : ফিলিস্তিনের ফাতাহ সরকার কাগজে কলমে অসাম্প্রদায়িক বা সেকুলার।

প্রশ্ন : বর্তমান (২০২১-) যুদ্ধবিরতির স্থায়িত্ব কতদিন হতে পারে? হামাস কি এভাবে যুদ্ধ করতে থাকলে মুসলিম বিশ্বের একতা ছাড়া নিজেরা ফিলিস্তিনকে মুক্ত করতে পারবে? বা, এভাবে কেবলমাত্র হামাস দ্বারা ফিলিস্তিন মুক্ত হওয়ার সম্ভাবনা আছে কি?

উত্তর : স্থায়িত্ব কতদিন তা বলা মুশকিল, তবে ফিলিস্তিন এভাবে মুক্ত হবার সম্ভাবনা দেখি না।

প্রশ্ন : ইব্রাহিম (আ) এর দুই ছেলে ইসহাক আর ইসমাইল (আ)-কে নিয়ে করা কোভেন্যান্টের (চুক্তির) ব্যাপারে বলুন। ইহুদী আর মুসলিম জাতির শিকড় নিয়ে জানুক। এটা একটি মিরাকুলাস ব্যাপার।

উত্তর : আলোচিত হয়েছে ইতোমধ্যে।

প্রশ্ন : ইসরাইল কি ফিলিস্তিনের সাথে তাদের সংঘাতকে বিবলিকাল মনে করে?

উত্তর : এ মুহূর্তে তারা বিবলিকাল মনে করে না। কেবল নিজের পূর্বপুরুষের অবস্থানে থাকা যে কাউকে তারা সরাতে রাজি, বা তাদের কাছ থেকে অধিকার

ইসরাইলের উত্থান-পতন ৩২৫

নিয়ে নিতে রাজি। কিন্তু তাদের এ অধিকার তাদের বিবলিকাল বিশ্বাস থেকেই এসেছে।

প্রশ্ন : ইসরাইল কি পশ্চিম তীরের দখল নিয়ে নেবে? এরপর দাজ্জাল আসবে? হাদিস মতে তো কিয়ামতের আগে সব জাতি মুসলিমদের শত্রু হবে। মুসলিমরা সংখ্যায় অনেক হবে তাও কিছু করতে পারবে না। যেমন এখন দুই বিলিয়ন মুসলিম তাও ইসরাইলকে কিছু করতে পারে না... তার মানে প্রফেসি অনুযায়ী কিয়ামতের আগে কী কী হবে তা বলাই আছে। তাহলে প্যালেস্টাইন যে দখল হবে এটা তো অনেকটা নিশ্চিতই। সব তো লেখাই আছে। সরি এভাবে লিখার জন্য।

উত্তর : ইসরাইলি সেটেলমেন্ট পশ্চিম তীরে যেভাবে বাড়ছে এক পর্যায়ে পুরোটা নিয়ে নেয়া অবাক করা ব্যাপার হবে না।

প্রশ্ন : আপনার মতে প্যালেস্টাইন আর কত বছরের মধ্যে হারিয়ে যেতে পারে?

উত্তর : অর্ধ-শতাব্দী, হয়তো।

প্রশ্ন : আসসালামু আলাইকুম। সর্বশেষবার ইহুদীদের অভিশপ্ত হওয়ার কারণ কী ছিল? যীশু খ্রিস্টকে নবী হিসেবে অস্বীকার করা? আর ইহুদীদের প্রতিশ্রুতি ভূমির প্রতিশ্রুতি কি কোনো শর্তসাপেক্ষ প্রতিশ্রুতি ছিলো? সেই প্রতিশ্রুতি কি এখন নেই বা কোনো একসময় কেড়ে নেয়া হয়েছিলো? (বরাবরের মতোই ইহুদী, ইসলাম, খ্রিস্টান তিন ধর্মের ধর্মগ্রন্থের রেফারেন্স দিয়ে উত্তর দিবেন আশা করি)

উত্তর : ওয়ালাইকুম সালাম।

ইহুদীদের দেয়া প্রতিশ্রুতির শর্ত ছিল অন্যায় বা জুলুম করা যাবে না। তবে এটা কুরআনে উল্লেখিত, বাইবেলে নয়। “আমার অঙ্গীকার অত্যাচারীদের প্রতি প্রযোজ্য হবে না।” (সূরা বাকারা ২:১২৪)

অনেকের ধারণা সেই প্রতিশ্রুতি চিরস্থায়ী নয়, বরং হিব্রু ‘ওলাম’ (עולם) শব্দ অনুযায়ী ‘দীর্ঘকালের’ জন্য ছিল। তাওরাতে দেয়া প্রতিশ্রুতিগুলো এ বইতেই অন্যত্র উল্লেখিত হয়েছে।

সর্বশেষবার ইহুদীদের অভিশপ্ত হওয়ার কারণ বলা হয় কিতাব পরিবর্তন, এবং কিতাবকেন্দ্রিক না হয়ে যা বাইবেলকেন্দ্রিক ধর্ম হয়ে যাওয়া। সম্রাট টাইটাস কর্তৃক তখনকার শান্তির কথা কুরআনে এভাবে এসেছে— “তোমরা সৎ কাজ করলে

তা নিজেদেরই জন্য করবে এবং মন্দ কাজ করলে তাও করবে নিজেদের জন্য। অতঃপর পরবর্তী প্রতিশ্রুতি পূরণের সময় উপস্থিত হলে আমি আমার দাসদেরকে প্রেরণ করলাম তোমাদের মুখমণ্ডল কালিমাচ্ছন্ন করার জন্য, প্রথমবার তারা যেভাবে বাইতুল মুকাদ্দাসে প্রবেশ করেছিল পুনরায় সেভাবেই তাতে প্রবেশ করার জন্য এবং তারা যা অধিকার করেছিল তা সম্পূর্ণ রূপে ধ্বংস করার জন্য।” (সুরা বনী ইসরাইল ১৭:৭)

প্রশ্ন : বর্তমান জায়োনিস্ট, এর সমর্থক ইহুদী এবং অর্থডক্স বা প্রোটেষ্ট্যান্ট ইহুদীদের মধ্যে ধর্মীয় বিশ্বাসের কি পার্থক্য আছে? থাকলে কীরকম?

উত্তর : জায়োনিস্ট ইহুদী এবং সাধারণ ইহুদীদের মাঝে একমাত্র পার্থক্য হলো, জায়োনিস্টরা ইসরাইল রাষ্ট্রের রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠা ও সম্প্রসারণ চায়। প্রোটেষ্ট্যান্টরা খ্রিস্টান, ইহুদী নয়।

প্রশ্ন : যেহেতু ইহুদীরা প্যালেস্টাইনে বা ইসরাইলে একত্রিত হবে, জেরুজালেমে থার্ড টেম্পল নির্মাণ করলেই দাজ্জালের আগমন ঘটবে (ইসলাম ধর্মমতেও সম্ভবত একই ভবিষ্যদ্বাণী করা হয়েছে), তাহলে কি ইহুদীরা আল্টিমেটলি জেরুজালেম এবং মসজিদুল আল আকসা এরিয়া দখল নিবেই? আটকানো যাবে না? আরেকটা বিষয়, যদিও কিছুটা অপ্রাসঙ্গিক, দাজ্জালের অরিজিন সম্পর্কে কিছু জানাবেন দয়া করে, যদি এবিষয়ে আপনার পড়াশোনা বা জ্ঞান থেকে থাকে আর কি। ধন্যবাদ।

উত্তর : আপনি যেভাবে বলছেন, ধর্মীয় দৃষ্টিকোণ থেকে ভবিষ্যদ্বাণী এভাবেই আসলে ঘটে যায়। অমোঘ বাণী যাকে বলে, এক সময় না এক সময় হবেই। তবে ধর্মীয় দৃষ্টিকোণ থেকে না বললে, দুই জাতির কোনো কমন সমাধানে রাজি হওয়াই ঠেকাতে পারে যত সংঘাত।

দাজ্জালের অরিজিনের আলোচনা এ বইতে নয়। অন্য কোনো বইতে করা যাবে।

প্রশ্ন : ইহুদী ও ইসলামের মাঝে ‘সৃষ্টিকর্তার ধারণাগত পার্থক্য’ কোন জায়গায়? আর কোনো পার্থক্য যদি নাই থাকে, তবে আমাদের নবীকে মেনে নিতে তাদের সমস্যা কোথায়?

উত্তর : সৃষ্টিকর্তা নিয়ে দুই ধর্মের মাঝে কোনো ধারণাগত পার্থক্য নেই।

“হযরত মুহাম্মাদ (সা) ইসমাইলি নবী হতে পারেন”, ইহুদীদের অনেকের মতে। অনেকে তাকে নবী মনেও করেন, কিন্তু অনুসরণ করেন না। ইহুদীরা

জেন্টাইল (অ-ইহুদী) কোনো নবীর অনুসরণ করে না। আমি এটুকু জানতে পেরেছি একজন যাঁ বাইকে জিজ্ঞাসা করে।

প্রশ্ন : ১ম বিশ্বযুদ্ধের পর ইংরেজরা ফিলিস্তিনিদের জমি কীভাবে ইহুদীদের দিয়ে দেয়? আর এখানে আমেরিকার ভূমিকাটা কী ছিল? কবে থেকে ইসরাইলিরা ফিলিস্তিনিদের জমি দখল করা শুরু করে ও যুদ্ধের অবস্থা সৃষ্টি হয়?

উত্তর : আলোচনা করা হয়েছে এ বইতে।

প্রশ্ন : মহানবী (সা) নিয়ে ইহুদীর মনোভাব কেমন? ধর্মীয় ভাবে তাকে তারা কীভাবে দেখে? যেহেতু মহানবী (সা) ইব্রাহিম (আ)-এর বংশধর।

উত্তর : এ বিষয় নিয়ে আগের বইতে (“ইহুদী জাতির ইতিহাস”) আলোচনা হয়েছে।

প্রশ্ন : এই যুদ্ধবিরতিটিকে (২০২১-) হামাসের বিজয় বলা চলে কি?

উত্তর : ৭৭% ফিলিস্তিনি তা-ই মনে করে।

প্রশ্ন : ইউ নো হু-র ভবিষ্যৎ আসলে কী?

উত্তর : যেভাবে চলছে চলতে থাকা একই হারে, যদি না কোনো অবাক করা সমাধান এসে হাজির হয়।

প্রশ্ন : ইসরাইল যদি গাজার চারিদিকে ঘেরাও করে রাখে, তাহলে হামাসের অস্ত্র বা রকেটগুলো কীভাবে আসে? যদি নিজেরা তৈরি করে তাহলে যেখানে নিত্যপ্রয়োজনীয় জিনিসই ঠিকমত পাওয়া যায় না সেখানে এগুলো কিভাবে তৈরি করে? আর যদি মাটির নিচে সুড়ঙ্গ দিয়ে আনে তাহলে ইসরাইলের কাছে কি এমন টেকনোলজি নেই, যার দ্বারা বর্ডার এরিয়ার মাটির নিচের গতিবিধি ট্র্যাক করে এগুলো ধরতে পারে?

উত্তর : মনে হচ্ছে তেমন প্রযুক্তি তারা ব্যবহার করছে না আপাতত।

প্রশ্ন : ইসরাইল/ ইহুদী/ জায়োনিস্টরা কি ইলুমিনাতি অথবা ঘডঙ এর সাথে সম্পর্কিত?

উত্তর : ইলুমিনাতি বা নিউ ওয়ার্ল্ড অর্ডার নিয়ে নানা ষড়যন্ত্র তত্ত্ব রয়েছে। এগুলো ছাড়াই ইসরাইলপন্থী লবিগুলো যথেষ্ট শক্তিশালী।

প্রশ্ন : আমেরিকা ঠিক কোন ঘটনার পর অথবা কী কারণে সবসময় ইসরাইল-ফিলিস্তিন সংঘাতে একচোখা নীতি অবলম্বন করে আসছে? তাদের নীতির ফলে “আমেরিকা ইহুদীরা নিয়ন্ত্রণ করে” এই ভাষ্যটাকে কি সত্যায়িত করে না?

উত্তর : আলোচিত হয়েছে লবিং বিষয়ে।

প্রশ্ন: পিএলও কি শুধুমাত্র ইসরাইলের বেসিক নাগরিক সুবিধা পাওয়ার জন্যই সশস্ত্র সংগ্রামের পথ থেকে সরে এসেছে? বা কী জন্য পশ্চিম তীরে কোন কার্যকর প্রতিরোধ নেই প্যালেস্টাইনিদের? পিএলও-র চুক্তির পর প্যালেস্টাইনে এর প্রতিক্রিয়া কী ছিলো? মাহমুদ আব্বাস কি পশ্চিমা মদদপুষ্ট?

উত্তর : আপনার সমস্ত প্রশ্নের উত্তর হলো ফাতাহর সেকুলারিজম, এবং ইসরাইলের অস্তিত্ব মেনে নেয়া। একটি মেনে নেয়া রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে কী আক্রমণ চালানো হবে?

প্রশ্ন : প্যালেস্টাইনিদের ভবিষ্যৎ কী? এখন তো তাদের বসবাস গাজা আর পশ্চিম তীরে। তাদের দুই রাজনৈতিক দল হামাস আর পিএলও ভিন্ন মতাদর্শের কারণেই কি ইসরাইল বার বার হামলার সুযোগ পাচ্ছে? এইবারের (২০২১) হামলার শিকার বেশি গাজাবাসী। এই এলাকা তো ইসরাইলের নিয়ন্ত্রণে নেই। ভবিষ্যতে কি গাজা কেন্দ্র প্যালেস্টাইন দেশ হবে? বর্তমানে জাতিগত নিধনের শিকার হওয়া গোষ্ঠীগুলোর ভবিষ্যৎ কী? আর রোহিঙ্গারা আগামীতে আমাদের জন্য থ্রেট কিনা?

উত্তর : গাজা ও পশ্চিম তীর নিয়ে কী হতে পারে, তা নিয়ে আলোচনা হয়েছে ইতোমধ্যে।

রোহিঙ্গা নিয়ে আলোচনা এ বইয়ের বিষয় নয়।

প্রশ্ন: আমেরিকার প্রেসিডেন্টরা সবসময় প্যালেস্টাইন-ইসরাইল ইস্যুতে ইসরাইলের পক্ষ নেয়। এটা কি শুধু টাকার জন্য না আমেরিকার ফরেন পলিসির অন্য কোন স্বার্থ?

উত্তর : আলোচনা হয়েছে ইতোমধ্যে।

প্রশ্ন : “দি লিডারশিপ অফ মুহাম্মাদ (সা)” বইয়ের যে বাংলা অনুবাদ বাজারে পাওয়া যায়, তা বাজে। আপনি কি পুনরায় অনুবাদ করতে পারেন না? **Leadership Lessons from the life of Rasulullah (S) by Mirza Yawar Beg** বইটির বাংলা অনুবাদ চাই।

উত্তর : বইটি পড়িনি, মাথায় রাখলাম।

প্রশ্ন : ইহুদীদের জন্য স্বতন্ত্র রাষ্ট্র ইসরাইল কেন ফিলিস্তিনের বুকেই করতে হলো? ফিলিস্তিন ব্যতিরেকে শুধু ইসরায়েলকে স্বাধীন রাষ্ট্রের স্বীকৃতি দেওয়ার প্রেক্ষিত আন্তর্জাতিক আইন, সর্বজনীন মানবাধিকার ইত্যাদির সাথে কতটুকু জাস্টিফাইযোগ্য, জাতিসংঘ বা পশ্চিমা রাষ্ট্রগুলোকে সেই প্রশ্নের অবতারণা করা যায় কিনা? হামাস এই প্রতিরোধ আর কতবছর অব্যাহত রাখতে পারবে, বিশেষ করে মিশর সীমান্তে দেয়াল তুলে দেওয়ার পর?

উত্তর : ইসরাইলের বুকে করতে হলো, কারণ এক সময় তারা এখানে বসবাস করত, এবং তাদের কাছে জেরুজালেম ধর্মীয়ভাবে পবিত্র। এজন্য এ ভূমি তাদের দাবি ছিল। জাতিসংঘ চেয়েছিল টু স্টেট করে দিতে, জেরুজালেমকে আলাদা রেখে, তা তো আর হয়নি। আইন ভঙ্গ নিয়ে আলাদা প্রশ্নে আলোচনা হয়েছে।

হামাস ভবিষ্যতে পারবে কি না, তা দেখবার বিষয়। হয়ত পারবে না, যেহেতু ইসরাইল আরও উন্নত হয়ে চলেছে।

প্রশ্ন : বহির্বিশ্বের সাহায্য-সহযোগিতা বিশেষত অস্ত্রের যোগান কীভাবে গাজায় পৌঁছে?

উত্তর : উত্তর দেয়া হয়েছে অস্ত্র এবং ডোনেশন দুটোর ব্যাপারেই।

প্রশ্ন : হলোকাস্টে কি সত্যিই ৬০ লক্ষ ইহুদীকে হত্যা করা হয়েছে?

উত্তর : আনুমানিক ৬০ লক্ষ, তবে কম বেশি হতেই পারে। একটি বড় অংকের ইহুদী নিধন হয়েছিল, এটি ঐতিহাসিক সত্য।

প্রশ্ন : Will the donations given to Palestinian Embassy reach Gaza?
(ফিলিস্তিন দূতাবাসে যেসব সাহায্য দেয়া হয়, সেগুলো কি গাজায় পৌঁছায়?)

উত্তর : এটা বলা মুশকিল। আমি প্রশ্নোত্তরে লিখেছি আগে কাদের মাধ্যমে ডিল হয় এটি।

প্রশ্ন: Let me know in details regarding Israeli Messiah (Dajjal), the Third Temple and Gog Magog war/buried on Jerusalem.

উত্তর : আলোচনা হয়েছে বইতে।

প্রশ্ন : যুদ্ধটা কারা করছে? শুধুই কি হামাস নাকি সাধারণ ফিলিস্তিন জনগণও অংশ নিয়েছে?

উত্তর : হামাস করেছে। সাধারণ জনগণ তো ইট পাটকেল ছোড়ার চাইতে বেশি দূর তেমন যেতে পারবে না, তাদের তো মিসাইল নেই।

প্রশ্ন: ইসরাইলিরা বারবার বলে ফিলিস্তিন হচ্ছে তাদেরকে আল্লাহ কর্তৃক দেয়া প্রমিজড ল্যান্ড। তাই যদি হয় সেক্ষেত্রে আমাদের হাতে তো কিছু নাই, কারণ স্বয়ং আল্লাহ তাদের কথা দিয়েছেন, ইসলাম এক্ষেত্রে কী বলে? আপনার লেখা পড়ে যদূর জেনেছি ইয়াকুব (আ) এর বংশধরেরাই ইহুদী। সুতরাং কেউ ধর্ম বিশ্বাস না করলেও সে ইহুদী হতে পারে। অনেক ইহুদীই আছে আমার জানামতে

যারা ধর্মে বিশ্বাসী নয়, আবার একদল বলছে ফিলিস্তিন তাদের গডস প্রমিজড ল্যান্ড, বিষয় দুটো পরস্পরবিরোধী হয়ে গেলো না?

উত্তর : যারা ধর্মে বিশ্বাসী নয়, তারা অনেক আগের পূর্বপুরুষদের ভূমি হিসেবে দাবি করে। আল্লাহ কথা দিয়েছেন বটে, তবে তা শর্তসাপেক্ষে, যা আগে আলোচনা করেছি।

প্রশ্ন : ইহুদীদের কি শেষ নবী বা এমন কিছুতে বিশ্বাস আছে? তাদের নবীর ধারা কি এখনও চলমান?

উত্তর : তাদের শেষ নবী নিয়ে বিশ্বাস নেই, তবে মাসিহ নিয়ে আছে। তারা নবী নয়, মাসিহের অপেক্ষায় আছে। আলোচনা হয়েছে এ নিয়ে বিস্তারিত।

প্রশ্ন : মুসলমানদের কাছে আল আকসা মসজিদ নাকি কুবাতুস সাখরা, কোনটার গুরুত্ব বেশি? আর কুবাতুস সাখরার পাথরের গুরুত্ব ইহুদীদের কাছে কেমন আর মুসলমানদের কাছে কেমন?

উত্তর : কুবাতুস সাখরার সেই পাথরটি একসময় কিবলা ছিল মুসলিমদের, ইহুদীদের কাছেও মহাপবিত্র। সে হিসেবে ঐতিহাসিক গুরুত্ব আছে, এখন আর ধর্মীয় বাধ্যবাধকতা নেই। আল-আকসা পুরো কম্পাউন্ডের কথাই কুরআনে উল্লেখিত আছে, তাই এটির গুরুত্বই বেশি, এটি একটি পবিত্র মসজিদ। এ কম্পাউন্ডে সুলাইমান (আ)-এর বাইতুল মুকাদ্দাস ছিল।



কুবাতুস সাখরা

প্রশ্ন : মাঝে মাঝে শুনি যে আল আকসা মসজিদ ভেঙে গুঁড়িয়ে ফেলা হবে কোনো ষড়যন্ত্র দ্বারা, সেক্ষেত্রে সেই পাথরেরও তো ক্ষতি হওয়ার সম্ভাবনা থাকে, ইহুদীরা কি টেম্পল তৈরির জন্য এতো বড় রিস্ক নেবে?

উত্তর : ইহুদীরা এ পাথরকে হোলি অফ দ্য হোলিজ ধরে নিয়ে এর ওপরে টেম্পল বানাতে চায়, একে ধ্বংস করে নয়। এর ওপরের স্থাপনার অবশ্য গুরুত্ব নেই ইহুদীদের কাছে।

প্রশ্ন : আর্ক অফ দ্য কোভেনেন্ট কি ঈসা (আ) বা ইসলামের আসার আগেই হারিয়ে গিয়েছিল? যদি তাই হয় তাহলে ইসলাম কী বলে এই ব্যাপারে? এটা কি কেউ আবার ফিরে পাবে এমন কোনো প্রফেসি আছে ইসলামে বা ইহুদী ধর্মে বা খ্রিস্টিয়ান ফেইথে?

উত্তর : ইহুদী ধর্মে বিশ্বাস করা হয় যে তাদের মাসিহ আসার পর আর্ক অফ দ্য কোভেনেন্ট ফিরে পাওয়া যাবে। এটি নেবুকাদনেজার কর্তৃক জেরুজালেম আক্রমণের সময়ই হারিয়ে গিয়েছিল, আড়াই হাজার বছরেরও বেশি আগে।

[বি.দ্র. সকল প্রশ্ন বাছাই করা হয়নি বইয়ের জন্য।]

পরিশিষ্ট ২

এক বলকে পুরো ইতিহাস



এ অধ্যায়টি আমি রেখেছি মূলত পুরো ইতিহাসের টাইমলাইন এক বলকে দেখে নেবার জন্য। পাঠকদের উপকারে লাগতেও পারে।

খ্রি.পূ. ৩১০০ : মেসোপটেমিয়ায় কুনিফর্ম লিপি উদ্ভাবন করে সুমেরীয়রা

খ্রি.পূ. ২৬১৫-২১৭৫ : মিসরের ওল্ড কিংডম সময়কাল

খ্রি.পূ. ২৩৬০-২১৮০ : মেসোপটেমিয়ায় প্রথম কোনো বড়সড় সাম্রাজ্যের উদ্ভব

খ্রি.পূ. ২১শ-১৯শ : আমোরাইট ও অন্যান্য জাতি মেসোপটেমিয়া ও কানান ভূমিতে (পবিত্র ভূমি) প্রবেশ করে

খ্রি.পূ. ২১শ-১৫শ : কানান ভূমির মধ্য-ব্রোঞ্জ যুগ

খ্রি.পূ. ২০৬০-১৯৫০ : তৃতীয় উর সাম্রাজ্য

খ্রি.পূ. ১৯০০-১৬০০ : প্যাট্রিয়াক অর্থাৎ ইব্রাহিম (আ) বা আব্রাহামীয় বংশের সময়কাল

খ্রি.পূ. ১৬৭৮-১৫৭০ : হিকসসদের দ্বারা কানান ও মিসর শাসিত

খ্রি.পূ. ১৫৭০-১৩০৪ : মিসরের নিউ কিংডম সময়কাল

খ্রি.পূ. ১৪৫০-১২০০ : এশিয়া মাইনর ও সিরিয়ার হিটাইট সাম্রাজ্য

খ্রি.পূ. ১৩শ-১২শ : সিরিয়া ও ফিলিস্তিনি ভূমিতে নানা জাতির আক্রমণ

খ্রি.পূ. ১২৭৫-১২৫০ : মিসর থেকে ইসরাইলিরা এক্সোডাস বা হিজরত করে মূসা (আ)-এর নেতৃত্বে

খ্রি.পূ. ১২৫০-১২০০ : কানানে একত্ববাদী ইসরাইলিদের আক্রমণ ও বিজয়

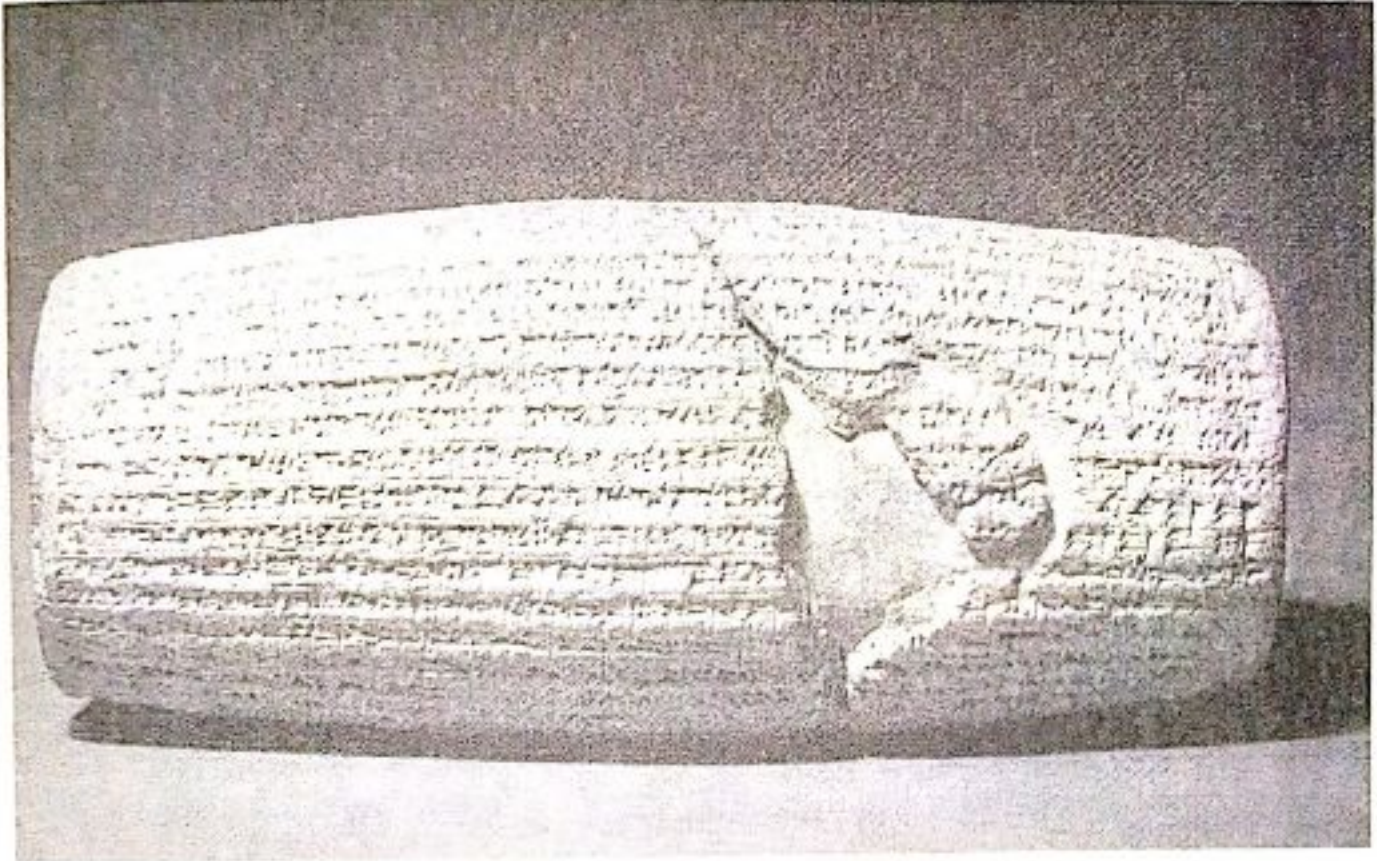
ইসরাইলের উত্থান-পতন ৩৩৩

- খ্রি.পূ. ১১০০ : লৌহ যুগ, এ অঞ্চলে ফিলিস্তিনিদের পুনরুত্থান
- খ্রি.পূ. ১০৫০ : আফেকে ইসরাইলিদেরকে পরাজিত করে পৌত্তলিক ফিলিস্তিনিরা
- খ্রি.পূ. ১০২০-১০০০ : ইসরাইলের রাজা সল বা তালুত
- খ্রি.পূ. ১০০০-৯৬১ : ইসরাইলের রাজা ডেভিড বা দাউদ (আ)
- খ্রি.পূ. ৯৬১-৯২২ : ইসরাইলের রাজা সলোমন বা সুলাইমান (আ)
- খ্রি.পূ. ৯২২ : সুলাইমান (আ)-এর মারা যাবার পর ইসরাইলের ভাঙন; উত্তরের রাজ্য ইসরাইল, দক্ষিণের রাজ্য জুদাহ বা এলদা বা জুদিয়া
- খ্রি.পূ. ৮৭৫-৮৪২ : অমরি সাম্রাজ্যের শাসন; নবী আল-ইয়াসা (আ) ও ইলিয়াস (আ)-কে কেন্দ্র করে ধর্মীয় রাজকীয় দ্বৈরথ
- খ্রি.পূ. ৮৪২ : ইয়েছ (জেছ) অমরি সাম্রাজ্যকে পরাজিত করেন
- খ্রি.পূ. ৮৭৩-৮৪৯ : জুদাহ রাজ্যের রাজা ইয়েহোসাফাত (Jehosaphat) ইসরাইল ও টায়ারের সাথে মিত্রতা করলেন
- খ্রি.পূ. ৮৩৬ : রাজা আহাব ও জেজেবেলের মেয়ে আসালিয়ার হত্যা, দাউদের বংশধারা আবারও সিংহাসনে
- খ্রি.পূ. ৭৮৫-৭৪৫ : দ্বিতীয় ইয়েরোবোয়াম (জেরোবোয়াম), আমোস ও হোসিয়ার রাজত্বকাল
- খ্রি.পূ. ৭৪৫-৭২৭ : আসিরীয় রাজা তৃতীয় টিগলাস-পিলেসার সিরিয়া ও ফিলিস্তিনে সাম্রাজ্য স্থাপন করেন
- খ্রি.পূ. ৭৩৪-৭১৫ : জুদাহ-র রাজা আহাজ আসিরীয় বিরোধী মিত্রপক্ষে যোগদান করতে অস্বীকৃতি জানান
- খ্রি.পূ. ৭২২ : আসিরীয় অবরোধের মুখে পতন হয় উত্তরের ইসরাইল রাজ্যের; পালিয়ে যায় বাসিন্দারা।
- খ্রি.পূ. ৭১৫-৬৮৭ : হেজেকিয়া, ইশাইয়া (আ) এবং মিকাহের সময়কাল
- খ্রি.পূ. ৭০১ : আসিরীয়রা জেরুজালেম অবরোধ করে
- খ্রি.পূ. ৬৪০-৬০৯ : হোসিয়াহর রাজত্ব; জুদাহর নাগরিকদের স্বাধীনতা অর্জন
- খ্রি.পূ. ৬২৫-৬০৫ : শেষ আসিরীয় রাজা নারবোপোলাসারের রাজত্ব; এরপর এ সাম্রাজ্য ধ্বংসে পড়ে
- খ্রি.পূ. ষষ্ঠ শতকের প্রথম দিক : আসিরীয় সাম্রাজ্য বিভক্ত হয়ে পড়ে ব্যাবিলনীয় এবং পারসিক মিডদের মাঝে
- খ্রি.পূ. ৫৮৬ : ব্যাবিলন পবিত্র ভূমি আক্রমণ করে ইহুদীদের বন্দী করে নিয়ে যায়।
- খ্রি.পূ. ৫৮৭ : জেরুজালেমের পতন

খ্রি.পূ. ৫৪৬-৫৩০ : মিড রাজাদের পরাজিত করেন পারস্যের রাজা সাইরাস,
পরাজিত করেন ব্যাবিলনীয়দেরকেও

খ্রি.পূ. ৫৩৮ : সাইরাসের আইনের কারণে ইহুদীরা অনুমতি পায় পবিত্র ভূমিতে
ফিরে গিয়ে বাইতুল মুকাদ্দাস আবার বানানোর

খ্রি.পূ. ৫১৫ : জেরুজালেমের সেকেন্ড টেম্পল অফ সলোমন বা বাইতুল মুকাদ্দাস
বানানো সম্পন্ন হয়; জুদাহ তখন থেকে পারস্যের একটি প্রদেশ



খ্রি.পূর্ব পঞ্চম শতকের সাইরাস সিলিন্ডার থেকে আমরা সাইরাস কর্তৃক ইসরাইলিদের
ফেরতাদেশের বিস্তারিত জানতে পারি; এখন এটি ব্রিটিশ জাদুঘরে সংরক্ষিত

খ্রি.পূ. ৪৫০-৪৪০ : নেহেমিয়া (আ) ও উজাইর (আ)-এর নেতৃত্বে প্রায় সকল
ইসরাইলি ফেরত আসে জুদাহ রাজ্যে

খ্রি.পূ. ৩৩৩ : আলেকজান্ডার দ্য গ্রেটের বাহিনী জুদাহ রাজ্যে অনুপ্রবেশ করে

খ্রি.পূ. ৩য় শতক : টলেমি শাসনের অধীনে জুদাহ প্রদেশ, মিসরে হেলেনিস্টিক
শাসন; আলেকজান্দ্রিয়ায় ইহুদী সমাজ গড়ে ওঠে

খ্রি.পূ. ২০১-১৯৮ : সিরিয়া, মেসোপটেমিয়া ও অন্যান্য রাজ্যের সাথে সাথে
জুদাহ প্রদেশও সেলুসিদদের নিয়ন্ত্রণে

খ্রি.পূ. ১৭৫-১৬৩ : সেলুসিদ রাজা চতুর্থ অ্যান্টিয়কাসের শাসন

খ্রি.পূ. ১৭৫ : জেরুজালেমে হেলেনিস্টিক ইহুদীদের প্রভাব শুরু

খ্রি.পূ. ১৬৭ : চতুর্থ অ্যান্টিয়কাস বাইতুল মুকাদ্দাসকে মন্দিরে পরিণত করেন;
ম্যাকাবি বিদ্রোহের সূচনা

খ্রি.পূ. ১৬৪ : সেলুসিদদের পরাজয়, ম্যাকাবিদের বিজয়, নতুন করে বাইতুল মুকাদ্দাস পুনরায় আল্লাহর উদ্দেশ্যে সাজানো

খ্রি.পূ. ১৬৩-১৪০ : সেলুসিদদের সাথে আর পেরে উঠতে পারছে না ম্যাকাবিরা

খ্রি.পূ. ১৬১ : জুদাহ ম্যাকাবি নিহত, তার ভাই জোনাথান ম্যাকাবিদের নেতা হলেন

খ্রি.পূ. ১৪৬ : খ্রিস ও ম্যাসেডোনিয়ার নিয়ন্ত্রণ রোমানদের হাতে

খ্রি.পূ. ১৪০ : জোনাথান নিহত; জেরুজালেমে তার ভাই সাইমনকে প্রধান ইমাম স্বীকৃতি দান

খ্রি.পূ. ১৩৪-১০৪ : সাইমনের ছেলে জন হিরক্যানাসের শাসন

খ্রি.পূ. ১০৪-১০৩ : জন হিরক্যানাসের ছেলে জুদাহ অ্যারিস্টোবুলাসের শাসন

খ্রি.পূ. ১০৩-৭৬ : জন হিরক্যানাসের দ্বিতীয় ছেলে আলেকজান্ডারের শাসন; ফিলিস্তিন ও ট্রান্সজর্ডান অঞ্চলে জুদীয় শাসন সম্প্রসারণ; জন হিরক্যানাসের সাথে ফারিসিদের বিরোধ

খ্রি.পূ. ৭৬-৬৭ : আলেকজান্ডারের স্ত্রী সালোমি আলেকজান্দ্রার শাসন

খ্রি.পূ. ৬৭-৬৩ : সালোমির দুই পুত্রের সিংহাসন নিয়ে কাড়াকাড়ি (দ্বিতীয় জন হিরক্যানাস এবং দ্বিতীয় অ্যারিস্টোবুলাস)

খ্রি.পূ. ৬৩ : পম্পে হিরক্যানাসকে সমর্থন দেন এবং জেরুজালেম দখল করে নেন, দ্বিতীয় জন হিরক্যানাস প্রধান ইমাম হলেন, তার উপদেষ্টা অ্যান্টিপ্যাটার হলেন জুদাহ-র শাসক

খ্রি.পূ. ৪৮ : জুলিয়াস সিজারের কাছে পম্পের পরাজয়

খ্রি.পূ. ৪৪ : জুলিয়াস সিজার নিহত

খ্রি.পূ. ৪২ : মার্ক অ্যান্টনি এবং অক্টাভিয়ান সিজার বাহিনীকে পরাজিত করেন, অ্যান্টনি শাসন করতে লাগলেন রোমান সাম্রাজ্যের পূর্ব পাশ, আর অক্টাভিয়ান করতে লাগলেন পশ্চিম পাশ

খ্রি.পূ. ৪০ : পার্থিয়ানরা জুদাহ আক্রমণ করে, অ্যান্টিপ্যাটারের ছেলে হেরোদ রোমে পালিয়ে যান যেখানে তাকে জুদাহ-র রাজা হিসেবে গণনা করা হয়

খ্রি.পূ. ৩৭-৪ : জুদাহ-র শাসক হিসেবে হেরোদের রাজত্ব

খ্রি.পূ. ৩১ : অক্টাভিয়ান অ্যান্টনিকে অ্যাক্টিয়ামে পরাজিত করে সম্রাট হলেন

খ্রি.পূ. ৪ : হেরোদের রাজত্ব ভাগ হয়ে যায় তিন ছেলের মাঝে; যীশু খ্রিস্ট বা ইসা (আ)-এর সম্ভাব্য জন্মসাল

খ্রি. ৬ : রোমান সরকার জুদাহ রাজ্যের শাসক

খ্রি. ১ম শতকের শুরুর দিক : ইহুদী র্যাবাই হিল্লেল ও শাম্মাইয়ের মৃত্যু

৩৩৬ ইসরাইলের উত্থান-পতন

খ্রি.পূ. ২০- খ্রি. ৫০ : আলেকজান্দ্রিয়ার হেলেনিস্টিক ইহুদী দার্শনিক ফাইলোর
জীবনকাল

খ্রি. ১৪-৩৭ : রোমান সম্রাট টাইবেরিয়াস

খ্রি. ২৬-৩৬ : জুদাহের গভর্নর পন্টিয়াস পাইলেট

খ্রি. ৩০ : ইহুদী ও খ্রিস্ট ধর্ম অনুযায়ী, যীশুর ক্রুশবিদ্ধকরণ

খ্রি. ৩৭-৪১ : রোমান সম্রাট কালিগুলা

খ্রি. ৪১-৫৪ : রোমান সম্রাট ক্লডিয়াস

খ্রি. ৬৫ : সেইন্ট পলের মৃত্যু

খ্রি. ৬৬-৭০ : রোমের বিরুদ্ধে ইহুদীদের বিদ্রোহ

খ্রি. ৭৪ : মাসাদার পতন

খ্রি. ৭০ এর দশক : ইয়াভনেহ-তে ইহুদীদের সানহেদ্রিন প্রতিষ্ঠা

খ্রি. ৬৯-৭৯ : রোমান সম্রাট ভেসপাসিয়ান

খ্রি. ৭৯-৮১ : রোমান সম্রাট টাইটাস

খ্রি. ১১৪-১১৭ : মিসর, লিবিয়া, সাইপ্রাস এলাকায় ইহুদীদের বিদ্রোহ

খ্রি. ১১৭-১৩৮ : রোমান সম্রাট হ্যাড্রিয়ান

খ্রি. ১৩২-১৩৫ : সিমিয়ন বার কহবা-র নেতৃত্বে জুদাহ প্রদেশে ইহুদীদের বিদ্রোহ

খ্রি. ১৩৫ : ফিলিস্তিন অঞ্চলে ইহুদী নিধন শুরু

খ্রি. ১৪০ বা ১৫০ এর দশক : ইহুদী নিধনের ইতি, গালিলিতে সানহেদ্রিন
জমায়েত

খ্রি. ১৯৩-২৩৫ : রোমান সেভেরীয় সাম্রাজ্য

খ্রি. ৩য় শতক প্রথম দিকে : ব্যাবিলনীয় ইহুদীদের মাঝে স্কলারদের আবির্ভাব,
অ্যাকাডেমি প্রতিষ্ঠা শুরু

খ্রি. ২২৫-২৫৫ : সানহেদ্রিন জমায়েত টাইবেরিয়াসে

খ্রি. ২৩৫-২৮৩ : রোমান সাম্রাজ্য জুড়ে রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক অস্থিরতা

খ্রি. ২৮৪-৩০৫ : রোমান সম্রাট ডায়োক্লিশেন খ্রিস্টান নিধন শুরু করলেন

খ্রি. ৩০৬-৩৩৭ : রোমান সম্রাট কনস্টান্টাইন পুরো সাম্রাজ্যের রাজ্য-ধর্ম করলেন
খ্রিস্টধর্মকে

খ্রি. ৪র্থ শতকের শুরুর দিক : ইহুদীদের ওপর প্রথম আইনি বাধা

খ্রি. ৪র্থ শতকের মাঝামাঝি : গালিলিতে ফিলিস্তিনি তালমুদ সম্পাদনা শুরু, ৫ম
শতকে শেষ

খ্রি. ৬ষ্ঠ শতক : ব্যাবিলনীয় তালমুদ সম্পাদনা সমাপ্ত

খ্রি. ৫২৭-৫৬৫ : পশ্চিম ভূমধ্যসাগর এলাকা জয় করে নেন রোমান সম্রাট জাস্টিনিয়ান

খ্রি. ৫৭০-৫৭১ : হযরত মুহাম্মাদ (সা)-এর জন্ম

খ্রি. ৬২২ : হযরত মুহাম্মাদ (সা)-এর ইয়াসরিবে হিজরত, যা পরবর্তীতে মদিনা হয়

খ্রি. ৬৩২ : হযরত মুহাম্মাদ (সা)-এর ওফাত

খ্রি. ৬৩০-৬৪০ দশক : মুসলিমদের সিরিয়া, ফিলিস্তিন, মিসর ও পারস্য বিজয়

খ্রি. ৬৬১ : উমাইয়া রাজবংশের সূচনা

খ্রি. ৭১১ : মুসলিমদের স্পেন বিজয়

খ্রি. ৭৪০ : ভোলগার তীরে খাজারদের ইহুদী ধর্ম গ্রহণ

খ্রি. ৭৫০ : আব্বাসীয় সাম্রাজ্য শুরু

খ্রি. ৭৫৬ : স্পেনে স্বাধীন উমাইয়া খেলাফত

খ্রি. ৮ম শতকের মধ্যভাগ : মধ্যপ্রাচ্যে ইহুদীদের মসীহভিত্তিক আন্দোলনের সূচনা

খ্রি. ৭৬২-৭৬৭ : কারাইট আন্দোলনের সূচনা

খ্রি. ৭৫৭-৭৬১ : সুরার ইয়েহুদা গাওন

খ্রি. ৭৮৬-৮০৯ : আব্বাসীয় খলিফা হারুন-উর-রশিদ

খ্রি. ৮৮২-৯৪১ : সাদিয়া গাওন

খ্রি. ১০৪০-১১০৫ : রাশি

খ্রি. ১০০৬ : ইংল্যান্ডে ইহুদীদের বসবাস শুরু

খ্রি. ১০৯৬ : রাইনল্যান্ডে ইহুদী গণহত্যা

খ্রি. ১১৩৫-১২০৪ : মোজেস মাইমনিদিজ

খ্রি. ১১৮২-১১৯৮ : ফ্রান্সের রাজা দ্বিতীয় ফিলিপ ইহুদীদের বের করে দিলেন

খ্রি. ১১৯০ : ইয়র্কে ইহুদী নিধন

খ্রি. ১২৪২ : প্যারিসে তালমুদ পোড়ানো

খ্রি. ১২৯০ : ইংল্যান্ড থেকে ইহুদীদের বের করে দেয়া

খ্রি. ১২৯৬ : কালিশের যুবরাজের চার্টার

খ্রি. ১৩০৬ : ফ্রান্সের রাজা চতুর্থ ফিলিপ ইহুদীদের বহিষ্কার করেন আবার

খ্রি. ১৩১৫ : ইহুদীদের ফিরিয়ে আনা হয় ফ্রান্সে

খ্রি. ১৩৩৪, ১৩৬৪, ১৩৬৭ : কালিশের চার্টার নবায়ন ও সম্প্রসারণ করা হয় পোল্যান্ডে

খ্রি. ১৩৪৮-১৩৪৯ : ব্ল্যাক ডেথ মহামারি

৩৩৮ ইসরাইলের উত্থান-পতন

- খ্রি. ১৩৯১ : কাস্টিল ও অ্যারাগনে গণহত্যা ও জোরপূর্বক ধর্ম পরিবর্তন
- খ্রি. ১৪৮৩-১৫৪৬ : মার্টিন লুথার
- খ্রি. ১৪৯২ : ইহুদীদের স্পেন থেকে বহিষ্কার করা, নয়তো খ্রিস্টান হতে হয়
- খ্রি. ১৫৩৬ : পর্তুগালে ইনকুইজিশন শুরু
- খ্রি. ১৫৫৩ : ইতালিতে তালমুদ পোড়ানো
- খ্রি. ১৫৫৫ : পোপ চতুর্থ পল রোমের ইহুদীদেরকে গেটো বন্দী করেন
- খ্রি. ১৫৯০ : মারানোরা অ্যামস্টারডামে আসে
- খ্রি. ১৬৫৫-১৬৬৭ : পোল্যান্ড আক্রমণ করে রাশিয়া ও সুইডেন
- খ্রি. ১৭৯১ : মধ্য রাশিয়ায় ইহুদী বণিকদের নিষিদ্ধকরণ, তবে ওডেসাতে বসতি গড়ার অনুমতি প্রদান
- খ্রি. ১৭৯১ : ফরাসি ইহুদীদের অধিকার ফিরিয়ে দেয়া হয়
- খ্রি. ১৭৯৯ : ফ্রান্সের প্রথম কনসুল হলেন নেপোলিয়ন
- খ্রি. ১৮০৪ : ফ্রান্সের সম্রাট হলেন নেপোলিয়ন
- খ্রি. ১৮০৭ : প্যারিসে সানহেদ্দিন আহ্মান করলেন নেপোলিয়ন
- খ্রি. ১৮১৪-১৮১৫ : ভিয়েনার কংগ্রেস
- খ্রি. ১৮২৪ : রাশিয়ানরা চেষ্টা করে গ্রামগুলো ইহুদীমুক্ত করতে
- খ্রি. ১৮২৫-১৮৫৫ : জার প্রথম নিকোলাস
- খ্রি. ১৮২৭ : প্রথম নিকোলাস আদেশ করেন যে ইহুদী ছেলেদের সেনাবাহিনীতে যোগ দিতে হবে
- খ্রি. ১৮৪৪ : ইহুদীদের জন্য সরকারি স্কুল প্রতিষ্ঠা রাশিয়ায়
- খ্রি. ১৮৪৮ : ফরাসি বিদ্রোহ
- খ্রি. ১৮৫৫-১৮৮১ : জার দ্বিতীয় আলেকজান্ডার
- খ্রি. ১৮৬৪ : ইহুদীরা রাশিয়ায় আইনি পেশায় যোগ দেয়ার অনুমতি পেলো
- খ্রি. ১৮৭১ : জার্মানি একত্রীকরণ
- খ্রি. ১৮৬০-১৯০৫ : থিওডোর হার্ৎজেল
- খ্রি. ১৮৭৯-১৮৮১ : জার্মানিতে ইহুদী বিরোধিতা শুরু
- খ্রি. ১৮৮১ : জার দ্বিতীয় আলেকজান্ডার নিহত
- খ্রি. ১৮৮১ : রুশ পোগ্রোম (ইহুদী হত্যা)
- খ্রি. ১৮৮৪ : জায়োনপ্রেমী কাতোউইচ কনফারেন্স
- খ্রি. ১৮৮৭ : রুশ বিদ্যালয় ও বিশ্ববিদ্যালয়ে ইহুদীদের কোটা রাখা শুরু
- খ্রি. ১৮৯১ : মস্কো থেকে ইহুদী বিতাড়ন

- খ্রি. ১৮৯৩ : জার্মানিতে ইহুদী-বিরোধী দল আড়াই লাখ ভোট পেল
- খ্রি. ১৮৯৪-৯৯ : ফ্রান্সে ড্রায়ফাস অ্যাফেয়ার
- খ্রি. ১৯০৫ : 'প্রোটোকলস অফ দ্য এন্ডারস অফ জায়ন' বই প্রকাশ
- খ্রি. ১৯০৫-১৯০৭ : পুনরায় রুশ পোগ্রোম
- খ্রি. ১৮৮০-১৮৯০ এর দশক : ফিলিস্তিনে ইহুদী কৃষি স্থাপনা
- খ্রি. ১৮৮১ : প্রথম আলিয়াহ
- খ্রি. ১৮৮৬-১৯৭৩ : ডেভিড বেন গুরিয়ন
- খ্রি. ১৮৯৬ : থিওডোর হার্ৎজেল প্রকাশ করলেন "দ্য জুয়িশ স্টেট"
- খ্রি. ১৮৯৭ : সুইজারল্যান্ডে প্রথম জায়োনিস্ট কংগ্রেস
- খ্রি. ১৯০৩ : ষষ্ঠ জায়োনিস্ট কংগ্রেসে হার্ৎজেল প্রস্তাব করেন 'উগান্ডা স্কিম' যা বিতর্কের জন্ম দেয়
- খ্রি. ১৯০৪-১৪ : দ্বিতীয় আলিয়াহ
- খ্রি. ১৯০৬-১৯০৭ : আমেরিকায় ইহুদীদের গণঅভিবাসন
- খ্রি. ১৯০৯ : তেলআবিব শহর প্রতিষ্ঠা
- খ্রি. ১৯১৪-১৯১৮ : প্রথম বিশ্বযুদ্ধ
- খ্রি. ১৯১৭ : ব্রিটিশ বাহিনী ফিলিস্তিন অধিকার করে; ব্যালফোর ডিক্লারেশন
- খ্রি. ১৯১৯ : ভার্সেই শান্তিচুক্তি
- খ্রি. ১৯২১ : ফিলিস্তিনে আরব বিদ্রোহ
- খ্রি. ১৯২২ : লিগ অফ ন্যাশনস কর্তৃক ফিলিস্তিনে ব্রিটিশ ম্যান্ডেটের অনুমোদন
- খ্রি. ১৯২৯ : জেরুজালেম ও ফিলিস্তিনের অন্যান্য শহরে মুসলিমদের বিদ্রোহ
- খ্রি. ১৯৩০ : ব্রিটেন ইহুদীদেরকে ফিলিস্তিনে আসার ওপর নিষেধাজ্ঞা দেয়
- খ্রি. ১৯৩৩ : হিটলার চ্যান্সেলর হলেন, ন্যাৎসি বাহিনী ইহুদীদের ব্যবসা বাতিল করে
- খ্রি. ১৯৩৫ : নুরেমবার্গ আইন
- খ্রি. ১৯৩৯-৪৫ : দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ
- খ্রি. ১৯৩৯ : জার্মানির পোল্যান্ড আক্রমণ
- খ্রি. ১৯৪০ : পূর্ব ইউরোপ জুড়ে ইহুদীদের গেটো স্থাপন
- খ্রি. ১৯৪১ : জার্মানির রাশিয়া আক্রমণ
- খ্রি. ১৯৪২-১৯৪৪ : ইহুদী হত্যার জন্য ন্যাৎসি বাহিনীর এক্সটার্মিনেশন শিবির স্থাপন
- খ্রি. ১৯৪৩ : ওয়ারস গেটো বিদ্রোহ

- খ্রি. ১৯৪৫-৪৭ : ফিলিস্তিনে ইহুদী-ব্রিটিশ সংঘর্ষ
- খ্রি. ১৯৪৭ : জাতিসংঘের সাধারণ পরিষদে ফিলিস্তিন বিভাগের পক্ষে ভোট
- খ্রি. ১৯৪৮ : ব্রিটিশদের ফিলিস্তিন ত্যাগ, ইসরাইলের স্বাধীনতা ঘোষণা, আরব রাষ্ট্রগুলোর ইসরাইল আক্রমণ
- খ্রি. ১৯৪৯ : অস্ত্রবিরতি
- খ্রি. ১৯৪৯ : ইউরোপ থেকে গণহারে ইহুদীদের ইসরাইলে আগমন
- খ্রি. ১৯৫৬ : ইসরাইলের সিনাই ক্যাম্পেইন
- খ্রি. ১৯৬৭ : ছয় দিনের যুদ্ধ
- খ্রি. ১৯৬৯-৭০ : সুয়েজ সংকট
- খ্রি. ১৯৭৩ : ইয়ম কিপুর যুদ্ধ
- খ্রি. ১৯৭৭ : মিসরের প্রেসিডেন্ট সাদাত ইসরাইল ভ্রমণ করেন
- খ্রি. ১৯৮২ : ইসরাইল লেবানন আক্রমণ করে
- খ্রি. ১৯৮৫ : ফিলিস্তিনে প্রথম ইন্তিফাদা শুরু হয়
- খ্রি. ১৯৯১ : গাফ্ফ ওয়ার
- খ্রি. ১৯৯৩, ১৯৯৫ : অসলো অ্যাকর্ডস
- খ্রি. ১৯৯৫ : ইসরাইলের প্রধানমন্ত্রী ইছহাক রাবিন নিহত
- খ্রি. ১৯৯৬ : বেনইয়ামিন নেতানিয়াহু প্রধানমন্ত্রী
- খ্রি. ১৯৯৯ : এহুদ বারাক প্রধানমন্ত্রী
- খ্রি. ২০০১ : এরিয়েল শ্যারন প্রধানমন্ত্রী
- খ্রি. ২০০৬ : এহুদ ওলমার্ট প্রধানমন্ত্রী
- খ্রি. ২০০৯ : নেতানিয়াহু পুনরায় ক্ষমতায়
- খ্রি. ২০১৪ : ইসরাইলের গাজা আক্রমণ
- খ্রি. ২০১৭ : ইসরাইলের রাজধানী জেরুজালেমে স্থানান্তরের ঘোষণা
- খ্রি. ২০২১ : ইসরাইলের পুনরায় গাজা আক্রমণ
- খ্রি. ২০২১ : নাফতালি বেনেট প্রধানমন্ত্রী ২০২৩ সাল পর্যন্ত এবং এরপর ২০২৫ সাল পর্যন্ত প্রধানমন্ত্রী থাকবেন ইয়াইর লাপিদ

পরিশিষ্ট ৩

হিব্রু পঠন



আদি পবিত্র ভূমি কানানের একমাত্র যে ভাষাটি বর্তমানে ব্যবহৃত হয়, তা হলো হিব্রু ভাষা। বাকি ভাষাগুলো এখন মৃত; হিব্রুও মৃত ছিল, কিন্তু তা পুনরুজ্জীবিত করা হয়েছে চেষ্টা করে। ইহুদীরা একে ডাকে ‘লাশন হা-কোদেশ’ (לשון הקודש) বলে, যার অর্থ ‘পবিত্র ভাষা’। ২০০ থেকে ৪০০ সালের মাঝে কোনো এক সময় হিব্রু বলা বন্ধ হয়ে যায়। তবে কাব্য আর বিভিন্ন লেখনির মাধ্যমে ভাষাটি বেঁচে থাকে। বর্তমানে ইসরাইলের রাষ্ট্র ভাষা ‘আধুনিক হিব্রু’, এবং সেমেটিক ধর্মের প্রাচীন নামগুলো সবচেয়ে কাছাকাছি উচ্চারণে পড়ার জন্য হিব্রু পঠন জেনে নেয়াটা উপকারী। একারণেই আমি চেষ্টা করে পড়াটা শিখে নিই, এ বই লিখতে গিয়ে অনেক নামই হিব্রুতে পড়তে হয়েছে যেটা হিব্রু পড়তে জানা না থাকলে সম্ভব হতো না। আগ্রহী পাঠকদের সাথে তাই শেয়ার করতে চাই হিব্রু উচ্চারণে নামগুলো কীভাবে পড়া যায় সেটা।

বলা বাহুল্য আজকের হিব্রু লিপি আর প্রাচীন হিব্রু লিপির মাঝে দৃশ্যমান পার্থক্য রয়েছে, আগের লিপিকে বলা হয় প্রাচীন হিব্রু বা প্যালিও হিব্রু, ঐ হিব্রুতেই তাওরাত ও অন্যান্য কিতাব লিখিত হতো।

বর্তমান হিব্রু নতুনদের জন্য সহজ করে লেখা হয়। ঠিক যেমন অনারবদের জন্য পরবর্তীতে আরবিতে জের জবর পেশ ইত্যাদি যোগ করা হয়েছিল, অথচ দেড় হাজার বছর আগের আরবিতে আপনি নুজ্জা ও হরকত খুঁজে পাবেন না। আরবিতে যেখানে ২৯টি বর্ণ, সেখানে হিব্রুতে ২২টি অক্ষর, কিন্তু হিব্রুতে স্বরবর্ণ বেশি, তাই বিভিন্নভাবে নানা শব্দ উচ্চারণ করা যায়, যা আরবিতে সম্ভব হয় না—

যেমন ‘এ’ ধ্বনি। আরবিতে এক অক্ষরের সাথে আরেক অক্ষর যোগ করে কার্শিভ লেখা যায়, কিন্তু হিব্রুতে সেটি সম্ভব নয়, আলাদা আলাদা লিখতে হয়। তবে দুটো ভাষাই সেমেটিক অর্থাৎ শাম দেশীয়, তাই তাদের উচ্চারিত শব্দ ও অর্থগুলোর ব্যাপক মিল রয়েছে। আরবির মতো হিব্রুও ডান থেকে বামে লেখা হয়, এবং আরবি জানা থাকলে হিব্রু অক্ষর শেখা সাপেক্ষে সহজেই হিব্রু শব্দ বা বাক্য পাঠ করা যায়। আরবিতে একে ইব্রানি ভাষা ডাকা হতো।

עברית
× ʔ ʕ ʔ ʕ ʔ

ওপরে আধুনিক হিব্রু, নিচে প্যালিও হিব্রু বা প্রাচীন হিব্রু। লেখা হয়েছে “হিব্রু”।



কুমরানের গুহা থেকে উদ্ধার করা ডেড সি স্ক্রলের হিব্রু

এক নজরে হিব্রু বর্ণমালা দেখে নেয়া যাক বাংলা উচ্চারণসহ—

8 খেৎ ח	7 জায়িন ז	6 ভাভ ז	5 হেয় ה	4 দালেৎ ד	3 গিমেল ג	2 বেৎ ב	1 আলেফ א
70 আ'য়িন ע	60 সামেখ ס	50 নুন נ	40 মেম מ	30 লামেদ ל	20 কাফ כ	10 ইয়দ י	9 টেৎ ט
400 ভাভ ז	300 সিন ש	200 রেশ ר	100 কুফ ק	90 সাদি צ	80 ফেয় פ		

উপরে ক্যালিগ্রাফিক হিব্রু অক্ষরের, বাংলা অক্ষরের নিচে হাতে যেভাবে লেখা হয় অক্ষরটি সেটি দেখানো হলো

এ তো গেলো আদর্শ লিপি, কিন্তু টাইপ করা লিপি আবার একটু ভিন্ন দেখতে, নিচে মিলিয়ে নিন ব্র্যাকেটে দেয়া হিব্রু টাইপড অক্ষরের সাথে উপরের ছকের অক্ষর। ব্র্যাকেটে কোন বর্ণের সাথে উচ্চারণ মিলে সেটিও উল্লেখ করলাম।

- আলেফ (א) [আ/অ]
- বেৎ (ב) [ব]
- গিমেল (ג) [গ]
- দালেৎ (ד) [দ]
- হেয় (ה) [হ]
- ভাভ (ו) [ও]
- জায়িন (ז) [জ]
- খেৎ/হেৎ (ח) [খ/হ]
- টেৎ (ט) [ট]
- ইয়দ (י) [য়]
- কাফ (כ, ך) [ক]
- লামেদ (ל) [ল]
- মেম (מ, ם) [ম]
- নুন (נ, ן) [ন]
- সামেখ (ס) [স]
- আ'য়িন (ע) [আ']
- ফেয় (פ, ף) [ফ]
- পেয় (צ) [প]
- সাদি (צ, ץ) [স]
- কুফ (ק) [কু]
- রেশ (ר) [র]
- শিন (ש) [শ]
- সিন (ש) [স]
- টাভ (ת) [টি/থ]

- যেকোনো অক্ষরের ওপরে বা নিচে স্বরচিহ্ন থাকতে পারে, আরবিতে যেমন যের যবর পেশ থাকে। আরবির মতো হিব্রুতেও এটি অপশনাল, কখনও কখনও পড়ার সুবিধার জন্য দেয়া হয়।
- যদি কোনো অক্ষরের নিচে ~ থাকে, তাহলে সেটা লম্বা 'আ' (বা 'অ') হবে, যদি -- থাকে তবে হ্রস্ব 'আ' হবে; যদি --: থাকে তবে অতিহ্রস্ব 'আ'।
- যদি কোনো অক্ষরের নিচে .. থাকে, তাহলে সেটা লম্বা 'এ' হবে, যদি : থাকে তবে হ্রস্ব 'এ' হবে; যদি :: থাকে তবে অতিহ্রস্ব 'এ'।
- কোনো অক্ষরের পর অর্থাৎ বামে যদি 'ו' থাকে তাহলে সেটি 'ও'-কার। ঐ পজিশনে কেবল ডট থাকলেও একই কথা।
- কোনো অক্ষরের পর অর্থাৎ বামে যদি 'י' থাকে তাহলে সেটি 'উ'-কার।
- কোনো অক্ষরের পর অর্থাৎ বামে যদি 'י' থাকে তাহলে সেটি দীর্ঘ 'ঈ'-কার। আর যদি নিচে কেবল একটি 'י' থাকে, তবে হ্রস্ব 'ই'-কার।

যেমন, নিচের শব্দটি খেয়াল করুন—

דָּאָדָּ

প্রথম (ডান) অক্ষর আলেফ (א), যার নিচে 'আ', তার মানে দাঁড়ালো 'আ'। এরপর 'দালেৎ' (ד), নিচে 'আ', তার মানে 'দা'। আর সবশেষে 'মেম' (מ)। অর্থাৎ 'আদাম'। আদম আর কি। নবী আদম (আ), হিব্রুতে যার অর্থ 'মানুষ'। এরপর দেখুন—

אֱלֹ

গুরুত্বপূর্ণ অক্ষর আলেফ (א), যার নিচে 'এ', আর এরপর লামেদ (ל)। অর্থাৎ 'এল', মানে 'ঈশ্বর', মাবুদ, আল্লাহ। ফেরেশতাদের নামের শেষে, বা অনেক নবীর নামের শেষেও এটা পাবেন। এর রাজকীয় রূপ 'এলোহিম'। জিব্রায়েল, মিকায়েল— এগুলো আরবিতে জিবরাঈল, মিকাইল হয়ে যায়। এল আর ইলাহ একই অর্থ। আচ্ছা, এরপর—

מִיגָן

প্রথমে কী আছে? মেম (מ), নিচে আছে এক ডট 'י', তার মানে 'মি'। এরপর গিমেল, আর নিচে শর্ট 'আ', তাহলে 'গা' (ג)। আর শেষে নুন (נ)। তাহলে শব্দটির উচ্চারণ 'মিগান'।

এবার আমরা সরাসরি বাক্যে চলে যাই, একদম ইহুদীদের তাওরাতের প্রথম আয়াত—

בְּרֵאשִׁית אֲבָרָא לֵהִים אֶת הַשָּׁמַיִם וְאֶת הָאָרֶץ

এটাকে ব্যবচ্ছেদ করা যাক এবার। ডান থেকে প্রথম শব্দ হলো 'בְּרֵאשִׁית'। প্রথম অক্ষর 'বেৎ' (ב), নিচে 'এ', তাহলে 'বে'; এরপর রেশ (ר), নিচে এ, তাহলে 'রে'; এরপর শুধুই আলেফ (א), এমনিতেই একটি স্বরবর্ণ হিসেবে দাঁড়িয়ে, ওটাকেও উচ্চারণ করুন টেনে নিয়ে। এরপর শিন (ש), কারণ ডান মাথায় ফোঁটা, বাম মাথায় নয় (সেক্ষেত্রে 'সিন' হতো), ঠিক এরপরই কিছু 'י', অর্থাৎ নিচে ডট ও পরে ইয়দ, তার মানে দীর্ঘ 'ঈ'-কার, তাহলে 'শি'; শেষের অক্ষর টাভ (ת) বা 'ট' বা 'থ'। শব্দটা দাঁড়ালো, 'বেরেশিথ' যার মানে 'আদিতে'।

দ্বিতীয় শব্দ 'אֲבָרָא'। প্রথম অক্ষর 'বেৎ' (ב), নিচে 'আ', তাহলে 'বা'; এরপর রেশ (ר), নিচে আ, তাহলে 'রা'। এরপর আলেফ যা আগের স্বরধ্বনিকে দীর্ঘ করলো। শব্দটি দাঁড়ালো 'বারা'। অর্থ, 'সৃষ্টি করিলেন'।

তৃতীয় শব্দ 'לֵהִים'। প্রথম অক্ষর আলেফ (א), নিচে 'এ', তাহলে উচ্চারণ 'এ'। এরপর লামেদ (ל), পরেই ওপরে ডট, তাহলে 'লো'। এরপরের অক্ষর 'হেয়' (ה), নিচে এক ডট পরে আবার ইয়দ (י), তাহলে 'হি'। আর শেষে 'মেম' (מ)। তাহলে শব্দটি হলো 'এলোহিম', অর্থ মাবুদ বা আল্লাহ।

চতুর্থ শব্দ 'וְאֶת'। প্রথম অক্ষর আলেফ (א), নিচে 'এ', তাহলে উচ্চারণ 'এ'। শেষের অক্ষর টাভ (ת) বা 'থ'। শব্দটা দাঁড়ালো, 'এথ'। এর অর্থ 'The', এটি একটি আর্টিকেল।

পঞ্চম শব্দ 'הַשָּׁמַיִם'। প্রথম অক্ষর হেয় (ה), নিচে 'আ', তাহলে 'হা'। 'হা' এখানে আর্টিকেল। এরপর শিন (ש), নিচে 'আ', তাহলে 'শা'। এরপর 'মেম' (מ), নিচে 'আ', তাহলে 'মা'। এরপর ইয়দ (י), নিচে 'ই'-কার, তাহলে 'ই'। শেষে 'মেম' (מ)। শব্দটি দাঁড়ালো, 'হা-শামাইম', অর্থ 'আকাশমণ্ডলী'। 'শামা' হলো 'আকাশ'। 'ইম' অর্থ বহুবচন, কেবল আল্লাহর ক্ষেত্রে সেটি সম্মানসূচক রাজকীয় একবচন (এলোহিম)।

ষষ্ঠ শব্দ 'וְאֶת'। এখানে দুটো শব্দ। প্রথম অক্ষর ভাভ (ו), নিচে 'এ'। মানে 'ভে' (আরবি 'ওয়া')। অর্থাৎ 'এবং' (and)। এটি পরের শব্দের সাথেই গুরুত্ব বসে যায়। এরপরের অক্ষর আলেফ (א), নিচে 'এ', তাহলে উচ্চারণ 'এ'। শেষের অক্ষর টাভ (ת) বা 'থ'। শব্দটা দাঁড়ালো, 'ভে-এথ'। অর্থাৎ, "and the"।

শেষ শব্দ 'אֶרֶץ'। এখানেও দুটো শব্দ। প্রথম অক্ষর হেয় (א), নিচে 'আ', তাহলে 'হা'। 'হা' এখানে আর্টিকেল। এরপরের অক্ষর আলেফ (א), নিচে 'আ', তাহলে উচ্চারণ 'আ'। এরপর রেশ (ר), নিচে 'এ', তাহলে 'রে'। আর শেষের অক্ষর 'সাদি' (ס), মানে 'ৎস'। পুরো শব্দটা 'হা-রেৎস', the earth, 'পৃথিবী'। এ নামে ইসরাইলের একটি দৈনিক পত্রিকা রয়েছে, যা খুবই বিখ্যাত।

তাহলে পুরো বাক্যটি দাঁড়ালো—

বেরেশিথ বারা এলোহিম এথ হা-শামাইম ভে-এথ হা-রেৎস।

অর্থ: “আদিতে আল্লাহ আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবী সৃষ্টি করিলেন।”

এই হলো প্রথম আয়াত, যা বর্তমানে ইহুদীদের তাওরাত বা বাইবেলের ওল্ড টেস্টামেন্টের প্রথম অধ্যায়ের প্রথম চরণে দেখা যায়।

মনে রাখা দরকার, যেহেতু হিব্রুতে এ-কার এবং ও-কার রয়েছে, কিন্তু আরবিতে নেই, তাই অনেক নামই আরবিকরণ হয়ে আরবিতে প্রবেশ করেছে, বিশেষ করে যাদের মাতৃভাষা আরবি ছিল না। যেমন ধরুন, ঈসা (আ) এর মাতৃভাষা ছিল হিব্রু কথ্যরূপ আরামায়িক, তার নামের উচ্চারণ ছিল ইয়েসোয়া (ישוע) বা ইয়েশোয়া, যার হিব্রু অর্থ ‘আল্লাহ রক্ষা করেন’; আরবিতে এ স্বরধ্বনি না থাকায় নামটি উচ্চারণ করা হয় ‘ঈসা’ (عيسى)। হযরত মূসা (আ) এর হিব্রু নাম ‘মোশে(হ)’ (משה), যেখানে আরবিতে তা ‘মূসা’ (موسى)।

হিব্রু শব্দগুলো পড়া প্র্যাক্টিস করতে চাইলে, এ বই বা আমার অন্যান্য বইতে উল্লেখিত হিব্রু শব্দগুলো পড়ে ফেলতে পারেন এখন! আর, ইন্টারনেট তো আছেই!

আশা করছি, আমি কিছুটা হলেও ধারণা দিতে পারলাম কীভাবে হিব্রু নামগুলো পড়া যায়। এই যে একটি প্রচলিত বাগধারা রয়েছে ‘হিব্রু মতো বিদঘুটে’, কথাটা কিন্তু অতোটাও সত্য নয়! তাই নয় কি?

পরিশিষ্ট ৪

গ্রন্থপঞ্জি ও তথ্যসূত্র



এ বই লিখতে গিয়ে আমি এতকিছু পড়েছি যে সেই তালিকা করা মুশকিল। এর মাঝে কিছু রয়েছে যেগুলো পাবলিকলি অ্যাভেইলেবলই নয়। তাই সেগুলোর নাম দিয়ে লাভও নেই। যেগুলো কেউ চেষ্টা করলে পড়তে পারেন, সেগুলোর তালিকা দেয়াই হয়তো ভালো হবে।

- পবিত্র আল-কুরআন
- দ্য হোলি বাইবেল, যার মাঝে ইহুদীদের বর্তমান তাওরাত
- তালমুদ
- দ্য কিংডম অফ আউটসাইডার্স (এটি মৌলিক বাংলা বই, এবং গত দেড়শো বছরের এ ইতিহাস আরও বিস্তারিত জানতে চাইলে এটি পড়তে পারেন, লেখক- সোহেল রানা।)
- ইসরায়েলের পুত্রগণ (এম ইদ্রিস আলী)
- A Treasury of Jewish Folklore, edited by Nathan Ausubel
- Trajectories in Near Eastern Apocalyptic a Post-rabbinic Jewish Apocalypse Reader by John C. Reeves
- Judaism: History, Belief and Practice by Dan Cohn Sherbok
- A Short History of the Jewish People: From Legendary Times to Modern Statehood by Raymond P. Scheindlin
- Atlas of Jewish History by Dan Cohn Sherbok

- The Jewish World in the Time of Jesus by Charles Guignebert
- The Jewish People: Their history and their religion- Penguin Books Ltd.
- The History of the Jewish Khazars by Dunlop D.M.
- The Jewish People: An Illustrated History by Shmuel Ahituv
- Atlas of Medieval Jewish History by Haim Beinart
- Jewish History in 100 Nutshells by Naomi Pasachoff, Robert J. Littman
- A Genetic History of the Jewish People- Oxford University Press
- Jewish History, Jewish Religion: The Weight of Three Thousand Years by Israel Shahak
- The History of the Jewish People in the Age of Jesus Christ by Emil Schürer
- The Story of the Jews: Finding the Words by Simon Schama
- Belonging: The Story of the Jew by Simon Schama
- সমসাময়িক খবর

শেষ কথা



অবশেষে এই বিশাল কাজটুকু শেষ করতে পেরেছি বলে ভালো লাগছে। আলহামদুলিল্লাহ। ‘ইহুদী জাতির ইতিহাস’ এবং ‘ইসরাইলের উত্থান-পতন’ এ যাবত বাংলা ভাষায় ইহুদী বা ইসরাইলকে নিয়ে সম্যক ধারণা দেয়ার জন্য পূর্ণাঙ্গ সিরিজ, সেটি বলাই যায়। অবশ্যই, একদম প্রতিটি ঘটনার পুঙ্খানুপুঙ্খ বিবরণ হয়তো এখানে নেই, কিন্তু প্রায় দেড় লাখ শব্দের এ বিশাল সংকলন পড়লে ধর্মীয় ইতিহাস ও ধর্মের বাইরের ইতিহাস দুটোই জানা হয়ে যাবে। এ সিরিজ বইয়ের জন্য কিবোর্ড ধরেছিলাম প্রায় ছয় বছর আগে, দ্বিতীয় ও শেষ বইটি বের করতে দুবছর লেগে গিয়েছে। তবে একদিক থেকে ভালো যে, ২০২১ সালের যুদ্ধের প্রতিফলন এ বইতে রয়েছে। ফিলিস্তিনের মুক্তি কবে আসবে আমি জানি না, সেটি আল্লাহই জানেন কেবল। ইসরাইল-ফিলিস্তিন নিয়ে এত মানুষ আমার কাছে মন খুলে প্রশ্ন পাঠিয়েছেন দেখে আমি অবাক হয়েছি।

অনুরোধ থাকবে, বইটি পছন্দ হলে আপনার প্রিয়জনদেরকেও উপহার দিতে পারেন, কিংবা পরামর্শ দিতে পারেন সংগ্রহ করে নিতে।

বইটি নিশ্চয়ই ভুলের উর্ধ্বে নয়, যেকোনো পরামর্শ, ভালো লাগা, খারাপ লাগা, সংশোধনী বা কোনো জিজ্ঞাসা থাকলে আমার সাথে যোগাযোগ করতে পারেন।

আমাকে ইমেইল করতে পারেন নিচের ঠিকানায়—

abdullah30im@gmail.com

অথবা ইনবক্স করতে পারেন আমার ফেসবুক পেজে (Abdullah Ibn Mahmud)–

<https://www.facebook.com/Abdullah1992Author>

কিংবা আমার ফেসবুক প্রোফাইলে–

<https://www.facebook.com/abdullah.ibnmahmud/>

আমি যদি অনিচ্ছাকৃত ভুল করে থাকি, তবে আমি আন্তরিকভাবে ক্ষমাপ্রার্থী।
আশা করছি, শীঘ্রই সংশোধন করে ফেলা যাবে।

আর হ্যাঁ, আমার অন্যান্য বইগুলোও পড়ার আমন্ত্রণ রইলো।

ইতি,

আব্দুল্লাহ ইবনে মাহমুদ

ঢাকা

২২.২.২২

“ইহুদী জাতির ইতিহাস”

৩

“ইসরাইলের উত্থান-পতন”

সমাপ্ত



প্রায় দুই হাজার বছর আগে রোমান সম্রাট এসে ধ্বংস করে দিলেন পবিত্র জেরুজালেম, গুঁড়িয়ে দিলেন বাইতুল মুকাদ্দাস বা সেকেন্ড টেম্পল অফ সলোমন, তাড়িয়ে দিলেন ইহুদীদের। তারপর তারা কোথায় গেল? কী করে টিকে ছিল? আর এতগুলো বছর পর কী করে দাপটের সাথে ফিরে এলো সেই একই জায়গায়, সেই পবিত্র ভূমিতে?

হিটলারের ইহুদী-নিধনের পেছনে কারণ কী ছিল? উসমানি খেলাফত অর্থাৎ অটোমান সাম্রাজ্যে কেমন ছিল ইহুদীদের জীবন? ইউরোপ আর আমেরিকায় তাদের বসবাসের শুরু কীভাবে? সেখানে তাদের দিনাতিপাত ভালো ছিল নাকি খারাপ? ব্যাবিলন আর আন্দালুসিয়ার ইহুদীদের অবস্থা কেমন ছিল? খাজার ইহুদী কারা? আশকেনাজি, সের্ফোর্দি এবং মিজরাহি ইহুদী কারা? জায়োনিজমের যাত্রা কীভাবে শুরু? ইসরাইল রাষ্ট্রের প্রতিষ্ঠা কীভাবে? আদি-নিবাসী ফিলিস্তিনিদের সাথে কেন রক্তপাত? কেন আক্রমণ গাজায়? পশ্চিম তীরের ভবিষ্যৎ কী? আগামী দিনগুলোতে আমরা পবিত্র ভূমির রাজনীতিতে কী দেখতে পারি?

ইহুদী জাতির গত দুই শতাব্দীর আগের ইতিহাসটুকু নিয়ে বাংলা ভাষায় বিস্তারিত কাজ প্রায় হয়নি বললেই চলে, এ বইটি সেই শূন্যস্থান পূরণ করবে। পাঠকপ্রিয় 'ইহুদী জাতির ইতিহাস' বইয়ের পর এ বইতে রয়েছে গত দুই হাজার বছরের লিপিবদ্ধ ইতিহাস যা আপনাকে সাহায্য করবে পবিত্র ভূমির রাজনীতি সম্পর্কে স্বচ্ছ ধারণা অর্জনে। আর সেই সাথে রয়েছে অজস্র পাঠকের নানা জিজ্ঞাসার উত্তর। 'ইসরাইলের উত্থান-পতন' বইটি পাঠকদের হতাশ করবে না আশা রাখি।

